প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

চুনীপান্নার রাজমুকুট কাউন্ট রজারের গুপ্তধন যোদ্ধামূর্তি রহস্য রানীর রত্নভাণ্ডার

ফ্রান্সিস সমগ্র (৩)

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

FRANCIS SAMAGRA PART 3
By Anil Bhowmick
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ১৯৯৬

পরিবেশনায় ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎ চন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ ঃ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণে ঃ
ইন্দ্রলেখা প্রেস

একশত টাকা মাত্র
Rs. One hundred ten Only

ISBN-81-7334-122-2

আজকের দিনে যে জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর পরেই তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ

নেশা সাহিত্য হলেও পেশায় শিক্ষক আমি। ছাত্রদের কাছেই প্রথম বলতে শুরু করি দুঃসাহসী ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের গল্প। দেশ, কাল, মানুষ সবই ভিন্ন, তবু গভীর আগ্রহ নিয়ে ছেলেরা সেই গল্প শুনতো। তখনই মাথায় আসে-ফ্রান্সিসদের নিয়ে লিখলে কেমন হয়। "শুকতারা" পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদারকে একটা পরিচ্ছেদ লিখে পড়তে দিই। উনি সেটুকু পড়ে খুশী হন। তাঁরই উৎসাহে শেষ করি প্রথম খণ্ড "সোনার ঘণ্টা"। "শুকতারা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সেটা। পরবর্তী খণ্ড "হীরের পাহাড়"ও "শুকতারা"তেই প্রকাশিত হয়। পরের খণ্ডগুলো প্রকাশের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন 'উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির'-এর কর্ণধার কিরীটিকুমার পাল। উভয়ের কাছেই আমি ঋণী।

ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের দুঃসাহসিক অভিযানের সমগ্র কাহিনী একটি বইয়ের মধ্যে পেয়ে কিশোর কিশোরীরা খুশী হবে, এই আশাতেই "ফ্রান্সিস সমগ্র" খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অক্টোবর ১৯৯৬ অনিল ভৌমিক

এই লেখকের কয়েকটি বই

বই	সমগ্র
সোনার ঘন্টা হীরের পাহাড় মুক্তোর সমুদ্র তুষারে গুপ্তধন	ফ্রান্সিস সমগ্র—১ম
রূপোর নদী মনিমানিক্যের জাহাজ বিষাক্ত উপত্যকা চিকামার দেবরক্ষী	ফ্রান্সিস সমগ্র—২য়
চুনীপান্নার রাজমুকুট কাউন্ট রজারের গুপ্তধন যোদ্ধামূর্তি রহস্য রানীর রত্নভাণ্ডার	ফ্রান্সিস সমগ্র—৩য়
যীশুর কাঠের মূর্তি মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস চার্লসের স্বর্ণসম্পদ রূপোর চাবি	ফ্রান্সিস সমগ্র—৪র্থ
ভাঙা আয়নার রহস্য সম্রাটের রাজকোষ রত্নহার উদ্ধারের ফ্রান্সিস রাজা ওভিড্ডোর তরবারি	ফ্রান্সিস সমগ্র—৫ম
চিচেন ইতজার রহস্য পাথরের ফুলদানি স্বর্ণখনির রহস্য হীরক সিন্দুকের সন্ধানে	ফ্রান্সিস সমগ্র—৬ষ্ঠ
সোনার ঘর শায়িত দেবতাদের মন্দির গর্ভগৃহে ধনভাণ্ডার রাজা আলফ্রেডের স্বর্ণখনি	ফ্রান্সিস সমগ্র—৭ম
সোনার সিংহাসন সিয়োভরের রত্নভাণ্ডার মৃত্যুসায়রে ফ্রান্সিস সুলতান হানিফের রত্নভাণ্ডার	ফ্রান্সিস সমগ্র—৮ম

ফ্রান্সিস সমগ্র ১—৮

এছাড়াও

সোনার শেকল
সর্পদেবীর গুহা
মেরীর স্বর্ণমূর্তি
হাতিপাহাড়ের গুপ্তধন
অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র
কিশোর গল্পসম্ভার

উৎসর্গ

শ্রী পুষ্পেন্দু লাহিড়ী
শ্রী অশ্বিনী দেবনাথ
প্রিয়সুহৃদবরেষু

এর পূর্ববর্তী পর্বগুলি ঃ

সোনার ঘন্টা
হীরের পাহাড়
মুক্তোর সমুদ্র
তুষারে গুপ্তধন
রূপোর নদী
বিষাক্ত উপত্যকা
মণিমানিক্যের জাহাজ
চিকামার দেবরক্ষী
ফ্রান্সিস সমগ্র (১ম)
ফ্রান্সিস সমগ্র (২য়)

এর পরবর্তী পর্বগুলি ঃ

কাউন্টরজারের গুপ্তধন
যোদ্ধামূর্তির রহস্য
রাণীর রত্ন ভাণ্ডার
যীশুর কাঠের মূর্তি

এছাড়াও লেখকের আরও কয়েকটি বই ঃ

সাহারার রহস্য
সর্পদেবীর গুহা
সোনার শেকল

চুনী পান্নার রাজমুকুট

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

চুনী পান্নার রাজমুকুট

ফ্রান্সিস, মারিয়া আর ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা যখন জাহাজে উঠল তখন রাত্রি নেমেছে। ফ্রান্সিস আর মারিয়া জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল। ওদের ঘিরে দাঁড়াল ভাইকিং বন্ধুরা। সবাই আনন্দে আত্মহারা। কেউ হেঁড়ে গলায় গান গাইছে, কেউ নাচছে। চিকামার গুপ্ত দেবমূর্তি উদ্ধার করেছে ফ্রান্সিস আর মারিয়া।

এবার ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব। আস্তে আস্তে গোলমাল থেমে গেল। সবাই চুপ করল। ফ্রান্সিস বলল—ভাইসব, গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি আমরা উদ্ধার করেছি। আমরা সফল। তবে এর আগে মূল্যবান কিছু না কিছু নিয়ে আমরা স্বদেশে ফিরেছি। এবার আমাদের হাত শূন্য। কিন্তু আমি এজন্যে দুঃখিত নই। আমি ভালোবাসি দুঃসাহসিক অভিযান আর বুদ্ধির খেলা। সেদিক দিয়ে আমাদের অভিযান সফল। বুদ্ধির খেলাতেও আমরা জয়লাভ করেছি। এবার ভাইসব, আজ রাতটুকু বিশ্রাম করে কাল ভোরেই যাত্রা শুরু করবো স্বদেশের দিকে। ফ্রান্সিস থামতেই সব ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া চলল নিজেদের কেবিনের দিকে। অন্য ভাইকিংরাও কেউ কেউ গেল কেবিনে, কেউ কেউ জাহাজের ডেকে দল বেঁধে বসল। গল্পগুজব, ছক্কাপাঞ্জা খেলা শুরু হলো।

পরদিন ভোরে ভাইকিংরা ঘুম থেকে উঠে পড়ল। ডেকে এসে দেখল বাতাস বেশ পড়ে গেছে। শুধু পাল খাটালেই জাহাজের গতি বাড়বে না। তাই একদল চলে গেল দাঁড়ঘরে। সেখানে সারি সারি দাঁড় টানার আসনে বসল। ওদিকে ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো শেষ হলো। দাঁড়ীরা দাঁড় টানা শুরু করল। জাহাজ চলল উত্তরমুখো, ভাইকিংদের দেশের দিকে।

মাস চারেক কেটে গেল। জাহাজ চলেছে। এর মধ্যে তিন চারটে বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। জাহাজের মেরামতির কাজ হয়েছে। খাদ্য, জল সংগ্রহ করতে হয়েছে। বার তিনেক ঝড়ের পাল্লায়ও পড়তে হয়েছে ওদের।

তখন জাহাজ ইউরোপের কাছে এসেছে। স্বদেশ আর বেশি দূরে নয়।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশে মেঘের জটলা দেখা গেল। সূর্য ডোবার আগেই গ্রামভাউসা বন্দর এলাকা সমুদ্র অন্ধকার হয়ে গেল। ফ্রান্সিস কেবিনঘরে শুয়েছিল। মারিয়া বিছানায় বসে রুমাল সেলাই করছিল। কাজের মধ্যেই ফ্রান্সিসের সঙ্গে গল্পও করছিল। আকাশে মেঘ জমা বাতাস পড়ে যাওয়া এসব ফ্রান্সিস মারিয়া বুঝতে পারেনি। জাহাজের নজরদার মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গা থেকে নেমে এল। ডেক-এ বিশ্রামরত দু'তিনজন ভাইকিং-এর কাছে এল। নজরদার হাত তুলে ওদের আকাশের অবস্থা দেখাল। ওরা ভাইকিং। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নাড়ির টান। ওরা বুঝতে পারল ঝড় আসছে। একজন ভাইকিং ছুটল কেবিনঘরের বন্ধুদের আসন্ন ঝড়ের খবর দিতে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে সবাইকে তৈরি হতে

হবে তো। হ্যারি তখনই সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে আসছে। ভাইকিং বন্ধুটি সিঁড়ির গোড়ায় হ্যারিকে দেখল। বলল—হ্যারি শিগগির ফ্রান্সিসকে খবর দাও। সাংঘাতিক ঝড় আসছে। হ্যারিও একনজর মেঘে অন্ধকার আকাশটা দেখেই বুঝল ঝড় আসতে বেশি দেরি নেই। হ্যারি ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। খবর শুনে ফ্রান্সিস মারিয়া দু'জনেই জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ততক্ষণে জাহাজে 'সাজো' 'সাজো' রব পড়ে গেছে। ভাইকিংরা চিৎকার করে পরস্পরকে ডাকাডাকি শুরু করল। সকলে ডেক-এ এসে জড়ো হল। দু'চারজন দড়িদড়া বেয়ে উঠে পাল নামিয়ে ফেলল। দাঁড়ঘরে দাঁড়ীরা দাঁড়টানা বন্ধ করল। জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল সবাই। সবাই তৈরি হল ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—তুমি এখানে থেকো না। কেবিনঘরে নেমে যাও। মারিয়া মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিস বলল—ছেলেমানুষি করো না। যা বুঝছি প্রচণ্ড ঝড় আসছে। ডেক-এ থাকলে তুমি টাল সামলাতে পারবে না। আহত হবে। নিচে নেমে যাও।

—রাজকুমারী আপনি কেবিনঘরে চলে যান। এ সময় ডেক-এ থাকা বিপজ্জনক। হ্যারি বলল। মারিয়া আর আপত্তি করল না। বাধ্য মেয়ের মত সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরে চলে গেল।

ওদিকে সূর্য-ঢাকা প্রায় অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো আঁকাবাঁকা রেখা আকাশটাকে যেন চিরে ফেলতে লাগল। তারপরই উন্মত্ত দানবের মত প্রচণ্ড বেগে ঝড় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। বিরাট বিরাট ফেনাভরা ঢেউয়ের মাথায় জাহাজটা উঠতে লাগল পরক্ষণেই ঢেউয়ের ফাটলে নেমে যেতে লাগল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে উত্তাল সমুদ্রের জলে কলার মোচার মত জাহাজের ওঠাপড়া চলল। শক্তহাতে হুইল ধরে জাহাজের গতি উত্তরমুখো রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল ফ্রান্সিস। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবে ঝড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজ যে কোনদিকে দ্রুতগতিতে চলল ফ্রান্সিস তা আন্দাজ করতে পারল না। ভাইকিংরা দড়িদড়া প্রাণপণে টেনে ধরে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল। ডেক-এর ওপর দিয়ে বিরাট বিরাট ঢেউ জাহাজের এপার থেকে ওপার আছড়ে পড়তে লাগল। ডেক-এ জলস্রোত রইল। সব ভাইকিং ভিজে নেয়ে উঠল। চলল ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই।

মাস্তুলের মাথায় নজরদার মাস্তুল আঁকড়ে ধরে বসে আছে। মাস্তুল একবার এদিকে হেলছে একবার ওদিকে। কিন্তু নজরদার ওস্তাদ নাবিক। ঠিক ঐ দুলুনির মধ্যেই চুপ করে বসে আছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—বুঝতে চেষ্টা করছে কোনদিকে ওরা যাচ্ছে। কিন্তু দেখবে কী বুঝবেই বা কী? চারদিকে অঝোর বৃষ্টিধারা আর ছিটকে-ওঠা সমুদ্রের জল একটা ঘন ধোঁয়াটে আবরণের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে দিয়ে নজরদার প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তবু হঠাৎ যেন খুব অস্পষ্ট দু'পাশে দু'টি পাহাড়ি ডাঙা দেখতে পেল। ও চোখ কচলে ভালো করে দেখবার চেষ্ট করল দু'পাশের পাহাড়ি ডাঙা। কিন্তু তখন আরো জোরে বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। চারদিক আরো ঝাপসা হয়ে গেল। ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজটাও যেন

জলের ওপর ছিটকে ছিটকে গড়িয়ে চলছে। নজরদার আর কিছুই দেখতে পেল না।

আস্তে আস্ত ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমতে লাগল। আকাশে মেঘ আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। আকাশ বেশ পরিষ্কার হল। পশ্চিমদিগন্তে দেখা গেল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সূর্য ডুবে গেল যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে। চারদিক অন্ধকার হ'য়ে আসতে লাগল। সব ভাইকিংরা সপ্‌সপে ভেজা পোশাক নিয়ে এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্তিতে ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে ছিল বসে ছিল। এখন সবাই উঠে পোশাক পাল্টাতে চলল।

রাতে পরিষ্কার আকাশে তারা ফুটল। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের ঢেউয়ের নরম ঝিকিমিকি দেখা গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। একটু পরে মারিয়াও এল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল—হ্যারি, লক্ষ্য করেছো এখানে সমুদ্র খুব শান্ত। জলের রঙও গভীর নীল। আমরা কি অন্য কোন সমুদ্রে এসে পড়লাম? চারদিক দেখতে দেখতে হ্যারি বলল—ঠিকই বলেছো—এরকম সমুদ্র আমরা পেয়েছিলাম যেবার সোনার ঘণ্টা উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। মারিয়া বলল—আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো—শীত কিন্তু অনেক কম। গরমও বেশি নয়। তার মানে আমরা একটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এসে পড়েছি।

—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন রাজকুমারী—হ্যারি বলল—আমার মনে হয় আমরা ঠাণ্ডার দেশ ইউরোপ থেকে দূরে—বেশ দূরে চলে এসেছি।

ফ্রান্সিস বলল—চলো তো—জাহাজ চালকের কাছে যাই। ও কী বলে দেখা যাক। তিনজনেই জাহাজ চালকের কাছে এল। চালক ওর হুইল ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—বলতে পারো ঝড়ের ধাক্কায় আমরা কোথায় চলে এসেছি? চালক মাথা নাড়ল। বলল—কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এই শান্ত সমুদ্র দেখে গরম দেখে

বলতে পারো ঝড়ের ধাক্কায় আমরা কোথায় চলে এসেছি?

মনে হচ্ছে আমরা পর্তুগাল বা স্পেনের কাছে আসিনি। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন যে কোন দেশ বা দ্বীপ পেলে জানতে পারবো আমরা কোথায় এসেছি। এখন কতকটা আন্দাজেই জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দেখি কোন দেশ বা দ্বীপে পৌঁছোতে পারি কিনা।

—হুঁ—এ তো চিন্তার কথা। ফ্রান্সিস চিন্তিতমুখে বলল। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল এখন কী করবে ওরা। হ্যারি তখনই মাস্তুলের মাথার দিকে তাকিয়ে নজরদারকে গলা চড়িয়ে ডাকল—পেড্রো—একবার নেমে এসো তো। নজরদার পেড্রো—মাস্তুলে বাঁধা দড়ির মই বেয়ে নেমে এল। পেড্রো কাছে আসতে হ্যারি বলল—ডাঙা দেখতে পেলে? পেড্রো মাথা নাড়ল।

—কোথায় এসেছি বলে তোমার মনে হচ্ছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে বলবো। ঝড়ের পাল্লায় পড়ে আমরা দিক ভুল করেছি। এখন কোনদিকে যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। পেড্রো বলল।

—আচ্ছা পেড্রো—মারিয়া বলল—তুমি কি ঝড়ের সময় কোনদিক থেকে ঝড় বইছে কোনদিকে আমরা যাচ্ছি বুঝতে পারো নি? পেড্রো কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—ডানদিকে অর্থাৎ গরমের দেশগুলোর দিকে জাহাজ বাঁক নিয়েছিল এটা বুঝেছি।

—নজরে পড়ার মত কিছু দেখো নি? মারিয়া বলল। পেড্রো আবার ভাবতে লাগল। তারপর বলল—ঝড়ের সময় জোর হাওয়ায় ছিটোনো বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবে আমি তখন যেন আবছা দেখেছি দু'ধারে দুটো পাহাড়ের মত উঁচু ডাঙা! পাথুরে ডাঙা।

—দু'দিকে দুটো পাথুরে উঁচু ডাঙা? কথাটা মারিয়া আপনমনে বলল। ভাবতে লাগল—কী হতে পারে ঐ দুটো ডাঙা।

—আমার দেখার ভুলও হতে পারে। পেড্রো বলল। মারিয়া কোন কথা না বলে ভাবতে লাগল। তারপর কী একটা ভেবে নিয়ে মারিয়া চমকে উঠল। বলল—ফ্রান্সিস আমরা একটা প্রণালী পেরিয়ে এসেছি। তার মানে আমরা ডানদিকে অনেকটা চলে এসেছি—গ্রীসের কাছাকাছি। ইউরোপ থেকে গ্রীসে আসতে গেলে একটা প্রণালী পেরিয়ে আসতে হয়।*

—বলো কি? তাহলে তো অনেকটা চলে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল—এবার তো ফিরতে হয়।

—আমার অনুমানটা ঠিক কিনা সেটা বুঝতে হলে কোন ডাঙায় পৌঁছোতে হবে। আগে তো কোন ডাঙা পাই—লোকজন পাই—কথা বলি—তারপর সব বুঝে নিয়ে জাহাজের গতি ঠিক করা যাবে। মারিয়া বলল।

—আমিও তাই বলি—হ্যারি বলল—এখন জাহাজ যেমন চলছে চলুক—দেখা যাক কোথায় গিয়ে ডাঙা পাই।

---

* আসলে ফ্রান্সিসদের জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ঝড়ের ধাক্কায় আজকের জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে ক্রীট দ্বীপ, গ্রীসের দিকে যাচ্ছিল।—লেখক

—পেড্রো—ফ্রান্সিস বলল—তোমার জায়গায় যাও—দিনরাত নজরদারি চালাও—দেখ ডাঙার দেখা পাও কিনা।

জাহাজ চলল।

দু'দিন পরে সকালবেলা মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার পেড্রো চিংকার করে উঠল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কথাটা ডেকে বসে থাকা ভাইকিংদের কানে গেল। সবাই জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল দূরে পাথুরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। টিলা আর পাথরের চাঁই ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। জাহাজ আরো কাছে আসতে দেখা গেল এদিকটায় অত টিলা বা পাথরের চাঁই নেই। বন্দরমতো। দুটো জাহাজ নোঙর বাঁধা রয়েছে। জাহাজ দুটো একেবারে পাথুরে মাটির ধারেই ভাসছে। জাহাজ দুটোর মাথায় কোনো পতাকা উড়ছে না। কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিস ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল একটা জাহাজের সামনের দিকে কালো কাঠ অনেকটা চটে উঠে গেছে। অন্য জাহাজের সঙ্গে জোর ধাক্কা লাগলে এরকম হয়। ফ্রান্সিস বুঝল—এটা যুদ্ধ জাহাজ। ততক্ষণে হ্যারি, মারিয়া আর বিস্কো ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, একটা জাহাজ বোধহয় মালবাহী। অন্যটা মনে হচ্ছে যুদ্ধজাহাজ। ঠিক বুঝতে পারছি না এখানে আমাদের নামা উচিত হবে কি না।

হ্যারি বলল—আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। তবে ভয় কিসের? তাছাড়া আমরা সমুদ্রে পথ হারিয়েছি। এটা কোন দ্বীপ বা দেশ সেটা জানতে পারলে আমাদের পথ খুঁজে পাওয়ার সুবিধে হবে।

মারিয়া বলল—একটা ব্যাপার দেখ, দুটো জাহাজই কিন্তু জনশূন্য। কোনো পাহারাদারও নেই। অদ্ভুত ব্যাপার!

উপায় নেই। বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা বন্দর। খোঁজখবর নিতে নামতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি জাহাজ-চালকের কাছে গেল। বলল—যতটা কাছে সম্ভব জাহাজ ভেড়াও। খোঁজখবর নেবার জন্যে কয়েকজনকে নামতে হবে।

দুটো জাহাজের পাশ দিয়ে গিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ পাথুরে ডাঙার কাছে এসে থামল। তখনও দেখা গেল জাহাজ দুটো ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে কাঠের পাটাতন নামানো হলো। তীরে গিয়ে পাটাতন ঠেকল। এবার নামা হবে কিনা তাই নিয়ে ফ্রান্সিসদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। জাহাজ-চালকও ওদের কাছে এল। বলল—আমরা প্রবল ঝড়ে ছিটকে কোথায় চলে এসেছি কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই এখানে নেমে খোঁজখবর করতেই হবে। অন্তত একজন মানুষকে পেলেও জানতে পারবো জায়গাটার নাম কী? তখন দিক ঠিক করে জাহাজ চালাতে পারবো।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি কী করবে এখন?

হ্যারি বলল—বিস্কো কয়েকজনকে নিয়ে নামুক। বন্দর যখন তখন লোকজন নিশ্চয়ই আছে। দেখ সামনে দুটো পাথরের টিলামতো। মনে হয় ও দুটোর ওপাশে মানুষের বসতি আছে।

ঠিক আছে। বিস্কো তুমি কয়েকজনকে সঙ্গে নাও। অস্ত্র নিও না। তোমাদের

সশস্ত্র দেখলে লোকজন ভয় পেতে পারে। তাছাড়া আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

চারজন ভাইকিং বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বিস্কো পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে তীরে নামল। তীরের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। চারদিকে তাকিয়ে দেখতেও লাগল। কিন্তু মানুষ বা বাড়িঘর দেখতে পেল না। জাহাজ থেকে ফ্রান্সিসরা দেখল বিস্কোরা টিলা পার হয়ে নেমে গেল। আর ওদের দেখা গেল না।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে অপেক্ষা করতে লাগল কখন বিস্কোরা ফিরে আসে।

বেলা বাড়তে লাগল। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় হলো। কিন্তু বিস্কোরা ফিরল না। ফ্রান্সিসরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। কেউ খেতে বসল না। সবাই তীরের টিলার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেলা আরও বাড়ল। তবু বিস্কোদের দেখা নেই। এবার ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—হ্যারি, বিস্কোরা নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে। চলো, শাঙ্কো আর কয়েকজনকে নিয়ে আমরা নামি। বিস্কোদের খোঁজ করতেই হবে।

বেশ চলো। হ্যারি বলল।

আমিও যাবো। মারিয়া বলল।

উঁহু, ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল—আগে আমরা বিস্কোদের খোঁজ নিয়ে আসি তারপর তুমি নামবে।

কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এল। একজন বলল—ফ্রান্সিস তোমার সঙ্গে আমরাও যাবো।

বেশ, সবাই তরোয়াল নিয়ে এসো। হ্যারি যাও, আমার তরোয়ালটাও নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

তরোয়াল কোমরে গুঁজে প্রথমে ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাথুরে মাটিতে নামল। পেছনে অন্য বন্ধুরা। তীরের ঢাল পেরিয়ে ওরা টিলাটার কাছে এল। ফ্রান্সিস চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হেঁটে চলেছে। টিলাটা পার হতেই দেখল চারদিকে ছোট ছোট পাথরের চাঁই ছড়ানো। তারই মধ্যে বেশ কিছু পাথরের বাড়িঘর। কিন্তু পাথুরে পথে বা বাড়িঘরে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

ওরা টিলা থেকে ঢালু পথ বেয়ে নেমে এল। চলল বাড়িঘরগুলোর দিকে। পথের দুপাশে পাথরের খাড়া খাড়া চাঁই। তার মধ্যে দিয়ে ওরা চলল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল, পাথরের চাঁইগুলোর ওপাশে বেশ কিছুটা সমতল জায়গা। ঘাসে ঢাকা। সেই জায়গাটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভালো করে নজর দিয়ে দেখল একটা পাথর দিয়ে তৈরি বড় উনুন। তখনও আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে উনুন থেকে। উনুনের ওপরে একটা লম্বা লোহার ডাণ্ডা বাঁধা। সেই লোহার ডাণ্ডায় পাঁচ সাতটা ছাল-ছাড়ানো ভেড়া ঝুলছে। ভেড়ার মাংস আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। ফ্রান্সিস এটা দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি, আমরা বোধহয় বিপদে পড়লাম। ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল কী করবে এখন। পিছু ফিরে জাহাজের দিকে ছুটবে না এগিয়ে যাবে। কিন্তু ফ্রান্সিস কোনো কিছু করারই অবকাশ পেল না। হঠাৎ ফ্রান্সিসরা দেখল রাস্তার দু'পাশের পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে নিঃশব্দে

উঠে দাঁড়াচ্ছে সশস্ত্র সৈন্যরা। তাদের মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম হাতে খোলা তরোয়াল। ওদিকে লম্বাটে দুটো পাথরের ঘর থেকে সশস্ত্র সৈন্যরা বেরিয়ে আসতে লাগল। বাড়িঘরের দরজা জানালা খুলে গেল। লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগল। এতক্ষণে যেন ঘুম ভেঙে এই অঞ্চলটা জেগে উঠল। পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে সশস্ত্র সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে দ্রুত নেমে এল। ঘিরে দাঁড়াল ফ্রান্সিসদের। অন্য সৈন্যরাও তাদের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এদিকে আসতে লাগল।

সৈন্যদের সাজসজ্জা দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল এরা দুর্ধর্ষ গ্রীক সৈন্যদের মতো যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত। এদের একজনের সঙ্গে হয়তো তরোয়ালের লড়াই চালানো যায় কিন্তু কয়েকজনের সঙ্গে লড়াই চালানো অসম্ভব। এখন ওরা তো মাত্র ছ'জন আর ঐ সুসজ্জিত সৈন্যরা সংখ্যায় একশোরও বেশি। কাজেই লড়াই করতে যাওয়া মানে মৃত্যু ডেকে আনা। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল—সবাই তরোয়াল ফেলে দাও। ও নিজেই প্রথম পাথুরে রাস্তায় তরোয়াল ফেলে দিল। হ্যারি আর অন্যেরাও তরোয়াল ফেলে দিল। শাঙ্কো তীর-ধনুক ফেলে দিল। একজন সৈন্য সেই তরোয়াল তীর-ধনুক তুলে নিল। ছাউনি থেকে যে সৈন্যরা আসছিল তাদের সবার সামনে ছিল একজন দীর্ঘদেহী সৈন্য। মুখে সামান্য দাড়ি-গোঁফ। বেশ স্বাস্থ্যবান। সে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের মধ্যে হ্যারি ছিল সুশিক্ষিত। ও গ্রীক ভাষা, মোটামুটি জানত। হ্যারি সেই সৈন্যদের দলপতির ভাষা একটু বুঝল। দলপতি জানতে চেয়েছিল, ওরা কারা, কোত্থেকে এসেছে। হ্যারি ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—আমরা ভাইকিং। চিকামা নামে একটা জায়গা থেকে আমরা ফিরে আসছিলাম। সমুদ্রপথে প্রচণ্ড ঝড়ে আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে এখানে এসে পড়েছি। আমরা যুদ্ধ চাই না।

পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াচ্ছে সশস্ত্র সৈন্যরা।

দলপতি বলল—কিছুক্ষণ আগে আমরা কয়েকজনকে বন্দী করেছি। তারাও কি তোমাদের সঙ্গে এসেছে?

হ্যাঁ তারাও ভাইকিং। আমাদের বন্ধু। কথাটা বলে হ্যারি জিজ্ঞেস করল এটা কি গ্রীকদেশ?

না, ক্রীট দ্বীপ। এই বন্দরের নাম ফালাসর্ন। পশ্চিম ক্রীটের বন্দর।

আমাদের বন্দী করা হচ্ছে কেন? আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি।

সেসব আমাদের বিদ্রোহী নেতা এনরিকো বুঝবেন। কালকে তাঁর কাছে তোমাদের হাজির করা হবে। তিনি যা করতে বলবেন, তাই করা হবে।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। দলপতির সঙ্গে যা কথা হলো সব বলল। দলপতি জিজ্ঞেস করল—তোমাদের জাহাজে আরো লোকজন আছে?

হ্যাঁ, হ্যারি বলল—তাদেরও কি বন্দী করা হবে?

হ্যাঁ সবাইকে। চলো জাহাজের দিকে। দলপতি হাত তুলে ইঙ্গিত করল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল দলপতির কথাটা। ফ্রান্সিস বলল—ওকে বলো যে আমরা দু'জন ওদের সঙ্গে যাবো। জাহাজের বন্ধুদের আত্মসমর্পণ করতে বলবো। অযথা রক্তপাত আমরা চাই না। হ্যারি দলপতিকে সে কথা বলল। দলপতি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস ও হ্যারি এগিয়ে এল। আট দশজন সৈন্য শাঙ্কোদের নিয়ে পেছনের ঘরবাড়ির দিকে চলে গেল।

সবার আগে ফ্রান্সিস আর হ্যারি। পেছনে দলপতি আর বিশ পঁচিশজন চলল জাহাজঘাটার দিকে। জাহাজের কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া আর অন্য ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহী নেতা এনরিকোর সৈন্যদল দেখেই ওরা বুঝল ফ্রান্সিসরা বন্দী হয়েছে।

ফ্রান্সিস জাহাজের কাছে এল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, আমরা বন্দী হয়েছি। সবাই জাহাজ থেকে নেমে এসো। কেউ অস্ত্র নিয়ে আসবে না। মারিয়া আর অন্য ভাইকিংরা বুঝল এখন আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওরা আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল। সৈন্যরা সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল। দলপতি হ্যারিকে বলল—জাহাজে ওঠো, আর কেউ আছে কিনা খুঁজে দেখব। হ্যারিকে নিয়ে দলপতি জাহাজে উঠল। রসুইঘরে দুজন ভাইকিং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওরা ফ্রান্সিসের কথা শুনতে পায়নি। সেই দুজনকে নিয়ে দলপতি আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে এল।

দলপতি হাত তুলে সবাইকে ছোট টিলাটার দিকে হাঁটতে নির্দেশ দিল। দলপতি সবার সামনে। পেছনে ফ্রান্সিস, হ্যারি, মারিয়া আর অন্য ভাইকিংরা। ওদের ঘিরে নিয়ে সৈন্যরা চলল। যেতে যেতে মারিয়া বলল—কী ব্যাপার বলো তো। এরা কারা? ফ্রান্সিস বলল—এরা বিদ্রোহী নেতা এনরিকোর সৈন্য। এটা ক্রীট দ্বীপ। জানি না এখানকার রাজা কে? এনরিকো কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাও জানি না। যাক গে, ওরা কালকে আমাদের এনরিকোর সামনে নিয়ে যাবে। দেখা যাক এনরিকো কী হুকুম দেয়।

টিলামতো জায়গাটা পার হয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে এল সকলে। একটা লম্বাটে পাথরের ঘরের সামনে এসে দলপতি দাঁড়াল। ঘরটার ছাদও পাথর গেঁথে তৈরি। একটা মাত্র লোহার দরজা। সেই লোহার গরাদ দেওয়া দরজার সামনে খোলা

তরোয়াল হাতে দুজন পাহারাদার সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে বিস্কো আর দু তিন জনের মুখ দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল এটা কয়েদঘর। খুব চিন্তায় পড়ল ফ্রান্সিস। এনরিকো যদি ওদের মুক্তি না দেয় তাহলে যে করেই হোক পালাতে হবে। সবাই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দলপতির নির্দেশে একজন পাহারাদার সৈন্য দরজায় লাগানো বড় তালাটা খুলল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিসহ সবাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। তারপর একে একে কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

ভেতরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখল কয়েদঘরটা লম্বাটে ধরনের। ছাদের কাছে কয়েকটা ফোকর। মেঝেয় শুকনো ঘাস বিছানো। সেখানে বন্দীরা শুয়ে বসে আছে। বিস্কো এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস্, এভাবে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে লড়াই করে মরা ভালো।

বিস্কো, ছেলেমানুষী করো না। দেখা যাক ওদের নেতা এনরিকো কী বলে। তারপর সময় সুযোগমতো পালাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকো। বিস্কো বলল—এই এনরিকো কে, এই সৈন্যরা কী করতে চায় এসব তুমি জানো?

না! ফ্রান্সিস বলল। তখন বিস্কো বলল, তুমি এদিকে এসো। এখানে একটা লোক কিছুদিন যাবৎ বন্দী হয়ে আছে। নাম কাভাল্লি। ও এখানকার অনেক খবরাখবর জানে।

চলো তো কাভাল্লির কাছে, ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারি আর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরাও এসো। বিস্কো ওদের ঘরের কোণার দিকে নিয়ে গেল। কাভাল্লি তখন ঘাসের বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা ওর সামনে এসে বলল। কাভাল্লির পরণে জোব্বামতো। মোটা কাপড়ের। ফ্রান্সিস কয়েদ ঘরের দিকে আসার সময় এরকম পোশাক পরা স্থানীয় লোকদের দেখেছে। বিস্কো ডাকল—কাভাল্লি—কাভাল্লি। কাভাল্লি চোখ মেলে তাকাল। বিস্কো ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এ ফ্রান্সিস, ও রাজকুমারী মারিয়া ও হ্যারি। এরা সবাই আমার বন্ধু। ফ্রান্সিস তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে।

কাভাল্লি, তুমি কি এই ক্রীটের লোক? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

না—পর্তুগালে আমার বাড়ি। কাভাল্লি পর্তুগীজ ভাষায় বলল—তবে এখানে এসে গ্রীকভাষাও শিখেছি।

তুমি এখানে এসেছিলে কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

সে এক ইতিহাস—কথাটা বলে কাভাল্লি আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল।

তুমি ক্রীটে কবে এসেছিলে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

প্রায় পনেরো বছর আগে। বড় অভাবের সংসার ছিল আমাদের। তাই ভাগ্য ফেরাতে একদিন দেশ ঘর ছেড়ে একটা মালবাহী জাহাজে কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই ক্রীট দ্বীপের উত্তরে খানিয়া বন্দর। ক্রীটের রাজধানীও খানিয়া। সেই নগরে এখানে ওখানে থাকলাম কিছুদিন। তারপর হঠাৎই খানিয়ার বিখ্যাত মোজেক শিল্পীর নজরে পড়লাম। তখন মোজেকের মিস্ত্রীর কাজ করছিলাম। সেই মোজেক শিল্পী তার নিজের বাড়িতে আমাকে রাখল। মোজেকের কাজে আমার

খুব আগ্রহ দেখে আমাকে যত্ন নিয়ে কাজ শেখাতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যেই আমি পাকা মিস্ত্রী হয়ে গেলাম। তখন শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট ক্রীটে রাজত্ব করছেন। বাইজেন্টাইনরা শিল্পীমনের মানুষ। নগরে প্রাসাদে, দুর্গের দেয়ালে মেঝেয় বিচিত্র মোজেকের কাজ করাত তারা। ছবিও আঁকাত। মোজেক মিস্ত্রীর খুব চাহিদা তখন। কাভাল্লি থামল।

তারপর? হ্যারি বলল।

শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট তখন খানিয়া দুর্গে থাকতেন। তাঁর শয়নকক্ষের দেয়াল মেঝে মোজেক করার ডাক পেলাম আমি। খুব মন দিয়ে চারজন সহকর্মী নিয়ে কাজ শুরু করলাম। সম্রাট প্রত্যেকদিন কাজ দেখতে আসতেন। তিনি নিজেও শিল্পী ছিলেন। নিজেই ভেড়ার চামড়ায় রঙ দিয়ে নকশা এঁকে দিতেন। আমরা তাই দেখে দেখে কাজ করতাম। প্রায় এক বছরে কাজ শেষ হলো। সম্রাট খুব খুশি হলেন কাজ দেখে। এবার সম্রাট নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর রাজমুকুট, পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা কারু-কাজ করা সোনার রাজদণ্ড, হাতির দাঁতের হাতলওলা তরোয়াল, বিচিত্র রঙে মিনে করা তরোয়ালের খাপ, ছোরা, দামি পাথরের অলঙ্কারমালা এসব সেই সজ্জাকক্ষে আনিয়ে রাখলেন। সভাকক্ষের যে দেখাশুনা করতো সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সম্রাট তাকে স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সজ্জাঘরের সব দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। আমিই সম্রাটকে রাজসভায় যাবার আগে পোশাক পরিয়ে দিতাম। মুকুট পরিয়ে সাজিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে সুখ শান্তি নেই।

কেন? কী হলো তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

একটু ইতিহাস বলি। কনস্ট্যান্টিনোপলে তখন চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে একদল সৈন্য জাহাজে চড়ে ক্রীটে এল। তাদের নেতা ছিল বোনিফেস। সম্রাট আগেই গুপ্তচর মারফৎ খবর পেয়েছিলেন যে বোনিফেস তার সৈন্যদল নিয়ে খানিয়া আসছে। উদ্দেশ্য ক্রীট দখল করা। যা হোক, খানিয়া বন্দরে বোনিফেসের সৈন্যদের সঙ্গে সম্রাটের সৈন্যদের দুদিন ধরে যুদ্ধ হলো। সম্রাটের সৈন্যরা হেরে গেল। বোনিফেস খানিয়া দুর্গ দখল করতে এল। একটু থেমে কাভাল্লি বলতে লাগল—গভীর রাত তখন। সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠালে। বললেন, ক্রীটের চাষীদের জোব্বামতো কিছু পোশাক এনে দিতে। ছুটে গিয়ে এনে দিলাম সেদিন। সেই পোশাক পরে সম্রাট সম্রাজ্ঞী তাঁদের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে দুর্গের পেছনের গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। বোধহয় সমুদ্রতীরে আগেই একটা জাহাজ এনে রাখা হয়েছিল। কাভাল্লি থামল।

তারপর বোনিফেস রাজা হলো, ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। বোনিফেস এসে প্রথমেই খোঁজ করল শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের ধনসম্পদের। সেসব পেলও। সম্রাটের সজ্জাকক্ষের সব মূল্যবান জিনিসই ছিল। কিন্তু পাওয়া গেল না বাইজেন্টাইন সম্রাটদের বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবহৃত মূল্যবান মুকুটটা। ফ্রান্সিস এতক্ষণ গল্পের মতো ইতিহাস শুনছিল। নিখোঁজ রাজমুকুটের কথা শুনেই ফ্রান্সিস বেশ উৎসুক হলো। ও ভালো হয়ে বসল। বলল—সেই রাজমুকুট

কোথায় থাকতো।

ঐ সজ্জাকক্ষেই। কোণার দিকে একটা কাঁচের আধারে। কাভাল্লি বলল।

আচ্ছা—তুমি সেই রাজমুকুটই শেষ কখন দেখেছিলে? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

কাভাল্লি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতে বলল—তখন তো বোনিফেস আক্রমণ করতে আসছে সেসব নিয়েই খুব চিন্তায় ছিলাম। তবে যতদূর মনে পড়ছে সম্রাট যে দিন পালিয়ে যান তার তিন কি চার দিন আগে তিনি শেষ রাজসভায় গিয়েছিলেন। রাজসভা থেকে খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে সম্রাট ফেরেন। আমি তাঁকে পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টাতে সাহায্য করলাম। উনি মুকুট খুলে দিলেন। খুব মৃদুস্বরে কী বললেন বুঝলাম না। শুধু দুটো কথা বুঝলাম—সম্রাটদের ভাগ্য। আমি মুকুটটা নিয়ে কাচের আধারে রেখে দিলাম। এই পর্যন্ত আমার মনে আছে। তারপর আর রাজসভাও বসেনি, সম্রাটও সভাকক্ষে আসননি। মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে যা পরামর্শ সবই দুর্গের মন্ত্রণাকক্ষে করেছেন।

সম্রাট কি আর কখনো সেই সজ্জাকক্ষে যাননি। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। কাভাল্লি ভাবল। হঠাৎই বোধহয় ওর মনে পড়ল। বলল—হ্যাঁ, যে রাতে উনি পালিয়ে যান সেই রাতে সজ্জাকক্ষে কিছুক্ষণের জন্য ঢুকেছিলেন। কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেননি। আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি যে চাষীদের পোশাক এনে দিয়েছিলাম সেটা পরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সম্রাটের হাতে কিছু ছিল না? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ ছিল। সম্রাটদের রাজমুকুটের ছবি। ওটা দেয়ালে ঝোলানো থাকতো।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল—তা সেই ছবিটা নিয়ে সম্রাট কী করলেন?

কাভাল্লি একটু ফুঁপিয়ে উঠল। বলল—উনি ছবিটা আমাকে দিলেন। তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন। কাভাল্লির চোখ জলে ভরে উঠল। চোখ মুছল ও।

ছবিটা কি তুমি এঁকেছিলে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

না, সম্রাট নিজেই এঁকেছিলেন। কথাটা বলেই কাভাল্লি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল—সম্রাট আমাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। তখনও দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বারে সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে বোনিফেসের সৈন্যদের লড়াই চলছে। ইচ্ছে করলে আমি সম্রাটের মূল্যবান রাজদণ্ড, তরোয়ালের খাপ, চুনী পান্না নিয়ে পালাতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। আমি সজ্জাকক্ষের খোলা দরজার সামনে বসে কাঁদতে লাগলাম।

তারপর?

কতক্ষণ পরে জানি না। বোনিফেসের সৈন্যদল এল। আমি ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে সম্রাটের দেওয়া ছবিটা আমার জোব্বার নিচে লুকিয়ে ফেললাম। সৈন্যরা এসে আমাকে তুলে দাঁড় করল। আমার পরিচয় জানতে চাইল। বললাম সজ্জাকক্ষের প্রহরী আমি।

একটু পরেই বোনিফেস এল। সজ্জাকক্ষে ঢুকল। সমস্ত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে দেখে সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। সে রাজমুকুটটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও

রাজমুকুটটা দেখতে পেল না। সে এবার আমাকে দেখতে পেল। সৈন্যরা আমার পরিচয় দিল। বোনিফেস আমাকে ঘাড় ধরে সজ্জাকক্ষে ঢোকাল। বলল—বল, রাজমুকুট কোথায়? আমি কাচের আধারটার দিকে আঙুল বাড়িয়েই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। কাচের আধারটা ফাঁকা। সম্রাটের মুকুট সেখানে নেই। বুঝলাম আমি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি। বোনিফেস নিশ্চয়ই ধরে নেবে আমিই রাজমুকুট সরিয়েছি। আতঙ্কে আমি চিৎকার করে বললাম—রাজমুকুট এই কাচের আধারেই ছিল। বোনিফেস বিশ্বাস করল না। বলল—তুই চুরি করেছিস। আমি বুঝলাম বোনিফেস আমাকে বন্দী করবে। চরম অত্যাচার চালাবে আমার ওপর। আমি দ্রুত ভাবতে লাগলাম কি করে পালানো যায়। একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল। বললাম—তাহলে রাজমুকুট নিশ্চয়ই সম্রাজ্ঞীর সজ্জাকক্ষে আছে। বোনিফেস দুজন সৈন্যকে বলল আমার সঙ্গে যেতে। বলল—যা নিয়ে আয় রাজমুকুট। আমি সৈন্য দু'জনকে নিয়ে চললাম। এই দুর্গের সিঁড়ি পথ ঘর সব আমার নখদর্পণে। সৈন্য দুজন তো এই প্রথম দুর্গে ঢুকল। ওরা এই দুর্গের কিছুই চেনে না। দুর্গের দেয়ালে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। আলো-আঁধারি পথ, সিঁড়ি, ঘর। একটা বেশ অন্ধকার সিঁড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি একলাফে সিঁড়িটায় নেমে পড়লাম। সৈন্য দুজন কিছু বোঝবার আগেই সিঁড়ির নিচের অন্ধকার ঘরে দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়লাম। সৈন্য দুজন কিছুক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করল। আমাকে খুঁজল। তারপর চলে গেল। আমি দ্রুতপায়ে ছুটলাম পেছনের গোপন দরজার দিকে।

আমি একলাফে সিঁড়িটায় নেমে পড়লাম।

তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

প্রায় পাঁচ-ছ' মাস খানিয়ায় গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। খানিয়ার বন্দর দিয়ে পালাবার উপায় নেই। বোনিফেসের সৈন্যরা বন্দর পাহারা দিচ্ছে। কোনো জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়তে দিচ্ছে না। কোনো জাহাজ বন্দরে ভিড়তেও দিচ্ছে না। তখন আমি পশ্চিমমুখো এই ফালাসর্ন বন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। হেঁটে ঘোড়ায়

চড়ে দিন সাতেক পরে এখানে এসে পৌঁছলাম। এই বন্দরটা তখনও অবরোধ করা হয়নি। হয়তো কোনো জাহাজ পাবো। পর্তুগাল পালাবো। কিন্তু এখানে এসে এনরিকোর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লাম। তারা সন্দেহ করল আমি বোনিফেসের গুপ্তচর। এখানে বন্দী করে রাখল।

আচ্ছা, এনরিকো কে? এরা বোনিফেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে কেন?

এনরিকো আগে ছিল জলদস্যু। বোনিফেস রাজা হয়েই ভেনিসের কাছে ক্রীট দ্বীপকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বাঁধা রেখেছে। এমনিতেই যে ভেনিসীয় লোকেরা এখানে ছিল তারা যথেষ্ট ধনী ছিল। এখন ক্রীট দ্বীপের ব্যবসা-বাণিজ্য ওদের হাতে চলে গেছে। ক্রীটবাসীরা এতে রাজা বোনিফেসের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়। জেনোদের নেতা এনরিকো এই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ক্রীটবাসীদের নেতা হয়েছে। সে তার সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছে। রাজা বোনিফেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নানা জায়গায় দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছোটখাটো লড়াই চলছে।

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—এসব এ দেশের লোকেদের ব্যাপার! আমরা এসবের মধ্যে নেই। যাকগে কাভাল্লি, তোমার কাছে নিখোঁজ রাজমুকুটের ঘটনাটা আরো কয়েকবার শুনবো। যতটুকু শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটই রাজমুকুটের মর্যাদা রাখতে ওটা কোথাও গোপনে রেখে দিয়েছেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—আচ্ছা সম্রাটের আঁকা সেই রাজমুকুটের ছবিটা কি তোমার কাছে আছে? কাভাল্লি বলল—হ্যাঁ আছে। কিন্তু কাউকে সে কথা বলতে পারবে না।

না, বলবো না। ফ্রান্সিস বলল। কাভাল্লি এবার যে ঘাসের ওপর বসেছিল সেখানকার ঘাসগুলো সরাল। নিচ থেকে বার করল একটা গোটানো সাদাটে ভেড়ার চামড়া। চামড়াটা দুহাতে খুলে টান করে ধরল। দেখা গেল নানা রঙে আঁকা একটি রাজমুকুটের ছবি (ভেঁড়ার চামড়ার ছবিটা পরের পৃষ্ঠায় আছে)। ছবিটার তলায় নানারকম ফুল-পাতার নকশা। হ্যারি সেই নকশাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলল—ফ্রান্সিস, ছবিটার নিচে নকশার ভেতরে ভেতরে কিছু লেখা আছে। কয়েকটা প্রাচীন গ্রীক অক্ষর পড়তে পারছি। বাকিগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

যে অক্ষরগুলো তোমার চেনা তা থেকে কোনো শব্দ বুঝতে পারছো? ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি নকশার জায়গাটা ভালো করে দেখতে দেখতে বলল—শব্দটা বোধহয় 'ভাগ্য'। ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল। বলল—আশ্চর্য! কাভাল্লিও সম্রাটের মুখে এই 'ভাগ্য' কথাটা শুনেছিল। তাহলে এই নকশাটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিখোঁজ রাজমুকুটের কিছু হদিস হয়তো এই নকশা থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

অসম্ভব নয়। তবে একটা কথা অনায়াসে বলা যায় যে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট বেশ বিদ্বান ও শিল্পী ছিলেন। হ্যারি বলল। এবার মারিয়া পাতলা চামড়াটা নিয়ে ছবি নকশা দেখতে লাগল। তখনই কয়েদঘরের লোহার দরজায় শব্দ উঠল—ঠাং ঠাং। তালা খোলা হচ্ছে। কাভাল্লি তাড়াতাড়ি ছবিটা নিয়ে নিজের জোব্বার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

দশজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে লোহার দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

দুজন দুটো বেশ বড় কাঠের পাত্র নিয়ে ঢুকল। একজন সৈন্য ঘাসের বিছানার সামনে পাথরের মেঝেয় এক ধরনের লম্বাটে পাতা পেতে দিতে লাগল। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। অনেক বেলাও হয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে সকলেরই। সকলেই উঠে এসে খেতে বসল। পাতায় দুটো করে বেশ মোটা গোল রুটি আর দু'টুকরো ভেড়ার মাংস ও ঝোল দেওয়া হলো। হ্যারি সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—বাঁধা হাতে খাবো কি করে?

বাঁধন খোলার হুকুম নেই, একজন সৈন্য বলল। সবাই খেতে লাগল। খিদে তো পেয়েছে। খুবই অসুবিধে হচ্ছে খেতে। তবু কেউ কিছু বলল না। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া, এরকম কয়েদঘরে থাকা, এভাবে খাওয়া, তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

মোটেই না। তোমরা যখন পারছো আমিই বা পারবো না কেন? মারিয়া বলল।

হ্যারি খেতে খেতে বলল—ফ্রান্সিস, নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজতে যাবে নাকি?

নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে এই কয়েদঘর থেকে মুক্তি পেতে হবে।

দেখি কালকে এনরিকোর সঙ্গে কথা বলে। হ্যারি বলল।

খাওয়ার পর ঘরের কোণায় একটা পাথরের চৌবাচ্চার মত জায়গায় সৈন্যরা খাবার জল ঢেলে দিল। চিনেমাটির বড় বাটি ডুবিয়ে সবাই জল খেল। সৈন্যরা লোহার দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চলে গেল। দুজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দরজায় পাহারা দিতে লাগল।

বিকেল হলো। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাভাল্লির কাছে শোনা ঘটনাগুলো ভাবছিল। ও মনস্থির করে ফেলেছিল এখান থেকে ছাড়া পেলেই খানিয়া যাবে। খানিয়া দুর্গ থেকে খুঁজে বের করবে বাইজেন্টাইন সম্রাটদের নিখোঁজ রাজমুকুট। ও এবার কাভাল্লির দিকে তাকাল। দেখল কাভাল্লি বসে চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। ফ্রান্সিস ডাকল—কাভাল্লি।

হুঁ। কাভাল্লি মৃদু শব্দ করে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

আচ্ছা এখান থেকে কীভাবে খানিয়া নগরে যাওয়া যায়?

স্থলপথে যেতে গেলে পূবের দিকে পোলিরিনা হয়ে যেতে হবে। জলপথে যেতে গেলে উত্তরে গ্রামভাউসা বন্দর হয়ে পুবমুখো যেতে হবে। কেন যাবে নাকি? কাভাল্লি বলল।

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—আগে তো এখান থেকে ছাড়া পাই। তারপর হ্যারিকে বলল—হ্যারি কালকে দলপতি আমাদের এনরিকোর সামনে নিয়ে যাবে। আমি তো গ্রীক ভাষা জানি না। তবু তুমি কিছু জানো। যা যা বলবে সব ভেবে রাখো।

আমার সব ভাবা হয়ে গেছে। এখন সবকিছু নির্ভর করছে এনরিকো মানুষটা কেমন তার ওপর। বিদ্রোহী নেতা—মনমেজাজ কেমন কে জানে! হ্যারি বলল।

রাত হলো। ফ্রান্সিসদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো কথাবার্তা হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়ল সবাই। রাত বাড়ল। ফ্রান্সিসের মাথায় নানা চিন্তা। তবু মারিয়াকে ডেকে বলল—তোমার অসুবিধে হচ্ছে বুঝি তবু আজেবাজে চিন্তা না

করে নিশ্চিন্তে ঘুমোও। শরীরটা ঠিক রাখো। একটু রাতে ফ্রান্সিসের দু'চোখ ঘুমে বুজে এলো।

পরদিন একটু বেলায় সেই লম্বা চেহারার দলপতি এল। কয়েদঘরের দরজা খোলা হলো। দলপতি সকলের দিকে তাকিয়ে হ্যারিকে খুঁজল। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। দলপতি হ্যারিকে দেখে বলল—তুমি গ্রীক ভাষা মোটামুটি জানো বলতেও পারো। তুমি এসো।

আমার সঙ্গে আরো দুজনকে যেতে দিতে হবে।

তারা তো গ্রীক ভাষা জানে না। দলপতি বলল।

তবু আমাকে পরামর্শ তো দিতে পারবে। হ্যারি বলল।

বেশ চলো। দলপতি বলল।

দলপতির পেছনে পেছনে হ্যারি, ফ্রান্সিস আর মারিয়া কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। দুজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ওদের পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস একবার ভাবল হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলবে। কিন্তু কিছু বলল না।

পাথর ছড়ানো পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ওরা চলল। রাস্তার দুধারে পাথর গেঁথে তৈরি বাড়িঘর। স্ত্রী পুরুষরা ফ্রান্সিসদের দেখল। ওরা খুব অবাক হলো মারিয়াকে দেখে আর মারিয়ার পোশাক দেখে।

একটা ছোট টিলার ঢালে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটা পাথরের বাড়ির সামনে এল ওরা। পাথরের দরজা পার হয়ে দলপতি একটা বেশ বড় ঘরে ঢুকল। পিছনে তাকিয়ে ফ্রান্সিসদেরও ঢুকতে ইঙ্গিত করল।

একটু অন্ধকারমতো ঘরটায় দেখা গেল মখমলমোড়া একটা আসনে সাধারণ অথচ দামি কাপড়ের জোব্বাপরা একজন মধ্যবয়সী লোক বসে আছে। মুখে দাড়ি গোঁফ। ফ্রান্সিস বুঝল—এই লোকটাই এনরিকো, বিদ্রোহী নেতা। এনরিকোর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করে ফ্রান্সিস বুঝল, এনরিকো ধূর্ত এবং ক্ষমতালোভী। দলপতি একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—আমাদের কথা বলছে। দলপতির কথাগুলি এনরিকো মন দিয়ে শুনল। এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে এনরিকো বলল—তোমরা কারা?

হ্যারি গ্রীকভাষায় উত্তর দিল—আমরা ভাইকিং।

এই ক্রীট দ্বীপে এসেছো কেন? এনরিকো বলল।

আমরা জাহাজে চড়ে চিকামা থেকে ফিরছিলাম। ঝড়ে পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। আমরা এখানে থাকতে আসিনি। আমরা কাউকে হত্যাও করিনি, লুঠপাটও করিনি। তবে আমাদের বন্দী করা হলো কেন?

তোমরা ভাইকিং এটা দলপতি জেনে তোমাদের বন্দী করেছে। তোমরা দক্ষ নাবিক। বীর যোদ্ধাও। আমার সেনাবাহিনীতে তোমাদের মতো সাহসী যোদ্ধা প্রয়োজন। রাজা বোনিফেসের নাম শুনেছো? এনরিকো বলল।

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হলো। ও খুব সহজভাবে বলল—না।

আমি কে তা জানো? এনরিকো বলল।

না। একই ভঙ্গিতে হ্যারি বলল।

ও। তাহলে এই দ্বীপের কোনো সংবাদই তোমরা জানো না। যাকগে শোন, এই দ্বীপের রাজা এখন বোনিফেস। সে এই দ্বীপকে ভেনিসীয় বড়লোক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি এনরিকো। আমার নেতৃত্বে ক্রীটবাসীরা বিদ্রোহ শুরু করেছে। রাজা বোনিফেসকে আমরা ক্রীট থেকে তাড়াবো।

হ্যারি খুব বিনীতভাবে বলল—দেখুন এসব তো আপনাদের দেশের ব্যাপার। এসবের সঙ্গে আমাদের তো কোনো সম্পর্ক নেই।

তা নেই। কিন্তু তোমাদের মতো সাহসী যোদ্ধা আমাদের চাই। তোমাদের আমার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।

হ্যারি বেশ চিন্তায় পড়ল। বলল—আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলে আমাদের মতামত জানাচ্ছি। এনরিকো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল! হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল। সব শুনে ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দু'একদিন পরে আমাদের মতামত জানাব। হ্যারি এনরিকোকে বলল সে কথা। এনরিকো একটু ভেবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। হ্যারি বলল—আমাদের তো কয়েদঘরেই রাখা হয়েছে। কাজেই আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হোক।

বেশ তাই হবে, এনরিকো বলল।

মারিয়াকে দেখিয়ে হ্যারি বলল—ইনি মারিয়া, ভাইকিং দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন ইনি সহ্য করতে পারছেন না। এই জীবনযাপনে ইনি অভ্যস্ত নন। এঁকে আমাদের জাহাজে থাকতে অনুমতি দিন। তবে এঁকে পাহারা দেবার জন্যে সৈন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া আমাদের এখানে ফেলে রেখে উনি একা জাহাজ চালিয়ে পালাতেও পারবেন না।

এনরিকো মন দিয়ে হ্যারির কথা শুনল। তারপর দলপতির দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া আর মারিয়াকে জাহাজে পাহারায় রাখার নির্দেশ দিল। দলপতি এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। এনরিকো হাত তুলে ফ্রান্সিসদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ফিরে চলল কয়েদঘরের দিকে। এনরিকো হ্যারির সব অনুরোধ মেনে নিল এই আশায় যে এই দুর্ধর্য ভাইকিংদের পেলে তার সৈন্যবাহিনীর শক্তি বাড়বে। ফ্রান্সিস সেটা ভালো করেই বুঝল। কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা বাড়ল। হাতে মাত্র দুটো দিন। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি এনরিকোর বাহিনীতে যোগ না দেয় তাহলে এনরিকো ওদের প্রতি আর কোনো দয়ামায়া দেখাবে না। কয়েদঘরে হাত-পা বেঁধে বন্দী করে রাখবে। মাত্র দুদিন সময় হাতে। যে করেই হোক পালাতে হবে। কিন্তু কি করে? ফ্রান্সিস সারা রাস্তা এই কথাই ভাবতে ভাবতে এল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের সামনে এল। দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে মারিয়াকে বলল—আমাদের সঙ্গে জাহাজে চলুন। হ্যারি মারিয়াকে কথাটা বুঝিয়ে দিল। মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না, আমি তোমাদের সঙ্গে এখানেই থাকবো। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—পাগলামি করো না। তুমি বাইরে মুক্ত থাকবে। বুদ্ধি করে আমাদেরও মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু এই কয়েদঘরে থাকলে সে আশাই থাকবে না। এই কয়েদঘরেই আমাদের তিলে তিলে মরতে হবে। মারিয়া

খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝল ফ্রান্সিসের কথাই ঠিক। ও আর আপত্তি করল না। তবু ফ্রান্সিসদের এই কষ্টকর বন্দীজীবনের কথা ভেবে মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। বিষণ্ণমুখে মারিয়া দুজন সৈন্যের পাহারায় ওদের জাহাজে চলে গেল।

কয়েদঘরে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঢুকতেই সব ভাইকিং বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। একজন সৈন্য এসে সবার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফ্রান্সিস সকলের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে এনরিকোর সঙ্গে ওদের যা কথাবার্তা হয়েছে সব বলল। সবশেষে বলল—ভাইসব, এনরিকোর সেনাবাহিনীতে আমরা ঢুকবো না! কোনো যুদ্ধে আমরা জড়াবো না। দুদিন সময় হাতে। দেখি এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় ভেবে বার করতে পারি কিনা। সবাই আবার ঘাসের বিছানায় গিয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

সারাদিন কেটে গেল। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। হঠাৎ এনরিকোর সৈন্যদের মধ্যে খুব আনন্দ হৈ-হল্লা শুরু হলো। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—পাহারাদারদের জিজ্ঞেস কর তো কি ব্যাপার? হ্যারি কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে জিজ্ঞেস করলো—কী হয়েছে ভাই? এত চ্যাঁচামেচি কিসের? একজন পাহারাদার বলল—খুব খুশির খবর এসেছে। লিসস-এর যুদ্ধে বোনিফেসের সৈন্যবাহিনী হেরে গেছে। সব পালিয়েছে। লিসস এখন আমাদের দখলে। হ্যারি ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। হ্যারির কাছে কাভাল্লিও শুনল সব কথা। বলল—লিসস দক্ষিণের একটা বন্দর। রাজধানী খানিয়া একেবারে উত্তরে। এনরিকোর খানিয়া দখল করতে এখনও অনেক দেরি।

সন্ধ্যের পরেই শুরু হলো এনরিকোর সৈন্যদের বিজয় উৎসব। পাহাড়ি পথের পাশে পাশে পাথরের চাঁইগুলোর ওপাশে যে পাথর ছড়ানো প্রান্তর সেখানে চার জায়গায় শামিয়ানা মতো টাঙানো হলো। তার নিচে পাথর এনে উনুন পাতা হলো। উনুন জ্বালানো হলো। দশ পনেরোটা ভেড়া কাটা হলো। উনুনের ওপর শিকে ভেড়ার মাংস গেঁথে পোড়ানো হতে লাগল। চলল সৈন্যদের আনন্দ হৈ-হল্লা গান আর নাচ। গাধার পিঠে চাপিয়ে আনা হলো নেশার আরকের ছোট ছোট পিপে। একটু রাতে মাংস খাওয়া, আরক খাওয়া শুরু হলো।

ফ্রান্সিসদের রাতের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। রাত বাড়ছে। এখন দুহাত খোলা। মাথার পেছনে দুহাত রেখে ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে আছে। অনেক চিন্তা মাথায়। এনরিকোর হাতের মুঠি থেকে পালাতে হবে। যে করেই হোক। ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে চোখ বুজল। কিন্তু ঘুম আসছে না।

রাত বাড়ল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের খেয়াল হলো বাইরে সব চিৎকার কোলাহল একেবারে থেমে গেছে। নিস্তব্ধ চারদিক। ও কয়েদঘরের দরজার লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। মশালের আলোয় দেখল পাহারাদার দুজন নেই। তাদের পায়ের শব্দ বা কথাবার্তা কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে বসল। কী ব্যাপার? ও একছুটে দরজার কাছে এল। বাইরের মশালের আলোয় দেখল, পাহারাদারদের একজন পাথরের সিঁড়ির উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মাথার উষ্ণীষ তরোয়াল মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অন্য পাহারাদারটি বারান্দায় উপুড়

হয়ে শুয়ে আছে। তার বর্ম উষ্ণীষ দুটোই পাশে পড়ে আছে। তরোয়ালটা পায়ের কাছে মাটিতে। ওদের দুজনেরই মাথার কাছে পড়ে আছে দুটো চীনেমাটির বাটি। একটা বাটিতে কিছু নেই, অন্যটার তলায় কালো রঙের জলের মতো কী যেন রয়েছে! সৈন্য দুজন একেবারে মড়ার মতো পড়ে আছে। নড়ছেও না। প্রান্তরের দিক থেকেও কোনো শব্দ ভেসে আসছে না। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। কী ব্যাপার? সবাই কি ঘুমিয়ে পড়ল? কিন্তু সবাই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল—আশ্চর্য ব্যাপার! ফ্রান্সিস দ্রুত কাভাল্লির কাছে এল। ধাক্কা দিয়ে কাভাল্লির ঘুম ভাঙাল। কাভাল্লি উঠে বসল। চোখ ডলতে ডলতে বলল—কী ব্যাপার?

চলো তো দরজার কাছে। সৈন্যদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাহারাদার দুটো মড়ার মতো পড়ে আছে।

বলো কি। কাভাল্লি ছুটে দরজার কাছে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে পাহারাদার দুজনকে দেখল। তারপর চীনেমাটির বাটিতে কালো রঙের তরল জিনিসটা দেখে কাভাল্লি মুখে দুহাত চেপে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ততক্ষণে হ্যারিও উঠে এসেছে। পাহারাদারদের ঐ অবস্থা দেখে হ্যারিও অবাক। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল, কাভাল্লি হাসছ কেন? কী ব্যাপার? কাভাল্লির হাসি বন্ধ হলো। কাভাল্লি বলল—উৎসবের আনন্দে সৈন্য, পাহারাদার সবাই আরক খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে।

আরক?

হ্যাঁ—ঐ যে বাটিটার তলায় একটু পড়ে আছে। কালো রঙের। ওটা পোলিরিনার আরক। কালো কুচকুচে আঙুরের রসের সঙ্গে কী সব মিশিয়ে পোলিরিনার কৃষকরা ঐ আরক বানায়। ঐ আরক এক বাটি খেলে পাঁচ-ছ ঘণ্টা কোনে হুঁশ থাকে না। খুশির ঠ্যালায় ঐ আরক খেয়ে সব সৈন্য পাহারাদার কুপোকাৎ। কাভাল্লি বলল।

তাই নাকি? ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই পালাবার সুযোগ। কিন্তু দরজার তালার চাবি? গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল—সিঁড়ির ওপর যে পাহারাদারটা পড়ে আছে তার কোমরে চাবির গোছা লাগানো। এখান থেকে বেশ দূর। হাত বাড়িয়ে পাওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস কয়েদঘরের চারদিকে একটা লাঠিমতো কিছু খুঁজতে লাগল! মশালের আলোয় দেখল কয়েদঘরের কোথাও লাঠিমতো কিছু নেই। বিস্কো ও আর কয়েকজন ভাইকিং উঠে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ওদের সব বলল। কিন্তু নিরুপায় ওরা। এই সুবর্ণ সুযোগটাকে ওরা কাজে লাগাতে পারল না। ফ্রান্সিস আক্ষেপের সঙ্গে গরাদ ধরে ঝাঁকুনি দিল। শব্দ হলো ঠং। হ্যারি ধমক দিল—ফ্রান্সিস শব্দ করো না।

সময় বয়ে চলল। ওরা গরাদের সামনে অসহায়ভাবে বসে রইল।

ওদিকে জাহাজে নিজেদের কেবিনঘরে সৈন্যদের হৈ-হল্লা শুনতে শুনতে মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। মারিয়ায় ঘুম খুব পাতলা। একটু শব্দ কানে গেলেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। ও হঠাৎ দরজার কাছে একটা শব্দ শুনল—ধপ্। ওর ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার? ও একবার ভাবল পাহারাদারদের ডাকে। পরক্ষণেই ভাবল দরজা খুলে দেখা যাক। মারিয়া বিছানা থেকে নেমে এল। আস্তে আস্তে দরজা

ঠেলল। দরজা খুলল না। আবার ঠেলল। কিছুটা দরজা খুলল আবার কিছুর চাপে সরে এল। মারিয়া এবার জোরে ঠেলল। একজন পাহারাদার সৈন্য দরজায় ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে পড়েছিল। দরজার ধাক্কায় সৈন্যটা গড়িয়ে কাঠের মেঝেয় পড়ে গেল। বেহুঁশ। মারিয়া দরজা খুলে সৈন্যটিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে অবাক। অন্য সৈন্যটিও মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মড়ার মতো দুজনেই অনড়। শরীরে কোনো সাড় নেই। মারিয়া প্রথমে কিছুই বুঝল না। একটুক্ষণ দাঁড়াল। সৈন্য দুজন সেই একইভাবে পড়ে আছে। মারিয়া এর কারণ বুঝল না। কিন্তু ওর মন আনন্দে নেচে উঠল—মুক্তি।

মারিয়া আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। দ্রুত ভেবে নিল কী করতে হবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। মারিয়া ভেবে দেখল—এই পাহারাদার দুজন যে কারণেই হোক বেহুঁশ হয়ে গেছে। কিন্তু সমুদ্রতীরে পাতা পাটাতনের ধারে অন্য সৈন্যরা থাকতে পারে। পাটাতন দিয়ে জাহাজ থেকে নামা চলবে না। সাঁতরে তীরে উঠতে হবে। কিন্তু মারিয়া পরনের পোশাকের দিকে তাকাল। পায়ের পাতা অব্দি ঝুল পোশাকটার। এটা পরে সাঁতরানো যাবে না। মারিয়া হাত বাড়িয়ে চামড়ার ঝোলাটা নিল। ঝোলা খুলে কাঁচি বের করল। তারপর হাঁটুর নিচে থেকে পোশাকের বাড়তি অংশটা কচ্‌কচ্‌ করে দ্রুত হাতে কেটে ফেলল। এবার আর সাঁতরাতে কোনো অসুবিধে হবে না!

মারিয়া আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ডেকে উঠে এল। ছুটে মাস্তুলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে সমুদ্রে, সমুদ্রতীরের ছোট টিলাটায়। ও দেখল, কেউ কোথাও নেই। দ্রুত জাহাজের ওপাশে চলে গেল। দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়ল। আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামতে লাগল। হাত ছড়ে যাচ্ছে যেন। তবু মারিয়া দাঁত চেপে সহ্য করল। আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল।

কোনোরকম শব্দ না করে জাহাজের পাশে সাঁতরে চলল। তারপর জাহাজ পাশে রেখে তীরভূমির দিকে সাঁতরে চলল। দূরত্ব বেশি নয়। তবু ও যখন জল থেকে পাথর ছড়ানো তীরে উঠল তখনও হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। চারদিকে তাকাল। না, কেউ কোথাও নেই। চাঁদের অল্প আলোয় পাথরের টুকরোয় পা ফেলে ফেলে মারিয়া পাথুরে রাস্তাটায় এল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল। জলে ভেজা শরীরটা কেঁপে উঠল। পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব ও ছুটল কয়েদঘরের দিকে।

পাথর ছড়ানো রাস্তাটার ঢাল বেয়ে উঠে এসে ছোট টিলাটার কাছে পৌঁছে মারিয়া সাবধান হলো। মাথা নিচু করে আসছিল এতক্ষণ। এখন আরো নিচু হয়ে চলতে লাগল। তখনই চাঁদের মৃদু আলোয় দেখল রাস্তার পাশেই একটা পাথরের চ্যাপ্টা চাঁইয়ের ওপর দু'তিন জন এনরিকোর সৈন্য। মারিয়া ভয়ে একলাফে পিছিয়ে এল। দেখল সৈন্য ক'জন কেউ নড়ছে না। ও এবার সাহস করে এগিয়ে এল। দেখল একজন সৈন্য বসে আছে। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে আছে। অন্য দুজন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। পাথরের চাঁই থেকে পা ঝুলছে। মারিয়া হাঁপ ছাড়ল।

আবার মারিয়া মাথা আরো নিচু করে চলল। তখনই একবার মাথা একটু তুলে পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে পাথর ছড়ানো প্রান্তরের দিকে তাকাল। চাঁদের অল্প আলোয় দেখল—প্রান্তর জুড়ে সৈন্যরা এলোমেলো সব শুয়ে আছে। মনে হলো যেন এক দঙ্গল মৃতদেহ। কারো কোনো সাড় নেই। শামিয়ানার নিচে নিভন্ত উনুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দুটো গাধা চরে বেড়াচ্ছে।

মারিয়া এবার নিশ্চিন্ত হলো। মনে সাহসও পেল। তবু মাথা নিচু করে ছুটতে ছুটতে কয়েদঘরের সামনে এল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর কয়েকজন তখনও গরাদ্ দেওয়া দরজার কাছে বসে আছে। ফ্রান্সিস বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। ও-ই প্রথম মারিয়াকে দেখল। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ও চমকে উঠে দাঁড়াল। তখন মারিয়া সিঁড়িতে পড়ে থাকা পাহারাদারটিকে ডিঙিয়ে দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল, মারিয়া। মারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—হ্যাঁ আমি। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলে উঠল, ঐ যে সৈন্যটা সিঁড়িতে পড়ে আছে—ওর কোমরে চাবির গোছা আছে। খুলে নাও। তাড়াতাড়ি। মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল। সিঁড়িতে পড়ে থাকা পাহারাদারটির কোমর থেকে আস্তে আস্তে চাবির গোছাটা খুলে নিল। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে হ্যারিকে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ডাকল—হ্যারি, হ্যারি। হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। ও মশালের আলোয় মারিয়াকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—সবাইকে ডাকো। কোনো শব্দ হয় না যেন। ওদিকে মারিয়া একটার পর একটা চাবি তালায় লাগাচ্ছে। লাগছে না। সময় যাচ্ছে। উত্তেজনায় মারিয়ার হাত কাঁপছে। ভেজা কাপড়জামা গায়ে। তবু যেন ঘেমে উঠল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—তাড়াহুড়ো

দুটো চাবি পেল মারিয়া।

করো না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর। দুটো বড় চাবি পেল মারিয়া, একটা ঢোকাল, ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরল না। পরেরটা ঢুকিয়ে ঘোরাতেই কট্ করে শব্দ হলো। তালা খুলে গেল। ফ্রান্সিস দরজার গরাদ ধরেই ছিল। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলল। অস্পষ্ট ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ উঠল লোহার দরজায়। ততক্ষণে সব ভাইকিংরা জেগে আছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। নিজে গেল টিলাটার কাছে। চারদিকে তাড়াতাড়ি নজর বুলিয়ে নিল। কোনো সৈন্য কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। দ্রুত ছুটে এল বন্ধুদের কাছে। কাভাল্লিকে বলল—ঐ টিলার দিক ছাড়া জাহাজঘাটায় যাওয়ার অন্য কোনো রাস্তা তোমার জানা আছে?

হ্যাঁ, তবে খুব পাথর-টাথরের রাস্তা। কাভাল্লি বলল।

ঠিক আছে—ঐ রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলো আমাদের। ফ্রান্সিস বলল।

কাভাল্লি ডানদিকের ঢালের দিকে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা চলল। সবাই চুপ। কেউ কোনো শব্দ করছে না। ঢাল শেষ হতে কাভাল্লি বাঁ দিকে ঘুরল। সত্যিই বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়ানো এদিকটায়। রাস্তা বলে কিছু নেই। চলল সবাই। দু'তিনজন পাথরে পা হড়কে পড়ে গেল। কেটে ছড়ে গেল হাঁটু, পা। কিন্তু কেউ এতটুকু শব্দ করল না। মারিয়া হোঁচট খেল। পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করে উঠল। মারিয়া মুখ বুজে সহ্য করল। ছড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত ছোটা যায় না। তবু যত দ্রুত সম্ভব ছুটল সবাই। বাঁ দিকে একটা ছোট্ট চড়াই পেরোতেই ওরা দেখল সমুদ্রতীরের ঢাল। তীরে ভাসছে ওদের জাহাজ। জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনটা তখনও সৈন্যরা তুলে রাখেনি।

পাটাতন দিয়ে সার বেঁধে দ্রুত জাহাজে উঠে পড়ল সবাই। মারিয়া কেবিনঘরে চলে গেল। ভেজা পোশাকে ওর কাঁপুনি ধরে গেছে। জাহাজে উঠতে আর দু'তিনজন বাকি। তখনই টিলার দিক থেকে কয়েকজন সৈন্যের চিৎকার ভেসে এল। ওদের তখন হুঁশ ফিরেছে বোধহয়। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—জাহাজ নোঙর করা হয়নি। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। কোনো শব্দ না করে দাঁড় বাইতে থাকো। আমি হুইল ধরছি।

দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে চলে গেল। বাকিরা জাহাজে উঠেই কাঠের পাটাতনটা তুলে নিল। টিলার দিক থেকে কয়েকজন সৈন্যকে তখন টলতে টলতে আসতে দেখা গেল। দাঁড়ীরা দাঁড় বাইতে লাগল। জাহাজ একটু নড়ে উঠে তীরের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। জলে দাঁড়ের ঘায়ের মৃদু শব্দ উঠল—ছপ্ ছপ্। ফ্রান্সিস হুইল ঘোরাল। জাহাজ গতি পেল। ভেসে চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। একটু পরেই ঘন কুয়াশার মধ্যে জাহাজটা ঢাকা পড়ে গেল। জাহাজ চলল উত্তরমুখো। এবার ভাইকিংরা মাস্তুলে উঠে পড়ল। দড়িদড়া টেনে পাল খুলে বেঁধে দিল। হাওয়ায় পালগুলো ফুটে উঠল। জল কেটে জাহাজ বেশ দ্রুত চলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কো তখনও ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। পুব আকাশে লাল রঙের ছোপ লেগেছে। সূর্য উঠতে দেরি নেই।

মারিয়া পোশাক পাল্টে ওদের কাছে এল। বলল—আমার পাহারাদার দুজন

তো উঠে বসে আছে। শাঙ্কো ওদের তরোয়াল আগেই সরিয়ে রেখেছে। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এখনও বুঝতে পারছে না কী ঘটে গেছে।

ওরা দুজন জাহাজেই থাক। সামনে কোনো বন্দরে ওদের নামিয়ে দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পুব আকাশ আরো লাল হলো। সূর্য উঠছে। ফ্রান্সিস তাকাল সেদিকে। সমুদ্রে সূর্যোদয়ের সেই অতি পরিচিত দৃশ্য। একটু একটু উঠতে উঠতে সূর্যের নিচের দিকটা জলের সঙ্গে লেগে থাকে। একটা বড় বিন্দু যেন। একটু পরেই বিন্দুটা লাফিয়ে উঠে ওপরের গোলের সঙ্গে মিশে যায়। সূর্যোদয় দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে বলল—আঃ মুক্তি!

শুধু জাহাজ-চালক আর তার সাহায্যকারী দুজন ভাইকিং ছাড়া আর সবাই বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমোল, বিশ্রাম করল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস, কাভাল্লি, হ্যারি আর মারিয়াকে নিয়ে জাহাজের ডেকে উঠে এল। ও কাভাল্লিকে বলল—আচ্ছা, রাজধানী খানিয়া বন্দরে যেতে হলে আমরা কী ভাবে যাবো?

উত্তরে একটা বন্দর পাবো—গ্রামভাউসা। ওখান থেকে পুবদিক ধরে জাহাজ চালালে আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই খানিয়া বন্দরে পৌঁছে যাবো।

গ্রামভাউসা বন্দরের কী অবস্থা জানি না। এনরিকোর সৈন্যরা হয়তো ঐ বন্দর দখল করে নিয়েছে। কাজেই ঐ বন্দরে আমরা নামবো না। খানিয়ার দিকে জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তুমি কি সত্যিই খানিয়া যাবে।

হ্যাঁ—শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিখোঁজ মুকুট খুঁজে বার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি মৃদু আপত্তির সুরে বলল—কিন্তু বন্ধুরা কি রাজী হবে? আমরা তো অনেকদিন দেশ ছাড়া!

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, তুমি সবাইকে ডেকে আসতে বলো। দেখি ওরা কী বলে। হ্যারি সবাইকে খবর দিতে চলে গেল। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া, তুমিও কি দেশে ফিরে যেতে চাও?

তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া, আমি তোমার কাছ থেকে এই কথাই আশা করেছিলাম।

একটু রাতে সব ভাইকিং বন্ধুরা এসে ডেকে জড়ো হলো। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—ভাইসব, আমি জানি তোমরা অনেকেই দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। কিন্তু দেশে ফিরে কী হবে? সেই তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অলস জীবন। তোমরা ভালো করেই জানো ঐ অর্থহীন সুখের একঘেয়ে জীবন আমরা চাই না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল কাভাল্লির কাছে এই ক্রীটের কিছু ইতিহাস শুনেছি। খানিয়া দুর্গে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট তাঁদের বংশানুক্রমে ব্যবহৃত রাজমুকুট গোপনে রেখে দিয়েছেন। সেই ইতিহাস তোমরা কাভাল্লির কাছে শুনো। আমি

স্থির করেছি সেই নিখোঁজ রাজমুকুট উদ্ধার করবো। কাজেই আমরা এখন খানিয়া যাবো। এবার বলো তোমাদের কারো এতে আপত্তি আছে কিনা। ফ্রান্সিস থামল। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে একটু গুঞ্জন উঠল। একজন বলল—ফ্রান্সিস ভেবে দেখ, কতদিন আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি। খানিয়াতে গিয়ে আবার কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো কি না—

সে সব আমি ভেবেছি। খানিয়াতে আমি যাবোই। যদি দেখি ওখানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাহলে ওখানে আমরা নামবো না। দেশের দিকে জাহাজ ঘোরাব। কিন্তু যদি দেখি পরিবেশ শান্তিপূর্ণ তাহলে রাজমুকুট খুঁজে বের করবো! একজন ভাইকিং বলে উঠল—কী দরকার ফ্রান্সিস, চলো না দেশেই ফিরে যাই।

বেশ, সামনেই গ্রামভাউসা বন্দর। হয়তো এখনও এনরিকোর সৈন্যরা দখল করেনি। আমি, হ্যারি আর মারিয়া বন্দরে নেমে যাবো। তোমরা জাহাজে ফিরে দেশে চলে যাও। আমরা খানিয়া যাবোই। ফ্রান্সিস বলল

ভাইকিংদের মধ্যে অনেকেই বলে উঠল—না, তোমাদের রেখে আমরা দেশে ফিরে যাবো না! তোমরা যেখানে যাবে সেখানে আমরাও যাবো!

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলে উঠল—এই তো খাঁটি ভাইকিং-এর কথা। সভা ভেঙে গেল। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। ডেকে বসল কেউ কেউ। কেউ কেউ কেবিনঘরে চলে গেল।

মারিয়া বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস, তুমি কি উদ্ধার করতে পারবে সেই নিখোঁজ রাজমুকুট?

আগে খানিয়া দুর্গে যাই, সব দেখি, বুঝি। তারপর বলতে পারবো, মুকুট উদ্ধার সম্ভব কি অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন বিকেলের দিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ গ্রামভাউসা বন্দরের কাছে এল। দূর থেকে বন্দরের রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি দেখা গেল। বন্দরটা বেশ সমতল জায়গায়। দূর থেকে ফ্রান্সিস মনোযোগ দিয়ে বন্দরটা দেখতে লাগল। দেখল রাস্তাঘাটে লোকজন চলাচল করছে। বেশ স্বাভাবিক জীবন। কোনো সৈন্য দেখতে পেল না। তার মানে এনরিকো এখনও এই বন্দরটা দখল করতে পারেনি। হ্যারি পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল—এখান থেকে দেখে যা বুঝছি এখানে এনরিকোর সৈন্যরা এখনও আসেনি। জাহাজ ভেড়াবো কি না তাই ভাবছি।

হ্যারি বলল—রসুইঘরের বন্ধুরা বলেছিল, জল, খাবার এসব কমে এসেছে। তুমি খানিয়া যেতে চাইছো। কাজেই কিছু খাদ্য, জল তো সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া এনরিকোর দুজন সৈন্য জাহাজে রয়েছে। ওদেরও তো নামিয়ে দিতে হবে।

ঠিক আছে। জাহাজ ভেড়ানো যাক। তবে আমরা কেউ আগে নামবো না। আগে কাভাল্লি নামবে সৈন্য দুজনকে নিয়ে। কাভাল্লি জল, খাদ্য এসবের খোঁজ নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে এখানকার অবস্থাটাও বুঝে আসবে। যদি কোনো বিপদে পড়ার আশঙ্কা না থাকে তবেই আমরা নামবো। ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজ তীরের কাছে আনা হলো। ওরা সমতল রাস্তা দিয়ে হেঁটে বন্দরের বসতি অঞ্চলের দিকে

চলে গেল।

ফ্রান্সিস জাহাজ-চালককে নির্দেশ দিল—তৈরি থেকো। আমি হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দেবে। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে গিয়ে দাঁড়ে হাত রেখে বসল। পালও নামানো হলো না। নোঙরও ফেলা হলো না। কাঠের পাটাতনের কাছেও দু'তিনজন ভাইকিং তৈরি হয়ে রইল। ফ্রান্সিসের নির্দেশ পেলেই পাটাতন তুলে ফেলবে।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া জাহাজের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। তিনজনেই তাকিয়ে আছে বন্দরের বসতি অঞ্চলের দিকে। সবাই টান টান। তৈরি। বিপদের আঁচ পেলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে এখন? তখনই দেখা গেল কাভাল্লি ফিরে আসছে। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই হেঁটে হেঁটে আসছে। ফ্রান্সিস হাঁপ ছাড়ল—যাক, বিপদের কোনো আশঙ্কা এখানে নেই। কাভাল্লি জাহাজে উঠল, ফ্রান্সিসের কাছে এল। হেসে বলল—ভয়ের কিছু নেই। এনরিকোর সৈন্যরা এখনও এখানে আসেনি। রাজা বোনিফেসের কিছু সৈন্য এখানে আছে। খুব শান্ত এ জায়গা। আমি জল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে এসেছি। আমার সঙ্গে লোক দিন আর কিছু স্বর্ণমুদ্রা। আমি সব নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস ভাইকিং বন্ধুদের ডেকে কয়েকজনকে দায়িত্ব দিল। তারা স্বর্ণমুদ্রা, খালি জলের পিপে, বস্তা-টস্তা এসব নিয়ে কাভাল্লির সঙ্গে তীরে নামল। চলল বসতি অঞ্চলের দিকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভাইকিংরা প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার পানীয় জল নিয়ে ফিরে এল। ফ্রান্সিসরা নিশ্চিন্ত হলো।

রাতে কেবিনঘরে বিছানায় শুয়েই ফ্রান্সিস বুঝল বেশ গরম লাগছে। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। ঘুম আসছে না। আবার অনেক চিন্তাও আছে মাথায়। খানিয়া যেতে হবে। ওখানে এখন কী অবস্থা তাও জানি না। যদি গিয়ে দেখি বিদ্রোহী এনরিকোর সৈন্যরা ওখানে পৌঁছে গেছে। লড়াই চলছে তাহলে তো খানিয়া বন্দরে নামা চলবে না। ওখান থেকেই জাহাজ ঘোরাতে হবে স্বদেশের দিকে। এসব ভাবতে ভাবতে বেশ রাতে ঘুমিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। একটা চাপা গরমে ও প্রায় ঘেমে উঠেছে। বিছানায় উঠে বসল ফ্রান্সিস। মোমবাতির আলোয় দেখল মারিয়া গভীর ঘুমে। ও আর মারিয়াকে ডাকল না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। দেখল সমুদ্র শান্ত কিন্তু আকাশ খুব পরিষ্কার নয়। কেমন একটা সাদাটে ধোঁয়ার মত কুয়াশা আকাশে। চাঁদের আলোও তাই অস্পষ্ট ম্লান।

ফ্রান্সিস দেখল। ডেক-এ এখানে ওখানে কম্বলমত মোটা কাপড় পেতে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু শুয়ে ঘুমুচ্ছে। গুমোট গরম থেকে এসে ফ্রান্সিসের ভালোই লাগল। কিন্তু হাওয়া নেই একেবারে। গ্রামভাউসার বাড়িঘরও সাদাটে কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়েছে।

ফ্রান্সিস জাহাজের ডেক-এর একেবারে পেছনের দিকে এল। একটা চৌকোনো মত জায়গা রয়েছে। ফ্রান্সিস সেখানেই মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ফ্রান্সিস জানে না। হঠাৎ কী একটা অস্বস্তিতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল রাত শেষ হ'য়ে আসছে। আবার শুয়ে পড়বে কিনা ভাবছে কানে অস্পষ্ট ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ পৌঁছল। এ তো জাহাজ চলার শব্দ। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তাকাল বাইরের সমুদ্রের দিকে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখল একটা জাহাজ যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওদের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। ও জাহাজটার মাস্তুলে কোন দেশের পতাকা আছে কিনা দেখল। না। কোন পতাকা উড়ছে না। জাহাজটা আরো কাছে এল! সাদাটে কুয়াশা আর অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল জাহাজের সামনের দিকে কালো রঙের কাঠ অনেকটা চটে উঠে গিয়ে খয়েরি রঙের কাঠ বেরিয়ে আছে। এবার ফ্রান্সিস ভীষণ চমকে উঠল। এই যুদ্ধ জাহাজটাই ও ফালাসর্ন বন্দরে ভেড়ানো দেখেছিল। বিদ্রোহী এনরিকোর যুদ্ধ জাহাজটা। ঐ জাহাজে চড়েই এনরিকোর সৈন্যরা আসছে গ্রামভাউসা বন্দর দখল করতে।

ফ্রাসিন্স দ্রুত মাথা নিচু করল। তারপর জাহাজের ডেক-এর কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে শুয়ে পড়ল। শরীরটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। একটু আসতেই মাস্তুলের আড়াল পেল। আস্তে আস্তে মাস্তুলের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল। দেখল কয়েক হাত দূরেই দু'জন ভাইকিং কম্বল মত মোটা কাপড় পেতে ঘুমিয়ে আছে। তখনই দু'জনের মধ্যে একজন পাশ ফিরল। ফ্রান্সিস দেখল—বিস্কো। ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল—বিস্কো—বিস্কো। ঘুমন্ত বিস্কোর কানে গেল না সে ডাক। ওদিকে জাহজটা আরও অনেক কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ডেক-এ আবার শুয়ে পড়ল। মাস্তুলের আড়াল থেকে বুক হিঁচড়ে বিস্কোর কাছে গেল। আস্তে আস্তে বিস্কোর কাঁধে ধাক্কা দিল। বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। একবারে মুখের কাছে ফ্রান্সিসকে দেখেও সঠিক চিনল না। দ্রুত উঠতে গেল। ফ্রান্সিস ওর মাথা চেপে ধ'রে বলল—আমি ফ্রান্সিস। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো। বিস্কো মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ বুঝল নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে। ফ্রান্সিস ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল—এনরিকোর সৈন্যরা গ্রামভাউসা বন্দর দখল করতে জাহাজে চড়ে আসছে। আর অল্পক্ষণ পরেই ওদের জাহাজ আমাদের জাহাজের গায়ে এসে লাগবে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে সবাই ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়েছে। কাউকে ডাকবো না। আমাদের বন্ধুরা লড়াই যেন না করে। এনরিকোর সৈন্যরা বন্দী করতে এলে যেন বাধা না দেয়। রক্তপাত আমি চাই ন। সবাই বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে নিও। ফ্রান্সিস থামল। একটু দম নিয়ে বলল—তুমি সবাইকে এই কথা বলো। আমি জলে নেমে যাবো। সময় ও সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবো। তোমরা লড়াই করতে যেও না। অবস্থা বুঝে আমি যা করার করবো। আমি যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস আবার ডেক-এর পাটাতনে বুক হিঁচড়ে হিঁচড়ে জাহাজের পেছনের

দিকে এল। ও যখন জাহাজের হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে নামতে শুরু করেছে তখনই এনরিকোর সৈন্য ভর্তি জাহাজটা ওদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। এনরিকোর সৈন্যরা ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ তুলে ফ্রান্সিসদের জাহাজে নামতে লাগল।

বিস্কো দু'হাত তুলে উঠে দাঁড়াল। খোলা তরোয়াল হাতে দু'তিনজন সৈন্য এসে বিস্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। সেই অল্প দাড়িওলা লম্বাটে চেহারার দলপতি বিস্কোর সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্কো বলল—আমাদের কাউকে হত্যা করবেন না? কিন্তু দলপতি বিস্কোর কথা কিছুই বুঝল না। ওদিকে সৈন্যরা খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কেবিনঘরগুলোর দিকে ছুটল। শুয়ে থাকা বসে থাকা ঘুমন্ত ভাইকিংরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বন্দী হতে লাগল, এনরিকোর সৈন্যদের হাতে। হাত বেঁধে সব ভাইকিং বন্দীদের ডেক-এ আনা হল। মারিয়াকেও হাত বেঁধে আনা হ'ল। হ্যারিও এল। বিস্কো ছুটে হ্যারির কাছে গেল। দ্রুত বলল—হ্যারি ফ্রান্সিস আত্মগোপন করেছে। ও বলেছে আমরা যেন যুদ্ধ না করি। শান্ত হ'য়ে থাকি। ফ্রান্সিস নিজেই যা করবার করবে। বিস্কো হ্যারির সঙ্গে কথা বলছে তখনই সৈন্যদের দলপতি দু'জনের দিকে এগিয়ে এল। হ্যারিকে গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞেস করল—আমাদের নেতা এনরিকো তোমাদের আমাদের হ'য়ে যুদ্ধ করতে বলেছিল। তোমরা পালালে কেন? দেখুন—আমরা গ্রীক নই—এদেশের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। রাজা বোনিফেস আমাদের কোন ক্ষতি করেন নি। তবে কেন আমরা আপনাদের যুদ্ধের সঙ্গে জড়াব? হ্যারি বেশ দৃঢ়স্বরে বলল। দলপতি কিছুক্ষণ হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বন্দী হ্যারির মুখে এরকম তেজোদৃপ্ত কথা শুনে দলপতি বেশ অবাকই হল। দলপতি যখন চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন হ্যারি বলল—আমাদের রাজকুমারী মারিয়াকে এভাবে বন্দী ক'রে রাখবেন না। তাঁকে তাঁদের কেবিনঘরে থাকতে দিন। আমরা কথা দিচ্ছি আমরা পালাবার চেষ্টা করবো না। দলপতি একজন সৈন্যকে ডেকে কী বলল। সৈন্যটি গিয়ে মারিয়ার হাতের বাঁধন খুলে দিল। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—রাজকুমারী—আপনি আপনার কেবিনঘরে চলে যান।

—কিন্তু তোমরা? মারিয়া বলল।

—আমরা বন্দীত্ব মেনে নিয়েছি। এই ডেকেই থাকবো আমরা। মারিয়া একটু ইতস্তত ক'রে বলল—ফ্রান্সিস কোথায়?

হ্যারি এবার এগিয়ে মারিয়ার কাছে গেল। নিম্নস্বরে বলল।

—ফ্রান্সিস ভালো আছে। ও আত্মগোপন করেছে। কাছাকাছিই আছে। ও বলেছে আমাদের মুক্তির উপায় করবে। এখন এই সেনাপতি ও সৈন্যরা যা বলে তাই করবেন। বিরোধিতা করবেন না।

মারিয়া আর কোন কথা না ব'লে নিজের কেবিনে চলে গেল।

এসময় দলপতি উচ্চকণ্ঠে কী আদেশ দিল সৈন্যদের। সৈন্যরা এগিয়ে এসে ভাইকিংদের ডেক-এর কাঠের পাটাতনে বসে পড়তে ইঙ্গিত করল। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—সবাই ডেক-এ বসে পড়ো। সবাই আস্তে আস্তে বসে পড়ল। দু'একজন ভাইকিং একটু জোর গলায় বলল—ফ্রান্সিসকে দেখছি না—

সে কোথায়? হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস সুস্থ আছে। নিরাপদে আছে! শুধু এইটুকুই জেনে রাখো তোমরা। ফ্রান্সিস বলেছে—তোমরা এই সৈন্যদের সঙ্গে কোনভাবে লড়াইতে নামবে না। ওরা যেমন বলে তেমনি চলবে। তোমরা বিরোধিতা করবে না। সবাই চুপ করে হ্যারির কথা শুনল। ওরা বীরের জাতি। এইভাবে বিনা যুদ্ধে বন্দী দশা মানতে ওদের মন চাইছিল না। কিন্তু ফ্রান্সিস বলেছে। কাজেই ফ্রান্সিসের নির্দেশমত চলতে হবে। ফ্রান্সিস আত্মগোপন করেছে। মুক্ত আছে। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই মুক্তির ব্যবস্থা করবে। ফ্রান্সিসের ওপর সে বিশ্বাস আছে।

তখন সবে সূর্য উঠছে। পূবের আকাশ লাল হ'য়ে গেছে। একটু পরে সূর্য উঠল। তবে চারদিকে কেমন সাদাটে কুয়াশার আস্তরণ থাকায় রোদ খুব উজ্জ্বল হ'ল না।

সৈন্যদের দলপতি এবার হাতের তরোয়াল উঁচিয়ে গ্রামভাউসা বন্দরের দিকে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত ক'রে চিৎকার ক'রে কী বলল। সৈন্যরা পর পর সারি বেঁধে জাহাজ থেকে নামতে লাগল। পাথুরে রাস্তা ধ'রে সৈন্যদল চলল বসতির দিকে। জাহাজে চারজন সৈন্য ভাইকিং বন্দীদের পাহারায় রইল। একজন সৈন্য রইল মারিয়ার পাহারায়।

একটু পরেই সমস্ত এলাকা থেকে লোকজনের আর্ত চিৎকার কান্নাকাটির ধ্বনি ভেসে এল। বোনিফেসের যে ক'জন সৈন্য ছিল তারা তো হার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। বন্দী কাভাল্লি চিৎকার ক'রে বলল—এনরিকোর সৈন্যরা জিতলে আমাদের মুক্তির কোন আশা নেই। ভাইকিং বন্দীরা শুনল। কিছু বলল না কেউ। কিন্তু কাভাল্লি ওরা যখন খাদ্য জল আনতে গিয়েছিল তখন ওখানকার বসতি ছাড়িয়ে বেশিদূর যায়নি। কিছুদূরে কিন্তু রাজা বোনিফেসের প্রায় শ'খানেক সৈন্যের ছাউনি ছিল। এটা কাভাল্লিরা জানতো না। সেই ছাউনিটা ছিল একটু দূরে একটা ঘাসে ঢাকা উপত্যকার মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এনরিকোর সৈন্যরা সেই উপত্যকায় এল। এর মধ্যে বোনিফেসের সৈন্যরাও তৈরি হ'য়ে গেছে। কারণ দূর থেকে ওরা গ্রামভাউসার অধিবাসীদের আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়েছিল।

এনরিকোর সৈন্যরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল উপত্যকা দিয়ে। বোনিফেসের সৈন্যরাও সশস্ত্র হ'য়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল। দুই সৈন্যদলে তুমুল লড়াই শুরু হ'ল সেই উপত্যকায়।

ওদিকে ফ্রান্সিস ওদের জাহাজের হাল ধ'রে শুধু মাথাটা জলের ওপর ঠেকিয়ে—চুপ ক'রে জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। ওপরে জাহাজের পাটাতনে শব্দ শুনেই ও বুঝল যে এনরিকোর সৈন্যরা ওদের জাহাজে নামল। সৈন্যদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি দলপতির গলা চড়িয়ে সৈন্যদলের আদেশ দেওয়া এসব শুনে ফ্রান্সিস বুঝল—এনরিকোর সৈন্যরা ওদের জাহাজ দখল করেছে। ও আশঙ্কা করেছিল হয়তো ভাইকিং বন্ধুরা অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে বাধা দেবে লড়াই করবে। কিন্তু ও তরোয়ালের লড়াইয়ের কোন শব্দ শুনল না। বোঝা গেল—ভাইকিং বন্ধুরা লড়াইয়ের সুযোগই পায় নি। এতে ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হ'ল। রক্তপাত ও মৃত্যু এসব

ঘটল না। তখনই ও শুনল হ্যারি চিৎকার করে ওর বন্ধুদের ফ্রান্সিসের নির্দেশ জানাচ্ছে। ফ্রান্সিস আরো নিশ্চিন্ত হ'ল। ওর নির্দেশ শোনার পর আর বন্ধুরা লড়াইয়ের চেষ্টা করবে না। কিন্তু ফ্রান্সিসের মাথায় তখন চিন্তা। কী ক'রে সবাইকে মুক্ত করা যায়। মারিয়া আর সব বন্ধুরা তো নিশ্চিন্ত—ফ্রান্সিস বন্দী হয়নি। মুক্ত আছে। মুক্তির একটা ব্যবস্থা ফ্রান্সিস করবেই। সবাই মুক্তির জন্যে ওর ওপর নির্ভর ক'রে আছে একথা ভেবে ফ্রান্সিসের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। অথচ ভেবে পাচ্ছে না কী ক'রে ওদের মুক্ত করবে।

ফ্রান্সিস এবার শব্দ থেকে বুঝল এনরিকোর সৈন্যরা জাহাজ থেকে নেমে যাচ্ছে। হালের আড়াল থেকে দেখল সৈন্যরা সারি বেঁধে গ্রামভাউসার বসতি এলাকার দিকে যাচ্ছে। তার মানে জাহাজে পাহারাদার সৈন্য মাত্র কয়েকজনই আছে। এদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ নিয়ে বন্ধুদের আর মারিয়াকে নিয়ে পালাতে হবে। কিন্তু কী ক'রে? ফ্রান্সিস কাভাল্লিদের কাছে শুনেছিল এ গ্রামভাউসারে বোনিফেসের খুবই অল্প সৈন্য আছে। এনরিকোর সৈন্যদের কাছে ওরা সহজেই হার মানবে। কাজেই সৈন্যরা সকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে ফিরে আসবে। তখন কি অত সৈন্যদের চোখে ধূলো দিয়ে পালানো যাবে? তাও জাহাজে চড়ে?

ফ্রান্সিস এসব সাতপাঁচ ভাবছে তখনই দূর থেকে চিৎকার হৈ হৈ শব্দ ভেসে এল। ফ্রান্সিস চমকে উঠল। তাহ'লে রাজা বোনিফেসের আরো সৈন্য গ্রামভাউসায় ছিল। যুদ্ধের নানা শব্দ আর্ত চিৎকার এসব শব্দ শুনে ফ্রান্সিস বুঝল জোর লড়াই বেঁধেছে। ওর মন আনন্দে নেচে উঠল।

যুদ্ধে যদি রাজা বোনিফেসের সৈন্যরা জেতে তাহ'লে তো বন্ধুদের মুক্ত করতে কোন অসুবিধেই হবে না। কিন্তু যদি এনরিকোর সৈন্যরা জেতে তাহ'লে তো মুক্তির কোন আশাই নেই। তবে একটা ক্ষীণ আশা ফ্রান্সিসের মনে জাগল হয়তো যুদ্ধে জিতলে এনরিকোর সৈন্যরা আর ওদের জাহাজে আজকে নাও ফিরতে পারে। কারণ যুদ্ধে জিতলে জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে কয়েকজন পাহারাদারই যথেষ্ট। যদি ঐ সৈন্যরা বেশি সংখ্যায় গ্রামভাউসাতেই থেকে যায় আজ রাতে আর ওদের জাহাজে ফিরে না আসে তাহলে সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আজ রাতের মধ্যেই কাজে লাগাতে হবে। যে ক'রে হোক বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে। জাহাজ নিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে। এখন রাত্রির অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কাজেই ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে মুখ ভাসিয়ে জাহাজের হাল ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে বেলা বাড়ছে। ভাইকিং বন্দীরা সকাল থেকে কিছু খায় নি। যে চারজন সৈন্য ওদের পাহারা দিচ্ছিল তারা জাহাজের রসুইঘরে পালা ক'রে গিয়ে খেয়ে এসেছে। ভাইকিং বন্দীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। তারপরই ওরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো। পাহারাদার সৈন্যরা তরোয়াল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। হ্যারি দেখল বন্ধুরা উত্তেজিত। ওরা হাত বাঁধা অবস্থায় সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। যদি উত্তেজিত হ'য়ে সৈন্যদের আক্রমণ ক'রে বসে তাহ'লে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুর মৃত্যু হবেই। হ্যারি বাঁধা দু'হাত ওপরে তুলে ভাঙা ভাঙা

গ্রীক ভাষায় চেঁচিয়ে বলল—আমরা বন্দী কিন্তু আমরা তো মানুষ। এত বেলা হ'য়েছে। আমরা কিছু খাই নি, আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করো। সৈন্যরা কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। ভাইকিং বন্দীরা আবার চিৎকার ক'রে উঠলো—ও—হো—হো।

এই চিৎকার গণ্ডগোলের শব্দ মারিয়ার কানে গেল। ও দ্রুত পায়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। একজন সৈন্য কেবিনঘরের দোরগোড়ায় পাহারা দিচ্ছিল। মারিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার! এত চেঁচামেচি কীসের? পাহারাদার সৈন্যটি মারিয়ার কথা কিছুই বুঝল না। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মারিয়া রাগত স্বরে বলল—গ্রীক ভূত! তারপর ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সৈন্যটি তরোয়াল বাড়িয়ে ধ'রে মারিয়ার পথ আটকাল। মারিয়া ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সৈন্যটির দিকে তাকাল একবার। তারপর ডানহাতের এক ঝটকায় তরোয়ালের ফলা সরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। সৈন্যটি কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। পাছে মারিয়া পালিয়ে যায় তাই ও একছুটে এগিয়ে এসে মারিয়ার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। মারিয়া ডেক-এ উঠতেই ভাইকিং বন্দীরা আবার চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—হো। মারিয়া হ্যারির কাছে এল। বলল—কী ব্যাপার হ্যারি?

—রাজকুমারী—সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি । ক্ষুধার্ত আমরা। দুপুরে খাওয়া জুটবে কি না জানি না। হ্যারি বলল। মারিয়া বলল—হ্যারি আমি সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আমি যে গ্রীক ভাষা জানি না। সৈন্যরা আমার কথা বুঝবে না। তুমি ওদের বুঝিয়ে বলো। হ্যারি সৈন্যদের বলল—শোন—রাজকুমারী মারিয়া আমাদের খাবার তৈরি করে দেবেন। উনি পালাবেন না। যদি তোমাদের মনে সেই সন্দেহ থাকে তাহ'লে রসুইঘরের দরজায় দু'জন পাহারাদার রাখতে পারো। এবার সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে কথা বলল। ওরা রাজি হ'ল। দু'জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়ার পেছনে এসে দাঁড়াল।

—কিন্তু রাকুমারী হ্যারি বলল—আপনি একা কি পারবেন এতজন লোকের রান্না করতে? আপনার খুব কষ্ট হবে।

—কিচ্ছু না—মারিয়া একটু হেসে বলল। তারপর নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে তরোয়াল উঁচিয়ে দু'জন পাহারাদার সৈন্যও চলল।

মারিয়া দ্রুতপায়ে রসুইঘরে এল। সৈন্য দু'জন দরজায় দাঁড়াল। মারিয়া রাজকুমারী হলেও আলস্যে দিন কাটাতো না। নিজের কাপড় জামা কাচতো, কাপড় রুমাল সেলাই করতো। রাজবাড়ির ফরাসী রাঁধুনির কাছে নানারকম খাবারের পদ রান্না করাও শিখেছিল। কিন্তু এত লোকের রান্না তো মারিয়া কোনদিন রাঁধেনি। তবুও নিজে থেকে এগিয়ে এসে এই দায়িত্ব নিল। এই বন্দী ভাইকিংদের একটাই পরিচয় ওরা ফ্রান্সিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু

প্রথমে মারিয়া আটা, ময়দা, চিনি, আনাজপাতি, মশলা এসব কোথায় কোথায় রাখা আছে দেখে নিল। একটা বড় গামলায় ভেড়ার মাংস কেটে রাখা আছে দেখল। এবার উনুন জ্বালা। তারপর রান্না।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে রান্না শেষ হ'ল। মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। বেশ

গলা চড়িয়ে বলল—রান্না হ'য়ে গেছে। ভাইকিং বন্দীরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো। অত লোকের জন্যে রান্না করার ধকলে মারিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে। ও তবু হাসল।

সৈন্যরা চারজন চারজন ক'রে ভাইকিংদের পাহারা দিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। এইবাবে ভাইকিং বন্দীরা খেয়ে আসতে লাগল। হ্যারি সবাইকে খেতে পাঠাতে লাগল। ও খাবে সবশেষের দলে, হ্যারি এসময় উঠে দাঁড়াল। একজন সৈন্য তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। হ্যারি বলল—খাবার আগে আমরা আমাদের দেবতাকে খাদ্য জল উৎসর্গ করে খাই। আমি দেবতাকে ডাকবো। আমাকে জাহাজের পেছন দিকে গিয়ে দেবতাকে ডাকতে হবে। সৈন্যটি কী ভাবল। তারপর তরোয়ালটা বাড়িয়ে ধ'রে যেতে বলল। হ্যারি জাহাজের পেছন দিকে হালের কাছে এল। আকেশর দিকে বাঁধা হাতদু'টো বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—হে দেবতা—তুমি অনেকক্ষণ খাওনি। আমাদের রান্না হ'য়ে গেছে। এবার তুমি খাও। ফ্রান্সিস জলের একটু ওপরে মাথা ভাসিয়ে হ্যারির সব কথা শুনল। এত বিপদ এত চিন্তার মধ্যেও হ্যারির কথা শুনে ফ্রান্সিসের হাসি পেল।

হ্যারি ফিরে এল। পেছনে পেছনে সৈন্যটাও এল। ও এসবের কিছুই বুঝল না।

সবশেষের দলের সঙ্গে হ্যারি খেতে গেল। হ্যারি খাবার ঘরে ঢুকে মারিয়াকে গ্রীক ভাষায় বলল—আপনি তো জানেন—আমাদের দেবতাকে উৎসর্গ না ক'রে আমি কিছু খাই না। মারিয়া তো অবাক, গ্রীক ভাষা তো বোঝে না। সৈন্যরা এবার বুঝল সে সত্যিই হ্যারি খাবার আগে ওদের দেবতাকে খাবার উৎসর্গ করে। কিন্তু মারিয়া ফ্যাল ফ্যাল ক'রে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। এবার হ্যারি ওদের মাতৃভাষায় বলল—একটা পাত্রে খাবার দিন। আর এক মগ জল। আমি দেবতাকে খাবার উৎসর্গ ক'রে খেতে আসছি। মারিয়া ঠিক বুঝল না হ্যারি কী বলতে চাইছে! হ্যারি তাড়া দিল—একটু তাড়াতাড়ি করুন। মারিয়া আর কিছু না ব'লে একটা এনামেলের থালায় মাংস রুটি সব্জি রাখল। একটা মগে জলও দিল। সে সব নিয়ে হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। একজন সৈন্যও ওর পেছনে পেছনে চলল। হ্যারি খাবার জলের মগ হাতের কাছে একটা পরিষ্কার জায়গায় রাখল। খাবে ব'লে হ্যারির হাতের বাঁধন সৈন্যটি খুলে দিয়েছিল। খাবার জল রেখে হ্যারি সৈন্যটিকে বলল—ভাই—এসময় এখানে কেউ থাকবে না। আমাদের দেবতা যখন খান তখন কারো তা দেখার নিয়ম নেই। তুমি আমার সঙ্গে খাবার ঘরে চলো। সৈন্যটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এবার হ্যারি দু'হাত তুলে গলা চড়িয়ে বলল—হে দেবতা! আপনার জন্যে এখানে খাদ্য রেখে গেলাম। আপনি এই খাদ্য পানীয় গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন। হাত নামিয়ে হ্যারি সৈন্যটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলল। ডেক-এর সামনের দিকে পাহারারত সৈন্যদের বলল...ভাই তোমরা দয়া ক'রে হালের দিকে এখন যেও না। আমাদের দেবতা খাবেন এখন?

জলে মাথা ভাসিয়ে থাকা ফ্রান্সিস মনে মনে হ্যারিকে বার বার ধন্যবাদ জানাল। সত্যি ওর তখন ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। মনে মনে হ্যারির বুদ্ধিরও প্রশংসা করল।

একটু অপেক্ষা ক'রে ফ্রান্সিস ঝোলানো দড়ি ধ'রে হালের কাঠের খাঁজে পা রেখে রেখে জাহাজে উঠে এল। উবু হ'য়ে ব'সে দ্রুত খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে জল খেয়ে ফ্রান্সিস দ্রুত দড়ি ধ'রে হালের খাঁজ বেয়ে বেয়ে জলে নেমে এল। এখন রাতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ওদিকে এনরিকোর সৈন্যদের সঙ্গে ছাউনির বোনিফেসের সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল লড়াই শেষ হবার মুখে। বোনিফেসের সৈন্যরা বীরের মত লড়াই করল। কিন্তু এনরিকোর সৈন্যদের কাছে ওরা শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশেষে নিস্তব্ধতা নেমে এল। তখন সূর্য অস্ত যেতে বেশি দেরি নেই।

রণক্লান্ত এনরিকোর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রের এখানে ওখানে শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম করতে লাগল। কিন্তু ক্লান্তি নেই দলপতির। সে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে সব সৈন্যদের অভিনন্দন জানাতে লাগল। সে স্থানীয় কিছু লোকজন ধ'রে নিয়ে এল। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই পাথর পেতে উনুন বসানো হ'ল। বস্তায় ক'রে ময়দা আনা হ'ল আর ভেড়ার মাংস। রান্না চলল।

সন্ধ্যের পরেই রান্না শেষ হ'ল। সব সৈন্যরা খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বোনিফেসের সৈন্যদের ছাউনিতেই শুয়ে পড়ল। সৈন্যদের দলপতি শুধু সমুদ্রতীরে এল। নিজেদের জাহাজে রইল। আরো তিন চারজন সৈন্য জাহাজের পাহারায় আগেই ছিল।

রাত বাড়ছে। জলের মধ্যে শুধু মাথাটা তুলে ফ্রান্সিস অপেক্ষা করছে। কিন্তু তখনও ভেবে পাচ্ছে না কী ক'রে বন্ধুদের মুক্ত করবে। কী ক'রে সবাইকে নিয়ে জাহাজে চড়ে পালাবে।

রাজকুমারী মারিয়া রাতের রান্নাও রাঁধল। খুবই কষ্ট হ'ল মারিয়ার। এত লোকের রান্না সহজ কথা না। কিন্তু মারিয়া মুখ বুঁজে এই কষ্ট মেনে নিল। ওর মনে শুধু এক চিন্তা—ফ্রান্সিস মুক্ত আছে। ও নিশ্চয়ই ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারবে কি? যদি ওদের মুক্ত করতে গিয়ে ফ্রান্সিস নিজে ধরা পড়ে যায় তাহ'লে তো সর্বনাশ। মারিয়া এবার ডেক-এ উঠে এল। গলা চড়িয়ে বলল—রান্না হ'য়ে গেছে। খেতে এসো সবাই।

আবার চারজন চারজন ক'রে ভাইকিং বন্ধুরা খাবার ঘরে গিয়ে খেয়ে আসতে লাগল। শেষ চারজনের মধ্যে হ্যারি গেল দুপুরের মতই দেবতাকে উৎসর্গ করবে ব'লে খাদ্য জল নিয়ে জাহাজের পেছনে হালের কাছে। দেখল এঁটো থালা গ্লাস রয়েছে। হ্যারি ভীষণ খুশি হ'ল। ফ্রান্সিস তাহলে কাছাকাছিই আছে। সঙ্গের পাহারাদার সৈন্যটি এসবের কিছুই বুঝল না। ডেক-এর কাঠের মেঝেয় খাবার জল রেখে দু'হাত ওপরে তুলে বলল—হে দেবতা—আপনি খাদ্য জল গ্রহণ করেছেন এই জন্যে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। আবার রাত্রির আহার রেখে গেলাম, গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। হাত নামিয়ে হ্যারি ফিরে চলল। সৈন্যটিও ওর পেছনে পেছনে চলল।

খেতে বসে হ্যারি দেখল মারিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়াই পরিবেশন করছে। অপেক্ষা করছে কে কী খেতে চায় তার জন্যে। হ্যারি মারিয়াকে বলল—

রাজকুমারী একটু জল দিন। মারিয়া তাড়াতাড়ি এনামেলের জগটা নিয়ে এগিয়ে এল। মারিয়া গ্লাসে জল ঢালছে তখনই হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—দেবতা খাবার খেয়েছে। জাহাজের হালের কাছেই কোথাও আছে। আনন্দে মারিয়ার মন নেচে উঠল। কিন্তু এই আনন্দ সে বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। আবার ভাইকিংদের হাত বেঁধে ফেলা হ'ল। সবাইকে আগের জায়গায় বসিয়ে রাখা হ'ল।

রাত বাড়ল। অনেকেই হাত বাঁধা অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে এল। হালের গায়ে খাঁজে খাঁজে পা রেখে ডেক-এ উঠে এল। দ্রুত খাবার খেয়ে জল খেয়ে ও আবার হাল বেয়ে সমুদ্রের জলের দিকে নামতে লাগল।

আজ আকাশ অনেক পরিষ্কার। কুয়াশা অনেক পাত্‌লা। চাঁদের আলোও উজ্জ্বল। ফ্রান্সিস হালের খাঁজে দাঁড়িয়ে একবার এনরিকোর সেনাদের যুদ্ধ জাহাজটার দিকে তাকাল। দু'জন সৈন্য জাহাজের ডেক-এ পাহারা দিচ্ছে দেখল। ডেক-এ আর কেউ নেই। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজর পড়ল জাহাজের সামনের দিকে। সেই জাহাজের কালো কাঠের নিচের দিকে। অনেকটা কাঠের চটা উঠে গিয়ে সাদাটে কাঠ দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল। আচ্ছা তখন যদি সবটা খুব্‌লে উঠে আসতো তাহ'লে তো হুড় হুড় ক'রে সমুদ্রের জল ঢুকে জাহাজটা ডুবেই যেত।

এই কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথায় একটা কথা এসে ধাক্কা দিল—জাহাজটাকে ঐ জায়গায় ফুটো করতে পারলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডুবে যাবে। ফ্রান্সিস কথাটা ভাবতে ভাবতে দ্রুত জলে নেমে এল। সাবধান হতে হবে। কিছুতেই সৈন্যদের নজরে পড়া চলবে না। ফ্রান্সিস গলা জলে ডুবে থেকে ভাবতে লাগল এখন একটা করাত চাই। হাতুড়ি বাটালি হ'লেও চলবে। কিন্তু সেসব তো ওদের জাহাজের কেবিন ঘরগুলোর শেষে এক কোণায় একটা কাঠের বড় বাক্সে রয়েছে। যে করেই হোক ঐ যন্ত্রগুলো আনতে হবে। ফ্রান্সিস অস্থির হ'য়ে পড়ল। আনতেই হবে ওগুলো। ভাবতে লাগল কী ভাবে আনা যায়।

ফ্রান্সিস আবার জল থেকে উঠে এল। ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। বুক হিঁচ্‌ড়ে হিঁচ্‌ড়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে এল। দেখল চারজন সৈন্য তরোয়াল হাতে বন্দী বন্ধুদের পাহারা দিচ্ছে। ঐ সৈন্যদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না; রাতও অন্ধকার নয়। চাঁদের আলো উজ্জ্বল। ধরা পড়তে হবে। তখন মুক্তির শেষ আশাটাও থাকবে না। ফ্রান্সিস আবার হালের কাঠের খাঁজে পা রেখে রেখে জলে নেমে এল। অপেক্ষা করতে লাগল যদি হ্যারি আবার আসে।

ওদিকে মারিয়া বন্ধ কেবিনঘরে কাঠের মেঝেয় পাইচারি করছে। দ্রুত ভাবছে কী ক'রে ফ্রান্সিসের খোঁজ পাওয়া যায়। কী ক'রে ওর সঙ্গে কথা বলা যায়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে কেবিনঘরের দরজা খুলে বাইরে এল। পাহারাদার সৈন্যটা দোরগোড়ায় মেঝেয় বসে ঝিমোচ্ছিল। দরজা

খোলার শব্দ শুনে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল। হাতে তরোয়াল তুলে নিল। মারিয়া সোজা ডেকে-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল। এবার আর পাহারাদার বাধা দিল না। মারিয়ার পেছনে পেছনে চলল।

ডেক-এ উঠে মারিয়া চলল বন্দী ভাইকিংদের কাছে। পেছনে পাহারাদার সৈন্যটিও চলল। হ্যারি বাঁধা হাত দুটো মাথায় দিয়ে শুয়ে ছিল। ঘুম আসছে না। কীভাবে মুক্তি পাবে। ফ্রান্সিস কীভাবে ওদের এই বন্দীদশা ঘোচাবে। এসব সাত পাঁচ ভাবছিল। মারিয়া কাছে এসে দাঁড়াতে হ্যারি উঠে বসল। ঠিক বুঝল না রাজকুমারী কেন ওর কাছে এসেছে। মারিয়া বলল—হ্যারি—এই গর্দভ পাহারাদারটাকে বলো তো আমি কেবিনঘরে ঘুমুতে পারছি না। ভীষণ গরম লাগছে। আমি হালের ওখানে ডেকে-এ শোবো। ঘুমুবো। হ্যারি পাহারাদারের দিকে তাকাল। মারিয়ার কথাগুলো বুঝিয়ে ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল। পাহারাদার মাথা নেড়ে বলল—যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

—রাজকুমারী ঠিকই বলেছেন—তুমি একটা নিরেট গর্দভ। হ্যারি বলল। পাহারাদার কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। তরোয়াল তুলল। হ্যারি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বলল—

—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোন। রাজকুমারী যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানও—কোথায় পালাবেন? গ্রামভাউচা এখন তোমাদের দখলে। ওখানে লুকোতে পারবেন না। আর রইলো সামনের ঐ সমুদ্র। একজন স্ত্রীলোক সাঁতরে ঐ সমুদ্র পার হ'তে পারবে? বলো—। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল। পাহারাদার এবার একটু ভাবল। অন্য পাহারাদারদের কাছে গেল। বোধহয় পরামর্শ চাইতে। ওদের সঙ্গে কথা ব'লে পাহারাদার ফিরে এল। বলল—উনি ওখানে ঘুমুতে পারেন কিন্তু আমি পাহারায় থাকবো। হ্যারি মারিয়াকে সে কথা বললো। মারিয়া বলল—

ঐ গর্দভটাকে বলো ঘুমোবার সময় ও আমার নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তাহ'লে আমি ঘুমুতেই পারবো না। ওকে মাস্তুলের আড়ালে থাকতে হবে। হ্যারি পাহারাদারকে বলল সে কথা। পাহারাদারটা একটু ভাবল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—ঠিক আছে। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—ও রাজি হ'য়েছে। যান শুয়ে পড়ুন তো।

মারিয়া চলল জাহাজের হালের দিকে। পেছনে সেই পাহারাদারটি। মাস্তুলের কাছে এসে মারিয়া পাহারাদারটিকে ইঙ্গিতে ওখানে দাঁড়াতে বলল। পাহারাদারটি কোন আপত্তি করল না। মাস্তুলের আড়ালেই দাঁড়াল।

মারিয়া হালের কাছে এসে দেখল এঁটো থালা মগ পড়ে আছে। ও বুঝল ফ্রান্সিস কাছেই কোথাও আছে। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল—আমাদের দেবতা—আপনি খুশিমনে আমাদের দেওয়া খাদ্য জল গ্রহণ করেছেন। আমরা আনন্দিত। এবার বলুন—আর কীভাবে আমরা আপনাকে খুশি করতে পারি? ফ্রান্সিস জলে ডুবে মারিয়ার কথাগুলো শুনল। খুশিতে ওর মন নেচে উঠল। এই সুযোগ। ও ভাবল—কিন্তু মারিয়ার কাছেই যদি কোন পাহারাদার সৈন্য থাকে তাহ'লে তো ডেক-এ উঠে ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। উল্টে ধরা পড়তে হবে। ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল মারিয়া আর কী বলে শোনার জন্যে।

তখনই মারিয়ার ফিস্ ফিস্ ক'রে বলা কথাটা ওর কানে কেল—এসো—কেউ নেই। ফ্রান্সিস আর দেরি করল না। দড়ি বেয়ে উঠে এল। ততক্ষণে মারিয়াও ডেক-এর ধারে ঝুঁকে ফ্রান্সিসকে দেখতে পেয়েছে।

ফ্রান্সিস সবটা দড়ি বেয়ে উঠলো না। ওপরে তাকিয়ে মারিয়ার ঝুঁকে-পড়া মুখ দেখল। খুব গলা চেপে ফ্রান্সিস বলল—হাতুড়ি বাটালি ছোট করাত। জল্দি। কথা কটা ব'লেই ফ্রান্সিস দ্রুত দড়ি বেয়ে জলে নেমে গেল। তারপরই ডুব দিয়ে রইল। যতটা সম্ভব দম চেপে ডুব দিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলল। দেখল মারিয়া চলে গেছে। যাক্—ওর কথা পাহারাদার সৈন্যরা শুনতে পায়নি।

ওদিকে মারিয়া দ্রুত হাতে এ'টো থালা জলের মগ হাতে তুলে নিল। সে সব নিয়ে বেশ দ্রুত চলল ডেক দিয়ে। দেখল পাহারাদারটি মাস্তুলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া ওকে এঁটো থালা মগ ইঙ্গিতে দেখাল। ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইঙ্গিত করল। পাহারাদার আর ওর পেছনে পেছনে এল না।

মারিয়া সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই এ'টো থালা গ্লাস দ্রুত নামিয়ে রাখল। নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। একটা মোটা কম্বলমত কাপড় গায়ে জড়াল। মোমবাতি জ্বালল। মোমবাতি নিয়ে চলল কেবিন ঘরগুলির পরে যেখানে একটা লম্বাটে কাঠের বাক্সে জাহাজ মেরামতির যন্ত্রপাতি থাকে সেদিকে। ছুটতে পারছে না যদি মোমবাতি নিভে যায়। তখনই একটা দম্‌কা হাওয়া বইল। মোমবাতির শিখা নিভু-নিভু হ'ল। মারিয়া হাতের চেটোয় সঙ্গে সঙ্গে শিখা আড়াল করল। মোমবাতি নিভল না।

কোন রকম শব্দ না ক'রে মারিয়া বাক্সের ডালাটা আস্তে আস্তে খুলল। মোমবাতির আলোয় খুঁজতে লাগল হাতুড়ি বাটালি আর করাত। একটু খোঁজাখুঁজি করেই পেয়ে গেল সে সব। তিনটে জিনিসই গায়ের মোটা চাদরের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। জোরে ছুটল এবার। বেশি দেরি হ'লে পাহারাদারটির সন্দেহ হতে পারে। মোমবাতি নিভে গেল। মারিয়া মোমবাতি ফেলে দিল।

সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। এবার আস্তে আস্তে হালের দিকে চলল। পাহারাদারটি বুঝল গায়ে দেবার কাপড় আনতে গিয়েছিল মারিয়া!

মারিয়া সেই জায়গায় এল। মোটা চাদরটা পেতে শুয়ে পড়ল। পাহারাদারটি এ পর্যন্ত দেখল। তারপর মাস্তুলের আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া আস্তে আস্তে উঠল। চারপাশ দেখে নিল। নয়—কেউ নেই। ও হালের কাছে গেল। যে দড়িটা ধ'রে ফ্রান্সিস ঝুলছিল সেই দড়িটা ধ'রে দু'বার হ্যাঁচ্‌কা টান দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বুঝল মারিয়া এসেছে। ও আস্তে আস্তে দড়ি বেয়ে হালের-মাথাটার কাছে এল। মারিয়া হাতুড়ি বাটালি করাত হাত বাড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি সেসব নিয়ে দড়ি বেয়ে নেমে এল। মারিয়া পাতা চাদরে এসে শুয়ে পড়ল। মারিয়া ভালো ক'রেই জানে আজকে ঘুম আসবে না। তবু যেন ঘুমিয়ে আছে এরকম ভঙ্গীতে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে রইল।

এবার ফ্রান্সিস ছোট করাতটা কোমরে গুঁজল। হাতুড়ি বাটালি ঢোলা জামার বুকের কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে রাখল। কোমরে চামড়ার বন্ধনী বাঁধা। হাতুড়ি বাটালি পেটের কাছে আটকে রইল।

ফ্রান্সিস একটু দম নিল। বেশ পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। সেই ভোর রাত

থেকে এতক্ষণ জলে ডুবে আছে। শরীর দুর্বল লাগা স্বাভাবিক। তবু দু'বার খেতে পেয়েছে বলে এখনও শরীরটা ঠিক আছে।

একটু বিশ্রাম নিল ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সাঁতার না কেটে জলে কোনরকম শব্দ না তুলে এগিয়ে চলল—এনরিকোর, সৈন্যদের যুদ্ধ জাহাজের দিকে। চাঁদের একটু উজ্জ্বল আলোয় দেখল জাহাজটার সামনের দিকে চট্‌লা-ওঠা জায়গাটা এদিকেই। একটু এগিয়ে দেখল ঐ জাহাজের একজন পাহারাদার সৈন্য রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। ডুব সাঁতার দিয়ে ঠিক সেই চট্‌লা-ওঠা জায়গাটার কাছে আস্তে আস্তে ভেসে উঠল। ওপরের দিকে তাকিয়ে বুঝল জাহাজের রেলিঙে একেবারে ঝুঁকে না পড়লে সৈন্যটি ওকে দেখতে পাবে না।

ফ্রান্সিস চট্‌লা-ওঠা জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল কাঠের চট্‌লা বেশ কিছুটা উঠেছে। তবু এত শক্ত কাঠের জাহাজের খোল ফুটো করা কম পরিশ্রমের কাজ নয়। অথচ আজকের বাকি রাতের মধ্যে একাজ সারতেই হবে। এখন সমস্যা হ'ল বাটালির মাথায় হাতুড়ি মারলে বেশ শব্দ হবে। নিঃশব্দে কীভাবে কাজ সারা যায়। ও ভেবে দেখল যদি জলের একটু নিচে চট্‌লা-ওঠা জায়গাটায় বাটালি বসিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তাহ'লে অল্প শব্দই হবে। কিন্তু হলেও সে শব্দ বাইরে শোনা যাবে না।

ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখে চট্‌লা-ওঠা খোলের একটা জায়গা বেছে নিল। এখানটায় চট্‌লা বেশি উঠেছে। এবার সেখানে বাটালিটা বসিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে হাতুড়ি চালাল। বাটালির মাথায় হাতুড়ির ঘা লাগল বটে শব্দও তেমন হ'ল না। কিন্তু জলের মধ্যে দিয়ে হাতুড়ি চালানোয় ঘা-টা তেমন জোরে হ'ল না। জলের মধ্যে জিনিসের ওজন কমে যায়। তার ওপর জলের বাধা। এর সঙ্গে রয়েছে জলের ওপর শরীর ভাসিয়ে রাখার সমস্যা। কাজেই ফ্রান্সিসকে দম নিয়ে নিয়ে দফায় দফায় হাতুড়ি চালাতে হ'ল।

প্রায় এক ঘণ্টার ওপর হাতুড়ি এভাবে চালাল ফ্রান্সিস। ক্লান্তিতে ফ্রান্সিসের শরীর ভেঙে আসছে। অথচ থামবার উপায় নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতে একাজ সারতে হবে।

আবার আধঘণ্টামত ফ্রান্সিস হাতুড়ি চালাল। এবার ঐ জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল প্রায় এক আঙ্গুল মত ফুটো হ'য়েছে। এবার হাতুড়ি বাটালি কোমরে গুঁজল। বের করল করাতটা। করাতটা ছোট। মাথাটা সরু। সুবিধেই হ'ল। এবার ঐ কাটা জায়গাটায় করাত বসিয়ে ফ্রান্সিস করাত ঘষ্‌তে লাগল। প্রথমে করাতটা ভালো চলছিল না। আস্তে আস্তে করাতের চলাটা সহজ হ'ল। কাঠ কেটে যেতে লাগল। জলের মধ্য করাত কাঠ কাটছে। বেশি শব্দ বাইরে এল না। ফ্রান্সিসের হাত ধ'রে আসছে। ও জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। শরীরে যেন কোন সাড় নেই।

হঠাৎ পাথুরে ভাঙার দিকে একটা পাখি ডেকে উঠল। ফ্রান্সিস চম্‌কে উঠল। করাত চালানো থামিয়ে ও আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে আসছে। চাঁদের আলো অনেক ম্লান হ'য়ে গেছে। পূর্বদিকে তাকাল। ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটু লাল আভামত।

ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে জোরে করাত চালাতে লাগল। হঠাৎ সমস্ত

করাতের মাথাটাই ঢুকে গেল। আনন্দে ফ্রান্সিস জলের মধ্যেই একটা ডিগবাজি খেল। কাটা জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল। জোরে জল ঢুকছে।

ফ্রান্সিস হাতুড়ি বাটালি বের করল। করাতটাও খুলে নিল। সব ফেলে দিল। তারপর পা দিয়ে জল টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল ওদের জাহাজের দিকে। এখন রেলিঙে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। ওকে দেখতে পাবে না।

ওদের জাহাজের হালের কাছে পৌঁছল ও। হালের খাঁজে পা রেখে রেখে একটু উঠল। তারপর হালটায় হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস হালের মাথার কাছে উঠে এল। উঁকি দিয়ে দেখল মারিয়া ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া সারারাতই জেগে ছিল। এখন একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ফ্রান্সিসের ডাক কানে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস ফিস ফিস ক'রে বলল—এনরিকোর জাহাজ ফুটো—ডুব্‌বে—শাঙ্কো—ছোরা—দড়ি কাটা ভোরের আগে—মুক্তি। খুব দ্রুত কথাগুলি বলে ফ্রান্সিস নেমে এল।

মারিয়া উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে হেঁটে চলল ভাইকিং বন্দীদের দিকে। ওর পাহারাদার মাস্তুলে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। মারিয়া মুখে শব্দ করল—হুঁস্। পাহারাদার হক্‌চকিয়ে উঠে দেখে সামনে মারিয়া। মারিয়া ইঙ্গিতে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। চলল ভাইকিং বন্দীদের দিকে। আর পাহারাদার ওকে দেখল শুধু। কিছু বলল না। বাধাও দিল না।

হ্যারি শুয়ে ছিল। চোখ বুজে। সারারাত ঘুমোয়নি। পাতলা অন্ধকারের দিকে তাকাল এবার। ভোর হ'তে বেশি দেরি নেই। তখন দেখল মারিয়া ওর দিকেই আসছে। হ্যারি উঠে বসল। মারিয়া ওর কাছে এল। হ্যারির দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বলল না। রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—দেবতা এসেছিল। ওদের জাহাজ ফুটো করেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুববে। শাঙ্কোর ছুরি। হাতের দড়ি কাটো। মুক্তি। কথা ক'টা ব'লে মারিয়া যেমন আস্তে আস্তে এসেছিল তেমনি আস্তে আস্তে চলে গেল।

হ্যারির মন খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু ও বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। হ্যারি ফিসফিস ক'রে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল না। হ্যারি পা বাড়িয়ে শাঙ্কোর পায়ে দু'তিনটে ধাক্কা দিল। সতর্ক শাঙ্কোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। ও আস্তে আস্তে উঠে বসল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—এনরিকোর জাহাজের খোল কেটেছে ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ জাহাজ ডুববে। ছুরি বের করো। দড়ি কাটো। প্রয়োজনে লড়াই। শাঙ্কো একথা শুনে লাফিয়ে উঠতে গেল। পরক্ষণেই সাবধান হ'ল। ও হ্যারির দিকে সরে এসে শুয়ে পড়ল। হ্যারি শাঙ্কোর বুকের কাছে ঢিলে জামার মধ্যে হাত চালিয়ে ছুরিটা বের করল। শাঙ্কো ঐ ভীষণ ধারালো ছুরিটা সবসময় হাতের কাছে রাখে। ঘুমোবার সময়ও রাখে। বিপদ বুঝলেই ছুরিটা ঢোলা জামার নিচে চালান ক'রে দেয়।

এবার শাঙ্কো খুব আস্তে আস্তে দড়ি বাঁধা হাত দু'টো হ্যারির দিকে এগিয়ে ধরল। শুয়ে শুয়েই। হ্যারি দু'হাত দিয়ে ছুরিটা ধ'রে শাঙ্কোর হাতের দড়ি ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। দু'জনেই শুয়ে আছে আর অন্ধকারও সবটা কেটে যায়নি।

পাহারাদাররা বুঝতেই পারল না। শাঙ্কোর হাতের দড়ি কেটে গেল। ও ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে ডেক-এর পাটাতনে একটু হিঁচড়ে গিয়ে বিস্কোর হাতের বাঁধন কেটে দিল। এবার বিস্কো ছুরিটা নিল। পাশের ভাইকিং-এর দড়ি কাটল। আস্তে আস্তে ছুরি একে ওকে চালান দিয়ে সবার দড়িই কাটা হ'য়ে গেল। সবশেষে কাটা হ'ল হ্যারির হাতের দড়ি।

আকাশ অনেক পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। পূব আকাশ গভীর লাল। সূর্য উঠতে দেরি নেই। হঠাৎ একজন পাহারাদার দেখল ওদের জাহাজ জলে অনেকটা নেমে গেছে। ও প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। পরক্ষণেই বুঝল ওদের জাহাজ ডুবছে। ও চিৎকার ক'রে আর সব পাহারাদারদের ডাকল। সকলেই রেলিঙের ধারে ছুটে এল। ও চিৎকার ক'রে বোধহয় দলপতিকে ডাকতে লাগল।

চিৎকার ডাকাডাকিতে দলপতির ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে মেঝেয় পা ফেলে উঠতে গেল। দেখে চমকে উঠল, যে ওর পা হাঁটু জলে ডুবে গেছে। ও ভীষণভাবে চম্‌কে উঠল—জাহাজ ডুবছে। ও জল ঠেলে ছুটল কেবিন ঘরের দরজার দিকে। তখনই মড়্‌মড়্ শব্দ তুলে জাহাজটা ডানপাশে কাত হ'ল। কাত হ'তেই থাকল। দলপতি সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠতে গিয়ে ছিট্‌কে কোমর সমান জলে গিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে জাহাজের মধ্যে জল বাড়তে লাগল। ডুবন্ত জাহাজের পাহারাদাররা আর দলপতির খোঁজ করতে নিচে নামল না। ছুটে গেল পাতা পাটাতনের দিকে। পাটাতন তখন তীরভূমি থেকে ছিট্‌কে গিয়ে জলে ভাসছে। সৈন্যরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে তীরের দিকে চলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজে তখন বন্ধনমুক্ত ভাইকিংরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো—হো। তারপর ছুটল হাতের কাছে যা পায় তাই জোগাড় করতে। ভাঙা দাঁড়ের কাঠ, শেকল, বড় বড় পেরেক, লম্বা লোহার ডাণ্ডা যে যা পেল তাই নিয়ে পাহারাদার সৈন্যদের দিকে এগিয়ে চলল। পাহারাদার সৈন্যরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপর তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ভাইকিংরা চিৎকার ক'রে একসঙ্গে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তরোয়ালের ঘায়ে দু'একজন আহত হ'ল—কিন্তু—পাহারাদারদের কয়েকজনের হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। হ্যারি চিৎকার করে বলল—কাউকে মেরো না। জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

ভাইকিং বন্ধুদের চিৎকার কানে যেতেই ফ্রান্সিস বুঝল ওর পরিকল্পনামতই কাজ হয়েছে। তখন ও আস্তে আস্তে হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু শরীর আর চলছে না। ও ওপরের দিকে তাকাল। দেখল মারিয়া হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ও অনেক কষ্টে আরো দু'পা ধাপ উঠল। হাত বাড়িয়ে মারিয়ার হাত ধরল। মারিয়া কি আর ওকে টেনে তুলতে পারে? হয়ত টেনে একটু সাহায্য করা মাত্র। মারিয়ার হাত ধ'রে ধ'রে অনেক কষ্টে জাহাজে উঠেই ডেক-এর ওপর চিৎ হ'য়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিসের সারা শরীর ভেজা সপ্‌সপে মাথার ভেজা চুল কপালে এসে পড়েছে। মুখ সাদা হ'য়ে গেছে। দু'হাত থেকে রক্ত ঝরছে। হাতুড়ি বাটালি চালাতে গিয়ে করাত ঘষতে গিয়ে ওর হাত কেটে গেছে। আঙুলে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস মড়ার মত চোখ বুজে পড়ে রইল। ফ্রান্সিসের এই অবস্থা দেখে মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস আস্তে

আস্তে চোখের পাতা খুলল। ম্লান হেসে বলল—কাঁদছো কেন? এই কথা শুনে মারিয়ার কান্না বেড়ে গেল। ফ্রান্সিস খুব ক্ষীণস্বরে বলল—শিগগির জাহাজ ছাড়তে—বলো। তারপর চোখ বুঝল।

মারিয়া এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়াল। ছুটল ভাইকিং বন্ধুদের খবর দিতে। ওদিকে তখন পাহারাদার সৈন্য সবাইকে ভাইকিংরা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ওরা সমুদ্রতীরের দিকে সাঁত্‌রে চলেছে। এনরিকোর সৈন্যদের যুদ্ধ জাহাজের মাস্তুলটা তখন দেখা যাচ্ছে। বাকি সবটাই জলের নিচে।

মারিয়া ডেক-এ এসে চিৎকার ক'রে বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস এসেছে। হালের কাছে শুয়ে আছে। একটু অসুস্থ। ও বলল—শিগগির জাহাজ ছাড়ো। সব ভাইকিংরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল—ও—হো—হো—হো। তারপর ছুটল ফ্রান্সিসকে দেখতে।

ফ্রান্সিসকে ও-রকম মড়ার মত চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে দেখে বন্ধুদের ভীষণ মন খারাপ হ'য়ে গেল। হ্যারি গলা চড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল—এখন একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। পাল তুলে দাও। জাহাজ চালাও যত দ্রুত সম্ভব। কয়েকজন ফ্রান্সিসকে কেবিনঘরে নিয়ে যাও। ফ্রান্সিসের সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে রাজকুমারী মারিয়াকে সাহায্য কর। যাও—জলদি। দু'তিন জন গিয়ে তীরের সঙ্গে লাগানো পাটাতন তুলে ফেলল। ফ্রান্সিসকে কাঁধে নিয়ে চলল কয়েকজন। কেবিনঘরে এনে শুইয়ে দিল। দাঁড়িরা ছুটল দাঁড়ঘরের দিকে। পাল খাটানো হ'ল দ্রুত হাতে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় উঠে গেল। জলে দাঁড় পড়তে লাগল—ছপ্—ছপ্। জাহাজ চলল বাইরের সমুদ্রের দিকে।

তখন উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের বুকে। রোদ ঝিকিয়ে উঠেছে ঢেউয়ের মাথায়। আস্তে আস্তে গ্রামভাউসা বন্দর দূরে মিলিয়ে গেল।

ফ্রান্সিসকে ভেজা পোশাক পাল্টে শুকনো পোশাক পরানো হয়েছে। জাহাজের বদ্যি এসে ফ্রান্সিসের ক্ষত-বিক্ষত দু'হাতে হলুদ রঙের মলম লাগিয়ে দিয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের জ্বালা ব্যথা কমেছে তা'তে। মারিয়া চামড়ার ব্যাগ-এ গরম জল ভ'রে নিয়ে ফ্রান্সিসের পায়ে গায়ে সেঁক দিতে লাগল। এর মধ্যে রসুইঘরে রাঁধুনি শুধু ফ্রান্সিসের জন্যে মাংস রুটি তৈরি ক'রে ফেলল। থালায় ক'রে নিয়ে এল ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে। মারিয়া ফ্রান্সিসকে ধ'রে আস্তে আস্তে বিছানায় বসিয়ে দিল। ফ্রান্সিস নিজেই গরম গরম রুটি মাংস খেতে লাগল। খাওয়া শেষ ক'রে জল খেল। তারপর শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের শরীরে যেন সাড় এল। ও চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক জাহাজ চলল। এতক্ষণ হ্যারি জাহাজ-চালকের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। একবার মাত্র গিয়েছিল ফ্রান্সিসকে দেখতে। তখনও ফ্রান্সিস চোখ বুজে শুয়ে আছে।

বিস্কো এসে হ্যারিকে বলল—ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। হ্যারি তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। দেখল ফ্রান্সিস বিছানায় বসে আস্তে আস্তে দু'-একটা কথা বলছে। হ্যারি এগিয়ে এল। বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। হ্যারির সারা শরীর থর্ থর্ করে আবেগে কাঁপছে।

চোখের কোল ভিজে উঠেছে। ফ্রান্সিস দুর্বল কণ্ঠে বলল—অ্যাই—তুমিও কি মারিয়ার মত কাঁদতে শুরু করলে? এ্যাঁ? ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিয়ে হ্যারি হাতের উল্টোপিঠে দু'চোখ মুছল। বলল—তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না—না। ফ্রান্সিস হাসল।

—এখন জাহাজ কোথায় যাবে মানে আমরা কোথায় যাবো? হ্যারি জানতে চাইল।

—খানিয়ায়। নিখোঁজ রাজমুকুটের সন্ধানে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা'হলে তো কাভাল্লির সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ কাভাল্লিকে ডাকো। ফ্রান্সিস একজন ভাইকিং বন্ধুকে বলল।

একটু পরেই কাভাল্লি এল। হ্যারি বলল—

—কাভাল্লি—ফ্রান্সিস বলছিল—এখন আমরা কীভাবে খানিয়া যাবো?

—এখন আমাদের পূবমুখো যেতে হবে। ঝড়টড় না হ'লে আমরা তিন চারদিনের মধ্যেই ক্রীটের উত্তরে রাজধানী খানিয়ায় পৌঁছোতে পারবো। কাভাল্লি বলল।

—হ্যারি জাহাজ-চালককে বলো কাভাল্লির নির্দেশ মতো জাহাজ চালাতে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল—ফ্রান্সিসের শরীরের দুবর্লতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। মারিয়া বাদে সবাই ঘরের বাইরে চলে এল।

হ্যারি ও কাভাল্লি জাহাজ-চালকের কাছে এসে দাঁড়াল। কাভাল্লির নির্দেশমত জাহাজ চলল খানিয়া বন্দরের উদ্দেশে।

জাহাজ চলেছে। বিদ্রোহী এনরিকোর যুদ্ধ জাহাজ ফ্রান্সিস ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে। কাজেই এখন ভাইকিংরা নিশ্চিন্ত। এনরিকোর সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবার কোন ভয় নেই।

এনরিকোর যুদ্ধ জাহাজ ডোবাতে গিয়ে ফ্রান্সিসকে অনেকক্ষণ কাল ঠাণ্ডা জলে মাথা ভাসিয়ে ডুবে থাকতে হয়েছে। তারপর বাটালিতে হাতুড়ি চালাতে হয়েছে। ছোট করাত চালাতে হয়েছে। হাতুড়ির ঘাও কখনও কখনও আঙুলে পড়েছে। বাটালিতে করাতে দু'হাত ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েছে। দু'তিনটি আঙুল ফুলে নীল হয়ে গেছে। জাহাজ ফুটো করবার উত্তেজনায় ফ্রান্সিস তখন এসব গায়ে মাখেনি। পরে দেখেছে ক্ষতগুলো আঙুল ফোলা কোনটাই কম নয়। জাহাজের বৈদ্যি ক্ষত জায়গায় আঙুলে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে। ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে মোটা ব্যান্ডেজমত বেঁধে দিয়েছে। তাঁতে একটু ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণা কমেছে। কিন্তু একদিনের মধ্যেই ঐ ক্ষত জ্বালা ফোলা আঙুল ফ্রান্সিসকে বেশ কাহিল ক'রে দিল। ব্যথায় টনটনানিতে ও হাত দুটো তুলতে পারছে না। সেদিন বিকেল থেকেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল শরীরটা যেন আর বশে নেই। হঠাৎই ক্ষতস্থানে ফোলা আঙুলে ব্যথা বাড়তে লাগল। সন্ধ্যের মধ্যেই ব্যথা প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠল। ফ্রান্সিস তবু কাউকে কিছু বলল না। ভাবল কমে যাবে। কিন্তু কমল না। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বুঝল জ্বর আসছে। ওর শীত শীত করতে লাগল। মোটা কম্বলমত কাপড়টা গায়ে ঢেকে ও বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রাতে খাওয়ার সময় হ'ল। মারিয়া এর মধ্যে দু'একবার ডেক-এ উঠেছিল। তারপর এমব্রয়ডারি নিয়ে বসেছিল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ বেশিরভাগ সময়ই চোখ

বুজে শুয়ে থেকেছে। তাই মারিয়া ওকে, বিশ্রাম করছে মনে করেছে। ডাকেও নি। বুঝতেও পারে নি যে ফ্রান্সিসের শরীর খারাপ।

এখন খাওয়ার সময় হ'তে ডাকল—চলো খেয়ে আসি। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—এখানেই খাবার নিয়ে এসো। মারিয়া ভাবল সেই ভালো। ফ্রান্সিসের আর হাঁটাচলা ক'রে দরকার নেই। এখানেই বিছানাতে বসেই খেয়ে নিক।

মারিয়া কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরেই দু'প্লেট রুটি মাংসের ঝোল সবজি নিয়ে এল। বিছানায় একটা পরিষ্কার কাপড় পেতে রাখল সে সব। ওদের রাঁধুনি বন্ধু কাচের গ্লাসে জল রেখে গেল। মারিয়া ডাকল—ওঠো খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল। ওর শরীর যে এখন এত খারাপ এখনও মারিয়া তা জানে না। জানলে এক্ষুনি চ্যাঁচামেচি শুরু করবে।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। স্পষ্ট বুঝল মাথাটা বেশ ঘুরছে। তবু মারিয়াকে কিছু বুঝতে না দিয়ে রুটি ছিঁড়ে মাংস খেতে শুরু করল। কিন্তু পারল না। মুখ বিষ তেতো। বমি হ'য়ে যাবে। ফ্রান্সিস শুধু জল ঢক্ ঢক্ ক'রে খেল। আর বসে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। মারিয়া খাওয়া শুরু করতে গিয়ে চমকে উঠল। এক ঝটকায় স'রে এসে ফ্রান্সিসের কপালে হাত দিল। বেশ গরম। প্রায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—সে কি তোমার তো জ্বর এসেছে। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থায়ই হাসল। বলল—ও গা গরম হ'য়েছে একটু। সেরে যাবে।

মারিয়ার আর খাওয়া হ'ল না। খাবার-দাবার সরিয়ে রেখে ও ছুটল দরজার দিকে। বাইরে এসে ছুটল হ্যারির কেবিনঘরের দিকে। হ্যারি তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে শুয়েছে। মারিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল—হ্যারি—হ্যারি। হ্যারি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। দেখল মারিয়া কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল—কী হয়েছে রাজকুমারী?

—ফ্রান্সিস অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। শিগগির এসো। মারিয়া আর কিছু বলতে পারল না।

—বলেন কি? চলুন। হ্যারি দ্রুত ছুটল ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিনঘরের দিকে। ছুটে বিছানার কাছে এসে দেখল ফ্রান্সিস কেমন নিস্তেজ হয়ে দু'চোখ বুজে শুয়ে আছে। হ্যারি ফ্রান্সিসের কপালে গলায় হাত রাখল। বেশ জ্বর। হ্যারি আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। হ্যারি লক্ষ্য করল চোখ দু'টো বেশ লাল।

—শরীর খুব খারাপ লাগছে? হ্যারি স্নেহার্দ্রস্বরে বলল। ফ্রান্সিস শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলোল। হাসল। মৃদু স্বরে বলল—ও ঠিক হ'য়ে যাবে। হ্যারি আর কিছু বলল না। ও জানে ফ্রান্সিস সহজে নিজের কষ্টের কথা বলবে না। পাছে মারিয়া হ্যারি বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় পড়ে। হ্যারি মারিয়াকে বলল—একটা ছেঁড়া কম্বলের টুকরো ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে কপালে জল পট্টি দিন। আমি বৈদ্যিকে ডেকে আনছি।

হ্যারি ছুটে বেরিয়ে গেল। মারিয়াও এদিকে ছেঁড়া কম্বলের একটা টুকরো খুঁজে বের করল। গ্লাসের জলে কম্বলের টুকরোটা ভিজিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কপালে চেপে ধরল। একটু আরাম লাগল ফ্রান্সিসের। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জ্বরের চেয়েও ওকে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল ক্ষত-বিক্ষত হাত আঙুলের যন্ত্রণা।

একটু পরেই বৈদ্যিকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি ফিরে এলো। বৈদ্যি ওর চিনেমাটির বোয়াম দুটো বিছানায় রাখল। এবার বিছানায় বসল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের দু'হাত আঙ্গুল থেকে ছেঁড়া কম্বলের পট্টিটা খুলতে লাগল। ফ্রান্সিস কঁকিয়ে উঠল। বৈদ্যি আরো সাবধান হ'ল। আস্তে আস্তে সব পট্টি খুলল। দেখল ক্ষতের জায়গাগুলো বেশ ফুলে উঠেছে। দু'টো আঙুল আরো ফুলেছে। চিন্তায় বৈদ্যির মুখ শুকিয়ে গেল। ও বুঝল গতিক ভালো নয়। ফ্রান্সিসের ঐ ক্ষতস্থান, ফোলা আঙ্গুল, বৈদ্যির চিন্তাগ্রস্ত মুখ এসব দেখে হ্যারির বুক কেঁপে উঠল। ও পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

বৈদ্যি দু'টো বোয়াম থেকে ওষুধ নিয়ে হাত ডলে মেশাল। একটু একটু জল দিয়ে মেশানো ওষুধটা চটচটে করল। তারপর ক্ষতস্থানে আঙ্গুলে লাগিয়ে দিতে লাগল। ওষুধ পড়তেই ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থায় আবার কঁকিয়ে উঠল। মারিয়া ফ্রান্সিসের কপালে হাত বোলাতে লাগল।

ওষুধ লাগানো শেষ হ'ল। ফ্রান্সিস একবারও চোখ খুলল না। নিস্তেজভাবে পড়ে রইল।

বৈদ্যি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হ্যারি বলল—কী রকম বুঝছো?

—যদি কালকে ঘাগুলো পেকে না ওঠে তাহ'লে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু জ্বর এসেছে। পেকে উঠতে পারে। এখন আমার কাছে যা ওষুধ আছে তাতে কতটা কাজ হবে জানি না। বৈদ্যি বলল।

—তা'হলে ফ্রান্সিসের বিপদ এখনও কাটেনি। হ্যারি বলল।

—না। বৈদ্যি আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—দেখি এই নতুন ওষুধে কাজ হয় কিনা।

বৈদ্যি বোয়াম নিয়ে চলে যাবার সময় বলল—জলপট্টি দিতে থাকো। জ্বর বাড়তে দিও না।

মারিয়া এবার জলের গ্লাস নিয়ে ফ্রান্সিসের শিয়রের কাছে ভালো হ'য়ে বসল। জলপট্টি দিতে লাগল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

এবার হ্যারির নজরে পড়ল খাবার পড়ে আছে। হ্যারি বলল—

—রাজকুমারী—আপনি কিছুই খাননি। খেয়ে নিন। আমি দেখছি। মারিয়া কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল। নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল। বোঝাই গেল এখন কিছু খাওয়ার মত মনের অবস্থা মারিয়ার নেই।

হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের পায়ের কাছে বিছানায় বসল। কম্বলটা দিয়ে ভালো করে ফ্রান্সিসের পাদু'টো ঢেকে দিল।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিসের তখন এক আচ্ছন্ন অবস্থা চলেছে। ও কোথায় আছে—এখন রাত না দিন কোন বোধই ওর নেই।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে হ'ল শরীরটা যেন খুব হালকা হ'য়ে গেছে। হাতের আঙ্গুলের জ্বালা যন্ত্রণা আর নেই। হালকা শরীর নিয়ে ও যেন ওর দেশের বাড়ির ফুলের বাগানে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ের নিচে নরম ঘাস। দিনটা একটু কুয়াশা জড়ানো। সূর্যের আলো নিস্তেজ। হঠাৎ সদর দরজা খুলে মা বেরিয়ে এলো। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে মাকে। তবে মা'র মুখ পোশাক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

মা আরো এগিয়ে এলো। ওর দিকেই। সেই ছোটবেলা মার যেমন মুখ দেখতো। সেই বয়েসের মা। এবার পোশাকটা দেখা গেল। কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ তোলা চক্‌চকে জমকালো পোশাক। এরকম পোশাক পরেই মা রাজবাড়ির উৎসবে, ভোজে, অনুষ্ঠানে যেতো। পরে অবশ্য এসব পোশাক মা কমই পরতো। রাজবাড়িতেও কম যেতো। ফ্রান্সিস ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটল মার দিকে। হঠাৎ এক ঝলক জোর হাওয়া এল। ভেজা ভেজা খুব ঘন কুয়াশা ছুটে এল। মা তখন হাসি মুখে দু'হাত সামনে ছড়িয়ে ওকে ডাকছে। ঘন কুয়াশায় মা ঢাকা পড়ে গেল। ফ্রান্সিসও হোঁচট খেয়ে ভেজা ঘাসে পড়ে গেল। ঘন কুয়াশায় সাদাটে অন্ধকারে সব ঢেকে গেল। ফ্রান্সিস আর্তস্বরে ডেকে উঠল মা। সত্যি—ফ্রান্সিসের গলা থেকে বেরিয়ে এল—মা—। ফ্রান্সিস চোখ খুলল।

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বলল—ফ্রান্সিস—কী হয়েছে। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। চোখ বুজল।

মারিয়া এবার ফ্রান্সিসের জল ভেজা কপালে হাত দিল। কী গরম। জলপট্টির জল মুহূর্তে শুষে যাচ্ছে। হ্যারিও ফ্রান্সিসের 'মা' ডাক শুনে তাকিয়েছিল। মারিয়া ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে তাকাতেই হ্যারি দ্রুত স'রে এসে ফ্রান্সিসের গলায় বুকে হাত দিল। প্রবল জ্বর। ভয়ে হ্যারির মুখ শুকিয়ে গেল। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—জলপট্টি দিতে থাকুন। আমি বৈদ্যিকে নিয়ে আসছি।

হ্যারি বৈদ্যির কাছে যাওয়ার পথে বিস্কোর কেবিনঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে জোরে ডাকল—বিস্কো—ফ্রান্সিসের শরীর খুব খারাপ। বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। ও ছুটে ঘরের বাইরে এল। তারপর ছুটল ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দিকে। হ্যারির ডাকাডাকি ছুটোছুটি বৈদ্যির দ্রুত ছুটে আসা দু'জন একজন ক'রে সব ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। সবাই জানল—ফ্রান্সিসের শরীর খুব খারাপ। সবাই এল ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের কাছে। ঘরের ভেতরে জায়গা কম। ঘরে পথে সবাই ভীড় ক'রে দাঁড়াল। কারো মুখে কথা নেই।

বৈদ্যি ফ্রান্সিসের গলায় বুকে হাত দিয়ে দেখল। কম্বল সরিয়ে পায়ের পাতায় হাত চেপে দেখল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—জ্বর অতো বেড়েছে। তবে কালকের দিনটা দেখতে হবে। ব'লে কোমরের ফেট্টি থেকে একটা মোটা কাপড়ের থলে বের করল। থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দু'টো কালো বড়ি বের ক'রে মারিয়ার হাতে দিল। বলল—এখন একটা বড়ি আর ঘণ্টা চারেক পরে আর একটা বড়ি খাইয়ে দিন। জ্বর আর বাড়বে না। জ্বালা যন্ত্রণা কমবে। তবে—কথাটা আর শেষ করল না।

হ্যারি ঘরের কোণায় রাখা কাঠের পাত্র থেকে কাঠের গ্লাসে জল ভরে মারিয়াকে দিল। মারিয়া জলের গ্লাসটা নিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখ খুলল। মোমবাতির আলোয় মারিয়া দেখল চোখ দু'টো টকটকে লাল। মারিয়া চম্‌কে উঠল। ওর হাত কেঁপে উঠল। গ্লাস পড়ে যায় যায়। বৈদ্যি গ্লাসটা ধ'রে ফেলল। মারিয়া মাথা নিচু ক'রে ফুঁপিয়ে উঠল। বৈদ্যি মারিয়ার হাত থেকে বড়ি দু'টো নিল। ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—ফ্রান্সিস এই ওষুধটা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শুকনো ঠোঁট দু'টো ফাঁক করল। বৈদ্যি মুখে জল

ঢেলে বড়িটা খাইয়ে দিল। অন্য বড়িটা হ্যারি হাত বাড়িয়ে বৈদ্যির কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে রাখল।

বৈদ্যি চলে গেল। ফ্রান্সিসের সব ভাইকিং বন্ধুরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা যাও। শুয়ে পড়ো। আমি আর রাজকুমারী এখানে থাকবো। বিস্কো ব'লে উঠল—আমরা আজ রাতে কেউ ঘুমুবো না। সবাই এখানে থাকবো। হ্যারি আর কিছু বলল না। ও তো জানে বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে কী ভালোবাসে!

হ্যারি চিন্তায় পড়ল। ওদের জাহাজের বৈদ্যি যা বলছে তাতে ওর ওপর তো আর ভরসা করা যাচ্ছে না। অথচ খানিয়া এখনও কতদূর কে জানে। ওখানে পৌঁছে ভালো বৈদ্যি দিয়ে চিকিৎসা করাবার আগেই হয় তো ফ্রান্সিস—হ্যারি আর ভাবতে পারলো না। ওর চোখ ফেটে জল এল। এত বুদ্ধিমান সাহসী শক্তিধর পুরুষ ফ্রান্সিস—এমন নিষ্পাপ ফুলের মত হৃদয়ের মানুষ ফ্রান্সিস স্বদেশ স্বজন থেকে এই বিদেশের এক সমুদ্রের বুকে ওদের অসহায় চোখের সামনে মারা যাবে? হ্যারি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মারিয়া তো তখন থেকে মাথাই তোলে নি আর।

বিস্কো ছুটে এসে হ্যারির কাঁধে হাত রেখে আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—হ্যারি, তুমি যদি এই সাংঘাতিক বিপদের মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ো তাহলে কার ওপর আমরা ভরসা রাখবো? বিস্কো যতই বলুক হ্যারির মত অনেক ভাইকিং বন্ধুরই দু'চোখে জল দেখা গেল। বিস্কো বলল—হ্যারি আমাদের আবাল্য বন্ধু ফ্রান্সিস জীবনে কখনও কারো প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করেনি—নিজের জীবন বিপন্ন না হলে কখনও কাউকে অস্ত্রাঘাত করে নি, তার এভাবে এত করুণভাবে মৃত্যু হ'তে পারে না। অসম্ভব।

হ্যারি চোখ মুছল। সত্যিই তো। এই মুহূর্তে ভেঙে পড়লে চলবে কেন। হঠাৎ ওর কাভাল্লির কথা মনে হ'ল। চারিদিকে তাকাল হ্যারি। দেখল দরজায় হাত রেখে কাভাল্লি বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি ডাকল—কাভাল্লি এদিকে এসো। কাভাল্লি এগিয়ে এসে হ্যারির সামনে দাঁড়াল। হ্যারি বলল—

—কাভাল্লি—খানিয়া পৌঁছতে আমাদের আর ক'দিন লাগবে?

কাভাল্লি একটু ভেবে বলল—তা দিন তিন চার।

—কিন্তু ততদিন তো—হ্যারি বলল—আচ্ছা—এই সমুদ্রপথে ধারে কাছে কোন বন্দর বা দ্বীপ নেই? কাভাল্লি মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল—উত্তর ক্রীটের একটি লম্বাটে অংশ এই সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে আছে। ঠিক তার মাথায় আছে নাক্সোস নামে একটা শহর বন্দর। আমি মাত্র একবার খানিয়া থেকে নাক্সোসে এসেছিলাম। তখন নাক্সোসে রাজত্ব করছিলেন একজন ভেনিসের ডিউক—ডিউক মার্কো। মার্কো সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি—ভেনিসের ডিউক হ'লেও উনি ক্রীট দেশীয় প্রজাদের মঙ্গলই করেছেন।

—ঠিক আছে—হ্যারি বলল—এখন বলো নাক্সোস বন্দর শহর কেমন। ওখানে ভালো চিকিৎসক পাওয়া যাবে কি না।

তা পাবেন বৈ কি। বড় বন্দর শহর। অনেক ভেনিসীয় মানুষের বাস। তারা

সুশিক্ষিত। তাদের মধ্যে ভালো চিকিৎসক নিশ্চয়ই আছে। কাভাল্লি বলল।

—এখন নাক্সোস পৌঁছতে কত সময় লাগবে? হ্যারি জানতে চাইল। কাভাল্লি আবার মাথা নিচু ক'রে কী হিসেব করল। তারপর মাথা তুলে বলল—গ্রামভাউসা থেকে বেশ দূরে চলে এসেছি আমরা। এখন জাহাজ দক্ষিণ মুখো ঘোরাতে হবে। একটু দ্রুত জাহাজ চালাতে পারলে আমরা কাল সন্ধ্যের মধ্যেই নাক্সোস পৌঁছে যাবো।

—না—না—হ্যারি বলল মাথা নেড়ে বলল—যে করেই হোক আমাদের কাল সকালের মধ্যে নাক্সোস পৌঁছতে হবে। কাভাল্লি বলল—রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল। পারবেন অত তাড়াতাড়ি জাহাজ চালিয়ে পৌঁছতে।

—পারতেই হবে। ফ্রান্সিসকে সুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতেই হবে। হ্যারি বলল।

এবার হ্যারি ঘরের বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকাল। সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল। হ্যারি আস্তে আস্তে দু'হাত ওপরে তুলল। তারপর একটু গলা জড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ফ্রান্সিস গুরুতর অসুস্থ। ওকে বাঁচাতে হ'লে এক্ষুণি যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে দক্ষিণ মুখো জাহাজ চালাতে হবে। কাভাল্লি বলছে—নাক্সোস পৌঁছোতে কাল সন্ধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ফ্রান্সিস এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের নাক্সোস পৌঁছোতে হবে। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু থেমে হ্যারি বলল—ভাইসব, আমরা সময়কে জয় করবো। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে জাহাজ চালাও। কাল সকালের মধ্যে আমাদের নাক্সোসে পৌঁছোতেই হবে। ফ্রান্সিসকে তোমরা কত ভালোবাসো আজকে তার পরীক্ষার দিন এসেছে। হ্যারি আবেগাপ্লুতস্বরে সব ভুলে চিৎকার ক'রে বলে উঠল—ভাইসব—প্রান্তবেগে জাহাজ চালাও—সময়কে জয় করবো আমরা। হ্যারির চিৎকার কানে যেতে প্রায় অচেতন ফ্রান্সিস মাথাটা এপাশ ওপাশ ক'রে চোখ মেলে তাকাল। দুর্বলস্বরে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া এতক্ষণ মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ফ্রান্সিসের ডাক কানে যেতে দ্রুত ফ্রান্সিসের মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস—শরীর খুব খারাপ লাগছে? ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। আস্তে আস্তে দু'চোখ বন্ধ করল, নির্জীবের মত শুয়ে রইল। ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আবার জলপট্টি দিতে লাগল।

অন্য সময় হ'লে ভাইকিং বন্ধুরা হ্যারির কথা শুনে 'ও—হো—হো—' শব্দের চিৎকার ক'রে উঠতো। কিন্তু এই ঘরে প্রায় অজ্ঞান ফ্রান্সি[illegible]ন ওরা কোন শব্দ করতে চাইল না। সবাই ছুটল যে যার কাজে। হ্যারি কাভাল্লিকে নিয়ে প্রায় ছুটে জাহাজের ডেক-এ চলে এল। দু'জনে ছুটে এল জাহাজ-চালকের কাছে। হ্যারি জাহাজ-চালককে বলল—কাভাল্লিকে এনেছি। ও যেদিকে যে পথে জাহাজ চালাতে বলে চালাও। কাভাল্লি এগিয়ে এসে জাহাজ-চালকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

হ্যারি আকাশের দিকে তাকাল। দেখল অন্ধকার আকাশ মেঘহীন। হাজার হাজার তারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। হাওয়া বইছে একটু কম জোরে। জাহাজের গতি বাড়াতে

হ'লে দাঁড় টানতে হবে।

ওদিকে সব ভাইকিংরা প্রচণ্ড তৎপরতায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদল চলে গেল দাঁড় ঘরে। দাঁড়ে হাত লাগাল। বিস্কো দুসারি দাঁড়িদের মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর দাঁড় টানার তালে তালে বিস্কো শরীর মাথা তালে তালে দুলিয়ে শুরু করল ওদের চারণ কবিদের গান। দাঁড়িদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড উৎসাহ। সমুদ্রের জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠল। একে কানে বাজছে দেশের কথা গানের পাগল করা সুর, অন্যদিকে অসুস্থ ফ্রান্সিসকে সকালের মধ্যেই বন্দর শহর নাক্সোসে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা। বিস্কোর গান চলল। দাঁড় বওয়া চলল—ছপ্ ছপ্ শব্দ জলে। বিস্কো হঠাৎ তালের ছন্দ বাড়িয়ে দিল। তাল মেলাতে আরো দ্রুত দাঁড় টানতে হল দাঁড়িদের। এতে ওরা খুশিই হ'ল। ওরা উৎসাহে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। একজন দাঁড়ি চেঁচিয়ে বলল—বিস্কো আরো জোরে। বিস্কো গানের তাল আরো বাড়াল। দাঁড়িরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। অতি দ্রুত দাঁড় পড়তে লাগল সমুদ্রের জলে। জাহাজের গতি অনেক বেড়ে গেল। বিস্কো একটু গান থামিয়ে তালের সঙ্গে দুলতে দুলতে চিৎকার ক'রে বলে উঠল—ফ্রান্সিসকে বাঁচাবো আমরা। সময়কে জয় করবো। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। জাহাজ চলল পূর্ণ বেগে।

ওদিকে মাস্তুলের মাথায় উঠে পড়েছে নজরদার পেড্রো। আট দশ জন ভাইকিং মাস্তুলে পালের কাঠ দড়িদড়া বেয়ে উঠে পড়েছে। সব ক'টা পাল টান টান খুলে দিল। বাড়তি দু'টো পালও লাগাচ্ছে, তখনই শুনল দাঁড় ঘর থেকে বন্ধুদের ও—হো—হো ধ্বনি। ওরাও চিৎকার করে জবাব দিল—ও—হো—হো—। বাড়তি দুটো পাল লাগানো হ'ল। সব পালগুলো ফুলে উঠল বাতাস লেগে। জাহাজের গতি আরো বাড়ল।

রাত শেষ হ'য়ে এল। পূবের আকাশে লাল রঙ ধরল। তখনই হঠাৎ দক্ষিণ মুখো বাতাস খুব জোরে ব'য়ে এল। ফুলে উঠল পালগুলো। ডেক-এ দাঁড়ানো ভাইকিংরা বাতাসের বেগ দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। দাঁড়ঘরে সেই ধ্বনি পৌঁছল। ওরাও চিৎকার করে সাড়া দিল। জাহাজটা যেন জল ছুঁয়ে উড়ে চলল।

আস্তে আস্তে পূব আকাশে সূর্য উঠল। নরম রোদ এসে পড়ল সমুদ্রের ঢেউয়ে জাহাজের গায়ে।

দাঁড় ঘরে তখনও চলছে পূর্ণোদ্যমে দাঁড় বাওয়া। বিস্কোর গলা ভেঙে গেছে। তালে তালে দুলতে দুলতে ওর শরীরে যেন আর সাড় নেই। তবুও ও একটু থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে গেয়ে চলেছে ওদের চারণ কবিদের গান। দাঁড়িরা ঘেমে নেয়ে উঠেছে যেন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। দম নেই যেন আর। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও থামছে না কেউ। শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে ওরা দাঁড় বেয়ে চলেছে।

এর মধ্যে হ্যারি একবার অসুস্থ ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে গিয়েছিল। দেখল ফ্রান্সিসের শিয়রে পাথরের মূর্তির মত মারিয়া ফ্রান্সিসের ডান হাতটা কোলে নিয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বসে আছে ওদের

জাহাজের বদ্যি। বদ্যি তার জ্ঞানমত চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই করেছে। কিন্তু তাতে বোধহয় ফ্রান্সিসের খুব একটা উপকার হয় নি। হ্যারি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখল ফ্রান্সিস অসহ্য ব্যথায় মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। কষ্টের গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল ফ্রান্সিসের মুখ থেকে। ফ্রান্সিসের চিরসঙ্গী হ্যারি কতবার দেখেছে কী প্রচণ্ড কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করেছে ফ্রান্সিস। আজকের কষ্ট বোধহয় এত প্রচণ্ড এত যন্ত্রণাদায়ক যে ফ্রান্সিসের মত শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষও তা সহ্য করতে পারছে না। ফ্রান্সিসকে এত অসহায় এত ব্যথাকাতর হ্যারি কোনদিন দেখে নি। ফ্রান্সিসের এই কষ্ট হ্যারি আর দেখতে পারল না। মুখ চোখ দুহাতে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হ্যারি। পাছে ওর কান্নার শব্দ ফ্রান্সিস বা মারিয়ার কানে যায় এই ভয়ে এক ছুটে হ্যারি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠতে উঠতেই হ্যারি পেড্রোর খুশির চিৎকার শুনতে পেল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। হ্যারি লাফিয়ে সিঁড়ি পার হ'য়ে ডেক-এ উঠে এল। ছুটল রেলিঙের দিকে। ততক্ষণে পালের তদারকিতে যারা পালের কাঠে বসে পাল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বেশি বাতাস ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে উঠল—হো—ও—ও। দাড়ি ঘরেও চিৎকার উঠল—হো—ও—ও। সারা জাহাজে খুশির হাওয়া বইল। জাহাজ দ্রুত এগিয়ে চলল ডাঙার দিকে।

রেলিঙে ঝুঁকে হ্যারি দেখতে লাগল ডাঙার অবস্থা। জাহাজঘাটা এদিকটাতেই। তিনটে ছোট জাহাজ জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজঘাটার পরেই বেশ সমতল একটা পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা চলে গেছে।

জাহাজ আরো কাছে আসতে হ্যারি দেখল জাহাজঘাটার পরে রাস্তায় দু'খানা পাথরের বাড়িঘর। লোকজন পথে যাতায়াত করছে। দু'তিন জন সৈন্যকেও দেখল জাহাজঘাটার দিকে হেঁটে আসছে। পরনে গ্রীক সৈন্যদের মতই লোহার বর্ম উষ্ণীব।

জাহাজ চালক হালের চাকা ঘোরোতে ঘোরাতে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি ছুটে ওর কাছে গেল। চালক বলে উঠল—শিগগির পাল গোটাতে বলো। দাঁড় বাওয়া বন্ধ করতে বলো—নইলে যে গতিতে জাহাজ ছুটছে পাথুরে জাহাজঘাটায় ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ডেক-এর উপর দিয়ে ছুটল দাঁড়ঘরের দিকে। যেতে যেতে ওপরের দিকে পালের কাঠে খুঁটিতে বসা ভাইকিং বন্ধুদের চিৎকার করে বলতে লাগল—শিগগির পাল গোটাও—পাল গোটাও। ওরা সঙ্গে সঙ্গে পালের দড়ি ধরে টানাটানি করে পাল গুটিয়ে ফেলতে লাগল।

হ্যারি ছুটে এল দাঁড়ঘরে। দাঁড়িরা তখনও প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে চলেছে। হ্যারি চিৎকার করে বলল—ভাইসব—ডাঙা—ডাঙায় এসে গেছি। দাঁড় বাওয়া বন্ধ কর। দাঁড়িরা দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল। হ্যারি দেখল বিস্কোর গলা ভেঙে গেছে। তবুও ফ্যাসফ্যাসে গলায় ও গান গেয়ে চলেছে। দাঁড়িদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। হ্যারি ছুটে বিস্কোর কাছে গেল। চেঁচিয়ে বলল—বিস্কো ডাঙা দেখা গেছে। নাক্সোস-এ পৌঁছে গেছি আমরা। বিস্কো গান থামাল। হ্যারির দিকে তাকাল। তারপর সমস্ত গা ছেড়ে দিয়ে কাঠের মেঝেয় পড় পড় হ'ল। হ্যারি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু বিস্কোর দেহে কোন সাড় নেই। ও চোখ বুঝে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। হ্যারি

বরাবরই শরীরের দিক থেকে দুর্বল। ও বিস্কোর শরীরের ভার ধ'রে রাখতে পারল না। আস্তে আস্তে বিস্কোকে কাঠের মেঝেয় শুইয়ে দিল। বিস্কো প্রচণ্ড ক্লান্তিতে চোখ বুজে হাত পা ছড়িয়ে কাঠের মেঝেয় শুয়ে রইল। হ্যারি দেখল—সব দাঁড়িরা কেউ কাঠের আসনে শুয়ে। কেউ দাঁড়ের গায়ে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ কাঠের মেঝেয় শুয়ে পড়েছে। কারো শরীরে কোন সাড় নেই। সারারাত না ঘুমিয়ে এতক্ষণ একটানা প্রাণপণে দাঁড় চালিয়ে সকলেই অসহ্য ক্লান্তিতে হাত পা ছেড়ে পড়ে গেছে। ফ্রান্সিসের প্রতি এই বন্ধুদের এই গভীর ভালোবাসা দেখে হ্যারি অবাক হয়ে গেল। ও আর কাউকে ডাকল না। বিশ্রাম করুক ওরা। হ্যারি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। এতক্ষণে হ্যারি বুঝল ও নিজেও কম ক্লান্ত নয়। ডেকেই শরীর এলিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু এখনও বিশ্রামের সময় আসে নি। আসল কাজ এখনও বাকি। ওকে ডেক-এ উঠে আসতে দেখে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল। শাঙ্কোও ছিল তার মধ্যে। বলল—হ্যারি এখন কী করবে? হ্যারি ক্লান্তস্বরে বলল—জাহাজ ঘাটে লাগলে আমি তোমাকে নিয়ে নামবো। কাভাল্লিকেও সঙ্গে নেবো। ও থাকলে সুবিধে। ও এখানকার রাজা রাজবাড়ি পথ ঘাট চেনে।

এবার হ্যারি শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো—এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সিসের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যাও—কাভাল্লিকে ডেকে নিয়ে এসো। জল্‌দি। শাঙ্কো ছুটে চলে গেল। একটু পরেই কাভাল্লিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

ততক্ষণে জাহাজের সেই দ্রুত গতি পড়ে গেছে। জাহাজ আস্তে আস্তে চলল জাহাজঘাটার দিকে। হ্যারি শাঙ্কো আর কাভাল্লি জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। তিনচার জন ভাইকিং বন্ধু কাঠের পাটাতনটা হাতে নিয়ে তৈরি হ'ল। আস্তে আস্তে জাহাজটা পাথুরে ঘাটটার গায়ে এসে লাগল। একটা বেশ জোর ঝাঁকুনি খেয়ে জাহাজটা থেমে গেল। দ্রুত পাটাতন ফেলা হ'ল। ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দে নোঙ্গর ফেলা হ'ল। পাটাতন দিয়ে হ্যারি ওরা দ্রুত পায়ে জাহাজঘাটায় নামল। নামতে নামতে কাভাল্লি বলল—সত্যি তোমরা বীরের জাতি। অসম্ভবকে সম্ভব করলে। এত তাড়াতাড়ি জাহাজ চালিয়ে এলে ভাবাই যায় না। হ্যারি ম্লান হেসে বলল—আমরা ভাইকিং—আমরা যা সংকল্প নি—তা ক'রে তবে ক্ষান্ত হই। মোটামুটি সমতল পাথর বাঁধানো রাস্তায় উঠতেই তিনজন সৈন্য এগিয়ে এসে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। হ্যারিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি চিন্তায় পড়ল। সৈন্যরা আটকে দিলে ঝামেলায় পড়তে হবে। হ্যারি কাভাল্লিকে বলল—কাভাল্লি আমি ভালো করে গ্রীক ভাষা বলতে পারবো না। তুমি একটা কথাই ওদের বোঝাও যে আমরা ভাইকিং। জাহাজে আমাদের এক বন্ধু মরণাপন্ন। তার সুচিকিৎসার জন্যে আমরা এখানকার রাজা ডিউক মার্কোকে অনুরোধ করতে যাচ্ছি।

সৈন্য তিনজন কোমরবন্ধ থেকে তরোয়াল খুলল। হ্যারিদের ঘিরে দাঁড়াল। হ্যারিওরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদের একজন গ্রীক ভাষায় বলল—তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন? এবার কাভাল্লি একটু এগিয়ে গেল সৈন্যদের দিকে। হ্যারি যা বলে দিয়েছিল তাই গড় গড় করে বলে গেল। সৈনিকদের একজন বলল—কিন্তু তোমরা বিদ্রোহী এনরিকোর গুপ্তচরও তো হ'তে পারো। এবার হ্যারি

ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—কে বিদ্রোহী এনরিকো? আমরা এনরিকোর নামই শুনি নি। হ্যারি বুঝল এখন মিথ্যে কথা না বলে উপায় নেই। সৈন্যরা ওদের যত দেরি করিয়ে দেবে ফ্রান্সিসের বিপদ তত বাড়বে। সৈন্য তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হ্যারির কথা যে জন্যেই হোক ওরা বিশ্বাস করল। খোলা তরোয়াল কোমরে গুঁজে রাখল। একজন সৈন্য বলল—যাও। তবে রাজা মার্কোর রাজসভা শুরু হ'তে এখনও ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। সৈন্য তিনজন চলে গেল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো—যা বুঝছি—এখন রাজার সাহায্য চাইতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে! দু'ঘণ্টা পরে রাজা রাজসভায় আসবেন। বেশ সময় যাবে রাজাকে আমাদের আবেদন জানাতে। তিনি আমাদের আবেদনে সাড়া দেবেন কিনা তাও আগে থেকে বলা সম্ভব না। যদি সাড়া না দেন তাহলে ঘণ্টা তিনেরও বেশি সময় নষ্ট হবে। অথচ ফ্রান্সিসের শরীরের যা অবস্থা তাতে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। শাঙ্কো ভাবল কথাটা। বলল—এখন কী করবে তাহলে?

—এই নগরে একজন ভালো বৈদ্যিকে খুঁজে বের করতে হবে। হ্যারি বলল। তারপর কাভাল্লিকে বলল—কোন ভাল বৈদ্যিকে চেনো তুমি? কাভাল্লি মাথা নাড়ল।

—ঠিক আছে—চলো। হ্যারি পাথর বাঁধানো রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে চলল। রাস্তায় কত লোক চলাচল করছে। হ্যারির সেদিকে চোখ নেই। ও খুঁজছে একটা ওষুধের দোকান। হ্যারি দু'পাশে তাকাতে তাকাতে চলেছে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা ঝাকড়া মাথা গাছের নিচে পাথর বাঁধানো বেদীমত। তার ওপর কিছু শুক্‌নো আর টাটকা গাছ-গাছড়া। নানা রকম শুক্‌নো শেকড়বাকড়—এসব নিয়ে দু'জন লোক ব'সে আছে। দু'চারজন খরিদ্দার গাছ পাতা শেকড়বাকড় নেড়েচেড়ে দেখছে। হ্যারি দ্রুত লোক দু'টির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল—এসব কি ওষুধ তৈরির গাছ-গাছড়া? লোক দু'টি কথাটা কিছু বুঝল। মাথা নেড়ে একজন বলল, হ্যাঁ।

—এই নগরের বৈদ্যিরা এসব কেনেন—তাই না? হ্যারি বলল। লোকটি আবার মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

—এখানকার কোন ভালো বৈদ্যিকে চেনো? হ্যারি বলল। লোকটি মাথা নেড়ে বলল—পাসকাতোর—রাজবদ্যি।

—কোথায় থাকেন পাসকাতোর। হ্যারি জানতে চাইল। লোকটা এবার হাত নেড়ে নেড়ে কী গড় গড় ক'রে বলে গেল। হ্যারি সব কথা বুঝল না। কাভাল্লির দিকে তাকাল। কাভাল্লি—মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বুঝেছি—পাসকাতোর মানে রাজবৈদ্যি থাকেন কাছেই। চলো আমার সঙ্গে। তিনজনে পথ দিয়ে চলল। কিছুটা যেতেই একটা মোড় পড়ল। মোড়ের ডান পাশে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা মত। কাভাল্লি উপত্যকা দিয়ে চলল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো।

দু'পাশের উঁচু উঁচু টিলামত। তার মাঝখান দিয়ে পথ। ওরা চলল। কিছুটা যেতেই কাভাল্লি এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। একটা উঁচু পপলার গাছের নিচে পাথরের বাড়িঘর কিছু। কাভাল্লি সেদিকে চলল। একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দেখা গেল বাইরের ঘরের দরজা খোলা। কিছু লোকজন ঘরে বসে আছে। কাভাল্লি এগিয়ে গিয়ে সেই লোকজনদের সঙ্গে কথা বলল। হ্যারিদের দিকে ফিরে

তাকিয়ে বলল—এটাই রাজবৈদ্যির বাড়ি। উনি এখনি আসবেন।

হ্যারি ও শাঙ্কো ঘরটায় ঢুকল। দেখল ঘরের একদিকে—একটা পাথরের বেদীমত। তাতে পাখির পালকের আসন পাতা। আর একপাশে পাথরের তাকওলা আলমারিমত। তাতে অনেক কাঠের কৌটো রাখা। নিচের তাকে অনেক শুকনো শেকড়বাকড় রাখা। ঘরটার ওপাশের দরজা দিয়ে দেখা গেল উঠানমত। তা'তে পাথর পাতা উনুন জ্বলছে। বিরাট বড় মাটির গামলামত কী বসান। তাতে নানা গাছপাতা সেদ্ধ হচ্ছে। গামলা থেকে ধোঁয়া উঠছে। হ্যারি বুঝল—কাঠের কৌটোগুলো ওষুধের কৌটো। উনুনে জ্বাল দিয়ে ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে।

ঘরে লম্বাটে কাঠের পাটাতন পাতা। রোগীরা বসে আছে। হ্যারি শাঙ্কো আর কাভাল্লিকে ইঙ্গিতে বসতে বলল। নিজে দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই পাকা দাড়িগোঁফওলা একজন বৃদ্ধ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন। বৃদ্ধের পরনে ঢোলা সাদা মোটা কাপড়ের জোব্বামত। কোমরে রেশম কাপড়ের বন্ধনী। হ্যারি বুঝল ইনিই রাজবৈদ্যি পাসকাতোর। হ্যারি এবার অন্য রোগীদের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—ভাই আমাদের এক বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। আমি আগে মাননীয় রাজবৈদ্যির সঙ্গে কথা বলবো। রোগীদের দুজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অন্যেরা কোন কথা বলল না।

এবার হ্যারি এগিয়ে গেল। পাসকাতোর ততক্ষণে আসনে বসেছেন। হ্যারি মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল, রাজবৈদ্য মহাশয়—আমরা বিদেশী ভাইকিং। আমাদের জাহাজে আমাদেরই এক বন্ধু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনি দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে জাহাজে এসে আমাদের অসুস্থ বন্ধুকে একটু দেখেন—চিকিৎসা করেন। পাসকাতোর একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—আমি বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। জাহাজে ওঠানামা করতে খুবই কষ্ট হবে। আপনারা যদি আপনাদের অসুস্থ বন্ধুকে এখানে আনতে পারেন তাহলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করবো। হ্যারি একটু ভাবলো কী করবে এখন? পরক্ষণেই ভাবল অন্য কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিসকে প্রাণে বাঁচাতে হ'লে যে ভাবেই হোক ফ্রান্সিসকে এখানে আনতে হবে। ও বলল—বেশ আমরা এক্ষুণি অসুস্থ বন্ধুকে নিয়ে আসছি।

হ্যারি, শাঙ্কো আর কাভাল্লিকে ইশারায় ডেকে ঘরের বাইরে এল। হ্যারি বলল—জাহাজে চলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সিসকে এখানে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

হ্যারি রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। শাঙ্কো ও কাভাল্লিও চলার বেগ বাড়াল।

জাহাজে উঠে হ্যারি ছুটল ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিনঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে দেখল—ফ্রান্সিস চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিন্তু স্থির হ'য়ে শুয়ে নেই। মাঝে মাঝেই জোরে মাথা এপাশ ওপাশ করছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে কষ্টের গোঙানি। ফ্রান্সিসের শিয়রের দুপাশে ব'সে মারিয়া আর ওদের বৈদ্যি ফ্রান্সিসের দু'টো হাত কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দুঃখে বেদনায় হ্যারির বুক ভরে উঠল। ফ্রান্সিসের মত শক্ত মনের মানুষ কী প্রচণ্ড কষ্টে এই রকম মাথা নাড়ছে গোঙাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে হ্যারি অস্থির হ'য়ে উঠল। ওর দু'চোখ জলে ভিজে

উঠল। পরক্ষণেই হ্যারি চোখ মুছে ফেলল। এখন মন দুর্বল হ'লে চলবে না। এখন অনেক কাজ।

ততক্ষণে বিস্কো আর কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু ঘরে ঢুকল। ওরা শাঙ্কোর মুখে শুনেছে অসুস্থ ফ্রান্সিসকে রাজবৈদ্যির বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। বিস্কোর শরীর এখনও দুর্বল। কিন্তু সেই দুর্বলতা ও গায়ে মাখল না। হ্যারি ডাকল—রাজকুমারী! মারিয়া আস্তে আস্তে মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—একটু কথা ছিল। মারিয়া বিছানা থেকে উঠে হ্যারির কাছে এল। হ্যারি দেখল—মারিয়ার দু'চোখ লাল। চোখের নিচে গভীর কালি। মুখ শুকিয়ে গেছে। দু'গালের চোখের জলের দাগ। হ্যারির বুক ব্যাথায় ভ'রে উঠল। মারিয়ার মাথার চুল সারা মুখে ছড়ানো। এলোমেলো। বেদনার প্রতিমূর্তি যেন! আজ বোঝার উপায় নেই মারিয়া কত হাসিখুশি কত প্রাণবন্ত মেয়ে। হ্যারি আস্তে আস্তে মারিয়াকে সব বলল। সব শুনে মাবিয়া বলল—তাহলে ফ্রান্সিসকে যে নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু এতে ওর কষ্ট বাড়বে না তো?

—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ফ্রান্সিসকে সাবধানে সযত্নে নিয়ে যেতে, যাতে ওর কোন কষ্ট না হয়—বিস্কো বলল।

—বেশ। মারিয়া আর কিছু বলল না। ফিরে গিয়ে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসের একটা পট্টি বাঁধা হাত কোলে তুলে নিল।

ওদিকে জাহাজে সাজো সাজো রব উঠল। অসুস্থ ফ্রান্সিসকে রাজবৈদ্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

বিস্কো ছুটে গেল কেবিন ঘরগুলোর পেছনে। একটু অন্ধকারমত জায়গাটায় অনেকগুলো কাঠের তক্তা থাকে থাকে সাজানো। জাহাজ মেরামতের জন্যে ওগুলো লাগে। বিস্কোর সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুও ছুটে এসেছিল। ওরা ধরাধরি ক'রে একটা লম্বাটে কাঠের তক্তা বের করল। নিয়ে এল ফ্রান্সিসের ঘরে। তক্তা মেঝেয় পেতে তার ওপর মোটা কম্বলমত পাতলা দু'টো। রাখল বালিশ। বিছানামত হ'ল। হ্যারি হাত চেপে পরীক্ষা ক'রে দেখল বেশ নরম হয়েছে। ও একটা মোটা চাদরও পেতে দিল। এবার ফ্রান্সিসকে বিছানা থেকে এনে এখানে শোয়াতে হবে। তারপর বিছানা-পাতা তক্তাটা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে রাজবৈদ্যির বাড়ি।

এবার হ্যারি ওরা চিন্তায় পড়ল। নাড়াচাড়া করতে গেলে যদি ফ্রান্সিসের কষ্ট বাড়ে। হ্যারি—কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ওদের ইতস্তত ভাব দেখে মারিয়া বলল—হ্যারি—হয়তো এভাবে নিয়ে যেতে গেলে ফ্রান্সিসের কষ্ট বাড়বে। কিন্তু এক্ষুণি তো নিয়ে যেতেই হবে! ওদের বৈদ্যি বন্ধু তখনও বিছানায় মাথা নিচু ক'রে বসেছিল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—যত কষ্ট হোক ফ্রান্সিসকে এক্ষুণি নিয়ে যাও। নইলে—ফুঁপিয়ে উঠে বলল—ফ্রান্সিসকে বাঁচানো যাবে না।

কথাটা শুনে হ্যারি ব'লে উঠল—রাজকুমারী—ফ্রান্সিসকে তুলে আনতে আপনি সাহায্য করুন। রাজকুমারী আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখ খুলল। চোখ দু'টো লাল।—তোমাকে রাজবৈদ্যির কাছে নিয়ে যেতে হবে। ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে আবার চোখ বুজল। মারিয়া ফ্রান্সিসের ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়েই বুঝেছিল প্রচণ্ড জ্বর ফ্রান্সিসের।

ফ্রন্সিস আবার মাথা দু'একবার এপাশ ওপাশ ক'রে গোঙাল।

হ্যারি ইঙ্গিতে বিস্কোকে কাঠের তক্তার বিছানাটা ধরতে বলল। দু'জনে বিছানা-পাতা তক্তাটা বিছানায় তুলে ফ্রান্সিসের পাশে রাখল। তারপর কয়েকজন ভাইকিংকে ইঙ্গিতে ডাকল। পাঁচ ছ'জন মিলে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে তুলল। ফ্রান্সিস গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিসের অসহ্য কষ্ট বেদনার কথা ভেবে বন্ধুদের কারো কারো চোখে জল এল। হ্যারি চাপাস্বরে বলল—কেউ কেঁদো না। তোমাদের চোখে জল দেখলে ফ্রান্সিস দুর্বল হয়ে পড়বে।

আস্তে আস্তে ওরা ফ্রান্সিসকে ধ'রে বিছানাপাতা তক্তায় শুইয়ে দিল। মারিয়া ফ্রান্সিসের হাত দু'টো আস্তে আস্তে বিছানাটার দু'পাশে নামিয়ে রাখল। বোধহয় অসহ্য হাতের যন্ত্রণার জন্যেই ফ্রান্সিস চোখমুখ কুঁচকে মাথা নাড়ল। ওর গলায় গোঙানির শব্দ হল। ফ্রান্সিস একবার চোখ মেলে মারিয়া আর বন্ধুদের ঝুঁকে পরা মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কাউকেই চিনল না বোধহয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'চোখ বন্ধ করল। আটদশ জন ভাইকিং বন্ধু হ্যারি আর বিস্কো বিছানা-পাতা তক্তাটা এবার আস্তে তুলল। খুব সাবধানে হাতে ধরাধরি করে কেবিনঘরের বাইরে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল।

সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে সযত্নে উঠে ডেক-এ এল। তারপর ধরাধরি ক'রে নিয়ে চলল কাঠের পাটাতনের দিকে। কাঠের পাটাতন তো খুব বড় হয় না। মাত্র দুজন সামনে পেছনে নামতে পারে। এবারে শাঙ্কো ছুটে এসে বিছানাটার সামনে ধরল। আর একপাশে ধরল বিস্কো। দু'জনে মিলে এবার বিছানাপাতা তক্তাটা নিয়ে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগল। একে ফ্রান্সিসের শরীরের ভার তার ওপর সরু পাটাতন। শাঙ্কো আর বিস্কোর ভীষণ কষ্ট হ'তে লাগল। হাত দু'টো যেন ছিঁড়ে যাবে এরকম অবস্থা। কিন্তু ওরা দাঁত চেপে সেই কষ্ট সহ্য করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে জাহাজঘাটায় নামিয়ে আনল। এবার আটদশ জন বন্ধু ছুটে এল। ওরা সবাই মিলে সেই বিছানাপাতা তক্তাটা ধরাধরি ক'রে আস্তে আস্তে সাবধানে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে একবার মাত্র চোখ চেয়েছিল। মাথা এপাশ ওপাশ করছিল। ওর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল গোঙানির শব্দ।

আস্তে আস্তে ওরা রাজবৈদ্যের বাড়ি পৌঁছল। রাজবৈদ্য সহকারী এগিয়ে এল। পাশের ঘরে একটা কাঠপাতা শয্যায় ফ্রান্সিসকে শুইয়ে দিতে ইঙ্গিত করল। বন্ধুরা সেখানে ফ্রান্সিসকে শুইয়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। শয্যার পাশে বসল মারিয়া। নিশ্চল পাথরের মত বসে রইল। হ্যারি আর বিস্কো সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে রাজবৈদ্য এলেন। ফ্রান্সিসের বিছানায় বসলেন। ফ্রান্সিসের কপালে গলায় হাত দিয়ে বোধহয় জ্বর কেমন দেখলেন। পায়ের কাছে কম্বল সরিয়ে পা দু'টো টিপে হাত বুলিয়ে দেখলেন। তারপর পট্টি বাঁধা হাত দুটো আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। এবার সহকারীর দিকে তাকিয়ে কী বললেন। সহকারী দ্রুত বেরিয়ে গেল। একটু পরে কালো কাঠের গামলা নিয়ে এল। তাতে গরম জল। ধোঁয়া উঠছে। সহকারী কিছু মোটা সাদা কাপড়ের টুকরো নিয়ে এল। সে সব রাজবৈদ্যকে দিল। তারপর একটা কাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলিমত বের করল। সেটা

গরম জলে চুবিয়ে নাড়তে লাগল। বেগুনি রঙ হ'য়ে গেল জলটার।

রাজবৈদ্য বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিসের বাঁ হাতটা আস্তে আস্তে তুললেন। তারপর কিছুটা সাদা ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে ঐ গামলার জলে চুবিয়ে ভেজালেন। সেটা হাতের পট্টির গায়ে লাগিয়ে ভেজালেন। আস্তে আস্তে পট্টিটা খুলতে লাগলেন। কিছুটা খুলতেই দগ্‌দগে ঘা মত দেখা গেল। রাজবৈদ্য এবার হ্যারির দিকে তাকালেন। মারিয়াকে দেখিয়ে আস্তে বললেন—এই ভদ্রমহিলাকে বাইরে যেতে বলুন। গ্রীক ভাষা মারিয়া বুঝল না। হ্যারি মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী, আপনি একটু বাইরে যান। মারিয়া কোন কথা না বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। রাজবৈদ্য সেই গামলার বেগুনী রঙের জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে ফ্রান্সিসের দু'হাতের পট্টি আস্তে আস্তে খুলে ফেলল। দেখা গেল দু'টো হাতেই কাটা জায়গাগুলো ঘায়ের মত হ'য়ে গেছে। হাত দু'টো বেশ ফুলেও গেছে। রাজবৈদ্য সহকারীকে কী বললেন। সহকারী ছুটে গিয়ে একটা তিনকোণা পাতায় জড়ানো হলুদ রঙের আঠামত কী নিয়ে এল। রাজবৈদ্য সেই জিনিসটা থেকে কিছুটা নিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের হাতের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে একবার মাথা তুলল। আবার মাথা নামাল বালিশের ওপর। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। রাজবৈদ্য সমস্ত ওষুধটাই দু'হাতের ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলেন। তাকিয়ে রইলেন ফ্রান্সিসের মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ সময় কাটল। ঘরের সবাই তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে। ফ্রান্সিস মাঝে মাঝেই চোখ মুখ কোঁচকাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'ল। নাক মুখ কোঁচকান বন্ধ হ'ল। ফ্রান্সিস চুপ ক'রে চোখ বোজা অবস্থায় শুয়ে রইল। বোঝা গেল যেন ওর কষ্ট একটু কমল।

রাজবৈদ্য এবার শুক্‌নো মোটা সাদা কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের হাত দু'টো বেঁধে দিলেন। দুটো হাত বিছানা পেতে দিলেন। বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হ্যারি রাজবৈদ্যের সামনে এগিয়ে এল। বলল—আমাদের বন্ধু—সুস্থ হবে তো? রাজবৈদ্য পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হাসলেন। বললেন—আর ঘণ্টা পাঁচ ছয় দেরি হ'লে আপনাদের বন্ধুকে বোধহয় বাঁচানো যেত না। যা হোক—ওষুধে কাজ হয়েছে এখন আস্তে আস্তে জ্বর কমবে। ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণাও কমবে। বন্ধুটি সুস্থ হবে। হ্যারি রাজবৈদ্যের ডানহাতটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাজবৈদ্য হ্যারির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন।

মারিয়া দ্রুত ঘরে ঢুকল। হ্যারিকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে মারিয়া কেমন বিহ্বলের মত ব'লে উঠল—তাহ'লে ফ্রান্সিস কি—আমাকে এই জন্যেই এখানে থাকতে দেওয়া হয় নি। হ্যারি তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না—না রাজকুমারী। রাজবৈদ্য বলেছেন—ফ্রান্সিস সুস্থ হবে। আস্তে আস্তে ওর জ্বর কমবে জ্বালা যন্ত্রণা কমবে। ভয়ের কিছু নেই।

মারিয়া কোন কথা বলল না। আস্তে আস্তে গিয়ে ফ্রান্সিসের শিয়রের কাছে বসল। একটা হাত আস্তে আস্তে তুলে কোলে রাখল। হাত বুলোতে লাগল।

সময় কাটতে লাগল। তখনও ঘরের মধ্যে হ্যারি বিস্কো শাঙ্কো। বাইরে অন্য

বন্ধুরা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা দু'য়েক কাটল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল। মারিয়া ঝুঁকে বলল—ফ্রান্সিস—এখন কেমন লাগছে? মারিয়া দেখল ফ্রান্সিসের চোখের লাল ভাবটা অনেক কম। কপালে হাত দিল। জ্বর অনেক কম। ফ্রান্সিসের চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক এখন। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলল—একটু ভালো।

—কোনো ভয় নেই ফ্রান্সিস—রাজবৈদ্য বলেছেন তুমি ভালো হ'য়ে যাবে। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস শুক্‌নো ঠোঁটে হাসল। ক্লান্তস্বরে বলল—জল। হ্যারি ছুটে গেল। একটু পরেই একটা কাঠের পাত্রে খাবার জল নিয়ে এল। মারিয়া আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে জল খাইয়ে দিল। জল খেয়ে ফ্রান্সিস বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

হ্যারির মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। ও হেসে বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। ওরাও হাসল। শাঙ্কো এক লাফে ঘরের বাইরে এল। বন্ধুরা অনন্ত অনড় দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো চাপা গলায় বলল—ভাইসব—ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। রাজকুমারীকে চিনতে পেরেছে। কথা বলেছে। জল খেয়েছে। সবাইয়ের মুখে হাসি ফুটল। অন্য সময় হ'লে হয়তো—ও—হো—হো ক'রে চিৎকার জুড়তো। এখন সবাই চুপ। একজন দু'জন করে ওরা বারান্দার পাথুরে মেঝেতে বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। গতকাল সারা রাত ওরা শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে জাহাজের দাঁড় বেয়েছে। এখন এই বেলা পর্যন্ত কেউ কিছু খায় নি। ক্লান্তিতে অবসাদে সবাই তখন খাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। অবশ্য ফ্রান্সিসের অসুস্থতার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারে নি এতক্ষণ। ফ্রান্সিস সুস্থ আছে জেনে এবার ওরা নিশ্চিন্ত হ'ল। উৎকণ্ঠা কেটে গেল। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল ওরা কী ভীষণ ক্লান্ত।

হ্যারি ওদের কাছে এল। বলল, ভাইসব—ফ্রান্সিস এখন অনেকটা সুস্থ। গতরাতে তোমরা অমানুষিক পরিশ্রম করে সময়কে জয় করেছিলে। তাই ফ্রান্সিসকে বাঁচাতে পারলাম আমরা। এবার জাহাজে ফিরে যাও। রাঁধুনিকে বলো রান্না করতে। তোমরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো। আমি শাঙ্কো আর রাজকুমারী এখানে রইলাম। তোমরা খেতে যাও। আমরা পরে খাবো।

ভাইকিং বন্ধুরা চলে গেল জাহাজে। হ্যারি রাজবৈদ্যের কাছে গেল। বলল—আপনাকে কী করে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো—। রাজবৈদ্য হেসে হাত তুলে হ্যারিকে থামালেন। বললেন শুনুন—আপনাদের যা শরীরের অবস্থা তাতে তাঁকে টানাটানি করা তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর হবে। রোগী ঐ ঘরেই থাকবে। আমার সহকারী সব ব্যবস্থা করবে।

—তাহলে তো খুবই ভালো হয়। হ্যারি বলল—আমরা কয়েকজন এখানে থাকবো—দিন রাত—রাজকুমারী মারিয়া সেবা-শুশ্রূষা করবেন।

হ্যারি ঘরে ফিরে এল। দেখল মারিয়া ফ্রান্সিসের ডান হাতটা কোলে নিয়ে সেই একইভাবে মাথা নিচু করে বসে আছে। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—রাজকুমারী—রাজবৈদ্য বললেন ফ্রান্সিসেকে এই ঘরে থাকতে হবে। ওর শরীরের এই অবস্থায় ওকে জাহাজে আনা নেওয়া নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না। আমি তাতে রাজি হয়েছি। এখন আপনি বলুন। মারিয়া মাথা নিচু করে শান্তভাবে

বলল—তোমরা যা চাইবে তা হবে। আমার মাথার ঠিক নেই। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

—তাহলে ফ্রান্সিস এখানেই থাক। আমরা কয়েকজন পালা ক'রে এখানে থাকবো। আপনাকে সাহায্যে করবো। হ্যারি বলল। মারিয়া শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কোন কথা বলল না।

হ্যারি ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে বলল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন শাঙ্কো বিস্কো ওরা জাহাজ থেকে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে আসে।

বেলা বাড়তে লাগল। হ্যারি বারান্দায় পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। ফ্রান্সিস এখন কিছুটা সুস্থ। আর ফ্রান্সিসের জীবনের আশঙ্কা নেই—রাজবৈদ্য তো তাই বললেন, এতক্ষণে হ্যারি বুঝতে পারল—ও কতটা শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত। হ্যারি দু'চোখ বুজল। আস্তে আস্তে ঐ অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিস্কোর ডাকে হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। হ্যারি চোখ খুলে দেখল—বিস্কো শাঙ্কো ওরা কয়েকজন ওর পাশে এসে বসল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া ফ্রান্সিসের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সিস ঘুম ভেঙে চেয়ে আছে। হ্যারি আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল। হ্যারি বলল—কিছু খাবে? ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। আস্তে মাথা ওঠানামা করে চাইল। হ্যারি বলল—দেখি রাজবৈদ্যর সহকারী কী বলে? হ্যারি ভেতরের উঠোন মত জায়গাটায় গেল। দেখল সহকারী যারা ওযুধ জ্বাল দিচ্ছে তাদের নির্দেশ দিচ্ছে। হ্যারি কাছে গিয়ে বলল—আমাদের বন্ধু—ফ্রান্সিস—ও এখন একটু ভালো। ও খেতে চাইছে। ওকে কী খেতে দেব? সহকারী বলল—তাঁকে তো শক্ত খাবার দেওয়া যাবে না। আমি খাবার তৈরি করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা খাইয়ে দিন।

ঘরে এসে হ্যারি মারিয়াকে সে কথা বলল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একজন লোক একবাটি খাবার জল নিয়ে এলো। বাটিতে একটা ছোট কাঠের হাতা রাখা! মারিয়া আস্তে আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ ক'রে ছিল। চোখ খুলে তাকাল। মারিয়া বলল—একটু খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মুখ হাঁ করল। মারিয়া হাতায় ক'রে খাবার খাইয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস খাবার খেয়ে জল খেয়ে একটু যেন ভালো বোধ করতে লাগল। চোখ বন্ধ করল। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—জাহাজে চলুন। কাল থেকে আপনি এক ফোঁটা জলও খান নি। মারিয়া মাথা নাড়ল।

—অবুঝ হবেন না রাজকুমারী। এভাবে না খেয়ে থাকলে আপনি অসুস্থ হ'য়ে পড়বেন। ফ্রান্সিস তো এখন কিছুটা সুস্থ। আসুন। হ্যারি বলল।

মারিয়া আর আপত্তি করল না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল। হ্যারি মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে এল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো তোমরা ফ্রান্সিসের কাছে থাকো। আমরা জাহাজে খেতে যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো।

তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। অসুস্থ ফ্রান্সিসের ঘরে একটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে।

ফ্রান্সিসের শিয়রে মারিয়া বসে আছে। হ্যারি শাঙ্কো মেঝেয় মোটা কম্বলমত পেড়ে বসে আছে।

সহকারীকে নিয়ে রাজবৈদ্য এলেন। ফ্রান্সিসের বিছানায় বসলেন। ফ্রান্সিস চোখ বুজে ছিল। মারিয়া মুখ নামিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—রাজবৈদ্য এসেছেন। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। রাজবৈদ্য হেসে গ্রীক ভাষায় বললেন—কেমন আছেন? ফ্রান্সিস বুঝল না। হ্যারি ব'লে উঠল—ফ্রান্সিস তুমি কেমন আছো রাজবৈদ্য তাই জানতে চাইছে। ফ্রান্সিস শুকনো ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে মাথা নেড়ে বোঝাল—ভাল। রাজবৈদ্য ফ্রানিসের কপালে গলায় পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর হাত দু'টো তুলে দেখলেন। ফ্রান্সিস একটু চোখ মুখ কোঁচকাল। রাজবৈদ্য সেটা লক্ষ্য করলেন। সহকারীকে মৃদুস্বরে কী বললেন। তারপর যখন চলে যাচ্ছেন হ্যারি এগিয়ে গিয়ে বলল—কেমন দেখলেন? রাজবৈদ্য পাকাদাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন—অনেকটা ভালো। কাল সকালে আবার ওষুধ পড়বে। জ্বর ছেড়ে যাবে। জ্বালা যন্ত্রণাও অনেক কমে যাবে। তিনি চলে গেলেন। ওদিকে সহকারী কাপড়ের পুঁটুলি থেকে বড়ি বের ক'রে মারিয়াকে ইঙ্গিতে খাইয়ে দিতে বলল। ওষুধ নিয়ে ফ্রান্সিস আবার চোখ বুজে শুয়ে রইল।

রাত হ'ল। হ্যারি মারিয়া শাঙ্কো আর বন্ধুরা কয়েকজন পালা ক'রে জাহাজ থেকে খেয়ে এল। রাজবৈদ্যর সহকারী ফ্রান্সিসের খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস খাবে বলে উঠে বসতে গেল। পারল না। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। মারিয়া ব্যস্ত হ'য়ে বলল—তোমাকে উঠতে হবে না। আমি খাইয়ে দিচ্ছি। মারিয়া ফ্রান্সিসকে খাইয়ে দিতে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল। সেই ঘরের মেঝেয় মোটা কম্বলমত পেতে হ্যারি আর শাঙ্কো শোবে ঠিক করল। হ্যারি শুয়ে পড়ার আগে বলল—রাজকুমারী—আপনি এখন ঘুমিয়ে নিন। আমরা আছি। মারিয়া মাথা নাড়ল। হ্যারি আর শাঙ্কো শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে পড়ল। এত ক্লান্ত ছিল ওরা যে চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না।

রাত শেষ হ'য়ে এসেছে তখন। হঠাৎ হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। দেখল মারিয়া বিছানায় গুটিসুটি হ'য়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ও আর মারিয়াকে ডাকল না।

হ্যারি বসে রইল। কিছুক্ষণ পরেই বাইরে একটা পাখির ডাক শুনল। তারপর আরো দু'তিনটি পাখির ডাকে বুঝল ভোর হয়ে এসেছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের অস্ফুট ডাক শুনল—মারিয়া। হ্যারি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের কাছে গেল। মারিয়ার কানে ডাকটা যায় নি। ও তখন অঘোর ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখে হাসল। বলল—হ্যারি—দেখতো—মনে হচ্ছে জ্বরটা ছেড়ে গেছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কপালে হাত রাখল। ঠাণ্ডা। আনন্দে হ্যারির চোখে জল এসে গেল। ও দু'হাতে চোখের জল মুছে ফেলল। ফ্রান্সিস হেসে দুর্বল কণ্ঠে বলল—এই—ছেলেমানুষি ক'রো না। একটু থেমে বলল—হ্যারি—যে জীবন আমরা মেনে নিয়েছি সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন স্থান নেই। আছে শুধু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই। সংকল্প সাধনের জন্যে লড়াই। সমস্ত দুঃখ কষ্ট ব্যথা

বেদনা দাঁত চেপে সহ্য ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছোতে হবে। এখানেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। ফ্রান্সিস কথাগুলো ব'লে একটু হাঁপাতে লাগল। হ্যারি বলল—বেশি কথা ব'লো না ফ্রান্সিস। তোমার শরীর এখনও ভীষণ দুর্বল।

ওদের কথাবার্তাতেই বোধহয় মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও লাফিয়ে উঠে বসল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে—আকুলস্বরে বলে উঠল—কী হ'য়েছে হ্যারি? হ্যারি হেসে বলল—ভয়ের কিছু নয়। ফ্রান্সিসের জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে।

—এ্যাঁ! মারিয়া তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের কপালে হাত রাখল। গলায় হাত রাখল। তারপর দু'হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—এই—কেঁদো না। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। হ্যারি আস্তে আস্তে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল। মারিয়া তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তিন দিন কাটল। চারদিনের দিন ফ্রান্সিসের দু'হাতের পট্টি রাজবৈদ্যি এসে খুললেন। দেখা গেল হাতের ফোলা একেবারেই নেই। ঘাও শুকিয়ে গেছে। এর মধ্যে ফ্রান্সিস বিছানায় উঠে বসেছে। মেঝেয় একটু একটু পায়চারি করেছে। দেখেশুনে ফ্রান্সিসকে পরীক্ষা ক'রে রাজবৈদ্য পাকা দাঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—এবার আপনি আপনাদের জাহাজে ফিরে যেতে পারেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে যাবেন। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রাজবৈদ্যর ডান হাত আস্তে ধরল। রাজবৈদ্য সস্নেহে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

সেদিন দুপুরের একটু পরে হ্যারিওরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে জাহাজঘাটার দিকে রওনা হ'ল। মারিয়া ফ্রান্সিসের হাত ধ'রে ওর পাশে পাশে চলল। দু'পাশে পেছনে রইল বিস্কো শাঙ্কোরা। ফ্রান্সিস বেশ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। হ্যারি বলেছিল ফ্রান্সিসকে—তোমার শরীর দুর্বল। তুমি কাঠের তক্তায় পাতা বিছানায় বসো আমরা ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস রাজি হয় নি।

ফ্রান্সিস চলার মধ্যেই একটু থেমে থেমে চলল। জাহাজঘাটায় এল ওরা। সরু পাটাতনের ওপর দিয়ে উঠতে গিয়ে ফ্রান্সিসের মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। টাল খেল ও। পেছন থেকে বিস্কো ফ্রান্সিসকে জোরে জড়িয়ে ধরল। সামনে উঠছিল শাঙ্কো। সেও ফ্রান্সিসকে ধরল। আস্তে আস্তে ওরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে জাহাজে উঠল।

খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম। কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস সম্পূর্ণ সুস্থ হল।

সেদিন ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজে উৎসবের আয়োজন করল।

হ্যারি ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিনঘরে এল। দেখল—ফ্রান্সিস সেই আগের মতই প্রাণবন্ত। কী একটা কথা নিয়ে ফ্রান্সিস আর মারিয়া হাসাহাসি করছে।

—এসো হ্যারি। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতেই বলল। হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—ফ্রান্সিস—রাজবৈদ্য তোমাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছেন। এবার তাঁকে তো তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিতে হয়। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল—মারিয়া—চিকামা থেকে কিছু দামি জিনিস আনতে পারলে ভালো হত। একেবারে শূন্য হাতে চলে এলাম।

—তা'তে আমি মোটেই দুঃখিত নই। মারিয়া বলল। তারপর বিছানার একপাশ থেকে একটা কালো চক্‌চকে কাঠের বাক্স বের করল। বাক্স খুলে বের করল একটা মোটা সোনার চেন-এর হার। তা'তে লকেটের মত ঝুলছে একটা প্রায়

হাঁসের ডিমের মত মুক্তো। ফ্রান্সিস দেখেই চিনল। এই সবচেয়ে বড়ো মুক্তোটা ও মারিয়ার জন্যে মুক্তোর সমুদ্র থেকে এনেছিল। ফ্রান্সিস একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। বলল—মারিয়া—এটা আমাদের স্মৃতির জিনিস।

—ঠিক—মারিয়া বলল—কিন্তু যিনি তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁকে তো আমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিসটাই দিতে হবে। ফ্রান্সিস একটু চুপ ক'রে থেকে দেখে বলল—এতে তোমার কোন কষ্ট হবে না তো।

—বিন্দুমাত্র না—মারিয়া হেসে বলল—তোমার চেয়ে মূল্যবান আমার কাছে অন্য কিছুই নয়। চলো হ্যারি।

হ্যারি আর মারিয়া রাজবৈদ্যর বাড়ি এল। রাজবৈদ্যর তখন শেষ রোগীটি দেখা হ'য়ে গেছে। হ্যারি আর মারিয়াকে দেখে হেসে বসতে বললেন। ওরা বসল। রাজবৈদ্য মারিয়াকে বললেন—সেদিন আপনাকে ঘরের বাইরে চলে যেতে বলেছিলাম কেন জানেন? আপনার স্বামীর ফোলা হাতের ঘা দেখলে আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হতেন। আপনি সহ্য করতে পারতেন না। হ্যারি রাজবৈদ্যর কথাটা মারিয়াকে বুঝিয়ে বলল। মারিয়ার মন রাজবৈদ্যর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। এবার মারিয়া বলল—আপনি এত মহৎ হৃদয়ের মানুষ। আমার স্বামীর জীবনদান করেছেন। এই ঋণ পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়েও শোধ করা যায় না। তবু আমার প্রার্থনা এই হারটি গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন। এবার হ্যারি মারিয়ার কথাগুলো গ্রীক ভাষায় রাজবৈদ্যকে বোঝাল। রাজবৈদ্য কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার আস্তে আস্তে বললেন—মা—তোমার এই শ্রদ্ধার উপহার আমি নিলাম। কয়েকদিন পরে আমার নাতনির বিবাহ। এই উপহার তাকে একজন বিদেশিনী মা'র উপহার হিসেবে দেব। হ্যারি কথাটা মারিয়াকে বুঝিয়ে বলল। মারিয়া এত খুশি হ'ল যে ওর চোখে জল এসে গেল। ও বার বার মাথা নুইয়ে রাজবৈদ্যকে শ্রদ্ধা জানাল। তারপর ওরা জাহাজে ফিরে এল। উৎসবের দিন সন্ধ্যেবেলা ভাইকিংরা যে যা কিছু ভালো পোশাক এনেছিল তাই পরল। সবাই জড়ো হলো ডেক-এ। ফ্রান্সিস এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সবাই আনন্দ করতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসের একটা ভালো পোশাক যে মারিয়া সঙ্গে এনেছিল সেটা ফ্রান্সিস জানতো না। রাজবাড়ির অনুষ্ঠানে যাবার পোশাক সেটা। মারিয়া সেই পোশাক বের ক'রে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস তো অবাক। এসব শৌখিন জমকালো পোশাক ফ্রান্সিস কিছুতেই পরতে চায় না। ওর অস্বস্তি হয়। কিন্তু আজকে ওর রোগমুক্তির জন্যে উৎসব। কাজেই, ফ্রান্সিসকে পরতে হ'ল সেই পোশাক। মারিয়াও পরল হালকা নীল রঙের গোড়ালি ঢাকা গাউন। একটু সাজগোজও করল। তারপরে দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। দেখল লাল নীল নানা রঙের কাগজ দিয়ে ডেক সাজানো হয়েছে।

হ্যারি শাঙ্কো বিস্কোরাও যা ভালো পোশাক সঙ্গে ছিল পরেছে। ফ্রান্সিস ও মারিয়া আসতেই সবাই চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—। জাহাজে যা সামান্য কিছু বাজি ছিল তাই ফাটানো হল। শুরু হ'ল নাচ গান। পেড্রো ধুলোটুলো ঝেড়ে ওর বেহালামত বাজনাটা নিয়ে এল। সেটার আটটা তারের মধ্যে দু'টোই ছিঁড়ে গেছে। পেড্রো মনের আনন্দে সেই বাজনাই বাজাতে লাগল।

রাত বাড়ল। এবার ডেক-এর একপাশে একটা কাঠের আসনে ফ্রান্সিস ও মারিয়া বসল। ওদের ঘিরে দাঁড়াল বন্ধুরা। একজন বিস্কোকে বলল—বিস্কো—তুমি সেদিন দাঁড়ঘরে গান গেয়ে আমাদের তালে তালে দাঁড় চালাতে সাহায্য করেছিল। সেই গান গাওনা ভাই। বিস্কো একটু হাসল। তারপর ওদের দেশের চারণ কবিরা যে সব গান গেয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় সেই গান ধরল।

মাতৃভূমির গান। মাটির গান। সবাই চুপ ক'রে শুনতে লাগল। দেশ থেকে কতদূরে এক অজানা দেশের বন্দরে কানে আসছে দেশের গ্রামের মাটির গান।

বিস্কোর গান থামল। কেউ কোন কথা বলল না। দেশের কথা মনে এল। সকলেরই বেশ মন ভারি হ'য়ে গেল। মারিয়ারও মন খারাপ হয়ে গেল দেশের কথা ভেবে। ও মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসকে বলল—ফ্রান্সিস—তোমার শরীর ভালো নেই। খানিয়া আর যাবো না। দেশে ফিরে যাই।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে হেসে বলল—না মারিয়া তা হয় না। খানিয়াতে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিখোঁজ রাজমুকুট আমি খুঁজে বার করবোই।

কিন্তু কতদিন দেশ ছেড়ে এসেছি—মানে—মারিয়া কথাটা শেষ করতে পারল না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল—মারিয়া—তোমরা যদি কেউ না যাও—আমি একা যাবো। কেউ আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না। মারিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না—আমরা তোমার সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল দেশের গান শুনেছো তো—তাই তোমার মন খারাপ হ'য়ে গেছে। মন শক্ত কর।

এরপর আনন্দে উল্লাসে ভাঁটা পড়ল। আসল কথা দেশের কথা ভেবে প্রায় সবারই মন খারাপ হ'য়ে এল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেকেই কেবিনঘরে শুয়ে পড়ল। বেশ গরম লাগছিল। শাঙ্কো কম্বলমত মোটা কাপড়টা নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। দেখল অনেকেই শুয়ে পড়েছে। শাঙ্কো জাহাজের মাথার কাছে কাপড় পেতে শুয়ে পড়ল। একসময় সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে এল।

তখন ভোর হয় হয়। জাহাজঘাটায় লোকজনের চিৎকার ডাকাডাকি চ্যাচামেচিতে শাঙ্কোর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে দাঁড়াল। দেখল জাহাজঘাটায় লোকজনের খুব ব্যস্ততা। শাঙ্কো একবার ভাবল—নেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা কী? কিন্তু ও তো গ্রীক ভাষা জানে না। ও ছুটল জাহাজের সিঁড়ির দিকে। হ্যারির কেবিন-ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল—হ্যারি—হ্যারি।

হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও বেরিয়ে এল।

—কী হ'য়েছে।

—জাহাঘাটায় দেখলাম—সব লোকজন ছুটোছুটি ডাকাডাকি করছে। কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—চলো তো। হ্যারি দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ডেক-এ উঠে দেখল বেশ কিছু ভাইকিং বন্ধু জাহাজের রেলিং ধ'রে জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি পাটাতন দিয়ে নামতে নামতে দেখল রাজা মার্কোর প্রায় শ'খানেক সৈন্য জাহাজঘাটায় সার দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সকলেই সশস্ত্র।

হ্যারি জাহাজঘাটায় নামল। সৈন্যদের দলপতিকে খুঁজতে লাগল। দেখল দলনেতা তরোয়াল হাতে সৈন্যদের সাজাচ্ছে। হ্যারি কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে বলুন তো? দলনেতা একবার হ্যারিকে দেখল। বলল—তোমরা কে?

—আমরা ভাইকিং। ওদের জাহাজটা দেখিয়ে বলল—ঐ যে আমাদের জাহাজ।

—জাহাজ চালিয়ে শিগগির পালিয়ে যাও।

—কেন?

—বিদ্রোহী এনরিকো পোলিরিনা দখল ক'রেছে। তারপর এই নাক্সোস আক্রমণ করতে আসছে। অনেক কাছে চলে এসেছে। গুপ্তচর খবর এনেছে একটা যুদ্ধ জাহাজ বোঝাই সৈন্য নিয়েই এই বন্দরের দিকে আসছে। আমরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছি। তোমরা পালাও। নইলে মরবে।

হ্যারি চিন্তায় পড়ল। ও দ্রুত ছুটল ওদের জাহাজের দিকে। ফ্রান্সিসকে জাহাজে ডেক-এই পেল। ততক্ষণে সবাই ডেক-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এত হৈ চৈ সৈন্য সাজানো কেন জানবার জন্যে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মাথা তুলে ডাকল—

—পেড্রো? পেড্রো এগিয়ে এল।

—শিগগির মাস্তুলে ওঠ। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখ কোন জাহাজ দেখতে পাও কিনা। পেড্রো তর্ তর্ ক'রে মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল। একটু পরে চিৎকার করে বলল—একটা জাহাজ আসছে—। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—কত জোরে আসছে—কতক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছবে? পেড্রো একটুক্ষণ চুপ ক'রে বোধহয় জাহাজের গতিবেগ হিসেব করল। বলল—আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এখানে পৌঁছবে।

—কোনদিক থেকে জাহাজটা আসছে? ফ্রান্সিস গলা জড়িয়ে বলল।

—বাঁ দিক থেকে। পেড্রো গলা চড়িয়ে উত্তর দিল। ফ্রান্সিস উত্তরটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের দিকে তাকাল। গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব আমরা এই যুদ্ধে জড়াবো না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। নোঙর তোল—পাল খাটাও—দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে চলে যাও। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাও—ডানদিক লক্ষ্য করে। জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। মাস্তুল বেয়ে দ্রুত উঠল কয়েকজন। পালের দড়ি দড়া টেনে পাল খুলে দিতে লাগল। শাঙ্কো আর বিস্কো ছুটে গিয়ে ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তুলে ফেলল। দাঁড়িরা সমুদ্রের জলে দাঁড় ফেলতে লাগল—ছপ্ ছপ্। জাহাজ ঘাট থেকে আস্তে আস্তে সরে এল। একটু দূরে আসতেই ভাইকিংরা সব পাল খুলে দিল। দাঁড়িরা জোর দিল দাঁড় টানায়। জাহাজ গতি পেল। ফ্রান্সিস ডাকল—কাভাল্লি। কাভাল্লি এগিয়ে এলো।

—এসো—তুমি চালককে সাহায্য কর। দিক ঠিক ক'রে খানিয়া বন্দরের দিকে জাহাজ চালাও। ফ্রান্সিস বলল। একটু পরেই জাহাজের গতি বাড়ল। দূরে মিলিয়ে গেল নাক্সোস বন্দর। জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এল।

জোর বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। দাঁড় বাওয়ার ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠল সমুদ্রে। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে জাহাজ খানিয়ার দিকে পূর্ণবেগে চলল।

দু'দিন কাটল। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে রয়েছে। দাঁড়ও বাইতে হচ্ছে

নির্বিঘ্নে চলছে জাহাজ।

তিন দিনের দিন দুপুর নাগাদ দূর থেকে খানিয়া বন্দরের জাহাজ, বাড়িঘর দেখা গেল। ফ্রান্সিসরা অনেকেই জাহাজের রেলিঙে এসে দাঁড়াল। আরো কিছুটা এগিয়ে বন্দরের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা নজরে পড়ল। সব খুঁটিয়ে দেখে কাভাল্লি বলল—খানিয়ার অবস্থা শান্তিপূর্ণ। ঐ দেখুন এখানে বিদেশী জাহাজও রয়েছে। ঐ একটা জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে। এখন সবই স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। এবার ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—কী করবে হ্যারি? জাহাজ বন্দরে ভেড়াবে না কাছাকাছি কোথাও জাহাজ নোঙর করবে। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে তীরে নামা যাবে। হ্যারি একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—দেখ, খানিয়ার দুর্গে তোমাকে যেতেই হবে, নইলে রাজমুকুট খুঁজে বার করবে কী করে? কাজেই গোপনীয়তার কোনো মানে হয় না। জাহাজঘাটাতেই জাহাজ ভেড়াবো আমরা। জাহাজঘাটা দিয়ে খানিয়ায় ঢুকবো।

বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর কাভাল্লির দিকে ফিরে বলল—কাভাল্লি তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। কাভাল্লির চোখেমুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল। ও বলল—দেখুন, বোনিফেসের সৈন্যরা আমাকে দেখলেই চিনে ফেলবে। এই সৈন্যরা অনেকেই তো বাইজেন্টাইন সম্রাটের সৈন্য ছিল। আমি কিন্তু বিপদে পড়বো তাহলে। ফ্রান্সিস বলল—কোনো ভয় নেই তোমার। রাজা বোনিফেস এখনও নিশ্চয়ই রাজমুকুট খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ মহামূল্যবান রাজমুকুটের জন্যে বোনিফেসের মতো লোভী লোক তো পাগল হবেই। আমরা ওরা এই দুর্বলতার সুযোগটা নেব। দেখবে তোমাকে আর বোনিফেস কোনো বিপদেই ফেলবে না।

আপনারা পারবেন আমাকে রক্ষা করতে? কাভাল্লি বলল।

নিশ্চয়ই পারবো। ফ্রান্সিস বলল—বোনিফেসের মতো ভীষণ লোভী রাজা এর আগেও দেখেছি। কাজেই এদের মতিগতি আমি ভালোই বুঝি। তুমি কিছু ভেবো না। এবার ফ্রান্সিস ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব, আমরা লুকোচুরির মধ্যে যাবো না। বন্দরেই জাহাজ ভেড়াবো। তারপর কাভাল্লিকে নিয়ে আমি, হ্যারি আর মারিয়া খানিয়া নগরে যাবো। নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বার করব। এতে কিছুদিন সময় লাগবেই। কাজেই আমরা যদি দু'একদিনের মধ্যে না ফিরি তোমরা চিন্তা করো না। রাজার সঙ্গে কথা হলে আর সবদিক থেকে আমরা নিরাপদ থাকলে আমরা কেউ এসে তোমাদের খবর দিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস থামল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল—ঠিক আছে আমরা এখানে তোমাদের খবরের জন্য অপেক্ষা করবো।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দরে ভিড়ল। নোঙর ফেলা হলো। জাহাজঘাটা পর্যন্ত কাঠের পাটাতন ফেলা হলো। মারিয়া নিজের কেবিনে এল। মোটামুটি সাজগোজ করে নিল। ফ্রান্সিস হ্যারি তৈরি হয়ে এল। কাভাল্লি একজন ভাইকিংয়ের কাছ থেকে এক টুকরো কাপড় চাইল। ভাইকিংটি ওর কোমরের ফেট্টি থেকে কিছুটা কাপড় ছিঁড়ে দিল। কাভাল্লি সেই কাপড়ের টুকরোটা মাথা ও মুখের দুপাশে পেঁচিয়ে বাঁধল যাতে কেউ ওকে চিনতে না পারে।

তিনজনে জাহাজ থেকে নেমে এল। কাভাল্লি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল খানিয়া দুর্গের দিকে। পথে লোকজনের ভিড়। তার মধ্যে রাজা বোনিফেসের সৈন্যরাও

ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু'ধারে দোকানপাট। ঘোড়ায় টানা গাড়িও চলছে। কাভাল্লি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছিল। তবু কাভাল্লি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না একটা মোড়ের মাথায় দু'জন সৈন্যের মুখোমুখি পড়ে গেল। একজন সৈন্য চলে যাচ্ছিল। অন্যজনের কিন্তু কাভাল্লির কাপড় ঢাকা দেওয়া মুখ দেখে সন্দেহ করলো সে কাভাল্লির মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। সন্দেহ বাড়ল। একটানে কাভাল্লির মুখের ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলে ফেলল। এবার আর কাভাল্লিকে চিনতে অসুবিধে হলো না। সৈন্যটি বলল—তুমি কাভাল্লি। সম্রাটের সজ্জাকক্ষের পাহারাদার ছিলে কাভাল্লি ভয়ে আর কথা বলতে পারল না। হ্যারি এগিয়ে এল। ভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—হ্যাঁ ও কাভাল্লি। ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—আমরা তিনজন ভাইকিং। আমরা ওর সঙ্গে এসেছি।

কেন?

সেসব আমরা রাজা বোনিফেসকে বলবো।

এখন তো রাজসভা শেষ হয়ে গেছে। সৈন্য বলল।

ঠিক আছে। আমদের দুর্গে নিয়ে চল। হ্যারি বলল।

দুর্গে গিয়ে কী করবে?

এবার কাভাল্লি বলল—আমি দুর্গরক্ষীদের অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করব। তারপর রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করব।

সৈন্যটি বলল—বেশ চলো। কিন্তু কাভাল্লি, তুমি যদি আবার আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাও—

না ও পালাবে না। হ্যারি বলল।

সৈন্য দু'জন ওদের নিয়ে চলল। তারা দু'জন সঙ্গে থাকায় দুর্গদ্বার দিয়ে ওদের ঢুকতে কোনো অসুবিধে হলো না। কাভাল্লি ওদের অপেক্ষা করতে বলে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসেরা দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্য দুজনও। কিছুক্ষণ পরে কাভাল্লি ফিরে এল। ওর সঙ্গে একজন বেশ সুসজ্জিত মধ্যবয়স্ক লোক এল। কাভাল্লি হ্যারিকে বলল—ইনিই দুর্গরক্ষীদের অধিনায়ক।

হ্যারি বলল—দেখুন আমরা তিনজন ভাইকিং। কাভাল্লিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

কী সেই উদ্দেশ্য?

শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করতে এসেছি এইজন্য রাজা বোনিফেসের সাক্ষাৎপ্রার্থী আমরা।

অধিনায়ক একটু ভাবল। বলল—এখন কি রাজা দেখা করবেন?

আপনি শুধু রাজাকে এই সংবাদটুকু পৌঁছে দিন যে কাভাল্লিকে সঙ্গে নিয়ে তিনজন ভাইকিং এসেছে। কী জন্যে এসেছি তাও বলবেন। কপাল ভালো। অধিনায়ক রাজি হলো। কিন্তু সঙ্গের সৈন্য দু'জনকে বলল—দেখো, কাভাল্লি যেন পালাতে না পারে। অধিনায়ক দুর্গে ঢুকে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। অধিনায়ক ফিরে এল। বলল—শিগগির এসো—রাজা তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। সবাই দুর্গের মধ্যে ঢুকল। বিরাট বিরাট পাথরের খিলানওলা দরজা পার হয়ে একটা মস্তবড় কাঠের দরজার সামনে

এল ওরা। কাঠের দরজায় পেতলের ফুলপাতা আঁকা নানা কারুকাজ। সুদৃশ্য পেতলের বর্শা হাতে দুজন দ্বাররক্ষী ছিল। অধিনায়কের ইঙ্গিতে ওরা দরজা খুলে দিল।

বিরাট একটা ঘরে ঢুকল ওরা। কাভাল্লি বলল—রাজসভাগর। হ্যারি সেটা ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে বলল। ঘরের চারদিকে পেতলের মশাল দণ্ডে মশাল জ্বলছে। রাজসভাঘরের পাথরের দেয়াল ও ছাদের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। মশাল দণ্ডের মাথায় মাথায় উজ্জ্বলরঙে আঁকা কত ছবি দেয়ালে, ছাদে। ফুল লতাপাতা মানুষ সমুদ্র পাহাড় কী অপরূপ ছবি সেসব। বাইজেন্টাইন সম্রাটদের আমলে আঁকা এইসব ছবিই বুঝিয়ে দেয় বাইজেন্টাইন সম্রাটরা কত বড় শিল্পরসিক ছিলেন। সামনেই সিংহাসন। রূপোর সিংহাসনে কত কারুকাজ। গভীর নীলরঙের মখমলমোড়া সিংহাসন। দু'পাশে আরও দুখানা রূপোর আসন। রাজ-অমাত্যদের জন্যে।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজসভা দেখতে লাগল। একটু পরে রাজা ঢুকল। সিংহাসনে বসল। বয়স হয়েছে রাজা বোনিফেসের। তবু হাঁটা চলা যুবকের মতো। বোনিফেস ফ্রান্সিসদের একবার দেখে নিয়ে কাভাল্লির মুখের দিকে তাকাল। বলল—তুমি কাভাল্লি? তুমি জানো বাইজেন্টাইন সম্রাটদের মুকুট কোথায় আছে?

হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—না, কাভাল্লি জানে না। তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা ঐ নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো।

রাজা বোনিফেস একটু চুপ করে থেকে বলল—নিখোঁজ রাজমুকুট আমার চাই। তারপর বলল—তোমরা ভাইকিং। এ দেশের কী জানো?

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে হ্যারি বলল—আমার এই বন্ধুটির নাম ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সাহস আর বুদ্ধিবলে অনেক গুপ্তধন উদ্ধার করেছে। সব দেখেশুনে ও সঠিক বলতে পারবে ঐ রাজমুকুট উদ্ধার করা সম্ভব কি না। রাজা একটু ভাবল। বলল—বেশ, চেষ্টা করে দেখো। হ্যারি ফ্রান্সিসকে রাজার সঙ্গে যা কথা হলো বলল। ফ্রান্সিস ওকে বুঝিয়ে বলল আর কী কী বলতে হবে। হ্যারি বলল—আমরা কাল থেকেই খোঁজার কাজ শুরু করবো। এজন্যে আপনার কাছে অনুমতি চাইছি।

বেশ—বলো। রাজা বলল।

এক—আমার বন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস সেই রাজমুকুট এই দুর্গেই কোথাও আছে। কাভাল্লি এই দুর্গের সব কিছু খুব ভালোভাবে চেনে। সুতরাং আমাদের সঙ্গে কাভাল্লি সবসময় থাকবে।

আপত্তি নেই। রাজা বলল—কিন্তু কাভাল্লি পালালো তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বেশ, আমরা রাজি। দুই—এই দুর্গের সর্বত্র আমাদের যেতে দিতে হবে, বিশেষ করে আপনার সজ্জাকক্ষে। হ্যারি বলল।

যাবে, কিন্তু সঙ্গে দুজন পাহারাদার সৈন্য থাকবে। কারণ সজ্জাকক্ষে মূল্যবান অনেক কিছু রয়েছে। আর সজ্জাকক্ষে সকালে যেতে পারবে না, যাবে বিকেলে—দু'ঘণ্টার জন্যে।

তাতেই হবে। হ্যারি বলল।

রাজা সিংহাসন থেকে উঠল। ভেতরের দিকে চলে গেল। ফ্রান্সিসেরা রাজ-সভাকক্ষের বাইরে এল। দুর্গদ্বার পার হয়ে ওরা যখন রাস্তায় নামল তখন সন্ধ্যে

হয় হয়। ওরা জাহাজঘাটার দিকে চলল। রাস্তার দুপাশে এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় লোকজন দোকানপাট এসব দেখে মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস, কাভাল্লি তো সঙ্গে আছে। চলো না নগরটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখি।

মারিয়া, আমরা বেড়াতে আসিনি। এখন অনেক চিন্তা মাথায়। ফ্রান্সিস আস্তে বলল। মারিয়ার বেড়াবার উৎসাহ আর রইল না। মন খারাপ হয়ে গেল ওর। ফ্রান্সিস বুঝল। বলল—মারিয়া, ভুলে যেও না—বিদ্রোহী এনরিকো যে কোনো মুহূর্তে এই খানিয়া আক্রমণ করতে পারে। তার আগেই আমাদের কাজ সেরে চলে যেতে হবে। তবে কথা দিচ্ছি—মুকুট খুঁজে বের করার পর যদি যুদ্ধ না লাগে, পুরো একদিন আমরা সবাই এই নগরে ঘুরে বেড়াবো। মারিয়া ফ্রান্সিসের কথার গুরুত্ব বুঝলো। বলল—ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই হবে।

জাহাজে ফিরে এল ওরা। বন্ধুরা সব ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরল। ফ্রান্সিস রাজা বোনিফেসের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বলল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রূপোর মোমদানিতে মোম জ্বেলে ফ্রান্সিস রাজমুকুটের ছবিটা নিয়ে বিছানায় বসল। ও আগেই কাভাল্লির কাছ থেকে ছবিটা চেয়ে রেখেছিল। পাশে মারিয়াও বসল। তখনই হ্যারি এল। বলল—আলো জ্বলছে দেখে এলাম। তিনজনেই মন দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। একসময় হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছবিটার নিচে ঐ নকশার ফাঁকে ফাঁকে কিছু লেখা আছে। কিন্তু ভাষাটা প্রাচীন গ্রীক। আমার অত জ্ঞানগম্যি নেই। তবে তার একটা শব্দ 'ভাগ্য'। ফ্রান্সিস বলল—লেখাটার পাঠোদ্ধার করতেই হবে। তার আগে দুর্গটা ভালো করে দেখতে হবে। বিশেষ করে সজ্জাকক্ষটা। কিছুক্ষণ তিনজনে এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলল। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস আর মারিয়া আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সারা দুপুর ফ্রান্সিস শুয়ে বসে সময় কাটাল। বিকেলে তৈরি হয়ে মারিয়া, হ্যারি আর কাভাল্লিকে নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় নামল। ওরা দুর্গে পৌঁছল। কাভাল্লি ওদের ঘুরে ঘুরে অন্তঃপুর বাদে সমস্ত দুর্গের ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি দেখাল। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে সব দেখতে লাগল। বেশির ভাগ ঘরেই সৈন্যরা থাকে। দেয়ালে ছাদে অনেক জায়গাতেই ছবি আঁকা। মোজেকের কাজ। বেশিরভাগ ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। দেয়ালে বড় আয়না, সৈন্যদের পোশাক রাখার লম্বা বাক্স—এইসব দেখে ফ্রান্সিসের মনে হলো বাইজেন্টাইন সম্রাট পালাবার আগে কোথাও নিশ্চয়ই রাজমুকুটটা লুকিয়ে রেখে গেছেন। সেই সময় সম্রাটের দুর্গের অন্য ঘরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। অন্তঃপুর আর সজ্জাকক্ষ—সম্রাট সে সময় ঐ দুটো জায়গাতেই গেছেন। ফ্রান্সিস কাভাল্লিকে বলল—এবার সজ্জাকক্ষে চলো। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক ওখানে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কাভাল্লি ওদের সজ্জাকক্ষের সামনে নিয়ে এলো। দুজন পাহারাদার সৈন্য চকচকে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই একজন কাভাল্লিকে ও ফ্রান্সিসদের দেখে দরজা খুলে দিল। দরজার কাঠ নানারঙের নকশায় চিত্রিত। ওরা ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের নাকে জেসমিনের মৃদু গন্ধ ভেসে এল। ঘরটির দেয়ালে মেঝেয় অতি সুন্দর মোজেকের কাজ। গাছ লতাপাতা পাখি। সামনেই বেশ বড় একটা আয়না দেয়ালে আটকানো। আয়নার সামনে পাথরের টেবিল। রেশমী কাপড়ে ঢাকা। সেই ঢাকনার কাপড়েও

নানা রঙের সুতোর কাজ। তার ওপরে সাজিয়ে রাখা রাজদণ্ড, খাপে ঢাকা তরোয়াল। তরোয়ালের খাপে দামি পাথর বসানো মীনে করা। হাতল হাতির দাঁতের। রাজদণ্ডে কত দামি পাথরের কাজ। নিরেট সোনার সেই রাজদণ্ড। কারুকাজ-করা খাপে ঢাকা ছোরা। সম্রাটের ব্যবহৃত হীরে পান্নার কত ছোট বড় হার। সোনার কাজকরা কোমরবন্ধনী। সম্রাটের দুটো পোশাকেও পাথর বসানো সোনার সরু পাতের কাজ। ফ্রান্সিসরা অবাক হয়ে এই মূল্যবান জিনিসগুলো দেখল। বোঝাই যাচ্ছে শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাট কিছুই নিয়ে যাননি। শুধু গোপনে কোথাও রেখে গেছেন রাজমুকুটটা।

ফ্রান্সিস ঘরের চারদিকে দেখতে লাগল। একপাশে একটা লম্বা কাঠের সিন্দুক। ফ্রান্সিস সিন্দুকের ডালাটা খুলল। দেখল—সম্রাটের পোশাক। সাধারণ দামি দু'ধরনের পোশাক। ফ্রান্সিস কাভাল্লিকে ডাকল। কাভাল্লি কাছে এলে বলল—এই পোশাকগুলো সব তোলে তো। কাভাল্লি সম্রাটের পোশাকগুলি তুলতে লাগল। হ্যারি আর মারিয়াও হাত লাগাল। সব পোশাক তোলা হলে দেখা গেল সিন্দুকটা ফাঁকা। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। সব পোশাক আবার রেখে দেওয়া হল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাতেই ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল কোণার দিকে কী যেন ঝুলছে। ও কাভাল্লিকে বলল—ওটা কী? কাভাল্লি হেসে বলল—সম্রাটের খেয়াল। একটা সোনার পাতলা পাত দিয়ে সম্রাট ফুলদানি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর নিজের হাতে ফুল-পাতা কেটে তৈরি করে এ ফুলদানিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট ঐ ফুলদানিতে প্রতিদিন একটু একটু আতর ঢালতেন। বলতেন, এটা আমার ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। একটু খেয়াল করে দেখুন এখনো জেসমিন ফুলের গন্ধ পাবেন। সত্যিই ফ্রান্সিস সেই গন্ধ পেয়েছিল। এইবার হ্যারি আর মারিয়াও জেসমিনের গন্ধ পেল। ফ্রান্সিস ঝুলন্ত ফুলদানিটার কাছে এল। দেখল—একটা গাঢ় সবুজ রেশমী কাপড়ে ফুলদানিটা ঢাকা। নানারঙের সুতোয় বোনা একটা জালমতো ছাদ থেকে ঝুলছে। তারই ভেতর ফুলদানিটা বসানো। নানারঙের কাপড় কেটে তৈরি ফুল-পাতা ফুলদানি থেকে বেরিয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা ফুলদানিটা দেখে বেশ আশ্চর্য হলো। সম্রাটের খেয়ালের নমুনা। ফুল-পাতাগুলো এত সুন্দরভাবে কেটে তৈরি করা মনে হচ্ছে যেন সতেজ। বেগুণী ফুল সবুজ পাতা। ফ্রান্সিস ভেবে পেল না এখানে কী করে কোথায় সম্রাট রাজমুকুট লুকিয়ে রেখে গেছেন।

এবার ফ্রান্সিস সবাইকে নিয়ে সজ্জাকক্ষের বাইরে এল। একজন সৈন্য দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—অন্দরমহলে তো আমরা যেতে পারবো না। মারিয়া যাও। সব খুঁটিয়ে দেখে আসবে। বিশেষ করে সম্রাজ্ঞীর সজ্জাকক্ষটা। মারিয়া চলে গেল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মারিয়া ফিরে এল। বলল—অন্দরমহল ভালো করে দেখেছি। সম্রাজ্ঞীর সজ্জাকক্ষে সম্রাজ্ঞী কিছুই রেখে যাননি। সেখানে বর্তমান রানী তার পোশাকপত্র অলঙ্কার এসব রেখেছে। কিন্তু মুকুট লুকিয়ে রাখার জায়গা সেখানে নেই। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—কালকে আবার দেখতে হবে।

সবাই জাহাজে ফিরে এল। ভাইকিং বন্ধুরা শুনল, নিখোঁজ রাজমুকুট পাওয়া যায়নি।

রাতে ফ্রান্সিসরা আবার মুকুটের ছবিটা নিয়ে বসল। ফ্রান্সিস বার বার বলল—ছবিটা থেকে নিশ্চয়ই কোনো সূত্র পাওয়া যাবে। হ্যারি হতাশস্বরে বলল—ছবিটার নিচে নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। কিন্তু কিছুতেই পাঠোদ্ধার করতে পারছি না। আলো জ্বলছে দেখে কাভাল্লি তখনই কেবিনঘরে ঢুকল। হ্যারি বলল—আচ্ছা কাভাল্লি, তুমি তো অনেকদিন এই খানিয়ায় ছিলে। তুমি কোনো বিদ্বান পণ্ডিত কাউকে চেন। কাভাল্লি একটু ভাবল। বলল—একজনকে জানি, প্যালিওলোগ—খুব পণ্ডিত মানুষ। সম্রাট মাঝে মাঝে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। কয়েকবার আমাকেও ডাকতে পাঠিয়েছেন। হ্যারি প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল—তুমি আমাদের কাল সকালেই প্যালিওলোগের বাড়ি নিয়ে চলো।

বেশ তো—নিয়ে যাবো। কাভাল্লি বলল।

পরদিন একটু বেলায় কাভাল্লি ফ্রান্সিসদের প্যালিওলোগের বাড়ি নিয়ে গেল। প্যালিওলোগ বাইরের একটা ছোট ঘরে একটা গদিওয়ালা আসনে বসেছিলেন। সামনে একটা পাথরের পাটাতন। তাতে কিছু সাদা পাতলা চামড়া রাখা, চিনেমাটির দোয়াত, পাখির বড় পালকের কলমও রয়েছে। প্যালিওলোগ বেশ বৃদ্ধ। মাথায় চুল দাড়ি গোঁফ ভুরু সব পাকা। পরনে ঢিলেঢালা জোব্বা। হ্যারি গ্রীক ভাষায় নিজের পরিচয় দিল। তারপর রাজমুকুটের ছবিটা তাঁর সমনে রাখল। বলল—ছবিটার

কোণার দিকে কী যেন ঝুলছে।

নিচে লতাপাতা ফুলের মধ্যেই নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। প্রাচীন গ্রীক ভাষা। যদি আপনি পড়তেন। প্যালিওলোগ ছবিটা উঁচু করে ধরলেন। একটুক্ষণ দেখলেন। হেসে বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছো। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা—"সম্রাটের ভাগ্য সুতোয় ঝোলে।" হ্যারি কথাটা বারবার বলল। মনে রাখল। এবার ফ্রান্সিস ও মারিয়াকে যা কথা হলো বলল। শেষে যা লেখা সেটা বলল। ফ্রান্সিসও কথাটা মনে রাখল। কিন্তু কথাটার সঙ্গে রাজমুকুটের সম্পর্ক বুঝতে পারল না। ওরা জাহাজে ফিরে এল। সারা দুপুর ফ্রান্সিস কথাটা নিয়ে ভাবল।

সেদিন বিকেলে ওরা আবার দুর্গে গেল। সম্রাটের সজ্জাকক্ষে ঢুকল ওরা। ফ্রান্সিস আবার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ছবিটা ছিল মারিয়ার হাতে। মারিয়া ছবিটা দেখবার জন্যে চামড়ার গোটানোটা খুলে মেলে ধরল। যাঃ উল্টোমুখো হয়ে রয়েছে। মারিয়া ছবিটা সোজা করতে গিয়ে একেবারে ঝুলন্ত ফুলদানিটার দিকে তাকাল। আরে? মারিয়া চমকে উঠল। ছবিটা সোজা করল না। মিলিয়ে দেখল মুকুটটা ওল্টালে ঠিক ফুলদানির মতো দেখাচ্ছে। ঠিক তখনই ফ্রান্সিসকে গলা চড়িয়ে বলল—সম্রাটের ভাগ্য সুতোয়ে ঝোলে। কাভাল্লি, ফুলদানিটাও সুতোয় ঝুলছে। মারিয়া ছুটে ফ্রান্সিসের কাছে এল। উল্টো রাজমুকুটের ছবিটা আর ফুলদানিটা আঙুল দিয়ে দেখাল। ফ্রান্সিস একমুহূর্ত ভাবল। তারপর উত্তেজিত স্বরে বলল—কাভাল্লি ফুলদানিটা নামাও। কাভাল্লি একটা পাথরের পাটাতনের ওপর উঠে আস্তে আস্তে ফুলদানিটা সুতোর জাল থেকে খুলে নামাল। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি ফুলদানিটা হাতে নিল। ভেতর থেকে ফুল পাতা তুলে নিল। দেখা গেল ছবিতে যে সোনার পালকটা মুকুটের মাথায় আঁকা আছে সেটা ফুলদানিটার মধ্যে রাখা। ফ্রান্সিস ফুল-পাতা রেখে সোনার পালকটা ভেতর থেকে তুলে নিল। আবার হাত ঢোকাল। তুলল মুকুটের পালকের ঠিক নিচেই যে রক্তপ্রবালের ছবিটা রয়েছে সেই চৌকানো রক্তপ্রবাল। তারপর আবার হাত ঢোকাল। তুলল পাতলা সোনার দোমড়ানো পাতের কিছু অংশ। সেসব মারিয়ার হাতে দিল। ফ্রান্সিস হেসে উঠল। ফুলদানিটা উঁচু করে তুলে চেঁচিয়ে বলল—মারিয়া, হ্যারি, এটাই সেই নিখোঁজ রাজমুকুট। ফ্রান্সিস এবার আস্তে আস্তে ফুলদানির গাঢ় সবুজ রঙের ঢাকনাটা খুলতে লাগল। দেখা গেল চুনী পান্না আর দামি দামি পাথর বসানো ওটার গায়ে। সেসবের চারদিকে নীল সবুজ মীনে করা। যখন সবটার ঢাকনা খোলা হলো, দেখা গেল চুনী পান্না নীলকান্তমণি দামি পাথর বসানো রাজমুকুট। দেয়ালে আটকানো মশালের আলো পড়ল রাজমুকুটে। চুনী পান্না নীলকান্তমণি দামি পাথর সব ঝিকমিকিয়ে উঠল। আলো ঠিকরোচ্ছে। কী অপরূপ সুন্দর সেই রাজমুকুট।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। অবাক হয়ে ওরা রাজমুকুটটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়ার হাত থেকে শীর্ষপালকটা নিল। মুকুটের মাথায় যেখানে লাগানো ছিল সেখানে ধরল। বলল—মারিয়া ছবির মতো রক্তপ্রবালটা রাখো। সোনার পালক আর রক্তপ্রবাল রাখা হলে দেখা গেল হুবহু ছবির মতো রাজমুকুটটা। সোনার পালক, রক্তপ্রবাল মুকুটের মধ্যে রেখে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল—শেষ বাইজেনটাইন সম্রাট শেষবারের মতো এই সজ্জাকক্ষে ঢুকেছিলেন। কাভাল্লিকে ঢুকতে দেননি। দরজা বন্ধ করে কাচের আধার থেকে মুকুটটা বের করেছেন।

সোনার পালক রক্তপ্রবাল মুকুট থেকে খুলে নিয়েছেন। মুকুটের ভেতরে রেখেছেন। এবার মুকুটের মতো ঠিক একই মাপে তৈরি করা ফুলদানিটা সুতোর জাল থেকে নামিয়েছেন। কাপড়ের ঢাকনা খুলেছেন। কাপড়ের ফুল পাতা তুলে নিয়েছেন। তারপর ঐ পাতলা সোনার চাদরে তৈরি ফুলদানিটা সহজেই দুমড়ে মুচড়ে রাজমুকুটের মধ্যে রেখেছেন। তার ওপর রেখেছেন ফুলপাতা। এবার ঢাকনায় মুকুটটা ভরে সুতোর জালে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফুলদানি আগেই ছিল। কাজেই কারো মনেই ফুলদানিটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। ফুলদানিটাকে কেউ কোনো গুরুত্বই দেবে না। কিন্তু সম্রাটের সেই লেখা কথাটা—সম্রাটের ভাগ্য সুতোয় ঝোলে—এই কথাটাই আমার দৃষ্টি টানল ঝুলন্ত ফুলদানির দিকে। তখনই মারিয়া ছবিটা উল্টো করে দেখাল। সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝুলন্ত ফুলদানিটাই নিখোঁজ রাজমুকুট। কাভাল্লি আস্তে আস্তে রাজমুকুটটার কাছে গেল। দুহাতে মুকুটটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শেষ সম্রাটের স্মৃতিও কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

ওদিকে রাজমুকুট পাওয়া গেছে দেখে সজ্জাকক্ষের রক্ষীরা ছুটল রাজা বোনিফেসকে খবর দিতে। একটু পরেই রাজা বোনিফেস দ্রুতপায়ে সজ্জাকক্ষে ঢুকল। পাথরের টেবিলের ওপর মুকুটটা রেখেছিল ফ্রান্সিস। রাজা বোনিফেস মুকুটটা দু'হাতে উঁচু করে তুলে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল—হা—হা—হা। মুকুটটা হাতে নিয়ে পাগলের মতো ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে যা যা বলতে হবে বলল। রাজার কিন্তু খেয়ালই নেই যে যারা নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করে দিল তারা তারই সামনে দাঁড়িয়ে। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—রাজা, আমাদের কিছু কথা ছিল। এতক্ষণে ওদের দিকে রাজার দৃষ্টি পড়ল। রাজা বলল—হুঁ, বলো।

আমরা নিখোঁজ রাজমুকুট খুঁজে বের করে দেব বলেছিলাম, তা দিয়েছি। এবার আমাদের একটা অনুরোধ। হ্যারি বলল।

এজন্যে তোমাদের আমি কিছু দিতে পারবো না। রাজা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

আমরা কিছু চাইও না। শুধু অনুরোধ—এই সজ্জাকক্ষের দেখাশোনার দায়িত্ব যেন কাভাল্লিকেই আবার দেওয়া হয়।

কিন্তু ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? রাজা বলল।

হ্যাঁ যায়। কাভাল্লি সৎ ও বিশ্বস্ত।

—ঠিক আছে। রাজা মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস বলল—এবার চলো।

ওরা যখন দুর্গের বাইরে এসেছে তখন কাভাল্লি ছুটে এল। বলল—চলুন জাহাজঘাটা পর্যন্ত আমি যাই। আপনারা আমার জন্যে এত করলেন।

জাহাজে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস হেসে বলল—মারিয়া, এবারও আমাদের হাত শূন্য। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—এ জন্যে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।

ওরা জাহাজে উঠতেই বিস্কো শাঙ্কো আর ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কালকে আমরা খানিয়া নগর ঘুরে বেড়িয়ে দেখবো। পরশু জাহাজ ছাড়বো। তারপর মারিয়াকে বলল—কী? খুশি তো? মারিয়া হেসে উঠল।

কাউন্ট রজারের গুপ্তধন

সেদিন সকালে খানিয়া নগর ঘুরে বেড়াবার জন্যে ভাইকিংদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হলো। সকালের খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া কেবিনঘরে বসেই খেল। এবার মারিয়া চামড়ার দুটো বড় পেটী খুলল। ফ্রান্সিসের জন্যে যে ভালো দুটো পোশাক এনেছিল তা একটা খুঁজে বের করল। পোশাক দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল, এ তো তোমাদের বাড়িতে, মানে রাজবাড়িতে নাচের আসরে যাবার পোশাক।

— আমরা খানিয়া নগর ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি। আজকে অন্তত ভালো পোশাকটা পর। সবসময় তো ঐ লড়াইয়ের পোশাকটা পরে থাকো। মারিয়া বলল।

— মারিয়া, আমরা ভাইকিং। এটাই আমাদের উপযুক্ত পোশাক। জীবনটাই তো একটা লড়াই। ফ্রান্সিস বলল।

খুব হয়েছে। নাও পর এটা। মারিয়া হেসে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে হ্যারি, বিস্কো, শাঙ্কো আর অন্য সব ভাইকিংরা যে যার ভালো পোশাক পরে তৈরি হয়ে জাহাজের ডেক-এ এসে জড়ো হলো। জাহাজের জীবন বড়ো একঘেয়ে। দিনরাত চারদিকে সীমাহীন সমুদ্র। মাটির দেখা পাওয়ার জন্যে, মাটিতে নামার জন্যে ওরা আকুল হয়ে থাকে। আজকে শুধু মাটিতে নামা নয়, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো। যুদ্ধ নয়, শান্তির দিন আজ। ওরা সাগ্রহে ফ্রান্সিস ও মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই সুন্দর পোশাক পরে ফ্রান্সিস ও মারিয়া ডেক-এ উঠে এলো। মারিয়া পরেছে হালকা গোলাপি রঙের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা গাউন। মারিয়াকে আজকে দেখতে রাজকুমারীর মতোই লাগছে। অবশ্য দীর্ঘদিন সমুদ্রে জাহাজে থাকার জন্যে মারিয়ার গায়ের রঙ আগের মতো গোলাপি-ফর্সা নেই। একটু যেন তামাটে হয়ে গেছে। ওরা দুজনে আসতেই ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও হো-হো। এটা ওদের আনন্দের ধ্বনি, প্রতিজ্ঞার ধ্বনি, আবার প্রতিবাদেরও ধ্বনি।

এমন সময় দেখা গেল কাভাল্লি জাহাজের পাটাতন দিয়ে উঠে আসছে। ওকে দেখে ফ্রান্সিসরা সকলেই খুশি হলো। কাভাল্লি ফ্রান্সিসের কাছে এলো। হেসে বলল, কালকেই শুনেছি আপনারা আজ খানিয়া নগরে ঘুরে বেড়াবেন। আপনারা তো চেনেন না, তাই আমি এলাম। সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদের।

— এ তো ভালোই হলো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

সবার আগে জাহাজের ফেলা পাটাতন দিয়ে কাভাল্লি, ফ্রান্সিস ও মারিয়া জাহাজঘাটায় নামল। পেছনে একে একে আর সব বন্ধুরা নামল। কাভাল্লি সবাইকে নিয়ে নগরের রাস্তা দিয়ে চলল। পথের লোকজন দোকানদারেরা অনেকেই ফ্রান্সিসদের এই দলকে দেখল। তারা ভেবে পেল না এরকম পোশাকপরা লোকগুলো কোন দেশের! বিশেষ করে মহিলারা মারিয়াকে বারবার দেখতে লাগল। এরকম মেয়েদের পোশাক ওরা কখনও দেখেনি। দল

বেঁধে হৈ হৈ করে চলল ওরা।

প্রথমে কা[illegible]র নিয়ে গেল বিরাট দুর্গটায়। রাজা বোনিফেস-এর বাসস্থান আর সভাগৃহ এখানে। কাভাল্লি সবাইকে নিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারি দুর্গটা আগেই ভালো করে দেখেছে। ওরা দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বারে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

দুর্গ দেখা হলে কাভাল্লি ওদের নিয়ে চলল একটা ছোট অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখাতে। খুব বেশি বড় নয় সেটা। চারদিকে পাথরে দেয়াল। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। দেখল চারিদিকে গোল করে পাথরে বসার জায়গা। মাঝখানে গোল জায়গা। কাভাল্লি ঐ জায়গাটা দেখিয়ে বলল, এটাকে বলে এরেনা। এখানে তরোয়ালের লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা হয়। রাতে মশালের আলোয় নাটকও অভিনীত হয়। তারপরে চলল সবাই উত্তর দিকে। দেখল ছবির মতো সুন্দর একটা হ্রদ। তারপরেই ঘাসে-ঢাকা ছোট পাহাড়। পাথর-ছড়ানো ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা।

খানিয়া নগর খুব একটা বড়ো নয়। দুপুরের মধ্যেই প্রায় সব দেখা হয়ে গেল। ঘোরাঘুরির জন্যে বেশ খিদেও পেয়েছে সকলের। মারিয়াই প্রস্তাব দিল, এখন জাহাজে ফিরে গিয়ে রান্নাবান্নার দরকার নেই। এখানেই কোনো সরাইখানায় খেয়ে নেওয়া যাক। সব ভাইকিংরা হৈহৈ করে এই প্রস্তাবে রাজী হলো।

কাভাল্লি দুর্গের কাছে এক বড় সরাইখানায় ওদের নিয়ে গেল। এত খদ্দের পেয়ে সরাইখানার মালিক খুশিতে আটখানা। সবাই টানা কাঠের বেঞ্চিতে বসল। সামনে কাঠের টানা টেবিলমতো। খেতে দেওয়া হলো বড় বড় গোল রুটি, তরকারি আর গরম গরম ভেড়ার মাংস। সবাই ক্ষুধার্ত। হাপুস-হুপুস করে খেতে লাগল।

বিকেল নাগাদ ভাইকিংরা হৈহৈ করতে করতে জাহাজে ফিরে এল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার সময় ভাইকিংরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এবার আর কোথাও নয়। সোজা দেশে ফিরবো। দু'একজন বলল, দেখ ফ্রান্সিস কী বলে।

রাত হলো। ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে আছে। ও ভেবে পাচ্ছে না এবার কী করবে? মারিয়া জিজ্ঞেস করল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

ফ্রান্সিস হেসে বলল, আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি। তুমি, আমার বন্ধুরা সবাই তো দেশে ফেরার জন্যে আকুল। আমার কিন্তু দেশে ফিরে অলস সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে করছে না।

— এখন তো কোথাও যাবার নেই। তবে দেশে ফিরতে চাইছো না কেন? মারিয়া বলল।

— কে বলতে পারে হয়তো ফেরার পথেই কোনো রহস্যের, কোনো গুপ্তধনের সংবাদ পেয়ে গেলাম। তখন? ফ্রান্সিস বলল।

— সে তখন ভাবা যাবে। এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাতে বলো। মারিয়া বলল।

— বেশ, তোমরা যেমন চাও। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া হলো। জাহাজচালক আর নজরদার পেড্রোকে নিয়ে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

— তাই তো ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

— আমরা অনেকদিন দেশ ছেড়ে এসেছি। সবাই দেশে ফিরতে চাইছে। পেড্রো বলল।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস জাহাজচালকের দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজ ছাড়ো দেশের দিকে। জাহাজচালক হেসে খুশিতে লাফিয়ে উঠল। পেড্রো দু'হাত তুলে হো-হো ধ্বনি তুলল। দু'জনেই ছুটল নিজেদের কাজের জায়গায়। দেশে ফেরার খবর ভাইকিংদের মধ্যে রটে গেল। সবাই হৈহৈ করে উঠল।

পেড্রো দড়ি বেয়ে মাস্তুলের মাথায় ওর বসার জায়গায় গিয়ে বসল। ঘরঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। কয়েকজন উঠে গেল পালের মাথায়। দড়িদড়া খুলে পালগুলো তুলে দিল। কিন্তু হাওয়ার তেমন জোর নেই। পালগুলো খুব ফুলে উঠলো না। তাই দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে নেমে গেল।

খানিয়ার জাহাজঘাটা থেকে ভাইকিংদের জাহাজ সরে এলো অনেকটা। সমুদ্রের জলে অনেকগুলো দাঁড় পড়ার শব্দ উঠল, ছপ্ — ছপ্ —

ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে খানিয়া বন্দর দূরে মিলিয়ে গেল। চারদিকে শুধু জল। জাহাজ তখন মাঝসমুদ্রে চলে এসেছে। সমুদ্রের জলে রোদ পড়েছে। ঝলসে উঠছে শান্ত ঢেউ। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ বেগে ভেসে চলেছে ভাইকিংদের দেশের উদ্দেশে।

তিন-চার দিন কাটল। ঝড়বৃষ্টি নেই। ভূমধ্যসাগরের শান্ত সমুদ্র। সমুদ্রের জল গভীর নীল। ক'দিনই হাওয়া বেগে বইছে। পালগুলো ফুলে উঠেছে। জাহাজ চলেছে। ভাইকিংরা খুশি। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। ডেকে বসে শুয়ে ওরা বিশ্রাম করে। দল বেঁধে কয়েকজন ছক্কাপাঞ্জা খেলে। রাত হলে দেশের গল্প করে। কতদিন পরে দেশে ফিরছে ওরা। কেউ কেউ হেঁড়ে গলায় গানও ধরে।

সেদিন সন্ধ্যে হয় হয়। পশ্চিম আকাশে তখন সবে সূর্য ডুবেছে। একটা গভীর কমলা রঙের আভা সারা পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলে উঠল, ডাঙা — ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কথাটা ডেক-এ শুয়ে বসে থাকা ভাইকিংদের কানে গেল। ওরা ছুটে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশের কমলা রঙের আলোয় ওরা দেখল পশ্চিম দিকে কিছু দূরে ডাঙা। তবে সমতল নয়। ছোট ছোট উঁচু-নিচু টিলার সারি। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ, বুঝে উঠতে পারল না ওরা। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে খবর পাঠানো হলো।

একটু পরে দু'জনে এল। সঙ্গে মারিয়া। সেই টিলার সারির রঙ কেমন বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যের নিস্তেজ আলোয় কালো কালো দেখাচ্ছে। ফ্রান্সিস ডাকল, হ্যারি।

— বলো। হ্যারি বলল।

— এটা কোনো দ্বীপ না দেশ বুঝতে পারছি না। কী করবে এখন?

দ্যাখো ফ্রান্সিস, আমরা এখন দেশে ফিরছি। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ সেটা এখন জানার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। তবে একটা সমস্যা হচ্ছে এই, ডাঙার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কাজেই ডাঙায় কারা থাকে, তারা আমাদের কোনো বিপদে ফেলে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। হ্যারি বলল।

— তা ঠিক। ফ্রান্সিস বলল, তবে আমরা কোথায় এলাম এটাও তো জানা দরকার।

তাহলে এক কাজ কর, হ্যারি বলল, সন্ধ্যের একটু পরে আমরা কেউ নৌকোয় চড়ে ওখানে যাবো। যদি দেখি লোকজন আছে, কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবে তাদের কাছে জেনে নেব এই জায়গাটা কী? দ্বীপ না কোনো দেশ? সেটা জানতে পারলে বুঝতে পারবো আমরা কোথায় এলাম, আমাদের দেশ কতদূর।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল, বেশ, আমিই যাবো।

— আমিও যাবো, মারিয়া বলে উঠল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, অচেনা অজানা জায়গা। দু'জনে বিপদে পড়লে তখন আমাদের উদ্ধার করতে গিয়ে আমার বন্ধুদের হয়তো লড়াইয়ে নামতে হবে। মিছিমিছি বোকার মতো রক্তক্ষয়, মৃত্যু আমি চাই না। আমি একাই যাবো।

সন্ধ্যের পরে পরেই ফ্রান্সিস দ্রুত রাতের খাবার খেয়ে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। মারিয়া একটু ভীত স্বরে বলল, তুমি একা একা যাবে! যদি কোনো বিপদে পড়ো!

ফ্রান্সিস হেসে বলল, অত ভয় পেলে তো বাড়ি থেকেই বেরুনো যায় না। অথচ কোথায় কোন অচেনা সমুদ্রে, অজানা দেশে এসেছি আমরা. তাহলে এলাম কেন?

মারিয়া আমতা আমতা করে বলল, না, বলছিলাম -- সাবধানে --

— কিচ্ছু ভেবো না। মনে সাহস আনো। ফ্রান্সিস বলল।

ডেক-এ উঠে ফ্রান্সিস রেলিঙের ধারে এল। ঝুঁকে দেখল একটা নৌকো নামানো হয়েছে। ঢেউয়ে দুলছে নৌকোটা। হ্যারি শাঙ্কো — ওরা কয়েকজন ওর কাছে এল। হ্যারির গায়ে একটা চাদরের মতো কাপড় জড়ানো। ফ্রান্সিস সেটা দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। ওরা ফ্রান্সিসের সঙ্গী হতে চাইছিল। ফ্রান্সিস নৌকোয় নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন হ্যারি এগিয়ে এল। বলল, ফ্রান্সিস, তুমি কি একাই যাবে?

— হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

-- একটা কথা ভেবেছো? হ্যারি বলল।

-- কী? ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

— যদি ওখানে গিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে বা লোকেদের সঙ্গে দেখা হয় তখন কী বলবে?

— বাঃ। জানতে চাইবো যে এটা কোন দ্বীপ বা কোন দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

— তোমার কথা ওরা বুঝবে? হ্যারি হেসে বলল।

— আরে! ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল, সত্যিই তো — এটা তো ভেবে দেখিনি। ওদের ভাষা তো আমিও বুঝবো না।

সুতরাং — হ্যারি হেসে বলল, আমি কিন্তু গ্রীকভাষাটা অল্পস্বল্প বুঝি।

হ্যারি, যাও শীগগির তৈরি হয়ে এসো। তুমি না থাকলে তো —

হ্যারি গায়ের কাপড়টা খুলে বিস্কোর হাতে দিল। দেখা গেল হ্যারির কোমরে তরোয়াল গোঁজা। পোশাকটাও নতুন। বলল, চলো আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

দু'জনে দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে পরপর নৌকোটার ওপর নামল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে খুব সবল না। বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস নৌকো চালালো ঐ টিলাগুলো লক্ষ্য করে।

বাঁকা চাঁদ রয়েছে আকাশে। কিন্তু চাঁদের আলো নিস্তেজ। অস্পষ্ট সমুদ্রের জল, টিলাগুলো দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। এই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সমুদ্রতীরে লোকজনের অলক্ষ্যে পৌঁছুনো যাবে। সবকিছু স্বাভাবিক দেখলে তবেই লোকজনের সামনে যাওয়া যাবে। অবশ্য যদি ওখানে মানুষজন থাকে।

তীরের কাছে নৌকোটা বেয়ে নিয়ে এলো ফ্রান্সিস। দেখল এখানে সমুদ্রের জল থেকে টিলা উঠে গেছে। এখানে নামার অসুবিধে। তবু এখানেই নামতে হবে। তারপর টিলাটার মাথায় ওঠা যায় কিনা দেখতে হবে। উঠতে পারলে ওপর থেকে সহজেই চারদিক দেখা যাবে।

নৌকোটা টিলার গায়ের কাছে নিয়ে এলো ফ্রান্সিস। অন্ধকারে দু'চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল নৌকো কোথাও ভেড়ানো যায় কিনা। পেল একটা জায়গা। গুহার মতো লম্বাটে ফাঁক একটা। ফ্রান্সিস ফাঁকের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে দিল। আটকে গেল নৌকোটা।

এবার ফ্রান্সিস টিলা পাথুরে গা-টা দেখতে লাগল। খাড়ানো বেশ হেলে আছে দেখল — কিছু পাথরের চাঁই উঁচিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, ওগুলো ধরে ধরে ওপরে ওঠা যাবে। ফ্রান্সিস প্রথমে পাথরে একটা ওঁচানো চাঁই ধরল। তারপর পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে উঠতে শুরু করল। মুখ নিচু করে বলল, হ্যারি, আমি যেভাবে উঠছি, দেখে দেখে তুমিও উঠে এসো।

— পারবো? হ্যারি একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

— কেন পারবে না! উঠতে শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সাবধানে উঠতে লাগল। একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। খুব অস্পষ্ট চাঁদের আলো রয়েছে। পেছনে হ্যারিও উঠতে লাগল।

বেশি উঁচু না। একসময় শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রান্সিস টিলার ওপরে উঠে এল। প্রথমেই দাঁড়িয়ে পড়ল না। একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে সামনের দিকে তাকাল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল সামনে একটা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। তারপরে গাছপালা. কিছু কাঠপাথরের ঘরবাড়ি। ওসব ছাড়িয়ে দূরে ধু ধু দেখা যাচ্ছে জলের আভাস। ফ্রান্সিস ভাবল তাহলে এটা একটা ছোট দ্বীপ। যতদূর চোখ যায়, জনমানবের দেখা নেই। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো। উঠে দাঁড়ালো। তখনই হ্যারির হাঁপানো গলা শুনল, ফ্রান্সিস, হাতটা ধরো। ঘুরে দেখল হ্যারি হাত বাড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে হ্যারির হাত ধরল। তারপর হ্যারিকে টেনে তুলে নিল। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল ঐ গাছগাছালি ঘরবাড়ির দিক থেকে অনেক লোক আসছে প্রান্তরের দিকে। অনেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল, খোলা তরোয়াল, বর্শা।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ডান হাত ধরে টান দিয়েই পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। হ্যারিও সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশে বসে পড়ল।

ওরা পাথরের আড়াল থেকে দেখল সেই দল বেঁধে আসা লোকগুলোর সামনে একজন লোকও আসছে। বেশ দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে আসছে লোকটা। বোঝা গেল ঐ লোকটাই ওদের নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই ওদের নেতা-টেতা হবে।

ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে লোকগুলো দলে দলে এসে দাঁড়াল। এ প্রান্তরে পড়ে-থাকা একটা বড় পাথরখণ্ডে সেই নেতা উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকদের কথাবার্তা থেমে গেল। একজন লোক নেতার পাশে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরে রইল। এবার সেই নেতাকে ফ্রান্সিস একটু ভালোভাবে দেখল। নেতাটি যুবক, সুন্দর সুগঠিত শরীর। বুকে লোহার বর্ম। কিন্তু মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। মাথার লম্বা লম্বা চুল ঘাড়ের পেছনে ঝুলে পড়েছে। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় তার মাথার চুল উড়ছে।

এবার নেতা যুবকটি গলা চড়িয়ে বলল, আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা —

সমুদ্রের জোর হাওয়া ফ্রান্সিসদের দিকে বইছে। যুবকটির কথা কাজেই ওরা একটু অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেল। যুবকটির কথা ফ্রান্সিস বুঝল না। হ্যারি বুঝল। আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, যুবকটি লোল্যাতিন ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। এই লো ল্যাতিন ভাষাটা বেশ সহজ। আমি ভালো বুঝি একটু বলতেও পারি। তবে অক্ষর চিনি না।

এবার যুবকটি যা বলতে লাগল হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে তা বুঝিয়ে দিতে লাগল। যুবকটি বলছে, আমরা সারাসেনরা সিসিলি দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসী। অথচ রাজা ফ্রেডারিক আমাদের সব অধিকার জমি অর্থ কেড়ে নিচ্ছে। অত্যাচারও চালাচ্ছে। রাজা ফ্রেডারিক বিদেশী নর্মানদের বংশধর। আমরা তার অধীনতা স্বীকার করবো কেন? সিসিলি আমাদের মাতৃভূমি। আমরা সিসিলি থেকে ঐ নর্মান বিদেশীকে তাড়াবো। রাজা ফ্রেডারিকের বংশবদ ভূস্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণ সিসিলি থেকে পালিয়ে আমরা এই লিপারি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছি। যুবকটি থামল। তারপর আবার বলতে লাগল,আমরা আজ রাতেই অন্ধকারের মধ্যে সিরাকস বন্দরে নামবো। আক্রমণ করবো ম্যামিয়েস দুর্গ। সমবেত বিদ্রোহীরা হৈহৈ করে চিৎকার করে উঠল। যুবকটি আবার বলতে লাগল, আমরা সংবাদ পেয়েছি রাজা ফ্রেডারিকের একদল সৈন্য রাজধানী পোলার্মো থেকে জাহাজে চড়ে এই সিরাকস বন্দরে আসছে। উদ্দেশ্য, ম্যামিয়েস দুর্গ রক্ষা। আমরা নতুন সৈন্যদল পৌঁছবার আগেই দুর্গ দখল করবো। যুবকটি থামল। আবার চিৎকার হৈ-হল্লা খোলা তরোয়াল ঘোরানো, বর্শা উঁচিয়ে ধরা, মশাল নাচানো শুরু হলো। যুবকটি আবার বলতে লাগল, সমুদ্রতীরে আমাদের যত নৌকো আছে সব জড়ো করা হয়েছে। নৌকোয় চড়ে আমরা সিরাকস বন্দরে নামবো। তারপর দুর্গ দখলের লড়াই। লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। বক্তৃতা শেষ করে যুবকটি পাথর থেকে নেমে দাঁড়াল।

এরপর যুবকটি হেঁটে চলল সেই গাছগাছালি ঘেরা বাড়িগুলোর দিকে। বিদ্রোহীরাও হৈহৈ করতে করতে পেছনে পেছনে চলল।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, কী বুঝলে?

বুঝলাম এটা একটা ছোট্ট দ্বীপ, লিপারি। কাছেই সিসিলি দ্বীপ। ঐ দ্বীপের রাজা এখন ফ্রেডারিক। এই দ্বীপে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা সারাসেন। সিসিলির আদি অধিবাসী। রাজা ফ্রেডারিকের অনুগত কিছু ভূস্বামী এদের দ্বীপছাড়া করেছে। তদুপরি রাজা ফ্রেডারিক বিদেশী নর্মানদের বংশধর। কাজেই এই সারাসেনরা একটি যুবকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছে। আজ রাতে ওরা এই দ্বীপ থেকে নৌকোয় চড়ে গিয়ে মূল দ্বীপ সিসিলির সিরাকস বন্দরে নামবে। তারপর ম্যামিয়েস দুর্গ আক্রমণ করবে। হ্যারি বলল।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলল, আমরা সিসিলি দ্বীপের কাছে এসেছি। এখানে

এখন যুদ্ধ চলবে। কাজেই আমরা এখানে নামবো না। বাঁ দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো।

তাই ভালো। হ্যারি বলল, এসবের সঙ্গে আমরা জড়াবো না।

এবার ফ্রান্সিস বলল, চলো জাহাজে ফিরবো। দু'জনে আগের মতোই ওঁচানো পাথর ধরে ধরে পাথরে খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নিচে নেমে এল। দেখল নৌকোটা ঠিকই আছে। ওরা আস্তে আস্তে নৌকোয় নেমে বসল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল জাহাজের দিকে।

দু'জনে জাহাজে উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। মারিয়াও এসে একপাশে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব কথা বলল। তারপর বলল, আমরা সিসিলির বিদ্রোহ, যুদ্ধ এসবের সঙ্গে জড়াবো না। রাত একটু বেশি হলে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সিসিলির দক্ষিণ দিক দিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। কথাটা শুনে ভাইকিং বন্ধুরা খুশিই হলো। সিসিলিতে নামা হবে না। সোজা দেশের দিকে যাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস কেবিনের দিকে চলল। সঙ্গে মারিয়া আসতে আসতে বলল, জানো, সিসিলি ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। সিসিলিকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের উদ্যান।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, মারিয়া -- তুমি কত পড়াশুনো করেছো? আমি কিন্তু গোমুখ্খু গোঁয়ার।

— মারিয়া বেশ দৃঢ়স্বরে বলল, না। তুমি আমাদের দেশের গর্ব, ভাইকিং জাতির গর্ব।

— ফ্রান্সিস হেসে মাথা ঝাঁকাল। কিছু বলল না।

— রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস বলল, পাল খাটাও। এখুনি জাহাজ ছাড়বো। বন্ধুরা পালের কাঠে উঠে গেল। দড়িদড়া ঠিক করে পাল খুলে দিল। জাহাজচালক হুইলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস তাকে বলল, দিক ঠিক রেখে দেশের দিকে জাহাজ চালাও। জাহাজচালক হুইল ঘোরাল। জাহাজ ঘুরে পশ্চিমমুখো হলো। ওদিকে পালেও হাওয়া লেগেছে। জাহাজ চলল। কিন্তু বাতাসের তেমন জোর নেই। জাহাজ আস্তে আস্তে চলল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস - হাওয়া পড়ে গেছে। দাঁড় বাইলে ভালো হতো।

-- কী দরকার রাত জেগে দাঁড় বাইবার। সকাল পর্যন্ত দেখি। হাওয়ার জোর না বাড়লে তখন দেখা যাবে। এখন সবাই বিশ্রাম করুক। ঘুমিয়ে নিক। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজের গতি মন্থর। লিপারি দ্বীপের দক্ষিণে জাহাজ এল। তখনই দ্বীপটায় অনেক লোকের চিৎকার হৈ-হল্লা শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল দ্বীপের বাড়িঘরে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশে কালো ধোঁয়া উঠছে। এবার তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, লোকজনের চিৎকার, কাতর আর্তনাদ, আহতের গোঙানি শোনা গেল। দ্বীপের আগুনের আভায় দ্বীপের পশ্চিমদিকে দুটো জাহাজের মাস্তুল দেখা গেল। পালগুলো গোটানো। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, বলো তো কী ব্যাপার?

গোলমাল, আহতদের আর্তনাদ শুনে মনে হচ্ছে ফ্রেডারিকের নতুন সৈন্যরা লিপারি দ্বীপ আক্রমণ করেছে। বিদ্রোহী যুবকটি বলেছিল রাজা ফ্রেডারিকের নতুন সৈন্যদল

আসছে। তারাই জাহাজে চড়ে এসেছে। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি এই দ্বীপটির বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। রাজা [illegible]কের সৈন্যরা সুশিক্ষিত সৈনিক সন্দেহ নেই। বিদ্রোহীদের তো দেখেছি। তেমন অস্ত্রশস্ত্র বা শিক্ষা নেই। ওদের লড়তে হবে মনের জোরে।

- যা বুঝছি বিদ্রোহীরা হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

- তারই সম্ভবনা বেশি। হ্যারি বলল।

জাহাজ চলেছে। লিপারি দ্বীপের চিৎকার হৈ-হল্লা শুনে বিস্কো, শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিংও ডেকে উঠে এসেছে ততক্ষণে। সবাই রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

দ্বীপটায় এ সময় হঠাৎ দু-একটা জ্বলন্ত ঘর বোধহয় ধসে পড়ল। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল। ফুলকি উড়ল বেশ উঁচু পর্যন্ত। দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ পর্যন্ত আগুনের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল। সমুদ্রের জলেও সেই আভা ছড়াল। তখনই বিস্কো চেঁচিয়ে উঠল, ফ্রান্সিস, একটা নৌকো জলে ভাসছে। ততক্ষণে সবাই সেই নৌকোটা দেখেছে। নৌকোটায় কোনো আরোহী নেই। আস্তে আস্তে ওটা ভেসে চলেছে। বিস্কো বলল, খালি নৌকো - কোনো মানুষ নেই নৌকোটায়।

আবার দ্বীপটায় জ্বলন্ত বাড়িঘর কিছু ধসে পড়ল। আগুনের ফুলকি উড়ল। আবার আগুনের আভা ছড়াল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল - নৌকোটার মধ্যে একটা হাত উঠেই নেমে গেল। এটা হ্যারির চোখেও পড়ল। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পেড্রো—পেড্রো কোথায়? পেড্রো একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, পেড্রো, মাস্তুলের মাথায় ওঠো। ভালো করে দেখোতো নৌকোটায় কোনো মানুষ আছে কিনা। পেড্রো ছুটল মাস্তুলের দিকে। ও তো নজরদার। তরতর করে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। একটু পরে অমনি দ্রুত নেমে এল। বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, নৌকোটায় দুজন লোক। গলুইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। তাই আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে মরে গেছে না বেঁচে আছে বুঝলাম না।

- বেঁচে আছে। আমি হাত তুলতে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল।

- কী করবে এখন? হ্যারি বলল।

- যে দেশেরই হোক, মানুষ তো। ফ্রান্সিস বলল, ওদের বাঁচাতে হবে। বিস্কো, এক্ষুণি যাও। নৌকোটা টেনে নিয়ে এস। কিন্তু আমাদের নৌকোয় চড়ে যেও না । বলা যায় না হয়তো রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা এদিকে নজর রাখছে। সাঁতরে যাও।

বিস্কো জাহাজের হালের দিকে চলে গেল। ঝোলানো দড়িদড়া ধরে ধরে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। জলে বেশি শব্দ না করে সাঁতরে চলল নৌকোটার দিকে।

নৌকোর কাছাকাছি পৌঁছে বিস্কো ঠিক করল আগেই নৌকোর মধ্যে উঁকি দেবে না। বলা যায় না ভেতরে যে দুজন লোক আত্মগোপন করে আছে তারা হয়তো সশস্ত্র। চমকে উঠে হয়তো ওকে আক্রমণও করতে পারে। বিস্কো তো তরোয়ালই আনেনি।

বিস্কো নৌকাটার পেছন দিকে গেল। নৌকোর গায়ে হাত রেখে একটু বিশ্রাম করল। নৌকোর পেছন দিকটা লম্বাটে নয়, চ্যাপ্টামতো। এই ভূমধ্যসাগর এলাকায় এরকম নৌকোই লোকেরা ব্যবহার করে। ওখান থেকে একটা দড়ি ঝুলছিল। বিস্কো দড়িটা নিয়ে

যুবকটি ডেকের ওপর শুয়ে পড়ল।

দাঁতে চেপে ধরল। তারপর সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে। নৌকোটাও ভেসে চলল সঙ্গে সঙ্গে।

নৌকোটা জাহাজের গায়ে এসে লাগল। এবার দেখা গেল দুজন লোক নৌকোটার গলুইয়ে শুয়ে আছে। মড়ার মতো। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, তোমাদের কোনো ভয় নেই। দড়ি ফেলা হচ্ছে, দড়ি ধরে ধরে উঠে এসো। লোক দুজনের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অল্প আলোয় দেখা গেল লোকটি বয়স্ক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। লোকটি নৌকো থেকে মুখ তুলে বলল, আমি মোটামুটি সুস্থ। কিন্তু সঙ্গের যুবকটি বেশ আহত। ও দড়ি ধরে উঠতে পারবে না। এবার বিস্কো নিশ্চিন্ত হলো - লোক দুটো সশস্ত্র নয়। বিস্কো নৌকোটায় উঠল। ওদিকে শাঙ্কোরা কয়েকজন মিলে জালের মতো বাঁধা দড়ি জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল। বিস্কো আহত যুবকটিকে ধরে তুলে বসিয়ে দিল। আহত যুবকটি কঁকিয়ে উঠল। ততক্ষণে দড়ির জাল নামানো হয়েছে। বিস্কো আস্তে আস্তে যুবকটিকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর দড়ির জালে বসিয়ে দিল। আহত যুবকটি গোঙাতে শুরু করল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ির জালে বসে-থাকা যুবকটিকে আস্তে আস্তে জাহাজের রেলিঙের ওপর দিয়ে তুলে এনে ডেক-এ নামাল। আহত যুবকটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ডেক-এই শুয়ে পড়ল। এবার জাহাজের কাঁচঢাকা চৌকোনো লণ্ঠনের আলোয় ফ্রান্সিস হ্যারি যুবকটিকে দেখেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যুবক সেই বিদ্রোহী নেতা। ঘাড়ের ওপর ঝুলে-পড়া মাথার চুল। এখন বুকে বর্ম পরা নেই। খালি গা। হাত-কাঁধ-মুখ-কপাল ক্ষতবিক্ষত। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, শীগগির বৈদ্যকে ডেকে আনো। ওদিকে বিস্কো আর বয়স্ক লোকটি দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এসেছে। বিস্কো তাড়াহুড়োতে একটা মারাত্মক ভুল করল। যুবক আর লোকটি যে নৌকোয় ভাসছিল সেই নৌকোটা বিস্কো দড়ি দিয়ে ওদের জাহাজের গায়ে বেঁধে রেখে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারিরা আহত যুবকটিকে নিয়ে ব্যস্ত। ওরা এটা লক্ষ্য করল না।

জাহাজের বৈদ্য ওষুধের ঝোলা নিয়ে এল। আহত যুবকটির ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল। বৈদ্যকে ফ্রান্সিস বলল, কেমন দেখলে?

- তরোয়াল বর্শার ঘায়ে কেটে গেছে। বেশি রক্ত পড়েছে তাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভয়ের কিছু নেই। বৈদ্য ঝোলা খুলল। চিনেমাটির বোয়াম বের করল। চটচটে আঠার মতো হলুদরঙা ওষুধ ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। যুবকটি কঁকিয়ে উঠেই শান্ত হলো। ওর মৃদু গোঙানি বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, একে তোমরা সাবধানে নিয়ে যাও। কোনো কেবিনে রেখো। মারিয়াকে বলো ও যেন যুবকটির দেখাশুনো করে।

শাঙ্কোরা কয়েকজন মিলে যুবকটিকে কাঁধে করে নিয়ে গেল।

বয়স্ক লোকটি তখন ডেক-এ বসে পড়েছে। বোঝা গেল ভীষণ ক্লান্ত লোকটি। ফ্রান্সিস একবার দেখল লোকটিকে। লোকটির পরনে সাধারণ চাষীর পোশাক। ফ্রান্সিস এবার হ্যারিকে মৃদুস্বরে বলল, হ্যারি চিনতে পেরেছো যুবকটিকে?

- হ্যাঁ। সেই যে বক্তৃতা দিচ্ছিল, বিদ্রোহী নেতা।

- কী করবে এখন? ফ্রান্সিস বলল।

- ও ভীষণ আহত। বিপন্নও । ওকে তো আশ্রয় দিতেই হবে। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ না

হওয়া পর্যন্ত তো ওকে রাখতেই হবে। হ্যারি বলল।

- বুঝলাম এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। কিন্তু পরাজিত আহত এই বিদ্রোহী নেতাকে ফ্রেডারিকের সৈন্যরা নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াবে। যদি আমাদের জাহাজ খানাতল্লাশী করতে আসে? ফ্রান্সিস বলল।

- কিন্তু ওরা কী করে বুঝবে যে যুবকটি আমাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে? হ্যারি বলল।

তা ঠিক। যাক গে, কালকের দিনটা দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

এ সময় মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, আহত যুবকটি এখন একটু ভালো আছে। ওর সঙ্গের লোকটি কোথায়?

ফ্রান্সিস ডেক-এ বসা লোকটিকে দেখাল। মারিয়া লোকটির কাছে গেল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন? লোকটি মাথা নেড়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল, আমি আসলে স্পেনীয়। অনেকদিন আগে জাহাজডুবি হয়ে এই সিসিলিতে এসেছিলাম। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো। লোকটির সঙ্গে কথা বলে সব জানা যাবে।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি লোকটির কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল, আপনার নাম কী?

- সাভোনা। লোকটি আস্তে বলল।

- ঐ যুবকটি তো বিদ্রোহী নেতা?

সাভোনা একটু আশ্চর্য হলো। বলল, - আপনারা জানলেন কী করে?

- যে ভাবেই হোক জানতে পেরেছি। যুবকটির নাম কী?

- মোরাবিত। ও আমার সন্তানের মতো। সাভোনা বলল।

- হুঁ। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, কী হয়েছিল অল্প কথায় বলুন তো।

লোকটি বলতে লাগল, আমরা লিপারি দ্বীপ থেকে সিসিলি আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। তার আগেই রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা দুটো জাহাজে চড়ে এল। লিপারি দ্বীপে আমাদের আক্রমণ করল। আমরা হেরে গেলাম। সৈন্যরা আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল। ভীষণ আহত মোরাবিতকে কাঁধে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে সমুদ্রতীরে এলাম। পেয়ে গেলাম আমাদের একটা নৌকো। মোরাবিতকে নৌকোয় শুইয়ে দিয়ে আমিও পাশে শুয়ে পড়লাম যাতে রাজার সৈন্যরা আমাদের দেখতে না পায়। নৌকো সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলল। তারপর - লোকটি থামল।

- হুঁ। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখুন, আমরা ভাইকিং - বিদেশী। মোরাবিত আর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি আপনারা অসুস্থ ও বিপন্ন বলে। কিন্তু আপনাদের দেশের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে আমরা নিজেদের জড়াতে চাই না। তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অঞ্চল থেকে চলে যেতে চাইছি। কিন্তু আপনারা জাহাজে থাকলে তো আমাদেরও জাহাজ থামিয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

সাভোনা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। মোরাবিত কাল নাগাদ একটু সুস্থ হলে আমরা আপনাদের জাহাজ থেকে নেমে যাবো।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। শুধু শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজের পাল নামিয়ে নোঙর ফেলতে বলো। জাহাজ এখানেই থামিয়ে রাখতে হবে। অন্তত কাল অবধি।

মারিয়া সাভোনাকে বলল, আসুন, আপনাদের দুজনকেই খেতে দেব। সাভোনা আস্তে আস্তে উঠল। মারিয়ার সঙ্গে চলে গেল খাবার ঘরের দিকে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস হ্যারি শুতে চলে গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম আসতে একটু দেরি হলো। ওর মাথায় নানা চিন্তা।

ভোর হলো। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেমেই আছে। হ্যারি বরাবরই খুব ভোরে ওঠে। হ্যারি জাহাজের ডেকে উঠে এল। অনেক ভাইকিং বন্ধু ডেকের এখানে ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে।

সবে সূর্য উঠেছে। সমুদ্রে আকাশে হালকা নরম রোদ ছড়ানো। হ্যারি লিপারি দ্বীপের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। দেখল দুটো যুদ্ধজাহাজ ওদের জাহাজের দিকে আসছে। বেশ দ্রুতই আসছে।

হ্যারি চিৎকার করে বলল, এই সবাই উঠে পড়ো। তারপরই ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকল, ফ্রান্সিস! ফ্রান্সিস!

মারিয়া জেগেই ছিল। ও ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, ডেক-এ এসো। দুটো যুদ্ধজাহাজ আমাদের জাহাজের দিকে আসছে।

বলো কি? ফ্রান্সিস বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। ছুটল ডেক-এ সিঁড়ির দিকে।

ডেক এ তখন ভাইকিং বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখে বিস্কো বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

- দাঁড়াও, দেখি। ফ্রান্সিস তাকাল জাহাজ দুটোর দিকে। জাহাজ দুটো তখন অনেক কাছে চলে এসেছে। সৈন্যরা জাহাজের রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীক সৈন্যদের মতো মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে লোহার বর্ম। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে জলদস্যুর দল নয়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা হলো - এরা কারা? ওদের জাহাজের দিকে আসছে কেন?

ফ্রান্সিস, আমরা আগেই লড়াইয়ে নামবো না - দেখি এদের উদ্দেশ্য কী? হ্যারি বলল।

- আমিও তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

তারপর ডেক-এ জড়ো হওয়া বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, ভাইসব, আমরা আগেই লড়াইয়ে জড়াবো না। এরা কারা, কী চায় আগে শুনি সব।

বন্ধুরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছিল মনে মনে। ফ্রান্সিসের কথা শুনে ওরা একটু হতাশ হলো। হতাশা চাপা থাকলো না বিস্কোর কথায়। বিস্কো বলল, যদি এই সৈন্যরা নিরস্ত্র আমাদের হত্যা করে?

ফ্রান্সিস বলল, আমার এখনও তা মনে হচ্ছে না। তবু সবাই অস্ত্র আনো। অস্ত্র নিয়ে ডেক-এ একপাশে দাঁড়াও। আমার আর হ্যারির তরোয়াল দুটোও এনো।

সবাই ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। ভাইকিংদের ছুটোছুটিতে কথাবার্তায় মারিয়া বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ও দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এল। ওদিকে মোরাবিতের পাশে সাভোনা ঘুমিয়েছিল। ভাইকিংদের ডাকাডাকি ছুটোছুটির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠল। দেখল মোরাবিত তখনও ঘুমিয়ে আছে। ও মোরাবিতকে আর ডাকল না। কেবিনঘরের বাইরে এল। সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ পা রেখেই ও চমকে উঠল। রাজা ফ্রেডারিকের জাহাজ। সামনের

জাহাজের ডেকে এ দাঁড়িয়ে আছে রাজা ফ্রেডারিকের প্রধান সেনাপতি এলাইমো। সাভোনা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করল। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ছুটল নিজেদের কেবিনের দিকে।

ওদিকে সেনাপতি এলাইমো যে জাহাজে ছিল সেই জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল। এলাইমো এক লাফে ফ্রান্সিসদের জাহাজের রেলিং ধরে ডেক এ উঠে এল। পেছনে পেছনে আরো কয়েকজন সৈন্য।

এলাইমো এগিয়ে এল ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়ার দিকে। এলাইমো দীর্ঘদেহী। বলিষ্ঠ। মুখে দাড়িগোঁফ। বেশ সযত্নে ছাঁটা। বলল, - আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন? লো ল্যাতিন ভাষা। হ্যারি এক পা এগিয়ে এসে বলল, আমার ভাইকিং। ক্রীট দ্বীপ থেকে ফিরছি।

সশস্ত্র ভাইকিংদের দেখে এলাইমো মৃদু হাসল। বলল, শুনেছি আপনারা বীরের জাতি। আমাদের সঙ্গে লড়াই চান?

- না। তবে আমাদের জীবন বিপন্ন হলে লড়াইতে তো নামতেই হবে। হ্যারি বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

যাকগে, এলাইমো সহজভঙ্গিতে বলল, আমি এলাইমো, রাজা ফ্রেডারিকের প্রধান সেনাপতি। এক বিদ্রোহী নেতা আর তার পরামর্শদাতার খোঁজে এসেছি।

- আমরা এখানকার কাউকেই চিনি না। হ্যারি বলল।

- কিন্তু তাদের আপনারা দেখেছেন। এলাইমো বলল।

- না, দেখিনি। হ্যারি বলল।

- ঠিক আছে, রেলিঙে ঝুঁকে দেখুন তো আপনাদের জাহাজের সঙ্গে একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে কিনা।

হ্যারি রেলিঙের কাছে গিয়ে ঝুঁকল। সর্বনাশ! বিস্কো কী সাংঘাতিক ভুল করেছে! মোরাবিতদের নৌকোটা বেঁধে রেখেছে। হ্যারি একবার বিস্কোর দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসের কাছে এল। নিচুস্বরে সব কথা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, দ্যাখো মিথ্যে বলে কাজ হয় কিনা।

হ্যারি এলাইমোর দিকে তাকাল। বলল, ওটা আমাদেরই নৌকো।

- অসম্ভব। ঐরকম গন্ডোলার মতো দেখতে নৌকো একমাত্র এই অঞ্চলের লোকেরাই ব্যবহার করে। এলাইমো বলল।

- খালি নৌকোটা ভাসছিল, আমরা জাহাজে বেঁধে নিয়েছি। হ্যারি বলল।

- এলাইমো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, গতরাতে অন্ধকারের মধ্যে ওরা ঐ নৌকোটায় লুকিয়ে পালিয়েছিল। কাজেই - একটু থেমে বলল, - ওরা দুজন আপনাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসকে নিম্নস্বরে সব বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল এখন সব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস দ্রুত হ্যারিকে বলে গেল কী বলতে হবে। হ্যারি বলল, আমরা সত্যি কথাই বলছি। কাল রাতে নৌকোয় আত্মগোপন করে যে দুজন এসেছিল তারা কারা আমরা জানি না। দুজন বিপদগ্রস্ত মানুষ।

তার মধ্যে একজন আবার গুরুতর আহত, তাই আমরা মানবিক কারণেই তাদের আশ্রয় দিয়েছি, আহতকে চিকিৎসা করিয়েছি।

— কোথায় ওরা? এলাইমো বলল।

— একটা কেবিনে। হ্যারি বলল।

— আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন। এলাইমো বলল।

— নিয়ে যাবো একটি শর্তে। আপনি ওদের হত্যা করতে পারবেন না। হ্যারি বলল।

— যদি করি। এলাইমো বলল।

— তাহলে আমরা লড়াইয়ে নামবো। হ্যারি কথাটা বলে ফ্রান্সিসকেও বলল। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল।

এলাইমো একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। ওদের জীবিত ধরাই রাজা ফ্রেডারিকের ইচ্ছে। ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাবো।

— আমরাও ওদের সঙ্গে যাবো। হ্যারি বলল।

— আপনারা যাবেন কেন? এলাইমো একটু আশ্চর্য হয়ে বলল।

— যদি যাওয়ার পথে আপনারা ওদের মেরে ফেলেন। হ্যারি বলল।

এলাইমো বুঝল এরা সহজে মোরাবিত আর সাভোনাকে ছাড়বে না। ও বলল, ঠিক আছে, আপনারা ক'জন যাবেন চলুন।

— আমরা সবাই যাবো। হ্যারি বলল।

— তার মানে? এলাইমো বলল।

— মোরাবিত আর সাভোনা আমাদের জাহাজে যে কেবিনঘরে আছে সেখানেই থাকবে। আমরা মোরাবিতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করবো। আপনাদের জাহাজের সঙ্গেই আমাদেরও জাহাজ যাবে।

এবার এলাইমো বলল, রাজা ফ্রেডারিক সিরাকস বন্দরের ম্যামিয়েস দুর্গে আছেন। সিরাকস বন্দর কাছেই। একটু থেমে বলল, কিন্তু— আপনাদের বিশ্বাস কি! আমাদের দুটো জাহাজ আপনাদের জাহাজের দুপাশে থাকবে। এভাবেই আমাদের নজরদারির মধ্যে দিয়ে আপনাদের সিরাকস বন্দরে যেতে হবে।

হ্যারি নিম্নস্বরে ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস বলল, বলো আমরা এই প্রস্তাবে রাজী। হ্যারি সে কথাই বলল।

এলাইমো সঙ্গের জনা দশেক সৈন্যকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে পাহারায় থাকতে হুকুম দিল। দুজন সৈন্যকে দেখিয়ে বলল, এরা মোরাবিত আর সাভোনা যেকেবিনঘরে আছে সে ঘরের সামনে পাহারা দেবে।

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বেশ। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সে কথা। মারিয়া বলল, আমি এই সৈন্য দুজনকে নিয়ে যাচ্ছি। মারিয়া হাত নেড়ে সৈন্য দুজনকে আসতে বলে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্য দুজনও চলল। এলাইমো নিজের জাহাজে ফিরে গেল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজের গুটোনো পাল তুলে দেওয়া হলো। জাহাজ চলল। দুধারে

এলাইমোর দুটো যুদ্ধজাহাজও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে মোরাবিতদের কেবিনঘরের সামনে এল। দেখল, খোলা তরোয়াল হাতে দুজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ও কেবিনঘরে ঢুকল। মারিয়া তখন মোরাবিতের শরীরের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাচ্ছে। সাভোনা চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস সাভোনার সাহায্যে মোরাবিতের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, এখন কেমন আছো?

মোরাবিত হেসে বলল, এখন অনেকটা ভালো আছি। কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না।

কেন? ফ্রান্সিস বলল।

আপনাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু সেই আপনারা আমাদের জন্যে কী বিপদে পড়লেন! এর চেয়ে আমরা ধরা দিলে ভালো হতো। মোরাবিত বলল।

তুমি এই নিয়ে ভেবো না। ফ্রান্সিস বলল।

সাভোনা বলল, আমরা বিদ্রোহী - প্রাণপণে লড়াই করেছি কিন্তু আমরা অস্ত্রে বা যুদ্ধবিদ্যায় রাজার সৈন্যদের সমকক্ষ নই। যদি কিছু অর্থ যোগাড় করতে পারতাম -

— ওর সঙ্গে মোরাবিতও কী বলে উঠল। সাভোনা হেসে উঠল।

— মারিয়া বলল, হাসছেন যে?

— মোরাবিত বলছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। সাভোনা হেসে বলল।

এবার ফ্রান্সিস চমকে ওদের দিকে তাকাল। বলল, কাউন্ট রজার কে? তার গুপ্তধন - মানে ব্যাপারটা কী বলুন তো?

— সাভোনা বলল, সেসব শুনে আপনাদের কী হবে?

মারিয়া বলল, ওর নাম ফ্রান্সিস। অনেক গুপ্তধনের রহস্য ও ভেদ করেছে। ওকে বলেই দেখুন না।

সাভোনা, বলুন তো কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বলল। তখনি হ্যারি ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যারি, ভালো সময়েই এসেছো। শোনো সাভোনা এক গুপ্তধনের কাহিনী বলছে।

সাভোনা আস্তে আস্তে বলতে লাগল ঃ

প্রায় একশো বছর আগের কথা। দুই নর্মান ভাই রজার ও রবার্ট সমুদ্র পথে সিসিলি এসেছিল। দু ভাই-ই ছিল দুঃসাহসী আর অত্যন্ত বলশালী। দুজনেই ছিল দস্যু। দস্যুবৃত্তি করে জমানো প্রচুর ধনসম্পদ ছিল ওদের। ক্রমে সিসিলি জয় করে রবার্ট উত্তরের আর রজার দক্ষিণের রাজা হয়ে বসল। রজার উপাধি নিল কাউন্ট। রাজা হিসেবে কাউন্ট রজার কিন্তু যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। যা হোক, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কাউন্ট রজারের ধর্মে মতি হলো। খ্রীস্টধর্মগুরু পোপের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলল। পুরোনো জীর্ণ গ্রীক মঠগুলো সংস্কার করল। সিরাকস আর কাতানিয়ায় দুটো গীর্জা তৈরি করল। তারপর কাউন্ট রজার মারা গেল। উত্তরের পোলার্মো থেকে ভাই রবার্ট ছুটে এল। উদ্দেশ্য কাউন্ট রজারের ধনসম্পত্তি অধিকার করা।

দুজনেই তো অতীতে দস্যু ছিল। রবার্ট সিরাকসের রাজবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউন্ট রজারের ধনসম্পত্তির কোনো হদিসই পেল না। রাজকোষের কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে রবার্ট ফিরে গেল। তারপর একশ বছর ধরে কাউন্ট রজারের বংশধরেরা, ধনী ভূস্বামীরা অনেকেই খুঁজছে। কিন্তু কেউ কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের হদিস করতে পারেনি। সাভোনা থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ সব মন দিয়ে শুনছিল। এবার বলল, আচ্ছা, কাউন্ট রজার কি তার গুপ্তধন কোথায় রাখা হয়েছে সেসব ব্যাপারে কোনো সূত্র রেখে যায়নি?

- কিচ্ছু না। সাভোনা বলল।

- কাউন্ট রজারের মৃত্যু হয়েছিল কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

- এই সিরাকসের রাজবাড়িতে। সাভোনা বলল।

- সেই রাজবাড়ি কি সিরাকসে এখনও আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

- না। বেশ কয়েক বছর আগে এখনকার রাজা ফ্রেডারিক সেসব ভেঙে ফেলেছিল। প্রচার করেছিল যে বেশ ভালো একটা দুর্গ তৈরি করবে। তৈরি করেছেও একটা দুর্গ, ম্যামিয়েস দুর্গ। কিন্তু আসল কারণ ছিল কাউন্ট রজারের গুপ্ত ধনভান্ডারের সন্ধান করা। কিন্তু রাজবাড়ি ভেঙে ফেলেও ফ্রেডারিক কিছুই পায়নি। সাভোনা বলল।

- তাহলে কাউন্ট রজারের তৈরি কোনো কিছুই সিরাকসে নেই? ফ্রান্সিস বলল।

- আছে। তার তৈরি গীর্জাটা। ওটা ম্যামিয়েস দুর্গের উত্তর কোনায় আছে। রাজা ফ্রেডারিক ওটার কিছু সংস্কার করেছিল। ভাঙেনি। তবে এখন ঐ গীর্জায় শুধু রাজপরিবারের মানুষদেরই প্রবেশাধিকার আছে, অন্য কারো নয়।

- তাহলে ঐ গীর্জাটা আপনি দেখেননি? ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে সাভোনা বলল, দেখুন, আমি একসময় রাজা ফ্রেডারিকের একজন অমাত্য ছিলাম। রাজা আমার কাছ থেকে স্পেনীয়, পর্তুগীজ ভাষা শিখেছিল। কয়েকটা ভাষা জানতাম বলে রাজসভায় যথেষ্টপ্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তবে সারাসেনদের ওপর অবিচার হচ্ছিল দেখে আমি সেই পদ ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের দলে চলে এসেছিলাম। ঐ গীর্জায় আমি রবিবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অনেকবার গেছি।

- গীর্জাটার কিরকম সংস্কার রাজা ফ্রেডারিক করেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

- যা কিছু সংস্কার ওপরেই হয়েছে। ভিত্তিটা সেই কাউন্ট রজার যেমন করিয়েছিলেন তেমনি আছে। বোধহয় ভিতটায় সুন্দর মোজেকের কাজ ছিল বলেই রাজা ফ্রেডারিক ভেঙে ফেলেনি। সাভোনা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকার কারণ কী তাই ভাবতে লাগল।

- হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস, কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের অনুসন্ধান করবে নাকি?

- অবশ্যই। ফ্রান্সিস বেশ জোর দিয়ে বলল।

মারিয়া বলল, রাজবিদ্রোহীদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, এজন্যে রাজা ফ্রেডারিক নিশ্চয়ই চটে যাবে। আমাদের না কয়েদঘরে বন্দী করে রাখে!

- দেখা যাক। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

সেনাপতি এলাইমোর নির্দেশমতো ফ্রান্সিসদের জাহাজ পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল তাদের দুটো জাহাজ দুপাশ দিয়ে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই দুরে সিরাকস বন্দর দেখা গেল। আস্তে আস্তে তিনটি জাহাজই ভিড়ল সিরাকস বন্দরের জাহাজঘাটায়।

এলাইমো ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারি ডেক-এ দাঁড়িয়েছিল। এলাইমো হ্যারিকে বলল, মোরাবিত আর সাভোনাকে নিয়ে আসুন। ওদের বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

- আমরা কী করবো? হ্যারি বলল।

- রাজার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের এই জাহাজে এখানেই থাকতে হবে। এলাইমো বলল। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, বলো যে বন্দীদের সঙ্গে আমরা তিনজনও রাজার কাছে যাবো। হ্যারি বলল সে কথা।

- আপনারা যাবেন কেন? এলাইমো একটু আশ্চর্য হয়েই বলল।

- রাজা ফ্রেডারিকের সঙ্গে আমাদের কথা আছে ফ্রান্সিসের শেখানো মতো হ্যারি বলল, এলাইমো একটু ভাবল। বলল, বেশ বিদ্রোহীদের আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই রাজা আজ হোক কাল হোক আপনাদের শাস্তি দেবেনই।

এলাইমোর আটজন সৈন্য যে কেবিনঘরে মোরাবিত আর সাভোনা ছিল সেই ঘরে গেল। ওদের দুহাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল।

জাহাজঘাটায় দাঁড় করানো ছিল একটা সুসজ্জিত সাদা ঘোড়া। এলাইমো সেই ঘোড়ায় উঠে বসল। ঘোড়া আস্তে আস্তে চলল।

বন্দী দুজনকে মাঝখানে রেখে দুপাশে দাঁড়াল খোলা তরোয়াল হাতে আটজন সৈন্য। পেছনে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি। মোরাবিত তখনও সুস্থ হয়নি। হাঁটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

নগরে ঢুকল সবাই। সিরাকস মোটামুটি বড় একটা বন্দর-শহর। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড়। সারি সারি খোলা দোকানপাট। এর মধ্যেই রটে গেছে মোরাবিত আর সাভোনাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হচ্ছে। লোকজন যে যার কাজ ফেলে মোরাবিতকে দেখতে ছুটে এল। সাভোনা রাজ-অমাত্য ছিল। তাকে অনেকেই দেখেছে। চেনেও। কিন্তু বিদ্রোহী যুবক মোরাবিতের নামই সবাই শুনেছে। চোখে কখনও দেখেনি। তাই সকলে সাগ্রহে মোরাবিতকে দেখতে রাস্তায় ভিড় করল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিকে দেখেও ওরা একটু আশ্চর্য হলো। এই ভিনদেশী লোকগুলোকে তো বন্দী করা হয়নি। তাহলে এদের দুর্গে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?

ম্যামিয়েস দুর্গ অনেকটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে। উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রধান দরজার কাছে এলাইমো ঘোড়া থেকে নামল। প্রধান ফটকটি মজবুত কাঠের। দ্বাররক্ষীরা এলাইমোকে দেখে মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। একটু শব্দ তুলে দরজা খুলে দিল ওরা।

সবাই দুর্গের ভেতরে ঢুকল। একটা পাথরের তৈরি চত্বরের পর দুর্গের পাথরে তৈরি বাড়িঘর। চত্বর পেরিয়ে একটা বড় দরজার সামনে সবাই এল। দুজন দ্বাররক্ষী এলাইমোকে

সম্মান জানাল। এলাইমো একজন দ্বাররক্ষীকে কী বলল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এলাইমোকে কী বলল। এলাইমো পেছন ফিরে হাতের ইঙ্গিতে সবাইকে ঘরে ঢুকতে বলল।

সৈন্যরা বাদে ঘরে ঢুকল সবাই। ঘরটা বেশ বড়। একটু অন্ধকার মতো। পাথরের দেয়ালের পাথর কুঁদে ফুল-লতাপাতার কাজ করা। সামনেই একটা পাথরের রঙিন কাপড়-ঢাকা আসনে রাজা ফ্রেডারিক বসে আছেন। দুপাশে লম্বাটে পাথরের কাপড়-ঢাকা আসনে কয়েকজন বসে আছেন। নিশ্চয়ই মন্ত্রী-অমাত্যরা। রাজা ফ্রেডারিকের মাথায় দামী পাথর বসানো সবুজ মীনে-করা মুকুট। রাজা মধ্যবয়স্ক। পরনে রেশমী কাপড়ের ঢিলে পোশাক। অমাত্যদের গায়েও একই রকম পোশাক।

এলাইমো মাথা নিচু করে রাজাকে সম্মান জানাল। মোরাবিত সাভোনা মাথা নোয়ালো না। ফ্রান্সিস এটা দেখে মনে মনে ওদের প্রশংসা করল। এলাইমো একনাগাড়ে কী বলে যেতে লাগল। হ্যারি মৃদুস্বরে সেসব ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে দিল। এলাইমোর কথা শেষ হলে রাজা ফ্রেডারিক মোরাবিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, - সারাসেনদের ক্ষেপিয়ে তুমি রাজবিদ্রোহী হয়েছো। তোমার ফাঁসি হবেই। এবার সাভোনার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, সাভোনা, বেশ তো আমার রাজসভায় সুখে ছিলে। সে সুখ তোমার সহ্য হলো না। সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলে। বিদ্রোহীদের পরামর্শদাতা হলে। এবার বাকি জীবন কয়েদঘরে কাটাতে হবে যে। মোরাবিত সাভোনা কোনো কথা বলল না।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, শুনলাম আপনারা ভাইকিং। মোরাবিত আর সাভোনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছেন। কিন্তু আপনারা কি জানতেন না ওরা রাজদ্রোহী?

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে সত্যি কথাই বলল, হ্যাঁ, মোরাবিত বিদ্রোহী আমরা ঘটনাক্রমে সেটা জানতাম। কিন্তু সাভোনার পরিচয় জানতাম না।

ফ্রান্সিসের কথা শুনে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, এটা স্বীকার করলে কেন? এতে তো আমাদের বিপদ বাড়বে।

- দেখা যাক। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক বললেন, আপনারা বিদেশী। তবু জেনেশুনে যখন ওদের আশ্রয় দিয়েছেন তখন আপনাদেরও বিচার হবে কয়েকদিনের মধ্যেই।

ফ্রান্সিস বলল, বেশ। তবে আপনাকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

- বলুন।

- সাভোনা এদেশের অতীত ইতিহাস ভালোই জানেন। ওঁর কাছে শুনেছি প্রায় একশো বছর আগের রাজা কাউন্ট রজার এখানে তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ কোথাও গোপনে রেখেছিলেন। আমরা স্থির করেছি সেই গুপ্তধন অনুসন্ধান করে উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

কথাটা শুনে রাজা ফ্রেডারিক বেশ আশ্চর্য হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, প্রায় একশো বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষরা ঐ গুপ্তধন উদ্ধারের কত চেষ্টা করেছেন। কেউ পারেননি।

আপনি বলছেন পারবেন!

- পারবোই একথা বলার সময় এখনো আসেনি। সব দেখেশুনে চিন্তাভাবনা করে তবেই পারবো কিনা সেটা বলা যাবে। তবে আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রাখি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রেডারিক অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বলল, আপনার কাছে আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই।

- বলুন।

- কাউন্ট রজার তাঁর রাজত্বকালে কী কী তৈরি করিয়েছিলেন?

- এখানে আর কাতানিয়ায় দুটো গীর্জা আর যে বিরাট বাড়িটা কাতানিয়ায় তৈরি করাবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেই বাড়িটা। তারপরই উনি মারা যান। রাজা বললেন।

- অসুস্থতার সময় কোথায় ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

- কাতানিয়ার ঐ বাড়িটায়। অবশ্য দুদিন পরেই তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এখানকার রাজবাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফ্রান্সিস চুপ করে শুনল। তারপর বলল, আজকে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। এই দুর্গে আমাদের একটা থাকবার জন্যে ঘর দেবেন। কাল থেকে আমরা তিনজন এখানেই থাকবো। আর একটা কথা, মোরাবিত আর সাভোনা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ওঁর সাহায্য আমাদের খুবই প্রয়োজন।

- যদি সাভোনা বা মোরাবিত পালিয়ে যায়? রাজা বললেন।

- আমি তার জন্যে দায়ী থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

- হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

- আর আমরা যেন সর্বত্র অবাধে যেতে পারি, খোঁজখবর করতে পারি, কেউ যেন আমাদের বাধা না দেয় - এই আদেশ আপনি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

- বেশ। রাজা মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল, যদি গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমাদের তো বটেই, মোরাবিত আর সাভোনাকেও মুক্তি দিতে হবে।

রাজা ফ্রেডারিক একটু ভাবলেন। তারপর দুজন অমাত্যকে ইঙ্গিতে ডাকলেন। দুজন রাজার সামনে গেলেন। তিনজনের মধ্যে কী কথাবার্তা হলো। অমাত্যরা ফিরে গিয়ে নিজেদের জায়গায় বসলেন। রাজা বললেন, দেখুন, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আপনারা উদ্ধার করতে পারবেন না। তবু আপনার শর্তে আমি রাজী হলাম। কিন্তু যদি গুপ্তধন উদ্ধার করতে না পারেন? রাজা বললেন।

- তাহলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের জাহাজ চালিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে দেবেন। মোরাবিত ও সাভোনার সঙ্গে আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের এই শর্ত শুনে হ্যারি ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলল, কী বলছো ফ্রান্সিস? মারিয়াও বিস্ময়ে বলে উঠল, কী সাংঘাতিক! ফ্রান্সিস গম্ভীরস্বরে বলল, অনেক ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা বাধা দিও না। রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ফ্রান্সিসের দিকে। মোরাবিত সাভোনা ওর আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, নিজের দেশবাসীও নয়। অথচ ওদের ভাগ্যের

সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না এই বিদেশী। রাজা দুজন অমাত্যকে ডাকলেন। তাঁদের বললেন সব। এবার সবাই ফ্রান্সিসের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। সবাই নীরব। হঠাৎ সাভোনা ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, ফ্রান্সিস, এ তুমি কী বললে! কী সাংঘাতিক শর্ত! উফ্।

– সাভোনা মোরাবিতকে ফ্রান্সিসের শর্তের কথা বুঝিয়ে বলল। মোরাবিত চিৎকার করে কী বলে উঠল।

– হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস মোরবিতও বলছে তুমি এরকম শর্ত দিও না। ফ্রান্সিস হাসল। বলল, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

রাজা ফ্রেডারিক বললেন, ঠিক আছে। আমরা পরস্পরের শর্ত মেনে চলবো। আপনারা জাহাজে ফিরে যেতে পারেন। তবে সৈন্যদের কড়া পাহারার মধ্যে আপনাদের থাকতে হবে।

- বেশ। ফ্রান্সিস মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বলল।

একদল সৈন্যের পাহারায় জাহাজে ফিরে এল ফ্রান্সিসরা। আসার পথে হ্যারি মারিয়া একটি কথাও বলতে পারল না। ফ্রান্সিসের শর্তের কথা ভেবে ওরা দুজনই বিমর্ষ।

জাহাজে উঠতেই সব বন্ধুরা ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরল। হ্যারি বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিসকে বিশ্রাম করতে যেতে দাও। রাজকুমারীও ফ্রান্সিসের সঙ্গে যান। যা বলার আমি বলছি। ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের ঘরে চলে গেল। হ্যারি বন্ধুদের সব বলল।

ফ্রান্সিসের শর্তের কথা শুনে বন্ধুরা ভীষণ উত্তেজিত হলো। কেউ কেউ অভিমানের সুরে বলল, ফ্রান্সিস আমাদের কিছু না জানিয়ে এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিল! কয়েকজন উত্তেজিত স্বরে বলল, ফ্রান্সিসকে আমরা জাহাজ ছেড়ে যেতে দেব না। আজ রাতেই পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে জাহাজ নিয়ে পালাবো। পাহারাদাররা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ভাইকিংদের কথা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি বিপদ আঁচ করল। বন্ধুরা যদি সত্যিই উত্তেজিত হয়ে লড়াইয়ে নামে তাহলে মৃত্যু রক্তক্ষয় অনিবার্য। ও গলা চড়িয়ে বলল, ওসব ভাবনা ছাড়ো। ফ্রান্সিসকে বলছি, ও তোমাদের সব বুঝিয়ে বলবে। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস তখন নিজের কেবিনে চুপ করে শুয়ে চিন্তা করছে। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারি এল। দেখল মারিয়া মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। হ্যারি বন্ধুদের মনোভাবের কথা বলল।

ফ্রান্সিস চুপ করে শুনল। তারপর বলল, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে ডেক-এ জড়ো হতে বলো। আমি যা বলার বলবো।

রাতে জাহাজের ডেক এ জড়ো হলো সবাই। ফ্রান্সিস এল। সঙ্গে মারিয়া। সকলের কথাবার্তা থেমে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, - ভাইসব, ধর্ম-ভাষা মাটির ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা এই পৃথিবীর অধিবাসী। আমাদেরএকটাই পরিচয় আমরা মানুষ। তাই মোরাবিত আমার ভাই। সাভোনা আমার পিতৃতুল্য। একটু থেমে বলল, ওদের লড়াই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে, ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। সেটা ওদের দেশের ব্যাপার। কিন্তু মোরাবিতের কথাই ভেবে দেখো। কী সুন্দর সুগঠিত শরীর! কত অল্প বয়েস! ওর দিকে যতবার আমি তাকিয়েছি এক অদ্ভুত স্নেহের টান বারবার অনুভব করেছি। সাভোনার কথা ভাবো। রাজার প্রিয় অমাত্য ছিলেন। যথেষ্ট

বুদ্ধিমান। চিন্তাশীল। সারাজীবন তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে তিনি মেনে নিয়েছেন বিদ্রোহীর কষ্টকর দুঃখময় জীবন। এমন দুটি মানুষের মৃত্যু হবে এ আমি মেনে নিতে পারিনি। কাজেই আমি আমার জীবনকে বাজি ধরেছি। আর একটু গলা চড়িয়ে ফ্রান্সিস বলল, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আমি উদ্ধার করবোই। মোরাবিত আর সাভোনাকে আমি বাঁচাবোই। তার জন্যে যদি আমাকে বাকি সারাজীবন এই সিসিলিতে থাকতে হয় আমি থাকবো। ততদিন তো ভাই মোরাবিত, পিতৃতুল্য সাভোনা দুজনেই বেঁচে থাকবে। থামল ফ্রান্সিস। তারপর বলল, ভাইসব, আমার শর্তের সঙ্গে আমি কিন্তু তোমাদের জড়াইনি। তোমরা ইচ্ছে করলে জাহাজ নিয়ে স্বদেশে চলে যেতে পারো। এবারে বুদ্ধির লড়াই। আমার একার লড়াই।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনো কথা বলল না। মাথার ওপরে ঝকঝকে তারাভরা আকাশ। শন্‌শন্ সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ। জাহাজের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ছে - ছলাৎ - ছলাৎ।

হঠাৎ বিস্কোর গলা শোনা গেল - ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে আমরা কেউ এখান থেকে এক পাও নড়বো না। শেষ পর্যন্ত তোমাকে যদি রাজা ফ্রেডারিক ফাঁসি দেন আমরা প্রত্যেকে তখন একই-সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবো। সব ভাইকিং উত্তেজিত ভঙ্গীতে দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, ও হো হো।

ফ্রান্সিসের দু চোখ ভিজে উঠল। চোখ মুছে ও ভাঙা গলায় বলল, ভাইসব, আমার বুদ্ধি চিন্তাশক্তির গভীরতার ওপর বিশ্বাস রাখো। জীবনের বাজি আমাকে লড়তে দাও। আমি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করবোই।

সবাই আবার চিৎকার করে ধ্বনি তুলল, ও হো হো। সভা ভেঙে গেল। সবাই পরস্পর কথা বলতে বলতে চলে গেল।

পরদিন সকালেই ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে ম্যামিয়েস দুর্গে এল। দুজন সৈন্য ওদের দুর্গের একটা বড় ঘরে নিয়ে এল। ওরা দেখল, ঘরটায় শুকনো ঘাসের ওপর কাপড় ঢাকা সুন্দর বিছানা পাতা। বালিশও রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। বিছানায় মোরাবিত শুয়ে আছে। মুখচোখ দেখে ফ্রান্সিসের মনে হল মোরাবিত এখন অনেকটা সুস্থ। সাভোনা আধশোয়া হয়ে কিছু ভাবছিল। ফ্রান্সিসদের দেখে উঠে বসল। বলল, ফ্রান্সিস, তোমাকে যতটুকু দেখেছি তাই থেকে একটা কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি তুমি জীবনে কিছু আদর্শকে বিশ্বাস করো এবং সেই আদর্শকে রক্ষা করতে তুমি সিদ্ধান্ত নাও। তাই আমি তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না। একটু থেমে বলল, বলো এবার তুমি কী করতে চাও?

- প্রথমেই কাউন্ট রজারের আমলের রাজবাড়ির যে অংশটা ভাঙা হয়নি সেটা দেখতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

- বেশ চলো। সাভোনা বলল।

সাভোনার দুর্গ-এলাকা ভালো করেই চেনা। ও ওদের দুর্গের উত্তর কোনায় নিয়ে এল। দেখা গেল একটা ছোট গীর্জা। সাভোনা গীর্জাটা দেখিয়ে বলল, এটাই কাউন্ট রজারের তৈরি গীর্জা। এটার কথা তোমাদের বলেছি। ওরা গীর্জাটার সামনে এল। গীর্জার চারদিকে সুন্দর বাগান। অনেক

ফুলগাছ। গোলাপ টিউলিপ ডালিয়া আরো নাম-না-জানা ফুল ফুটে আছে। কাঠের দরজা খুলে ওরা গীর্জাটার দরজার সামনে এল। দেখল প্রবেশপথের মেঝেয় নানারঙের সুন্দর মোজেকের কাজ করা। সাভোনা বলল, এই মেঝে কিন্তু কাউন্ট রজারই তৈরি করিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক এই মেঝেটা ভাঙেনি।

ওরা গীর্জার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ছোট গীর্জা। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। দেয়ালে মাতা মেরীর ছবি। বেশ ভাবগম্ভীর শান্ত পরিবেশ। দেখা গেল মেঝেতেও মোজেকের কারুকাজ। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখল। গীর্জা যেমন হয় তেমনি সব। জানলায় রঙিন কাচ। সকালের রোদ কাচের রঙ মেখে মেঝেয় পড়েছে। ফ্রান্সিস বেশ ভালো করেই দেখল সব।

সবাই বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সাভোনাকে বলল, সাভোনা, কাল আমরা কাতানিয়া যাবো। আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন?

সাভোনা হেসে বলল, রাজা ফ্রেডারিক দুজন সৈন্যকে রেখেছে, দেখেছো তো? পাহারাদারির জন্যে ওদের কিন্তু রাখা হয়নি। আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য ওদের নিযুক্ত করেছে রাজা। গুপ্তধন বলে কথা! রাজা ফ্রেডারিক এখন রাজধানীতে ফিরে যাবে না। গুপ্তধন খুঁজছো তুমি। খুব উৎসাহ রাজা ফ্রেডারিকের। রাজা এখন এখানেই থাকবে।

দিন দুয়েক কাটল। সেই ঘরেই ফ্রান্সিসদের শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিন কাটে।

সেদিন সকালে দুর্গের পাহারাদার সৈন্যদের মধ্যে বেশ ব্যস্ততা দেখা গেল। ফ্রান্সিস সাভোনাকে জিজ্ঞেস করল - কী ব্যাপার বলুন তো?

- মনে হচ্ছে রাজা ফ্রেডারিক দুর্গ পরিদর্শনে আসছেন। সাভোনা বলল।

- রাজা কি এরকম দুর্গ পরিদর্শন করেন নাকি? হ্যারি বলল।

- হ্যাঁ - সাভোনা বলল - আর রাজাদের এই পরিদর্শনের কাজ করা উচিতও। তা নইলে সৈন্যরা অলস হয়ে পড়ে।

একটু পরেই ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে কয়েকজনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা দিয়ে ঢুকলেন রাজা ফ্রেডারিক। পেছনে দুজন অমাত্য। রাজার মাথায় মুকুট নেই। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের ঢোলা পোশাক। পোশাকে সোনার সূতোর লতা ফুল তোলা।

রাজাকে দেখে আধশোয়া ফ্রান্সিস উঠে বসল। রাজা বললেন - গুপ্তধনের কোন হদিশ করতে পারলেন?

- না - ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল - সবে তো খোঁজা শুরু করলাম। কয়েকটা দিন যাক। সব দেখি শুনি জানি তবে তো।

- দেখুন, চেষ্টা করে। তবে এর আগেও তো কম চেষ্টা হয় নি কিন্তু কেউ কোন হদিশও করতে পারে নি।

- দেখি চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস বললে।

এবার রাজা সাভোনা ও মোরাবিতের দিকে তাকালেন। বললেন - তোমরা আপাতত এখানেই থাকবে। কিন্তু খবর্দার - পালাবার চেষ্টা করবে না। এখন কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের খোঁজ চলছে। দেখা যাক - কী হয়। রাজা অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

তখনই দুর্গের ছোট গীর্জাটায় প্রার্থনার ঘন্টা বেজে উঠল - ঢং - ঢং - । ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল - সাভোনা চলুন গীর্জায় যাবো।

- কিন্তু রাজপরিবার আর অমাত্যদের পরিবারের লোক ছাড়া ঐ গীর্জায় আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। সাভোনা বলল।

- হুঁ - তবু যেতে ইচ্ছে করছে। গীর্জার ভেতরে যাবো না আমরা। বাইরে থেকে প্রার্থনা অনুষ্ঠান যতটা পারি দেখবো শুনবো। ফ্রান্সিস বলল।

- বেশ - চলুন। সাভোনা উঠে দাঁড়াল। হ্যারি মারিয়া মোরাবিত ও উঠে দাঁড়াল। সবাই চলল দুর্গের ছোট গীর্জাটার দিকে। মোরাবিত এখন অনেকটা সুস্থ। ওর হেঁটে যেতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না।

গীর্জাটায় তখন ধর্মযাজকের বাইবেল পাঠ চলছে। ফ্রান্সিসরা গীর্জাটায় সামনের দিকে কিছুটা দূরে পাথরের দেয়াল ঘেঁযে দাঁড়াল। একটু পরেই শুরু হল প্রার্থনা সংগীত। ল্যাতিন ভাষায় রচিত প্রার্থনা সংগীতের অর্থ ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া বুঝল না। সাভোনা আর মোরাবিত বুঝল। ফ্রান্সিসরা গানের অর্থ বুঝলো না কিন্তু গানের সুর বড় ভালো লাগল। সকালের উজ্জ্বল রোদে বাতাসে আকাশের নীলে ছড়িয়ে যাওয়া গানের সুর এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করল। মারিয়া অস্ফুটস্বরে বলে উঠল - অপূর্ব। ফ্রান্সিসও বলে উঠল - সুন্দর গান। সাভোনা বলল - এই গান কার রচনা জানেন? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল।

- কাউন্ট রজারের। সাভোনা হেসে বলল।

- বলেন কি? হ্যারি বলে উঠল।

- হ্যাঁ - কাউন্ট রজারের অনেক এরকম খৃষ্টবন্দনা গীতি এই দক্ষিণ সিসিলিতে আজও গাওয়া হয়। সাভোনা বলল - তাহলে তো কাউন্ট রজার শুধু রাজাই দিলেন না -গীতিশিল্পীও ছিলেন। মারিয়া বলল।

- সাভোনা একটু মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল।

গীর্জায় বন্দনাগীতি শেষ হল। গীর্জা থেকে স্ত্রী পুরুষরা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁরা রাজপরিবার অমাত্যদের পরিবারের স্বজন আত্মীয়। স্ত্রীলোকদের পোশাকে কত পারিপাট্য। কত সাজসজ্জা। পুরুষরাও দামি পোশাক পরেছেন। কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁরা দুর্গের প্রশস্ত পথ ধরে অন্দরমহলের দিকে চললেন। তাঁরা কথা বলতে বলতেও উৎসুক্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসদের এক নজর দেখে গেলেন। বিশেষ করে মারিয়াকে। মারিয়া এতক্ষণে নিজেদের পোশাক সম্পর্কে সচেতন হল। দেখল - নিজের পোশাকটা একসময় দামি কাপড়ে তৈরি করা হয়েছিল। এখন কাপড়ের রঙ জ্বলে গিয়ে ব্যবহারে ব্যবহারে একেবারে ন্যাকড়ার মত হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের হ্যারির পোশাকেরও এক অবস্থা। মারিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে আসতে লাগল। পথে মারিয়া কতকটা আপন মনে বলল - আমাদের পোশাক আশাকের যা ছিরি হয়েছে। ওঁদের সামনে লজ্জাই করছিল। ফ্রান্সিসদের মাথায় তখন গুপ্তধনের চিন্তা। ও অন্যমনস্ক ছিল। তবু কথাটা ওর কানে গেল।

ও মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল - মারিয়া পোশাক নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কী আছে।

আসল তো মানুষটা যে পোশাক পরে। ভালো ভালো পোশাক তো দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ববোধ নীতিবোধ মনের উদারতা এসব তো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। এসব অনেক কষ্টে অর্জন করতে হয়। বলো ঠিক কি না।

মারিয়া একটু চুপ ক রে থেকে বলল - তুমি এতসব ভাবো?

- নিশ্চয়ই - ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল - জীবন আমাকে অনেককিছু শিখিয়েছে মারিয়া। মারিয়া আর কোন কথা বলল না।

ওরা পাথুরে পথটার একটা বাঁকে এল। ডানদিকের পথটা দুর্গে ওদের ঘরের দিকে চলে গেছে। সোজা পথটা গেছে দুর্গের প্রধান দেউড়ির দিকে।

হঠাৎ মোরাবিত দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধস্বরে কী বলতে লাগল। হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলা কথাগুলো বুঝল। হ্যারি বলে উঠল - সর্বনাশ।

ফ্রান্সিস বলল — কী ব্যাপার হ্যারি।

মোরাবিত বলছে - ওর সহযোদ্ধারা জলে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী কষ্ট সহ্য করছে ওরা আর আমি এখানে নিশ্চিন্তে খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি। আমি পালাবো।

তখনই দেখা গেল সাভোনা মোরাবিতের দুহাত ধরে কী বোঝাচ্ছে ওকে। মোরাবিত মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে সাভোনার হাত ছাড়িয়ে সদর দেউড়ির দিকে দ্রুত ছুটল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর পেছনে ছুটতে শুরু করল। ডাকতে লাগল মোরাবিত - মোরাবিত। ঠিক তখনই দুজন সৈন্য ওদিক থেকে মোড় ঘুরে মোরাবিতের সামনে এসে পড়ল। মোরাবিতকে ওরা চেনেণ সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য দুজন খাপ থেকে দ্রুতহাতে তরোয়াল খুলে ফেলল। তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়াল। মোরাবিত দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সৈন্য দুপা এগিয়ে এসে মোরাবিতের কাঁধ লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। মোরাবিত এক লাফে সরে এল। তরোয়ালের কোপ লাগল না। সেই সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে ধরার আগেই মোরাবিত শুন্যে লাফিয়ে উঠে সৈন্যটির বুকে লাথি চালাল। সৈন্যটি ছিট্কে পাথুরে রাস্তায় পড়ে গেল। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে পড়ে গেল। মোরাবিত দ্রুত হাতে নিচু হয়ে তরোয়ালটা তুলে নিয়েই অন্য সৈন্যটির মুখোমুখি দাঁড়াল। সৈন্যটি তরোয়াল হাতে মোরাবিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোরাবিতের বুকে তো বর্ম নেই। তরোয়ালের ফলা ওর বুক ছুঁয়ে গেল। বুক লম্বালম্বি কেটে গেল। রক্ত বেরোলো।

মোরাবিত সৈন্যটার ওপর লাফিয়ে পড়ার আগেই ফ্রান্সিস পেছন থেকে মোরাবিত কে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে বলল - সাভোনা - মোরাবিতকে বলুন ও যদি সত্যি ওর মাতৃভূমিকে ভালোবাসে ওর বিদ্রোহী বন্ধুদের ভালবাসে তবে যেন এক্ষুনি অস্ত্রত্যাগ করে। সাভোমা তখনই সেখানে এসে পড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসের কথাগুলো ও বলল। মোরাবিত একটু শান্ত হল। তরোয়াল নামাল।

ফ্রান্সিস বলল - সাভোনা - বলো যে এখন একা এত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া নিরেট বোকামি। ও পালাতে পারবে না বরং মৃত্যু ডেকে আনবে। তাতে না ওর মাতৃভূমির না ওর বিদ্রোহী বন্ধুদের কারো উপকারই হবে না। বরং বেঁচে থাকলে - সময় সুযোগ বুঝে ও পরে লড়াই করবে। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মোরাবিত শূণ্যে লাফিয়ে উঠে সৈন্যটির বুকে লাথি মারলো।

সাভোনা দ্রুত ফ্রান্সিসের কথাগুলো বলে গেল। মোরাবিত চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। মন দিয়ে শুনল কথাগুলো। পাথুরে পথে ছিটকে পড়া সৈন্যটি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্য সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস মোরাবিতকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাত তুলে সৈন্যটির দিকে এগিয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল - সাভোনা মোরাবিতকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলুন। সাভোনাও চিৎকার করে কথাটা বলল। মোরাবিত হাতের তরোয়াল ফেলে দিল। পাথুরে রাস্তায় শব্দ হল ঝনাৎ। সৈন্যটি তরোয়াল নামাল। ফ্রান্সিস মোরাবিতকে ধরে নিজেদের ঘরের দিকে চলল। পেছনে পেছনে চলল সাভোনা হ্যারি আর মারিয়া।

যেতে যেতে মোরাবিত ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বিড় বিড় করে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল না। ও গলা চড়িয়ে বলল - সাভোনা - মোরাবিতকে বলো - ও যেন আমার ওপর বিশ্বাস রাখে। যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামতে হয় তবে আমি আর আমার বীর বন্ধুরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করবো। মৃত্যু হলে মৃত্যুকে মেনে নেব। মোরাবিত যেন এখন আমাদের ভুল না বোঝে। সাভোনা ফ্রান্সিসের কথাগুলো মোরাবিতকে বলে গেল। মোরাবিত একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না। শান্তভাবে হাঁটতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে ভেক্তর বন্ধুদের এই ক্ষোভকে কাজে লাগাল। আগের কোন অভিযানে ভেক্তর ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আসে নি। এবারই প্রথম। ও ক্ষুব্ধ বন্ধুদের কয়েকজনকে বোঝাতে লাগল - এভাবে বিদেশ বিভুঁইয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকা অর্থহীন। ফ্রান্সিসরা পড়ে থাকুক। চলো - আমরা জাহাজের দখল নিয়ে দেশের দিকে জাহাজ চালাই। ফ্রান্সিসরা না হয় পরে অন্য কোন জাহাজে দেশে ফিরবে।

দু'একদিনের মধ্যে ভেক্তরের এইসব কথাবার্তা শুনে বেশ কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধল। জাহাজে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেই। বিস্কো আর শাঙ্কো এই বিক্ষোভ আঁচ করতে পারল না। ওদের তখন চিন্তা ফ্রান্সিস গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারল কিনা।

সেদিন দুপুর থেকেই অসহ্য গুমোট আবহাওয়া। সমুদ্রে বাতাস পড়ে গেছে। জলে শান্ত ঢেউ। গরমে ভাইকিংরা দুপুরে কেউ ঘুমুতে পারল না।

বিকেল হতে গরম একটু কমল বটে কিন্তু গুমোট ভাবটা কাটল না।

সন্ধ্যের সময় ভেক্তর বিক্ষুব্ধ বন্ধুদের জড়ো করল জাহাজের হালের দিকে। মাস্তুলের আর সিঁড়িঘরের আড়ালে পড়া জায়গাটায়। এখানে ডেক-এর ওপর ভেক্তর বিক্ষুব্ধ বন্ধুদের নিয়ে একটা ছোটখাটো সভা মত বসাল। ভেক্তর আগের কথাগুলোই বলল।

এবার একজন ভাইকিং বলল - কিন্তু - আমাদের জাহাজ তো সেনাপতি এলাইমোর দুটো জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। আমাদের জাহাজেও রয়েছে আটজন সশস্ত্র পাহারাদার সৈন্য। এরমধ্যে আমরা জাহাজ নিয়ে পালাবো কী করে?

ভেক্তর বলল - সেসব পরিকল্পনা আমার ছকা হয়ে গেছে। তোমরা জাহাজ নিয়ে পালাতে রাজি কি না সেটা আগে বলো। প্রায় সকলেই বলে উঠল - হ্যাঁ - আমরা রাজি।

- প্রয়োজনে এলাইমোর সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে। বলো - তোমরা রাজি। ভেক্তর বলল।

সবাই বলে উঠলো - হ্যাঁ হ্যাঁ রাজি।

একজন ভাইকিং বলে উঠল - আমরা বহুদিন হল দেশ ছেড়ে এসেছি। এখানে ওখানে বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর নয়। এবার দেশে ফিরবো। কোন বাধা আমরা মানবো না। প্রায় সকলেই তার কথা সমর্থন করল।

ভেক্তুর বলল - আমার সঙ্গে ছজন থাকো। বাকিরা তৈরি থাকো আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়ার জন্য। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালিয়ে পালাতে হবে। একটু থেমে ভেক্তুর বলল এবার সবাই চলে যাও। তারপর বলল - বিস্কো শাঙ্কো যেন ঘুণাক্ষরেও আমাদের এই পরিকল্পনা জানতে না পারে। ওদের সঙ্গে অন্য যারা ফ্রান্সিসের জন্য এখানেই অপেক্ষা করতে চাইবে বা আমাদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যাবে প্রয়োজনে তাদের আমরা বন্দী করবো। একটু থেমে ভেক্তুর বলল - এখন সবাই যাও। এমন স্বাভাবিকভাবে থাকবে যেন কেউ তোমাদের সন্দেহ না করতে পারে। সভা ভেঙে গেল। সবাই চলে গেল। এবার ছজন সঙ্গীকে ভেক্তুর বলল - তোমরা কাছাকাছি থাকো। প্রয়োজন পড়লেই তোমাদের যেন হাতের কাছে পাই।

ভেক্তুর পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল। দেখল আকাশে গভীর লাল রঙ ছড়িয়ে আছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ভেক্তুর সেইদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

জাহাজের কেবিন ঘরে বিস্কো শাঙ্কো আর অন্য ভাইকিংরা ভেক্তুরের এই পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতে পারল না। জানতেও পারল না ওপরে ডেক-এ জড়ো হয়ে ভেক্তুর আর ভেক্তুরের সঙ্গীরা কী মতলব করছে।

রাত হল। রাত বাড়তে লাগল। ভাইকিংদের রাতের খাওয়ার সময় হয়ে এল।

ভেক্তুর একা ডেক থেকে নেমে এল। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব ও এল ওদের বৈদ্যির কাছে। কেবিনঘরে যে তিনজন ভাইকিং বন্ধু ছিল তারা ভেক্তুরেরই দলের লোক। বৈদ্যি বিছানায় শুয়ে ছিল। ভেক্তুর বৈদ্যির পিঠে হাত চেপে বলল এই ওঠো। কথা আছে।

বৈদ্যি উঠে বসল। বলল - কে আবার অসুখে পড়ল?

ভেক্তুর গলা নামিয়ে বলল। কেউ না। একটা কথা - তুমি যে ওযুধগুলো দাও তারমধ্যে বিষাক্ত ওযুধও তো আছে।

-হ্যাঁ আছে বৈকি। কাটা ঘায়ে যে হলুদ রঙের ওযুধটা লাগাই ওটা কেউ ভুলে খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। বৈদ্যি বলল।

- যদি খাবারের সঙ্গে খেয়ে ফেলে? ভেক্তুর জানতে চাইল।

- তবে একটু দেরি হবে মানে বিষের কাজ শুরু হলেই মারা যাবে। বৈদ্যি একটু থেমে হেসে বলল - তবে শখ করে কেউ খাবারের সঙ্গে বা জলের সঙ্গে খেতে যাবে নাকি?

- কিন্তু শত্রু মারতে তো এই ওযুধটা কাজে লাগানো যায়। ভেক্তুর বলল।

- হ্যাঁ তা যায় বৈ কি? বৈদ্যি বলল। বৈদ্যির শিয়রের কাছেই কাঠের তক্তার ওপর সাজানো ওযুধের কাঁচের বোয়ামগুলোর দিকে ভেক্তুর তাকালো তারপর হাত বাড়িয়ে হলুদ রঙা ওযুধের বোয়ামটা নিল। তাক থেকে কিছুটা কাগজ ছিঁড়ে নিল। বোয়ামের মুখ খুলল।

বৈদ্যি হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল - কী করছো ভেক্তুর?

ভেক্তর বলল - এই ওযুধ কিছুটা নিচ্ছি। বলা যায় না যদি হঠাৎ দরকার পড়ে ভেক্তর হাত ঢুকিয়ে বেশ কিছুটা হলুদ রঙা ওযুধ টুকরো কাগজটায় রাখল। তারপর বোয়াম তুলে রাখল। বৈদ্যি কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। চুপ করে রইল। ভেক্তর ওযুধটা নিয়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেবিনঘরের তিনজন ভাইকিং দেখল। কিন্তু বুঝল না কিছুই।

ভেক্তর কিছুক্ষণ পরে ডেক এ উঠে এল। সঙ্গী ছজনকে ইশারায় ডাকল। ওরা কাছে এলে ভেক্তর ওদের সঙ্গে নিয়ে এলাইমোর পাহারাদার সৈন্যদের কাছে গেল। হেসে বলল - সৈন্যভাইরা একটা কথা বলছিলাম। সৈন্যরা ওর স্পেনীয় ভাষা বুঝল না। এবার ভেক্তর হেসে হেসে হাতের ইঙ্গিতে ওদের একসঙ্গে খেতে আমন্ত্রণ জানাল। সৈন্যরা কিছুটা বলল। কেউ কেউ হাসল।

ভেক্তরের নির্দেশমত হালের কাছে ডেক-এর ওপর ততক্ষণে দুজন ভাইকিং দুসারিতে পাতা কাঠের থালায় গরম গরম রুটি ভেড়ার মাংসের ঝোল সাজিয়ে দিয়েছে। এবার এলাইমোর সৈন্যরা বুঝল। ভেক্তর হেসে ওদের খেতে আসতে বলল। সৈন্যরা খুব খুশী। খোলা তরোয়াল কোমরের খাপে ঢুকিয়ে রেখে খেতে এল। ভেক্তর হেসে হেসে ওদের একটা সারিতে বসতে বলল। সৈন্যরা খেতে বসে পড়ল। অন্য সারিটার সামনে বসল ছ জন সঙ্গীসহ ভেক্তর। সবাই খাওয়া শুরু করল।

ভেক্তর খাচ্ছে কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে সৈন্যদের দিকে। খেতে খেতে হঠাৎ একজন সৈন্য ওয়াক তুলে বমি করবে বলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দুপা এগিয়েই কাঠের ডেক-এ গড়িয়ে পড়ল। অন্য একজন সৈন্য কয়েকবার ওয়াক তুলে শুয়ে পড়ল। একে একে সাতজন সৈন্যই বিযাক্ত খাবার খেয়ে মারা পড়ল। ঠিক তখনই সমুদ্রের স্তব্ধ পরিবেশে একটা শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। কালো দেয়ালের মত ঢেউ ভেঙে পড়ল জাহাজের ডেক-এ। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, গম্ভীরধ্বনিতে বাজ পড়ল। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি সেইসঙ্গে মুহুর্মুহু আকাশ জুড়ে বাজ পড়া।

ভীষণ দুলছে জাহাজটা। ওর মধ্যেই ভেক্তর চেঁচিয়ে বলল - সৈন্যদের উষ্ণীষ বর্ম তরোয়াল খুলে নাও।

ওর ছজন সঙ্গী ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের ওপর।

সৈন্যরা তখন কেউ কেউ মারা গেছে। কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়েছে। তীব্র বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন। উষ্ণীষ বর্ম তরোয়াল খুলে নিয়ে ভেক্তরের সঙ্গীরা মৃত সৈন্যদের হালের দিকের রেলিঙের কাছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। তারপর গড়িয়ে ফেলে দিল ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে। ভেক্তরের সঙ্গীরা সৈন্যদের উষ্ণীষ মাথায় পরল। বর্ম বুকে বাঁধল। তরোয়াল খাপে গুঁজে রাখল। এত কান্ড দুপাশের পাহারাদার জাহাজ থেকে এলাইমোর কোন সৈন্য দেখতে পেল না। কারণ প্রচন্ড ঝড়ে দুটো জাহাজই ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রবল বেগে উঠছে পড়ছে।

অন্ধকারে চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এলাইমোর পাহারাদার জাহাজদুটো বৃষ্টির ঝাপটার সাদা ধোঁয়াটে আস্তরনের মধ্যে দিয়ে ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় উঠছে পড়ছে। ভীষণভাবে এপাশে ওপাশে দুলছে। হঠাৎ কখনো বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানিতে জাহাজ দুটো দেখা যাচ্ছে। পরক্ষণেই বৃষ্টির ঝাপটায় ধোঁয়াটে চারপাশ।

ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর।

ফ্রান্সিসদের জাহাজেও চলছে প্রচন্ড দুলুনি। কেউ ভালো করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। প্রায় সব ভাইকিংরাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে কেবিনঘরে নেমে গেছে। ভেক্তরের দুজন সঙ্গী মাস্তুল আঁকড়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। ভেক্তর এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। ও নিজে তখনও ডেক-এ রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তখন লক্ষ্য নোঙর তুলে জাহাজ গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। বিদ্যুতের আলোয় ভেক্তর দুজন সঙ্গীকে দেখল। ও ডেক এর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে কখনও গড়াতে গড়াতে ঐ সঙ্গী দুজনের কাছে এল। সঙ্গী দুজনের কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলতে লাগল - শিগ্‌গির নোঙর তোল। নোঙর তোল জাহাজ ছাড়ো মাঝ সমুদ্রের দিকে। জলদি - । সঙ্গী দুজন মাস্তুল ছেড়ে ডেক-এ বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকারে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল নোঙর বাঁধা দড়ির দিকে। বেশ কসরৎ করে অনেক কষ্টে নোঙর তুলে ফেলল।

নোঙর তোলা হতেই ঝড়ের প্রচন্ড ধাক্কায় জাহাজটা কাত হয়ে যেন ছুটে চলল।

এতসব কান্ড ঘটেছে বিস্কো শাঙ্কো তার কিছুই জানে না। ওরা তখন নিজেদের কেবিনঘরে। বিস্কো বিছানায় শুয়ে আছে। শাঙ্কো ওর বিছানায় বসে বিস্কোর সঙ্গে গল্পগুজব করছে। সেই কেবিনঘরে আরো দুজন ভাইকিং বন্ধু বিছানায় বসে ছক্কা পাঞ্জা খেলছে। জাহাজ যে সমুদ্রে ভেসে চলেছে এটা জাহাজের দুলুনিতে ঝড়ের মাতনে ওরা বুঝতেও পারে নি।

কিছুক্ষণ পরেই ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমল। আকাশে মেঘ কেটে যেতে লাগল। সমুদ্র শান্ত হতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা অনুজ্জ্বল চাঁদটা দেখা গেল। বাতাসের বেগ অনেক কমে গেল। সমুদ্র শান্ত হল।

অন্য ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে বিস্কো আর শাঙ্কো রাতের খাবার খেতে খাবার ঘরে এল। দেখল - অস্ত্র সজ্জিত ভেক্তর আর তার অনুগামি বন্ধুরা খাওয়া শেষ করে উঠছে। বিস্কো আর শাঙ্কো ওদের শিরস্ত্রান বর্ম পরা দেখে বেশ আশ্চর্য হল।

বিস্কোর সঙ্গী কয়েকজনও অবাক। ওদের কোমরে বাঁধা তরোয়ালও সোজা লম্বাটে। বাঁকা নয়।

বিস্কো এগিয়ে গিয়ে ভেক্তরকে জিজ্ঞেস করল - কী ব্যাপার ? এলাইমোর সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র তোমরা পেলে কী করে ?

- এলাইমোর পাহারাদার সৈন্যরা কেউ বেঁচে নেই। ভেক্তর বলল,

- তার মানে ? শাঙ্কো - বলে উঠল।

- ওদের নিকেশ করা হয়েছে। ভেক্তরের পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীটি বলল। বিস্কো চেঁচিয়ে বলে উঠল - সর্বনাশ। আমাদের দুপাশে এলাইমোর জাহাজ ঘিরে আছে। ওরা এই হত্যার কথা জানতে পারলেই আমাদের আক্রমণ করবে। তখন নিরস্ত্র আমরা কেউ বাঁচবো না। ফ্রান্সিসদেরও মেরে ফেলা হবে।

একটু থেমে বিস্কো বলল - তোমাদের কে বলেছে ওদের একেবারে প্রাণে মেরে ফেলতে ?

- আমি বলেছি। ভেক্তর গম্ভীরগলায় বলল।

- এরকম একটা সাংঘাতিক কাজ করলে তুমি ? শাঙ্কো বলল।

ভেক্তর বেশ ঠান্ডা মেজাজে বলল - এখন এলাইমোর দুটো পাহারাদার জাহাজ অনেক দূরে।

- তার মানে? বিস্কো বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

- আমাদের জাহাজ এখন মাঝ সমুদ্রের দিকে চলেছে। ডেকএ উঠে দেখগে। ভেক্তরের একজন সঙ্গী বলল।

- বলো কি? বিস্কো শাঙ্কোর মুখের দিকে তাকাল।

তারপরে দুজনেই ছুটল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে। ডেক-এ উঠে দেখল জাহাজের পাল খাটানো হয়েছে। জোর বাতাসে খোলা পাল ফুলে উঠেছে। জাহাজ দ্রুত চলেছে ঢেউ ভেঙে। বিস্কো ভেবে পেল না এখন কী করবে। শাঙ্কোও অবাক।

তখনই ভেক্তর ওর সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে ডেক-এ উঠে বিস্কোদের কাছে এল। বিস্কো ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল - ভেক্তর - জাহাজ ফেরাও সিরাকস বন্দরের দিকে। ফ্রান্সিসদের ফেলে রেখে আমরা দেশে ফিরতে চাইনা। ভেক্তর কুটিল হাসি হাসল - ফ্রান্সিসের কথা ভুলে যাও। এখন এই জাহাজের ক্যাপ্টেন আমি। আমি যা বলবো তাই হবে। আমি হুকুম দিয়েছি জাহাজ দেশের দিকে চালাতে।

- কিন্তু - ফ্রান্সিসদের এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ফেলে রেখে আমরা চলে যাবো? ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া - এরা কি আমাদের বন্ধু নয়? শাঙ্কো বলল।

- ফ্রান্সিসের পাগলামিকে আমরা আর প্রশ্রয় দেব না। ভেক্তরের এক সঙ্গী বলল।

- কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে গেছে ফ্রান্সিস। এরমধ্যে পাগলামির কী দেখলে? শাঙ্কো বলল।

- ফ্রান্সিস কোনদিন এ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারবে না। ভেক্তর হেসে বলল।

- ভেক্তর - বিস্কো বলল - তুমি এই অভিযানে প্রথম এসেছো। তাই জানো না ফ্রান্সিস কত শক্ত শক্ত ধাঁধার সমাধান করেছে। সোনার ঘন্টা, হাঁসের ডিমের মত মুক্তো উদ্ধার করেছে। ফ্রান্সিসের চেয়ে হয়তো বেশি বলশালী তুমি। কিন্তু ফ্রান্সিসের বুদ্ধি চিন্তা ধীশক্তির কাছে তুমি ছেলেমানুষ। সবচেয়ে বড় কথা - ফ্রান্সিস বন্ধুদের বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত সবসময় - যে কোন মুহূর্তে। একটু থেমে বিস্কো বলল - আজ তুমি ফ্রান্সিসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছো - কিছু বন্ধুকে ক্ষেপিয়ে-।

বিস্কো কথাটা শেষ করতে পারল না। ভেক্তর একটানে কোমর থেকে তরোয়াল খুলে বিস্কোর বুকের ওপর তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরল। কঠিনস্বরে বলল - এই জাহাজে যে আমার হুকুম অমান্য করবে তাকেই বন্দী করে রাখবো।

বিস্কো শাঙ্কোর পেছনে দাঁড়ানো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু চিৎকার করে বলল - তোমার হুকুম আমরা মানবোনা। আমাদের নেতা ফ্রান্সিস। ওরা এই কথা বলেই ছুটলো নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। লক্ষ্য অস্ত্রঘর।

ওরা অস্ত্রঘরের সামনে এসে দেখল - ভেক্তরের দলের দুজন ভাইকিং উষ্ণীষ বর্ম পরে খোলা তরোয়াল হাতে অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে। ওরা বুঝল ভেক্তর দল পাকিয়েছে। ওদের দেশে ফেরার লোভ দেখিয়েছে। অনেকদিন ওরা দেশ ছেড়ে এসেছে। দেশে ফেরার জন্য ওরা আকুল।

হয়ে উঠেছে। কাজেই সহজেই ভেক্তরের দলে গিয়ে ভিড়েছে। ভুলে গেছে ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়ার কথা। যে দুজন এলাইমোর সৈন্যদের পোশাক পরে অস্ত্রঘর পাহারা দিচ্ছে তারা তো ভাইকিং ওদের সুখদুঃখের বন্ধু। ভাইয়ের মত। স্বদেশবাসী। ওদের দুজনকে কাবু করা যায়। কিন্তু তাতে রক্তপাত হবেই। ভেক্তরের বিরোধীরা বুঝে উঠতে পারলো না এখুন কী করবে। ওদিকে জাহাজ চলেছে। সিরাকস বন্দর থেকে অনেকটা চলে এসেছে। জাহাজ এখনি ফেরাতে হবে।

ফ্রান্সিসের বন্ধুরা অস্ত্রঘরের সামনে থেকে সরে এল। নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কথা বলল। স্থির হল ঐ দুজন ভেক্তরের দলের পাহারাদারকে আক্রমন করে অস্ত্রঘর দখল করতে হবে।

ওরা পরামর্শ সেরে আস্তে আস্তে অস্ত্রঘরের দিকে চলল। তারপরে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ দুজন পাহারাদারের ওপর। আচমকা এই আক্রমণে পাহারাদার দুজন কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। একজন তো ছিটকে কাঠের মেঝেয় পড়ে গেল। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। অন্যজন কিন্তু দ্রুত হাতে তরোয়াল চালাতে লাগল। নিরস্ত্র দু'তিনজন কাঁধে বুকে তরোয়ালের ঘা লেগে আহত হল। রক্তে ভিজে গেল ওদের শরীর। কিন্তু পাহারাদারটি ততক্ষণে কাঠের মেঝেয় ওদের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। একজন ওর তরোয়াল ধরা হাতটা বাঁটসুদ্ধু পা দিয়ে চেপে ধরল। ও যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠে তরোয়াল ছেড়ে দিল।

ওরা ভেক্তরের দলের পাহারাদার দুজনকে অল্পক্ষণের মধ্যেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। অস্ত্রঘরের একপাশে ওদের ফেলে রাখল। তরোয়ালের ঘায়ে যারা আহত হয়েছিল তাদের দুজন বন্ধু নিয়ে চলল বৈদ্যির কাছে। এই প্রথম ভাইকিং বন্ধুরা বন্ধুর রক্ত ঝরালো। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি নিজেদের মধ্যে লড়াই হবে কোনোদিন।

ওরা এবার অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল বর্শা দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে ছুটল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ডেক-এ তখন বিস্কো আর শাঙ্কোর দুহাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের বন্ধুর দল তরোয়াল বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এল ওদের মুক্ত করতে। ভেক্তরের দল তো আগে থেকেই যুদ্ধসাজে তৈরি হয়ে আছে। ওরাও ভেক্তরের নেতৃত্বে তরোয়াল উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল। ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত তখন। লড়াই মৃত্যু রক্তপাত অনিবার্য।

বিস্কো বাঁধা দুহাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল - এ কী করছো? আমরা ভাইকিং এক দেশের মানুষ - ভাই আমরা - বন্ধু - । আমরা পরস্পর লড়াই করবো - ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙাবো? দুদলই থমকে দাঁড়াল।

শাঙ্কো চিৎকার করে বলল - ভেক্তর - এবার দেখো - তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছো। আমরা যারা এতদিন পরস্পরের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম আজ সেই আমরা পরস্পরের প্রাণ নেবার জন্যে তরোয়াল ধরেছি।

- ভাইসব বিস্কো চিৎকার করে বলল - অস্ত্র নামাও।

দুদল ভাইকিংরাই একটু দ্বিধার পর বিস্কোর কথা মেনে নিল। আস্তে আস্তে তরোয়াল নামাল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শাঙ্কো ভেক্তরের দিকে তাকিয়ে বলল - ভেক্তর এবার বলো তোমরা কী চাও? ভেক্তর বেশ

রাগতস্বরে বলল - তোমাদের দুজনকে আমরা নিকেশ করে দিতাম। কিন্তু তা করিনি।

- কেন? বিস্কো বলল।

- কারণ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও তোমরা আমাদের বন্ধু।

বিস্কো দেখে বলল - এখন আর সে কথা ওঠে না। আমরা পরস্পর আর বন্ধু নেই।

- যাক গে - ভেক্তর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বাঁ হাত ঘুরিয়ে বলল - তোমাদের দুজনকে কেবিন ঘরে বন্দী করে রেখে আমরা জাহাজ চালিয়ে দেশে ফিরে যাবো।

- না - বিস্কো বলল - ফ্রান্সিসদের এইভাবে বিদেশের মাটিতে ফেলে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনা, একটু থেমে বিস্কো বলল - বরং সামনের কোন বন্দরে আমরা নেমে যাবো। তারপর অন্য কোন জাহাজে চড়ে সিরাকস বন্দরে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিসের কাজ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবো। ফ্রান্সিস কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করবেই - এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ভেক্তর হেসে বলল - ফ্রান্সিস জীবন থাকতে সেটা পারবে না।

- দেখা যাক - শাঙ্কো বলল - যদি তার জন্যে ফ্রান্সিস সারা জীবন এই সিসিলি দ্বীপেই থাকে তাহলে আমরাও থাকবো।

- ঠিক আছে - ভেক্তর বলল - তোমাদের সামনের বন্দরেই নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে তোমাদের সবাইকে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে। সব অস্ত্র অস্ত্রঘরে জমা রাখতে হবে। সেই অস্ত্রঘর একেবারে বন্ধ করে রাখা হবে যাতে তোমরা কেউ অস্ত্র হাতে নিতে না পারো।

বিস্কো শাঙ্কোর বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল - ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদেরও অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে।

- না আমরা সশস্ত্রই থাকবো। ভেক্তর দৃঢ়স্বরে বলল। বিস্কো শাঙ্কোর বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠল - না।

বিস্কো বুঝল - বিপদ। দুদলই যেভাবে উত্তেজিত তাতে সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় মৃত্যু অনিবার্য। বিস্কো বাঁধা দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বলে উঠল - থামো। উত্তেজিত দুদলই একটু থমকালো। উদ্যত তরোয়াল বর্শা নামালো কেউ কেউ। বিস্কো চিৎকার করে বলতে লাগল - ভাইসব - ভুলে যেও না আমরা ভাইকিং - এক জাতি আমরা - পরস্পরের ভাই।' একটু থেমে বিস্কো এবার ভেক্তরের দিকে তাকাল। বলল - ভেকতর - তুমি আমাদের কোথায় নামিয়ে এনেছো দেখ। ভাই অস্ত্র ধরেছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

- তার জন্যে আমি দায়ী নই। ভেক্তর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

- না - তুমিই দায়ী - বিস্কো বেশ গলা চড়িয়ে বলল - আমাদের মত যারা জাহাজে জাহাজে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ায় মাটির প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষন থাকে। আবার সেই মাটি যদি হয় স্বদেশের মাটি তাহলে সেই আকর্ষন হয়ে ওঠে আরো দুর্বার। তুমি আমার বন্ধুদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছো। আমাদের বন্ধুদের ক্ষেপিয়ে তুলে - বিস্কো কথাটা শেষ করতে পারলো না।

ভেক্তর এক লাফ দিয়ে ছুটে এসে বিস্কোর বুকে তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরল। দাঁত-চাপাস্বরে বলল - আর একটা কথা বললে তোমাকে নিকেশ করবো। বিস্কোর বন্ধুরা বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। ভেক্তর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল - তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।

ওরা তখনও বিস্ময়বিমূঢ়। ভেক্তর চেঁচিয়ে বলল - অস্ত্রত্যাগ কর নইলে বিস্কোর প্রান যাবে। বিস্কোও বলে উঠল - অস্ত্র রেখে দাও। ওরা অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল। ওরা বুঝল এখন লড়াইয়ে নাম[illegible] প্রথমেই বিস্কোকে হত্যা করবে। ওরা আস্তে আস্তে হাতের তরোয়াল বর্শা ডেকএর ওপর ফেলে দিল। শব্দ হল ঝনাৎ - ঝন্ - ঝনাৎ।

ওদিকে পূব আকাশে সূর্য উঠেছে। ভোরের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের নীলাভ জলে জাহাজে। সমুদ্র বেশ শান্ত।

ভেক্তর ওর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল - তোমরা চারজন বিস্কো আর শাঙ্কোকে নিয়ে যাও। একটা ঘরে ওদের দুজনকে বন্দী করে রাখো। দরজায় তালা দিয়ে সবসময় একজন পাহারা দেবে। বাকি এই অস্ত্রগুলো নিয়ে অস্ত্রঘরে রেখে দাও। দরজায় তালা দিয়ে দুজন পাহারায় থাকবে।

ভেক্তরের নির্দেশমত ওরা বিস্কো ও শাঙ্কোর সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্কো কোন আপত্তি করল না। ক্রুদ্ধস্বরে বলল - শাঙ্কো চলো। বিস্কো নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে চলল। শাঙ্কোও চলল ওর পেছনে পেছনে। ভেক্তরের সঙ্গীরা খোলা তরোয়াল হাতে ওদের পেছনে পেছনে চলল। অন্য দুজন ডেক থেকে সমস্ত অস্ত্র তুলে নিয়ে চলল।

যেতে যেতে পেছন ফিরে বিস্কো বন্ধুদের বলল - ভেক্তরদের সঙ্গে কেউ লড়াই করতে যাবে না। সামনের কোন বন্দরে আমরা নেমে যাবো। অপেক্ষা করবো অন্য জাহাজের জন্যে। জাহাজ পেলে আমরা ফিরে যাবো সিরাকস বন্দরে। সব করতে হবে শান্তিতে। বন্ধুদের রক্তপাত মৃত্যু আমরা চাইনা। বিস্কোরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। বিস্কোর কেবিনঘরে বিস্কো আর শাঙ্কোকে বন্দী করে রাখা হল। দরজায় তালা দিয়ে পাহারাদার দাঁড়াল। অস্ত্র রেখে অস্ত্রঘরেও তালা লাগানো হল।

বিস্কো বিছানায় আধশোয়া হল। ওর মাথায় তখন অনেক চিন্তা। যদি ওর দলের বন্ধুরা ভেক্তরদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে তাহলে রক্তপাত মৃত্যু অনিবার্য। যে করে হোক এই লড়াই হতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু এখন তো ও নিজে বন্দী। কিছু যদি ঘটে যায় ও কিছুই করতে পারবে না। ভয় আশঙ্কাটা এখানেই।

তখন বেলা হয়েছে। সমুদ্রে বাতাস পড়ে গেছে। জাহাজের পালগুলো নেতিয়ে পড়েছে। জাহাজের গতি অনেক কমে গেছে।

বাঁ দিকে লিপারি দ্বীপের তটভূমি দেখা গেল। ছোট্ট একটা বন্দর মত জায়গা থেকেএকটা জাহাজ বিস্কোদের জাহাজের দিকে আসছে দেখা গেল। জাহাজ চালকের পাশেই সশস্ত্র ভেক্তর দাঁড়িয়ে ছিল। ও ঠিক বুঝল না ঐ জাহাজটা কাদের। এটাও বুঝল না জাহাজটা ওদের জাহাজ লক্ষ্য করেই আসছে কিনা। জাহাজটা ওদের জাহাজের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে বলেই ভেক্তরের মনে হল। হয়তো তাই যেত। ঐ জাহাজটা ছিল সেনাপতি এলাইমোর সৈন্যদের। মোরাবিত আর সাভোনার বিদ্রোহী বন্ধুদের বিদ্রোহ দমন করে ওরা ফিরে আসছিল। জাহাজটা বিস্কোদের জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

তখনই এলাইমোর সৈন্যদের দলপতি লক্ষ্য করল বিস্কোদের জাহাজে ওদেরই মত অস্ত্র পোশাকে সজ্জিত ভেক্তর আর ওর বন্ধুদের কয়েকজনকে। ওরা ঠিক বুঝল না - এরা কারা?

জাহাজে ভাইকিংদের পোশাক পরা জনা কয়েককেও ওরা দেখল। দলপতি বুঝল কিছু বিদেশীও ঐ জাহাজে আছে। দলপতির সন্দেহ বাড়ল। ও দাঁড়িদের নির্দেশ দিল দাঁড় বাইবার জন্যে। সিঁড়ি নেমে দাঁড়িরা ছুটল দাঁড় ঘরের দিকে। সারি সারি কাঠের আসনে বসে পড়ল দাঁড় তুলে নিল। সমুদ্রের জলে দাঁড় পড়তে লাগল - ছপ্ - ছপ্। জাহাজের গতি বাড়ল। দ্রুত ছুটল বিস্কোদের জাহাজ লক্ষ্য করে।

ওদিকে ভেক্তর বুঝতে পারল যে ঐ ছুটে আসা জাহাজটা যাদেরই হোক তারা ওদের জাহাজটা ধরতেই আসছে। ভেক্তর তাড়াতাড়ি চিৎকার করে বলল - দাঁড়ঘরে যাও। প্রাণপণে দাঁড় বাও। ঐ জাহাজটা আমাদের কাছে আসার আগেই আমাদের পালাতে হবে। কিন্তু ভেক্তরের দলের লোক তো বেশি নয়। তবু তারা ছুটল দাঁড়ঘরের দিকে। দাঁড় বাওয়াও শুরু হল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এলাইমোর সৈন্যদের জাহাজ বিস্কোদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। কেঁপে উঠল দুটো জাহাজই। দলপতির সঙ্গে আট দশজন সৈন্য বিস্কোদের জাহাজে উঠে এল। দলপতি ডেক-এর ওপর দাঁড়ানো ভাইকিংদের দেখল। তখনই ভেক্তর চাপাস্বরে পাশের ভাইকিং কে বলল - শিগগির যাও। অস্ত্রঘরের আর বিস্কোদের ঘরের পাহারাদারদের এক্ষুনি ডেক-এ আসতে বল। ওরা সশস্ত্র। লড়াই হলে ওদের থাকতেই হবে। ভাইকিংটি দ্রুত পায়ে ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে।

নিজেদের কেবিনঘরে বন্দী বিস্কো আর শাঙ্কো ঘরের বাইরে ভেক্তরের দলের লোকদের দ্রুতপায়ে ছুটোছুটির শব্দ শুনল। বুঝল - ডেক-এ কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু বুঝল না কী ঘটেছে। তখনই ওদের কেবিনঘরের দরজায় ধাক্কা দিল কারা। দুজনেই বিছানা ছেড়ে উঠে দ্রুত দরজার কাছে এল। ওদিকে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু দরজার তালার ওপর হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। কয়েকটা প্রচন্ড ঘা পড়তেই তালা ভেঙে পড়ে গেল। দরজা খুলে গেল। বন্ধুরা ঘরে ঢুকল। জাহাজের বৈদ্যিও ঢুকল ওদের সঙ্গে। বিস্কোর দিকে তাকিয়ে বলল - বিস্কো - তুমি একটা সাংঘাতিক ঘটনা জানো না। বিস্কোরা ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

— বিস্কো- ভেক্তরের দল আমার বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে এলাইমোর আটজন সৈন্যকে মেরে ফেলেছে। বৈদ্যি বলল।

বিস্কো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর বলল — কী সাংঘাতিক। কিন্তু তুমি ওষুধ দিলে কেন?

— ভেক্তর চাইল। বলল আহত হ'লে লাগাবে। বৈদ্যি বলল।

— কী মারাত্মক ভুল করেছো ভেক্তরকে বিশ্বাস করে। বিস্কো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল। এবার একজন ভাইকিং বন্ধু ভেক্তররা কী নৃশংস-ভাবে এলাইমোর সৈন্যদের হত্যা করেছে সে সব কথা বলল।

বিস্কো বলে উঠল -ঈস!— ভেক্তররা শেষ পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর কাজ করল। আমরা যুদ্ধ করেছি- আমার বন্ধুরা সামনা সামনি লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে. কিন্তু কক্ষণো এইরকম নিষ্ঠুরভাবে নিরপরাধ সৈন্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে এভাবে মারেনি। ভেক্তররা ভাইকিং জাতির কলঙ্ক।

একজন ভাইকিং বন্ধু তাড়া দিল বিস্কো শাঙ্কো ডেক-এ চলো। একদল সৈন্য জাহাজে চড়ে এসে আমাদের জাহাজে উঠেছে। মনে হচ্ছে ওরা এলাইমোর সৈন্য। শিগগির চলো!

ওরা ছুটল সিঁড়ির দিকে। ডেক-এ এসে দেখল— ভেক্তর তার দলবল নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য জাহাজের সৈন্যদের দলপতিও সঙ্গে জনা দশবারো সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছে।

একটু পরেই সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে দলপতি ভেক্তরদের দিকে এগিয়ে এল। ভেক্তরের দিকে তাকিয়ে লো ল্যাটিন ভাষায় জিজ্ঞেস করল— তোমরা কে? কোত্থেকে আসছো? ভেক্তররা সেই ভাষা কিছুই বুঝল না। বিস্কোরাও বুঝল না।

তবে ভেক্তর আন্দাজে বুঝে নিয়ে বলল- আমরা ভাইকিং-ভাইকিং-সিরাকস বন্দর-সিরাকস আসছি। দলপতি এটুকু বুঝল যে ওরা বিদেশী। সিরাকস বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে আসছে।

দলপতি লো ল্যাতিন ভাষাতেই বলল - তোমরা আমাদের অস্ত্র পোশাক কী করে পেলে? ভেক্তর কথাটা বুঝলনা। তখন দলপতি ওর নিজের শিরস্ত্রান বর্ম তরোয়াল আঙ্গুল ঠুকে দেখাতে লাগল।

এবার ভেক্তর বুঝল। ও হেসে তাড়াতাড়ি বলে উঠল — ক্রীট-ক্রীট-খানিয়া-খানিয়া। বোঝাতে চাইল ক্রীটের রাজধানী খানিয়া নগর থেকে এনেছে। দলপতি বুঝল সেটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলনা। ভেক্তরের দল বিস্কো শাঙ্কোদের দল তখনও বুঝে উঠতে পারছে না কী ঘটবে এরপরে? তবে বিস্কো বুঝল ঐ দলপতির সন্দেহ যায় নি।

হঠাৎ ভেক্তর কিছু বুঝে ওঠার আগেই দলপতি খুব দ্রুত দুপা ছুটে এসে ভেক্তরের কোমরের ঝোলানো তরোয়ালটা এক ঝটকায় খুলে নিল।

ভেক্তর চিৎকার করে বলে উঠল - বন্ধুরা - তৈরি হও। ভেক্তরের দলের ভাইকিংরা কোমরে তরোয়ালের বাঁটে হাত রাখল।

দলপতি হাতের খোলা তরোয়ালটা চোখের কাছে আনল। দেখল-তরোয়ালের বাঁটের ঠিক নিচেই একটা ট্যাড়া চিহ্ন খোদাই করা। ঢ্যাড়া চিহ্নের মাথায় দুটো ফুটকি। এটা রাজা ফ্রেডারিকের রাজকীয় চিহ্ন। রাজার সৈন্যদের তরোয়ালে ঐ জায়গায় এই রাজকীয় চিহ্ন খোদাই করা থাকে। দলপতির সন্দেহ এবার দৃঢ় হল। স্পষ্ট বুঝল ওদের সৈন্যদের হত্যা করে ভেক্তররা এই অস্ত্র পোশাক সংগ্রহ করেছে।

দলপতি চিৎকার ক'রে কী ব'লে উঠল। সেনাপতির সঙ্গী সৈন্যরা তরোয়াল কোষমুক্ত করল। ওপরের দিকে তুলে ধরল। উজ্জ্বল রোদ পড়ে চকচকে তরোয়ালের ফলাগুলো ঝলসে উঠল। ভেক্তরের বন্ধুরাও তরোয়াল কোষমুক্ত করল। একজন ভেক্তরের খালি হাতে একটা তরোয়াল দিল।

দলপতির জাহাজ থেকে আরো সৈন্য চিৎকার করে খোলা তরোয়াল হাতে এই জাহাজে উঠে এল।

সৈন্যরা ভেক্তরের দলের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দে আহতের গোঙানিতে মৃত্যু-চিৎকারের

জাহাজের ডেক ভরে তুলল।

বিস্কো শাঙ্কো আর ওদের বন্ধুরা তখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে এই লড়াই দেখতে লাগল। হাজার হোক ওরা তো ভাইকিং। বীরের জাত। চোখের সামনে বন্ধুদের এই ভাবে আহত হ'তে মৃত্যু হ'তে দেখে ওরা স্থির থাকতে পারল না। দু'তিনজন বিস্কোর কাছে ছুটে এল। উত্তেজিত স্বরে বলল — বিস্কো -আমাদের বন্ধুরা মারা যাচ্ছে। আমরা লড়াই করবো। বিস্কো চঁচিয়ে বলল — না — ওরা যে নির্মম কাজ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত ওদের করতে দাও। ওদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল দলনেতার সৈন্যরা সংখ্যাই শুধু বেশি নয় যুদ্ধেও নিপুণ। শুরু হ'ল ভেক্তরের দলের হার। আসলে ভেক্তরের দলে নিপুণ ভাইকিং যোদ্ধারা বেশি ছিল না।

তখন ভেক্তর আর দলপতির মধ্যে তরোয়ালের লড়াই চলছে। এগিয়ে পিছিয়ে লড়াই চলছে। ভেক্তরের মাথায় শিরস্ত্রান। বুকে বর্ম আঁটা। ওকে তরোয়ালের ঘায়ে কাবু করতে পারছিল না দলপতি। হঠাৎ দলপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেক্তর। দলপতি এই হঠাৎ আক্রমন ঠেকাতে ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে লাগল। একসময় জাহাজের রেলিঙের ওপর পিঠ রেখে তরোয়াল চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভেক্তরের প্রবল আক্রমণের মুখে এক মুহূর্তের জন্য হার মানল। দলপতি রেলিঙের ওপর প্রায় চিৎ হয়ে পড়ল। দুজনেই তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে। দলপতির মাথা থেকে শিরস্ত্রান খসে পড়ল সমুদ্রের জলে। ভেক্তর এই সুযোগ ছাড়ল না। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে ও দলপতির মাথা লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল চালল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভেক্তরের। মাস্তুলের ঝুলন্ত দড়িতে লাগল মাথার ওপর থেকে নেমে আসা তরোয়ালের কোপ। দড়ি কেটে গেল বটে। কিন্তু আচমকা বাধায় ভেক্তরের হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। দলপতি উঠে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র ভেক্তরের গলা লক্ষ্য ক'রে সজোরে তরোয়াল চালাল। ভীষণভাবে আহত ভেক্তর সশব্দে ডেক-এর ওপর গড়িয়ে পড়ল। একটুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে স্থির হয়ে গেল।

তখনই বিস্কো চিৎকার ক'রে বলে উঠল — ভাইকিং ভাইসব — লড়াই থামাও। ভেক্তর যে পাপ করেছে তার ফল পেয়েছে। আর লড়াই নয়। ভাইকিংরা অস্ত্র নামাল। বিস্কো ব'লে উঠল — সবাই অস্ত্র ফেলে দাও। ভাইকিংরা হাতের তরোয়াল ডেক-এ ফেলে দিল। দলপতিও কী ব'লে উঠল। তার সৈন্যরাও তরোয়াল নামাল।

এবার দলপতি ক্লান্ত পায়ে আস্তে আস্তে বিস্কোর সামনে এসে দাঁড়াল। দলপতি বিস্কোর কোন কথাই বুঝতে পারেনি। তবে এটা বুঝেছিল যে বিস্কোই ওদের দলনেতা। দলনেতা বার দু'য়েক ক্লান্তস্বরে বলল —তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?

বিস্কো বুঝল না। তবে বিস্কো ডান হাত তুলে পেছন দিকে সমুদ্র দিগন্ত দেখিয়ে বারবার বলতে লাগল— সিরাকস বন্দর — সিরাকস বন্দর। দলপতি সিরাকস কথাটা শুনে বুঝল ওরা সিরাকস বন্দরে ফিরে যেতে চায়। দলপতি মাথা ওঠানামা ক'রে বোঝার ইঙ্গিত করল।

বিস্কো ভেক্তরের দলের ভাইকিং বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল — তোমরা যদি দেশে ফিরে যেতে চাও বলো তাহ'লে লিপারির ঐ ছোট বন্দরটায় তোমাদের নামিয়ে দেব। কোন জাহাজে উঠে তোমরা দেশে চলে যেও।

ভেক্তরের অনুগামীদের দুজন গুরুতর আহত হয়েছিল। অনেকেই মারাও গিয়েছিল। বাকিদের মধ্যে কয়েকজন বলল — না— আমরা তোমাদের ফ্রান্সিসদের ফেলে দেশে ফিরবো না। ফিরলে সবাই একসঙ্গে ফিরবো। — এই তো খাঁটি ভাইকিংদের মতো কথা। বিস্কো বলল।

দলপতি আর এলাইমোর সৈন্যরা নিজেদের জাহাজে চলে গেল।

বিস্কো জাহাজ চালকের কাছে এল। বলল— বন্দরে ফিরে যাবো। জাহাজের মুখ ঘোরানো হ'ল।

তখন দুপুর। বিস্কোদের সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। রাঁধুনি বন্ধুরা রান্না শুরু করল। ওদের দফায় দফায় খেতে খেতে বিকেল হ'য়ে গেল। ততক্ষণে সমুদ্রে জোর হাওয়ার দাপা দাপি শুরু হ'য়েছে। জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হ'ল। জাহাজ দ্রুত ঢেউ ভেঙে চলল সিরাকস বন্দরের দিকে। দলপতির জাহাজটাও পেছনে পেছনে আসতে লাগল। জাহাজ যখন সিরাকস বন্দরে পৌঁছল তখন রাত হ'য়েছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজ জাহাজঘাটায় লাগতেই ঘাট থেকে এলাইমোর পাহারাদার কয়েকজন সৈন্যের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে এল। বিস্কো শাঙ্কো রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিস্কো বুঝল ওদের জাহাজের দশ জন পাহারাদার যে নিখোঁজ হয়েছে এটা এলাইমোর সঙ্গী সৈন্যরা জানতে পেরেছে। ভেক্তর ঝড়ের সময় জাহাজ নিয়ে পালিয়েছিল। কাজেই ওরা ধরে নিয়েছে ভাইকিংরা ওদের সঙ্গী পাহারাদারদের হত্যা করেছে।

ঘাটে পাটাতন ফেলতেই এলাইমো সর্বপ্রথমে উঠে এল। পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে আরো পাঁচ ছ'জন সৈন্য। সবারই মুখ থমথমে। বিস্কো বুঝল — ভীষণ সমস্যায় পড়ল ওরা। হ্যারি ছাড়া ওরা কেউই লো ল্যাতিন ভাষা জানেনা। ওরা কী ক'রে এলাইমোকে সমস্ত ব্যাপারটা বলবে। কী ক'রে বোঝাবে যে ঐ দশজনকে হত্যার জন্যে ওরা দায়ী নয়। স্পেনীয় ভাষায় চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। বিস্কো এগিয়ে এল। স্পেনীয় ভাষায় বলল আপনাদের ভাষা আমি জানিনা। আমি স্পেনীয় ভাষায় সব বুঝিয়ে বলছি।

এলাইমো গম্ভীর সুরে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল — স্পেনীয় বুঝি -ভালো বলতে পারিনা। বলো সব।

বিস্কো থেমে থেমে আস্তে আস্তে ভেক্তরের দলপাকানো — পাহারাদারদের হত্যা করা-পালানো- অন্য জাহাজের আক্রমণ ও ভেক্তর ও তার সঙ্গী অনেকের মৃত্যু-সব বলল।

এলাইমো চুপ ক'রে সব শুনল। তারপর বলল — তুমি মিথ্যা-সত্য -কী বুঝবো?

বিস্কো দুশ্চিন্তায় পড়ল। ওর ভাগ্য ভালো। তখনই দলপতি র সেই জাহাজটা জাহাজঘাটায় এসে লাগল। শাঙ্কো দেখল সেটা। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল— বিস্কো সেই দলপতির জাহাজ এসেছে। আমি দলপতিকে নিয়ে আসছি। শাঙ্কো দ্রুত পায়ে পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে ছুটল।

বিস্কো এলাইমোকে বলল — আপনার সৈন্য বাহিনীর এক দলপতি সব ঘটনা দেখেছে-জানে সে আসছে সব বলবে আপনাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতিকে সঙ্গে নিয়ে শাঙ্কো ফিরে এল। শাঙ্কো তখনও হাঁপাচ্ছে। সেনাপতি এলাইমোকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দলপতি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। এবার এলাইমো দলপতির কাছে সব জানতে চাইল। দলপতি আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। আরো বলল - সে সন্দেহ করেছিল ঐ কয়েকজন ভাইকিং তাদেরই সৈন্যদের হত্যা ক'রে অস্ত্র পোশাক

নিয়ে সশস্ত্র হয়েছিল। এটা যে সত্য তা সে এখানে এসে জানতে পেরেছে। এখানকার পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে।

এলাইমো বলল -সেই ভাইকিংরা কী ক'রে সৈন্যদের হত্যা করেছিল-কখন হত্যা করেছিল?

দলপতি মাথা নেড়ে বলল— সেটা কেউ বলতে পারছে না। বিস্কো ওদের সব কথা বুঝল না। কিন্তু এটা বুঝল যে এলাইমো জানতে চাইছে কী ক'রে কখন জাহাজে পাহারাদার ওর সৈন্যরা মারা গেল। আশঙ্কায় বিস্কোর বুক কেঁপে উঠল। ভেক্তররা নির্মম ভাবে ঐ পাহারাদারদের হত্যা করেছিল। এটা যদি এলাইমো জানতে পারে তাহ'লে এলাইমো ক্ষিপ্ত হবেই। বিস্কোদের ওপর সে প্রতিশোধ নেবেই। তার অর্থ ওদের সবাইকে আত্মরক্ষার জন্যে লড়াইএ নামতে হবে। ক'জন বাঁচবে আর ক'জনই বা জাহাজে চড়ে পালাতে পারবে?

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। এলাইমো দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল — এই বিদেশী ভাইকিংদের মধ্যে কারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল চিনিয়ে দিতে পারবে।

দলপতি উপস্থিত বিস্কো শাঙ্কো আর ওদের বন্ধুদের দেখে দেখে মাথা নেড়ে বলল -না- এরা লড়াই করেনি।

— তাহলে কারা লড়াই করেছিল? এলাইমো জানতে চাইল।

— তাদের বেশিরভাগই হয় মারা গেছে নয়তো আহত হয়েছে। দু'চারজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়েছে। দলপতি বলল।

এলাইমো এবার বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল-আহতরা কোথায়?

বিস্কো দ্রুত ভাবল বলবে আহত কেউ নেই। সব মরে গেছে। কিন্তু এলাইমো যদি জাহাজ খানাতল্লাশী করে তবে দু'জন আহত বন্ধু ধরা পড়ে যাবে। তখন মিথ্যে বলার জন্য ওদের সবাইকে বিপদে পড়তে হবে। কাজেই সত্যি কথাই বলতে হ'ল। বিস্কো বলল— আসুন।

বিস্কো নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে এলাইমোর। তার পেছনে দলপতিসহ চার পাঁচজন সৈন্য। যে কেবিনঘরে আহত দুই ভাইকিং বন্ধু ছিল। বিস্কো সেই ঘরে ঢুকল। এলাইমো দলপতিও ঢুকল। আহত দু'জনের পরনে তখনও এলাইমোর সৈন্যদের সেই পোশাক। শুধু শিরস্ত্রাণ আর তরোয়াল নেই। একজন শুয়েই ছিল। তার উরুতে কম্বল মত কাপড়ের মোটা ফেট্টি বাঁধা। অন্যজনের বাঁ কাঁধেও ঐরকম মোটা ফেট্টি। দু'জনেই এলাইমোকে দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠল। এলাইমো ওদের পোশাক দেখে থমকে দাঁড়াল। রাগে ওর দু'চোখ জ্বলে উঠল। এক ঝটকায় কোমর থেকে রুপালি বাঁটের তরোয়াল খুলে ফেলল। বিস্কো একলাফে এলাইমোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'হাত জোড়া করে বারবার বলতে লাগল— দোহাই— ওদের হত্য করবেন না। রাজা ফ্রেডারিকের দরবারে নিয়ে চলুন। বিচার হোক ওদের। রাজা ফ্রেডারিক যা শাস্তি দেবেন মেনে নেবো। দুই আহত ভাইকিং এর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। এলাইমো কী ভেবে তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। দলপতিকে কী আদেশ দিয়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দলপতি ওর পাঁচজন সৈন্যকে আনতে বলল। সৈন্যরা বসে থাকা ভাইকিংকে এক হ্যাঁচকা টানে বিছানা থেকে মেঝেয় দাঁড় করাল। অন্য তিনজন সৈন্য শুয়ে থাকা ভাইকিংকে জোর ক'রে তুলে দাঁড় করাল। ওরা দু'জনেই ব্যথায় গোঙাতে লাগল।

বিস্কো দলপতিকে বার বার বলতে লাগল- ওরা ভয়ানক আহত। দুটো দিন সময় দিন।

আমরাই ওদের নিয়ে যাবো।

দলপতি সে কথা বুঝলও না। কানও দিলনা। সৈন্যদের ইঙ্গিত করল টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে। সৈন্যরাও বিন্দু মাত্র করুণা দেখাল না আহত ভাইকিংদের প্রতি। টেনে হিঁচড়ে দু'জনকে কেবিনঘর থেকে বার করল। নিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলতে গিয়ে একজন ভাইকিং এর কাটা উরুতে বাঁধা ফেট্টিটা খুলে গেল। ও চিৎকার ক'রে উঠল। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ছুটল। দু'জনের আর্তনাদে অসহ্য যন্ত্রণার জন্য কান্নায় ভরে উঠল জাহাজের ডেক। সৈন্যরা সে সবে কান দিল না। ওদের দু'জনকে টেনে হিঁচড়ে জাহাজ ঘাটায় নামাল।

অন্য ভাইকিং বন্ধুরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। শাঙ্কো বলল -বিস্কো- এখন কী করবে?

— চলো— ওদের দু'জনকে একটা খুব জরুরী কথা বলতে হবে। কথাটা ব'লে বিস্কো ওদের আহত বন্ধু ও সৈন্যদের দলের দিকে ছুটল। শাঙ্কোও পেছনে পেছনে ছুটল। আহত দু'জন তখন যন্ত্রনাকাতর চিৎকার ক'রে চলেছে।

বিস্কো ছুটে ওদের কাছে এল। ওদের দেশীয় ভাষায় চিৎকার ক'রে বলল — সাবধান সৈন্যদের বিষ খাইয়ে মেরেছো— রাজার কাছে একথা কক্ষণো বলবে না। বলবে — লড়াই হ'য়েছে। কথাটা দু'তিনবার ব'লে বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। দলপতি বা পাহারাদার সৈন্যরা বিস্কোর কথা কিছুই বুঝল না। ওরা বন্দী দু'জনকে টেনে নিয়ে চলল। নিস্তব্ধ রাতে পথে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত শোনা গেল বন্দী দু'জনের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আর্তনাদ। বড় করুণ সেই পরিবেশ।

শাঙ্কো কাছে আসতে বিস্কো বলল-চলো- এক্ষুণি ফ্রান্সিসকে সব বলতে হবে। একমাত্র ফ্রান্সিসই রাজা ফ্রেডারিককে ব'লে ওদের প্রাণে বাঁচাতে পারে।

— কিন্তু এত রাতে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে? শাঙ্কো বলল।

— উপায় নেই। দেখা করতেই হবে। চলো—দুর্গে যাবো। বিস্কো হাঁটতে শুরু করল শাঙ্কোও সঙ্গে চলল।

জনশূণ্য অন্ধকার পথ দিয়ে ওরা দ্রুত হাঁটতে লাগল দুর্গের দিকে।

ওরা দু'জনে দুর্গের প্রধান দেউড়ির সামনে এল। লোহার বিরাট দরজা বন্ধ। লোহার মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

বিস্কো সৈন্যদের বলল— বিশেষ দরকারে এসেছি ভাই। আমাদের একটা অনুরোধ রাখো। দু'জন সৈন্য হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্কোর কথা কিছুই বুঝল না। তবু একজন গরাদের কাছে মুখ বাড়াল। বিস্কোর এতক্ষণে খেয়াল হ'ল ওরা তো ওর কোন কথাই বুঝবে না। বিস্কো এবার বার বার বলতে লাগল— সাভোনা-সাভোনা। সৈন্যটি বুঝল এরা সাভোনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সৈন্যটি আঙ্গুল তুলে আকাশ দেখিয়ে বোঝাতে চাইল অনেক রাত হ'য়ে গেছে। কিন্তু বিস্কো হাল ছাড়ল না। বার বার 'সাভোনা' 'সাভোনা' বলতে লাগল। সৈন্যটি বুঝল বিস্কোকে নিরস্ত করা যাবে না। সৈন্যটি মাথা ওঠানামা ক'রে সম্মতি জানাল। হাতের ইঙ্গিতে ওদের ওখানেই দাঁড়াতে বলল। তারপর পাথরের চত্বর পেরিয়ে চলল দুর্গের ঘরগুলোর দিকে।

অল্পক্ষণ পরেই সাভোনা এল। দরজার কাছে এসে মশালের আলোয় বিস্কোদের চিনতে

পারল। বলল-কী ব্যাপার? এত রাতে এসেছো?

— শিগগির ফ্রান্সিসকে আসতে বলুন। এরমধ্যে অনেক কান্ড ঘটে গেছে। বিস্কো বলল। সাভোনা আর কোন কথা বলল না। দুর্গের ঘরগুলোর দিকে চলে গেল।

একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়া প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। দরজার কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল-বিস্কো-কী হ'য়েছে? এ্যাঁ?

—সে অনেক কথা। সব বলছি-শোন। একটু থেমে বিস্কো ওদের দেশীয় ভাষায় আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা বলল।

সব কথা শেষ হ'তে মারিয়া ব'লে উঠল— কী সাংঘাতিক! হ্যারি বলল-তোমরা ভেক্তরকে বাধা দিতে পারলে না?

— যখন জানলাম তখন যা ঘটার ঘটে গেছে। বিস্কো বলল। ফ্রান্সিস ঘটনা শুনতে শুনতে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— ভেক্তর আর আমার বন্ধুরা এরকম নির্মম কাণ্ড ঘটাতে পারে— স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষ কতটা নিচে নামলে এরকম নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে। বিস্কো বলল- ভীষণ আহত বন্ধু দু'জনকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে—

— থামো— ফ্রান্সিস ধমকে উঠল— ঐ নৃশংস মানুষ দু'টোকে কি রাজা ফ্রেডরিকের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাবে?

— তবু-ওরা যে আমাদেরই বন্ধু। ওদের প্রাণে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? বিস্কো বলল।

—না। ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল। হ্যারি মারিয়া অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে থাকল।

— রাজা ফ্রেডারিককে তুমি যদি একবার অনুরোধ করো— বিস্কো বলল।

— বিস্কো-একটা কথা জেনো- এ ভাবে কাপুরুষের মত যারা মানুষকে হত্যা করে তাদের আমি বন্ধু ব'লে স্বীকার করিনা। আমি ম'রে গেলেও ওদের জন্য প্রাণভিক্ষা চাইবো না। ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওদেরই করতে দাও। ফ্রান্সিস থেমে থেমে কথাগুলো বলল। তারপর বলল— তোমরা যাও। আমি যা বললাম বন্ধুদের তা বুঝিয়ে ব'লো। কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে। মারিয়া বা হ্যারি কোন কথা বলল না। ওরা ভালো ক'রেই জানে ফ্রান্সিসকে কোনভাবেই সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে না।

ওরা ফিরে চলল নিজেদের ঘরে।

বিস্কো মৃদুস্বরে শাঙ্কোকে বলল— ফ্রান্সিস কতকগুলো নীতি মেনে চলে। কোন অবস্থাতেই ফ্রান্সিস ওর নীতিবিরোধী কাজ মেনে নেয়না। তাই বন্ধু হ'লেও ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।

দু'জনে মন্থরপায়ে জাহাজঘাটার দিকে চলল। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল ওরা কত ক্লান্ত।

জাহাজঘাটের কাছে এসে বিস্কো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল— কী হল বিস্কো?

বিস্কো বেশ চিন্তান্বিতস্বরে বলল — আহত বন্দী দু'জন তো আমাদেরই স্বদেশবাসী ভাই বন্ধু। জানিনা ওদের দু'জনকে কোথায় বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। ভীষণ আহত ওরা। এলাইমোর সৈন্যরা ওদের দু'জনকে নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এই টানা হ্যাঁচড়ায় ওদের শরীরের ক্ষত থেকে আরো রক্ত পড়েছে। দুর্বল হ'য়ে পড়েছে ওরা। ওদের চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা

হয়েছে কিনা তাও জানি না।

— ঠিকই বলেছো বিস্কো — শাঙ্কো বলল — তবু ওরা যেমন নিষ্ঠুর ভাবে এলাইমোর পাহারাদার সৈন্যদের বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে —এটাকে মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। ওদের এই ঘৃণ্য আচরণের জন্যে যে শাস্তি ওদের পাওয়া উচিৎ তাই পাক। আমরা কী করবো বলো?

— তবু — শাঙ্কো — ভেবে দেখ — আমরা যখন দেশে ফিরবো তখন ওদের বাবা মা তো জানতে চাইবে ওদের ছেলেদের কী হয়েছে?

— রাজা ফ্রেডারিক কি ওদের মুক্তি দেবে না? শাঙ্কো জানতে চাইল।

মাথা খারাপ-- বিস্কো বলল — রাজা ফ্রেডারিক যখন সব জানতে পারবে তখন ওদের প্রাণদণ্ড দেবেই। ফাঁসি ওদের হবেই। পারবে দেশে ফিরে ওদের পুত্র হারা বাবা মাকে সান্ত্বনা দিতে? কী ব'লে ওদের সান্ত্বনা দেবে?

— কী করবো বলো — যা সত্য তাই বলবো শাঙ্কো বলল।

বিস্কো জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল -- না শাঙ্কো তা হয় না। ওরা যাই করুক তবু ওরা আমাদের ভাইয়ের মত -- বন্ধুও। ওদের যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে।

— কিন্তু কী ক'রে? শাঙ্কো বলল -- দেখে এলে তো রাজার সৈন্যরা কীভাবে ম্যামিয়েস দুর্গ পাহারা দিচ্ছে। রাজা ও রাজপরিবারের অনেকে এখন ঐ দূর্গে আছে. তাই এত নিরাপত্তার কড়াকড়ি। পারবে ঐ কড়া পাহারার মধ্যে দিয়ে বন্ধুদের মুক্ত করতে?

— দেখি তো চেষ্টা ক'রে। বিস্কো বলল। তারপর ফিরে দাঁড়াল। বলল — চলো — ম্যামিয়েস দুর্গের মাঝে। শাঙ্কো বুঝল বিস্কোকে ফেরানো যাবে না। ও যদি সঙ্গে না যায় তাহ'লে বিস্কো একাই বন্ধুদের মুক্ত করতে যাবে। তা'তে একা বিস্কো বিপদে পড়বেই। অথচ এখন বিস্কোকে সেকথা বোঝানো যাবে না। বিস্কো শাঙ্কোর জন্য অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত ম্যামিয়েস দুর্গের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

শাঙ্কো ডাকল— বিস্কো— দাঁড়াও। বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল — তুমি যাবে, না যাবে না!

— যাবো। জাহাজ থেকে আমার তীর ধনুক নিয়ে আসছি। তুমি একটু দাঁড়াও। কথাটা বলে শাঙ্কো দৌড়ে চলল জাহাজ ঘাটের দিকে।

একটুপরেই শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এল দু'জনে চলল ম্যামিয়েস দুর্গের দিকে। দুর্গের প্রধান দেউড়ি দূর থেকে দেখল। দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনে। আর এগোলো না। দেউড়িতে দশ পনেরোজন পাহারাদার সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। দেউড়ির আশেপাশে সাত আটটা মশাল জ্বলছে। বেশ আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

দেউড়ির কাছে যাওয়া যাবে না। ওরা রাস্তার অন্যপাশে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। টানা পাথরের উঁচু দেয়ালের জায়গায় জায়গায় মশাল জ্বলছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইল। লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ পর পর তিনজন সৈন্য দেয়ালে গুঁজে রাখা মশালের তলা দিয়ে খোলা তরোয়াল হাতে দেয়ালের ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে পাহারা দিচ্ছে। যদি পাথরের উঁচু দেয়াল। ডিঙোতে হয় তাহলে ওরা যখন পাহারা দিতে দিতে দূরে চলে যাবে তখনই ডিঙোতে হবে ওরা ফিরে আসার আগেই কাজ সারতে হবে।

বিস্কো বেশ নজর দিয়ে দেয়ালটা দেখতে দেখতে ফিস্ ফিস্ করে বলল— শাঙ্কো লক্ষ্য

বিস্কো বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামলো।

করো— পাথরের দেয়ালের খোঁদলে খোঁদলে মশালগুলো বসানো আছে। আচ্ছা তীর মেরে মশালগুলো ফেলে দেওয়া যায় না? শাঙ্কো বেশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বুঝল যে তীর ছুঁড়ে ঠিক ঘা দিতে পারলে মশালগুলো খোঁদল থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু মশালগুলো ছিট্‌কে মাটিতে পড়লেও তো নিভবে না। ধূলোটে পথে পড়ে গিয়েও নিভে যাবে কিনা সেটাই সমস্যা। না নিভে যদি অল্প অল্পও জ্বলতে থাকে তাহলেও তো ওখান দিয়ে দেয়ালের কাছে যাওয়া যাবে না। দেয়ালও টপ্‌কে পার হওয়া যাবে না। শাঙ্কো ওদিকে তাকিয়ে এসব ভাবছে তখনই দেখল সেই তিনজন প্রহরী সৈন্য মশালগুলোর নিচে দিয়ে খোলা তরোয়াল হাতে আসছে। হঠাৎ দুটো মশালের নিচে দিয়ে আসার সময় একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কোর কানে খুব মৃদু শব্দ এল ছপ্। শাঙ্কো চম্‌কে বিস্কোর দিকে তাকাল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল— বিস্কো ঐ মশাল দুটোর নিচের মাটিতে জল কাদা জমেছে।

বিস্কো কথাটা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল তাহ'লে তো ওখানে মশালদুটো ফেলতে পারলে মশালের আগুন নিভে যাবে। অনেকটা জায়গা অন্ধকার হয়ে যাবে।

শাঙ্কো অন্ধকারে হেসে বলল— ঠিক তাই। ততক্ষণে পাহারাদাররা দূরে চলে গেছে। শাঙ্কো কাঁধে কোমরে ঝুলিয়ে রাখা ধনুকটা খুলে হাতে নিল। কাঁধের তীরের খাপ থেকে একটা তীর তুলে নিয়ে ধনুকে পরাল। ছিলা টেনে ধরে সামনের মশালটার দিকে নিশানা করল। তারপর তীর ছুঁড়ল। অন্ধকারে তীর ছুটল। কিন্তু মশালটার আগুনে লাগল না। খোঁদলটায় ঢুকে ছিটকে এসে নিচে পড়ে গেল।

বিস্কো চাপা গলায় বলল—শাঙ্কো — আবার তীর ছোঁড়ো নিশানা যেন নিখুঁত হয়। তীর নষ্ট করা চলবে না। শাঙ্কোর কেমন জেদ চেপে গেল। এবার একটু সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ল। তীরটা ছুটে গিয়ে জ্বলন্ত মশালের গায়ে বিঁধে গেল। মশালটা খোঁদল থেকে ছিটকে গিয়ে নিচের জলকাদার মধ্যে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। আবার তীর ছুঁড়ল। পরের জ্বলন্ত মশালটাও ছিটকে পড়ল নিচের জলকাদায়, সেটাও সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। দেয়ালের কাছে অনেকটা জায়গা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। বিস্কো খুশিতে শাঙ্কোর পিঠ চাপড়াল।

দু'জনে অন্ধকারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর বিস্কো মাথা ঝুঁকিয়ে অন্ধকারে এক ছুটে রাস্তাটা পেরিয়ে দেয়ালের ধারে চলে এল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অন্ধকারে ও শাঙ্কোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে শাঙ্কোও একইভাবে এক ছুটে দেয়ালের কাছে চলে এল। অন্ধকারে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দুজনেই অল্প অল্প হাঁপাতে লাগল। বিস্কো ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বেশ কিছুটা দূরে দুর্গের সদর দেউড়ির সামনে প্রহরী সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। অন্ধকারে এত দূরে ওদের দেখতেই পাবে না।

এবার বিস্কো খুব ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেয়ালের গায়ে কয়েকটা পাথরের খাঁজ দেখল। ছোট খোঁদলও আছে-বোধহয় মশাল রাখার জন্যে। বিস্কো প্রথম খাঁজটায় পা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে খাঁজে খাঁজে পা রেখে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল। একেবারে দেয়ালের মাথার কাছে মশাল রাখার খোঁদল। খোঁদলটায় পা রেগে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দেয়ালের মাথায় উঠে বসল। তারপর দেয়ালের ওপাশে আবার পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে দুর্গের পাথুরে চত্বরে নামল। নেমেই অন্ধকারে বসে পড়ল। শাঙ্কোও বিস্কোর মত পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠতে লাগল। দেয়ালের মাথার কাছে খোঁদলটায় পা রেখে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে পা টা পিছলে

গেল। একটা পাথরের বড় টুকরো খসে গিয়ে নিচে পড়ে গেল। জলে কাদায় পড়ে শব্দ হল থপ্। দেউড়ির একজন প্রহরীর কানে গেল শব্দটা। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হ'ল। দেয়ালে বুক চেপে অনড় দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরীটা অন্ধকারে এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কপালে গোল করে হাত রেখে মশালের আলো আড়াল করেও কিছুক্ষণ দেখল। কিন্তু অন্ধকারে যতটা দেখতে পেল তাতে কোনকিছুর নড়াচড়া দেখতে পেল না। নিশ্চিন্ত মনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল। শাঙ্কোও নিশ্চিন্ত হল। ও আবার সেই খোঁদলে পা রেখে শরীর ঝাঁকিয়ে দেয়াল ডিঙোল। দেয়ালের ওপাশে নেমেই বিস্কোর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

একটু পরে বিস্কো বলল— শাঙ্কো— দেখ— দুর্গের ঘরগুলোর জায়গায় জায়গায় মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় যা দেখছি তাতে বুঝতে পারছি ওগুলো থাকা শোয়ার ঘর। আমাদের আহত বন্ধু দু'জনকে এইসব ঘরে নিশ্চয়ই রাখা হয়নি। ওদের বন্দী করা হয়েছে। কাজেই নিশ্চয়ই রাখা হয়েছে কয়েদঘরে। এবার সেই কয়েদঘরটা খুঁজে বের করতে হবে। চলো রাত শেষ হবার আগেই ওদের মুক্ত করতে হবে। বিস্কো অন্ধকারে মাথা নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে দুর্গের ঘরগুলোর দিকে চলল। একই ভাবে পেছনে পেছনে শাঙ্কোও চলল। দুর্গের প্রথম ঘরটার কাছাকাছি এল। মশালের আলো যতদূর গেছে তার বাইরে এসে থামল। না এসব ঘর না। বাঁ দিকে ঘুরে আবার চলল। পরপর ঘরগুলো পার হতে লাগল। একটা বড় ঘরের সামনের সিঁড়িতে দেখল অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। প্রহরীর সংখ্যাও বেশি। তার মানে এখানে রাজা ফ্রেডারিক আছে। বিস্কোরা অন্ধকার পাথুরে চত্বর দিয়ে চলল। অন্দরমহল পার হল। তখনই দেখল পশ্চিম কোনায় দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা লম্বাটে পাথরের ঘর। ঘরটার সামনে দরজার দুপাশে মশাল জ্বলছে। কাছাকাছি আসতে দেখল ঘরটার দরজায় লোহার গরাদে একটা বড় তালা লাগানো দরজায়। দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে। বিস্কো ফিস্ ফিস্ করে বলল শাঙ্কো এটাই কয়েদঘর। আহত বন্ধুদুজনকে নিশ্চয়ই এখানে কয়েদ করা হয়েছে।

—কিন্তু ওদের মুক্ত করবে কী ভাবে? দেখছো না— দুজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। শাঙ্কো বলল। তারপর বলল— তবে যদি বলো তীর ছুঁড়ে মশাল দুটো ফেলে দিতে পারি।

— কোন লাভ নেই। ওখানে জল নেই। মশাল সহজে নিভবে না। উল্টে রাজার ঘরের পাহারাদারদের নজরে পড়বে। অন্য উপায় ভাবো। বিস্কো বলল।

— দু'টোকেই তীর মেরে জখম করতে পারি। শাঙ্কো বলল।

—কী লাভ তাতে। ওরা আহত হলেই চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করবে। তীরে আহত হয়েছে দেখলে ওরা বুঝে নেবে ধারে কাছে কোন শত্রু তীরন্দাজ আছে। সারা দুর্গএলাকা দল বেঁধে খুঁজে বেড়াবে। আমাদের তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। তারপর সৈন্যরা প্রহরীরা আরো সাবধান হয়ে যাবে। বন্ধুদের উদ্ধার করা তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বিস্কো বলল।

তারপর বলল— শোন পাহারাদার দু'জনকে কাবু করতে হবে। ওদের কোমরে ঝোলানো চাবি নিয়ে দরজা খুলে বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে। তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে পালাতে হবে।

— কিন্তু বন্ধুরা তো বেশ আহত— পারবে ওরা? শাঙ্কো বলল।

— পারতেই হবে। নইলে ওদের ফাঁসির হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ফ্রান্সিস চেষ্টা করলে হয়তো পারতো। কিন্তু ফ্রান্সিস এরকম নৃশংস কাজকে কক্ষনো সমর্থন করবে না। বিস্কো বলল। তারপর মাথা নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলল কয়েদ ঘরের দিকে। কয়েদ ঘরের

বারান্দায় প্রহরী দু'জন পাহারা দিচ্ছিল। অন্ধকার থেকে মাথা নিচু করে ছুটে এসে বারান্দায় উঠে বিস্কো আর শাঙ্কো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রহরী দুজনের ওপর। দুজন প্রহরী কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজনের মাথায় গুঁতো খেয়ে ওরা ছিট্‌কে বারান্দায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল। হাতের তরোয়ালও ছিটকে গেল। বিস্কো চিৎ হয়ে থাকা দু'জন প্রহরীর গলা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে দ্রুত বলল শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি খোল। মুখ বাঁধো। প্রহরী দুজন গোঙাতে লাগল। শাঙ্কো দ্রুত হাতে নিজের কোমরের ফেট্টিটা খুলল। একজন প্রহরীর মুখ চেপে পেঁচিয়ে বাঁধল। প্রহরীটা অস্পষ্ট স্বরে গোঙাতে লাগল। বিস্কোর কোমরের ফেট্টি খুলে শাঙ্কো অন্য প্রহরীটার মুখ চেপে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর দু'জনেই প্রহরীদের তরোয়াল দুটো তুলে নিল।

একজন প্রহরী উঠে দাঁড়াতে গেল। শাঙ্কো তার বুকে তরোয়ালের ধারালো ডগাটা চেপে ধরে বলল-- উঠতে গেলেই মরবে। মুখের বাঁধনেও হাত দেবে না। দুজন প্রহরীই ওদের দিকে চিত হয়ে শুয়ে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বিস্কো প্রহরীদের কোমরে গোঁজা চাবির থোকা খুঁজতে লাগল। সর্বনাশ। দুজনের কারো কোমরেই তো চাবির গোছা নেই। বিস্কো আর শাঙ্কো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যে প্রহরীর কোমরে চাবির গোছা থাকে সে গিয়েছিল অন্য প্রহরীদের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে সময় কাটাতে। সেই প্রহরী ঠিক তখনই বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে তো অবাক। বিস্কো শাঙ্কো তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন প্রহরী বারান্দায় পড়ে আছে। গোঙাচ্ছে। বিস্কো শাঙ্কো লাফিয়ে প্রহরীটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। তার আগেই প্রহরীটি তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে ছুটল রাজার ঘরের সামনের প্রহরীদের দিকে। চিৎকার করে বলতে লাগল শিগগির আয়- কয়েদঘরে ডাকাত পড়েছে।

-- পালাও -- বলেই বিস্কো বারান্দা থেকে লাফিয়ে পাথুরে চত্বরে নামল। শাঙ্কোও লাফিয়ে নামল। দুজনে প্রানপণে ছুটল পাথরের প্রাচীরের দিকে।

কিন্তু ততক্ষণে দুর্গের প্রহরীরা চিৎকার করতে করতে মশাল হাতে ছুটে আসতে শুরু করেছে। তখন প্রাচীরের পাথুরে দেয়াল মাত্র হাত পাঁচেক দূরে। বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কোও দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে শাঙ্কো বলল-- কী হল ?

-- অসম্ভব। দেয়ালের সবটা উঠতে পারবো না। সেই চেষ্টা করলে প্রহরীরা এলোপাথারি তরোয়াল চালাবে। আমরা ভীষণভাবে আহত হবো। বলা যায় না। আমাদের মেরেও ফেলতে পারে। তার চেয়ে লড়াই না করে ধরা দাও ? প্রাণে তো বাঁচবো। পরে দেখা যাবে। বিস্কোর কথা শেষ হবার আগেই প্রহরীরা বিস্কোদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওরা হাঁপাচ্ছে তখন। মশালের আলো পড়েছে বিস্কো আর শাঙ্কোর মুখে গায়ে। বিস্কো হাতের তরোয়ালটা পায়ের কাছে ফেলে দিল। পাথরের চত্বরে শাঙ্কোও তরোয়াল ফেলে দিল। শব্দ হল ঝনাৎ ঝনাৎ। দু'তিন জন প্রহরী এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞাসা করল-- তোমরা কারা ? কোত্থেকে এসেছো ? বিস্কোরা লো ল্যাতিন ভাষা বুঝল না। ওরা দুজনেই মাথা নাড়ল।

বিস্কো ও শাঙ্কোকে ঘিরে ধরা প্রহরীরা বুঝে উঠতে পারল না এরা কারা। দুজন প্রহরী ফ্রান্সিস হ্যারিকে গতকাল দেখেছিল। শুনেছিল ওরা ভাইকিং বিদেশী। বিস্কোদের পরনেও ফ্রান্সিসদের মত পোশাক। বুঝল এরাও ভাইকিং। ও বললংএরা ভাইকিং। বিদেশী। 'ভাইকিং' কথাটা শুনে বিস্কো আর শাঙ্কো দুজনেই মাথা ওঠানামা করে সমর্থন জানালো।

দু তিনজন প্রহরী তরোয়ালের ইঙ্গিতে কয়েদঘর দেখাল। তারপর ওদের সঙ্গে যেতে ইঙ্গি

তে জানাল। আগে আগে চলল বিস্কো আর শাঙ্কো। পেছনে প্রহরীর দল।

কয়েদঘরের বারান্দায় প্রহরী দুজন তখন উঠে বসেছে। কয়েদঘরের লোহার গরাদের দরজা খোলা হল। বিস্কো আর শাঙ্কোকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তখন পূবআকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই।

কয়েদঘরে ঢুকে মশালের আলোয় বিস্কো আহত বন্ধু দু'জনকে খুঁজতে লাগলো। ঘরে শুকনো ঘাস ছড়ানো বিছানামত। তাতে সাত আট জন বন্দী হয়ে বসে আছে। বাইরের চিৎকার চ্যাচামেচিতে ওদের ঘুম ভেঙে গেছে। বিস্কো দেখল একেবারে বাঁ কোনায় দু'জন বন্ধুই শুয়ে আছে। বিস্কো ছুটে ওদের কাছে গেল। পেছনে শাঙ্কোও ছুটে এল। আহত এক বন্ধু আস্তে আস্তে উঠে বসল। ডান হাত ধরল। অন্যজন উঠে বসতে পারল না। বিস্কোদের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্কো শাঙ্কো দু'জনে ওদের পাশে বসল। বন্ধুটি একটু আশ্চর্য হয়েই বলল তোমাদের বন্দী করা হল কেন? রাজার সৈন্যদের মেরে ফেলার জন্যে তোমরা তো দায়ী নও।

তখন বিস্কো কীভাবে ওদের মুক্ত করার জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সব বলল।

বন্ধুটির দু'চোখ জলে ভরে উঠল। মাথা নামিয়ে বলল তোমরা তাহলে সত্যিই আমাদের বন্ধুর মতই এখনও ভালোবাসো।

ভালোবাসি বই কি। সেই নৃশংস ঘটনার জন্যে দায়ী ভেক্তর। সেই তোমাদের ভুল বুঝিয়ে দলে টেনেছে। তোমরাও দেশে ফেরার আকুলতায় সব ভুলে গিয়ে ভেক্তর যা বলেছে তাই করেছো। তোমাদের কোন দোষ নেই। বিস্কো বলল। শুয়ে থাকা আহত বন্ধুটির দু'চোখও জলে ভিজে উঠল। ও চোখে হাত চাপা দিল।

বিস্কো আর শাঙ্কো বন্ধুদের পাশে ঘাসের বিছানায় বসল। শাঙ্কো কাঁধ থেকে ধনুক আর তূণীর খুলে পাশে রাখল। বিস্কো নিজেকে এত ক্লান্ত বোধ করছিল যে বসে থাকতে পারল না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর মাথায় তখন নানা চিন্তা। বন্ধুদের উদ্ধার করতে এসে এভাবে নিজেরাও বন্দী হয়েছে এই খবরটা ফ্রান্সিস পাবে নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস এতে ওদের ওপর রাগ করবে কি না কে জানে। আবার হয়তো ফ্রান্সিসরা এ খবর নাও পেতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে বিস্কোর একটু তন্দ্রা এল।

সকাল হ'ল। লোহার দরজা খুলে প্রহরীরা কয়েদঘরের বন্ধীদের জন্যে খাবার নিয়ে এল। গোল আধপোড়া রুটি আর নানা শাকশব্জির ঝোল। বিস্কোরা হাতমুখ ধুয়ে সকালের খাবার খেতে লাগল।

ওদিকে দুর্গরক্ষীরা সাভোনাকে সকালেই জানাল যে গত রাতে দুজন ভাইকিং দুর্গের মধ্যে ধরা পড়েছে. একটু বেলায় রাজা ফ্রেডারিকের কাছে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে। বিচার হবে। সাভোনা বেশ চিন্তায় পড়ল। বুঝে উঠতে পারল না ফ্রান্সিসকে এই খবরটা দেবে কি না। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কথাটা না জানালে পরে যদি ফ্রান্সিস জানতে পারে তবে সাভোনার ওপর বেশ মনঃক্ষুন্ন হবে। কাজেই ফ্রান্সিসকে সব জানানো উচিত। বলা যায় না। রাজা ফ্রেডারিকের বিচারে ঐ দুজনকেও হয়তো ফাঁসি কাঠে চড়ানো হবে।

সবে সকালের খাওয়া শেষ হয়েছে ফ্রান্সিসদের। তখনই সাভোনা ফ্রান্সিসদের গত রাতের ঘটনাটা আস্তে আস্তে বলল—। ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল। বুঝল বিস্কো আর শাঙ্কো গতরাতে ওদের সঙ্গে কথা বলে আর জাহাজে ফিরে যায় নি। আহত বন্ধু দুজনকে মুক্ত করতে প্রহরীদের

দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্গের মধ্যে কোন ভাবে ঢুকেছিল। হ্যারি আর মারিয়াও খবরটা শুনল। মোরাবিত ও সাভোনার কাছে সব শুনল। ওরা দুজনেই ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসরা এখন কী করবে? দেখল— ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে আছে। খুব চিন্তায় পড়ল ফ্রান্সিস। বিস্কো শাঙ্কো দুজনেই নির্দোষ। বন্ধু দুজনকে বাঁচাতেই ওরা দুর্গের মধ্যে কোনভাবে ঢুকেছিল। কিন্তু রাজা ফ্রেডারিক কি সেটা মানবেন? হয়তো ওদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন। ওদের বেত মারার অথবা ফাঁসি দেওয়ার হুকুমও দিতে পারেন।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে সাভোনাকে বলল— আপনি খোঁজ নিয়ে জানুন তো বন্দীদের কখন রাজা ফ্রেডারিকের সম্মুখে হাজির করা হবে। সাভোনা বিছানা ছেড়ে উঠল। বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল— ফ্রান্সিস - বন্দীদের আর অল্পক্ষণ পরেই মন্ত্রনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে। রাজা আর অমাত্যরা কয়েকজন ওখানে বসেই বিচার করবেন।

তাহলে চলুন না। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি, মারিয়া, মোরাবিতও উঠল। সাভোনা আগে আগে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা।

মন্ত্রনা কক্ষের সিঁড়ির কাছে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। সাভোনা এগিয়ে গেল প্রহরীদের দিকে বলল— মন্ত্রনাকক্ষে কয়েকজন বন্দীর বিচার হবে। আমরা যাবো।

প্রহরীরা মাথা নাড়ল। কারো যাবার হুকুম নেই।

সাভোনা ফিরে এসে ফ্রান্সিসদের বলল সে কথা। ফ্রান্সিসরা হতাশ হল। বন্ধুদের মুক্ত করার জন্যে একবার অন্তত চেষ্টা করা যেত। কিন্তু বিচারের সময় উপস্থিত থাকতে না পারলে কিছুই করা যাবে না। আহত বন্ধু দুজনের ফাঁসি তো হবেই বিস্কো শাঙ্কোকেও কয়েদঘরে আটকে রাখা হবে। কতদিন কে জানে। বিস্কো শাঙ্কো কোন অপরাধ করেনি তবু রাজা ফ্রেডারিক বা সেনাপতি এলাইমোর অনুমতি ছাড়া ওরা গোপনে দুর্গের মধ্যে ঢুকেছিল। বন্দী বন্ধুদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। এই অপরাধে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবেই। ফ্রান্সিস সাভোনাকে এই আশঙ্কার কথা বলল।

সাভোনা মাথা ওঠানামা করে বলল— এটা হতে পারে। রাজা ফ্রেডারিক সহজে ওদের মুক্তি দেবে না।

ফ্রান্সিস বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। সাভোনা নিজেই রাজবিদ্রোহী। কাজেই সেও এব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে না। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই দেখা গেল। একদল প্রহরী সৈন্য বিস্কো শাঙ্কো আর আহত দুজন ভাইকিংকে নিয়ে আসছে। সকলের সামনে আসছে সেনাপতি এলাইমো।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল— হ্যারি এলাইমোকে বুঝিয়ে বলো। একমাত্র এলাইমোই রাজা ফ্রেডারিককে বলে আমাদের মন্ত্রনাকক্ষে নিয়ে যেতে পারে।

বন্দীদের নিয়ে এলাইমো ততক্ষণে সিঁড়ির কাছে এসেছে. হ্যারি এগিয়ে গেল। বলল— মাননীয় সেনাপতি— আমাদের কিছু বলার ছিল। এলাইমো দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনাপতি— ঐ বন্দী চারজনই আমাদের বন্ধু স্বজাতি। রাজা ফ্রেডারিক বিচারে ওদের যা শাস্তি দেবেন তাই আমরা মাথা পেতে মেনে নেব। কিন্তু বিচারের সময় শুধু ওদের কথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট না ও হতে পারেন। সেই জন্যে বলছি যদি বিচারের সময় রাজা ফ্রেডারিক মন্ত্রণাকক্ষে আমাদের উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেন তাহলে আমরা ওদের স্বপক্ষের বক্তব্য রাজা ফ্রেডারিককে বুঝিয়ে বলতে পারবো।

এলাইমো ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হ্যারিকে বলল ঐ সাভোনা আর মোরাবিতের জন্যে আমি বলবো না। তবে বন্ধু হিসেবে আপনাদের কথা বলবো। যদি মহামান্য রাজা অনুমতি দেন তাহলে আপনাদের নিয়ে যাবো।

এলাইমো সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্ত্রনাকক্ষের দিকে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। চার বন্দী বন্ধুই ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। আহত বন্ধু দুজনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বেশি আহত বন্ধুটি ব্যথা যন্ত্রনায় গোঙাচ্ছে তখন।

অন্য বন্ধুটি কাঁদকাঁদ স্বরে বলল—ফ্রান্সিস-তুমি বিশ্বাস করো পাহারাদারদের খাবারে বিষ দেওয়া হয়েছিল এটা অন্ততঃ আমরা দুজন জানতাম না। ভেক্তর আগে আমাদের কিছুছু বলেনি। তবে রাজার সৈন্যদের সঙ্গে আমরা লড়াই করেছি ভেক্তরের নির্দেশে। তা ছাড়া ভেবেছিলাম লড়াইয়ে জিততে পারলে দেশে ফিরে যেতে পারবো। একটু থেমে বলল ফ্রান্সিস একমাত্র তুমিই আমাদের বাঁচাতে পারো। ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বন্ধুর কথাগুলো শুনে গেল। আহত বন্ধুটি মুখে হাতচাপা দিয়ে কেঁদে উঠল।

ফ্রান্সিস এবার মুখ তুলে বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল — তোমরা কেন ওদের মুক্ত করতে গেলে? কেন এভাবে বিপদ ডেকে আনলে?

বিস্কো একটু মনঃক্ষুন্নস্বরে বলল— কী করবো— তুমি ওদের ওপর এত রেগে গেলে যে-

বিস্কো— ওদের কাছে সব জেনে সময়মত ওদের মুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতামই। তার আগেই তোমরা মাথা গরম করে ভবিষ্যতে কী হতে পারে এসব না ভেবেই বোকার মত জীবনের ঝুঁকি নিলে। ফ্রান্সিস বলল।

— ফ্রান্সিস তুমি এটাকে বোকামি বলছো? বিস্কো বেশ বিরক্তির সুরেই বলল।

— হ্যাঁ — বোকামিই করেছো — ফ্রান্সিস বলল — দুজন বন্ধুই আহত। একজনের উরু এতটা জখম যে চেয়ে দেখো ও ভালো করে দাঁড়াতেও পারছে না। পারবে এই আহত বন্ধুদের নিয়ে পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে?

— চেষ্টা তো করতাম। বিস্কো বলল।

— বেশ। ধরে নিলাম পালাতে পারতে। ওদের সঙ্গে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিতে? ফ্রান্সিস বলল।

— কেন? আমাদের জাহাজে? বিস্কো বলল।

—আর এক বোকামির কাজ ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল— তখন এলাইমো আমাদের জাহাজ তল্লাশী করতোই। তোমরা ধরা পড়ে যেতে। তখন ক্রুদ্ধ রাজা ফ্রেডারিক আমাদের সবাইকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখতো আর সবচেয়ে মারাত্মক যে কাজ করতো সেটা হল আমাদের জাহাজের খোলা ভেঙে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতো। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল তখন বন্দীদশা মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকতো না। ধরো যদি কয়েদঘর থেকে পালাতেও পারতাম জাহাজের অভাবে আমরা এই সিসিলির বাইরে যেতে পারতাম না। আবার আমরা ধরা পড়তাম। আবার কয়েদঘরে বন্দীদশা ভোগ করতে হতো।

বিস্কো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ফ্রান্সিস আমি এতসব ভাবি নি। তুমি আমাকে মাফ করো। আজকে বুঝলাম—আমাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কেন। ফ্রান্সিস তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। হ্যারি মারিয়াও অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে এত চিন্তা ভাবনা থাকে ওরা বেশ আশ্চর্য হল।

এলাইমো তখনই মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হ্যারিকে বলল— রাজা ফ্রেডারিক অনুমতি দিয়েছেন। আপনারা মন্ত্রনাকক্ষে যেতে পারেন। তবে রাজা ফ্রেডারিক অনুমতি না দিলে আপনারা কোন কথা বলতে পারবেন না।

এলাইমোর কথাটা ফ্রান্সিসকে বলে হ্যারি বলল — তবে আর আমাদের মন্ত্রনাকক্ষে গিয়ে কী হবে।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল— এটা একটা সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। রাজা ফ্রেডারিক যখন বিচারের সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছেন তখন কিছু বলারও অনুমতি আমাদের দেবেন। চলোনা। দেখা যাক।

এলাইমোর নির্দেশে প্রহরীরা ততক্ষণে বন্দীদের মন্ত্রনাকক্ষে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফ্রান্সিসরাও তারপরেই ঢুকল।

মন্ত্রনাকক্ষের ভেতরটা একটু অন্ধকারমত। পাথরের দেয়ালে আটকানো জ্বলন্ত মশালের আলোয় মোটামুটি সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা লম্বাটে শ্বেতপাথরের বড় টেবিল। তার ওপাশে রাজা ফ্রেডারিক বসে আছেন। দুপাশে তাঁর দুজন অমাত্য। রাজা ফ্রেডারিক মাথায় মীনেকরা মুকুট। গায়ে অবশ্য রাজবেশ নয়। হালকা সবুজ রঙের সাটিনের চাদর জড়ানো। পেশীবহুল হাত কাঁধ উন্মুক্ত। অমাত্যদের পরনেও একই পোশাক। শুধু সাটিনের কাপড়ের রং আলাদা।

টেবিলের এপাশে বন্দীদের দাঁড় করানো হল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া ঘরের আর একপাশে পাথরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

এলাইমো রাজাকে সম্মান জানিয়ে বন্দীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে তার বিবরণ দিতে লাগল। হ্যারি মৃদুস্বরে এলাইমোর কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলে দিতে লাগল। এলাইমো বলল মহামান্য রাজা—এরা সবাই জাতিতে ভাইকিং। আপনার আদেশে বন্দরে আমাদের দুটো জাহাজ ওদের জাহাজ পাহারায় ছিল। আমাদের আট জন সৈন্যও ওদের জাহাজে পাহারাদার হিসেবে ছিল। ঝড়ের সুযোগে আমাদের প্রহরীদের লড়াই করে হারিয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। লিপারি দ্বীপের কাছে ওদের জাহাজ আটকানো হয়। আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে ওদের লড়াই হয়। দুপক্ষের অনেকেই মারা যায় নয় তো আহত হয়। এই আহত দুজন ভাইকিং সেই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল। অন্য দুজন গতরাতে আহত বন্দী বন্ধুদের মুক্ত করতে ওরা সকলের অলক্ষে দুর্গে ঢুকেছিল। ধরা পড়েছিল। ওদের দুজনকেও এখানে হাজির করা হয়েছে। এই দুজন কি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল? রাজা ফ্রেডারিক বললেন।

— না — ওরা সেই লড়াইয়ে নামেনি। এলাইমো বলল।

— ঠিক আছে। আহত দুজন এগিয়ে এসো। রাজা ফ্রেডারিক বললেন। ওরা দুজন টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তখনই ফ্রান্সিস বলল মহামান্য রাজা — যদি আমাকে দুএকটা কথা বলতে অনুমতি দেন তবে বাধিত হবো।

রাজা ফ্রেডারিক ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। বললেন — তোমরাই তো কাউন্ট রজারের

রাজার সামনে ফ্রান্সিস।

গুপ্তধন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক আছে। বলো তোমার কী বলার আছে। রাজা বললেন

— মহামান্য রাজা সেনাপতি এলাইমো যে লড়াইয়ের কথা বললেন এবং যে লড়াইয়ে আমাদের এই দুই বন্ধু আহত হয়েছিল সেই লড়াই হয়েছিল অনেক পরে। আপনার প্রহরী সৈন্যদের মৃত্যু হয়েছে লড়াই করতে গিয়ে না। ফ্রান্সিস বলল

— তবে? রাজা বেশ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—বিষ প্রয়োগ করে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল,

— বলো কি? রাজা ফ্রেডারিক চম্‌কে উঠে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

মারিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল — ফ্রান্সিস তুমি একথা বলে দিলে কেন?

ফ্রান্সিস হাতটা একটু তুলে মারিয়াকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। হ্যারি কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। বুঝল না — যে মর্মান্তিক ঘটনাটা রাজা ফ্রেডারিক সেনাপতি এলাইমো বা অন্য কেউ জানে না সেটা ফ্রান্সিস বলতে গেল কেন।

রাজা ফ্রেডারিক অমাত্য দুজনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বললেন। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন-কে কীভাবে তাদের বিষ খাইয়ে মারল?

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—আমাদের এক বন্ধু ভেক্তর আমাদের জাহাজে কিছু বন্ধুদের নিয়ে দল পাকিয়েছিল। তাদের বুঝিয়েছিল আমি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো না। তবে কেন ওরা এই বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকবে? ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল মহামান্য রাজা — আমরা জাহাজে জাহাজে দূর দূর দেশে দ্বীপে ঘুরে সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মাটির প্রতি টান বিশেষ করে স্বদেশে ফেরার টান অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই ভেক্তর এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় এবং আমাদের কিছু বন্ধুকে ভুল বোঝায়। ফ্রান্সিস থামল।

— এখন ভেক্তর কোথায় আছে? রাজা ফ্রেডারিক জানতে চাইলেন।

— ভেক্তর লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে। তার দলের বন্ধুরা কেউ মারা গেছে কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাদেরই আহত দুজন আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

— হুঁ। বলো কী বলছিলে। রাজা ফ্রেডারিক বললেন।

— আপনার যে প্রহরী সৈন্যরা আমাদের জাহাজে থেকে পাহারা দিচ্ছিল ভেক্তর তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে মাত্র দুজন বন্ধুকে নিয়ে। তারা কেউ আর বেঁচে নেই। আপনার প্রহরী সৈন্যদের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ভেক্তর আর দুজন বন্ধু তাদের হত্যা করে। এই নির্মমতা ক্ষমার অযোগ্য। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক। রাজা ফ্রেডারিক মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন।

— এইবার মহামান্য রাজা আপনার সুবিচারের জন্যে কয়েকটা কথা বলছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল আপনি দেখলেন আমি যদি না বলে দিতাম তাহলে আপনারা কেউই জানতে পারতেন না আপনার আটজন প্রহরী সৈন্যের কী ভাবে মৃত্যু হয়েছিল। আমি অনায়াসে সেই সত্য গোপন করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। তাহলেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—

আমি যা সত্য তা বলি এবং স্বীকার করি। কোন অবস্থাতেই সত্য আমি গোপন করি না। ফ্রান্সিস থামল। রাজা ফ্রেডারিক পাশের অমাত্যদের ফ্রান্সিসের কথাগুলি লো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বললেন। অমাত্যরা ফ্রান্সিসদের স্পেনীয় ভাষা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর সব শুনে রাজাকে মৃদুস্বরে কিছু বললেন।

রাজা সব শুনে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন — বেশ — আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলাম।

তাহ'লে এবার আমি আর একটি সত্য কথা বলছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর আঙুল তুলে আহত দুই ভাইকিং বন্ধুকে দেখিয়ে বলল — এই বন্ধু দু'জনও ভেক্তরের চাতুরীতে ভুল বুঝে ঐ দলে ভিড়েছিল এবং ভেক্তরের নির্দেশে আপনার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। আহত হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রহরী সৈন্যদের যে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হবে এ কথা ভেক্তর ওদের কখনো বলে নি। ওরা সে কথা অন্য কোন ভাবে জানতেও পারেনি। কাজেই আমার বিনীত আবেদন এই নিরপরাধ দুই বন্ধুকে আপনি মুক্তি দিন। এমনিতে আহত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ওরা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছে। ফ্রান্সিস থামল।

রাজা ফ্রেডারিক আবার মৃদুস্বরে অমাত্যদের সঙ্গে সব জানিয়ে পরামর্শ করলেন। তারপর সেনাপতি এলাইমোর দিকে তাকিয়ে বললেন — এলাইমো — আপনি কী বলেন?

এলাইমো একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল — মহামান্য রাজা — একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ইনি সত্যবাদী। এই দুজন আহত ভাইকিং আমাদের প্রহরীদের মৃত্যুর ষড়যন্ত্রে অংশ নেয় নি — ইনি সে কথা বলেছেন এবং আমাদের এক্ষেত্রেও তাঁর কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিৎ। এলাইমোর কথাগুলি হ্যারি ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক আবার অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন — দেখ — এই আহত দু'জন ভাইকিং আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেছে। আমাদের সৈন্যদের হত্যা করেছে না তো আহত করেছে। কাজেই শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল — হ্যারি— শাস্তি মকুব করা যাবে না। বলো কী করবে।

হ্যারি মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল — মহামান্য রাজা এই দুইজন আমাদের বন্ধু স্বদেশবাসী ভাইয়ের মত। তবু ওদের শাস্তি দিন এটাই আমরা চাই। যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন তাহলে কেমন শাস্তি দেবেন সেটা বলি।

— বলো। রাজা বললেন।

—ওদের চারজনকেই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখুন। আহত দু'জনের কোনরকম চিকিৎসা হবে না। যদি বিনা চিকিৎসায় ওরা সুস্থ হয় তো হবে। নইলে ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। হ্যারি বলল।

— বেশ। কিন্তু তোমরা তো ওদের মুক্তি চাইছো। রাজা বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল — মান্যবর রাজা — যখন আমরা কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো তখন ওদের মুক্তি দেবেন — আমার এই নিবেদন।

হ্যারি নিচুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস-ভীষণ ঝুঁকি নিচ্ছো।

এ ছাড়া কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিস মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক আবার অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর বললেন — বেশ

তোমাদের অনুরোধই মেনে নেওয়া হ'ল। যতদিন তোমরা কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে না পারছো ততদিন এই চারজন কয়েদঘরে বন্দী থাকবে।

মারিয়া [illegible] মান্য রাজা — আমার একটা নিবেদন আছে। রাজা মারিয়ার দিকে তাকালেন। বললেন

— বেশ বলো।

— এমনিতেই দুজন আহত বন্ধুর কোন চিকিৎসা হবে না। অনেক কষ্ট বেদনা ওদের সহ্য করতে হবে। কাজেই অনুরোধ কয়েদঘরের কষ্ট থেকে ওদের রেহাই দিন। মারিয়া বলল।

— কী ভাবে? রাজা বললেন।

— ওরা সবাই আমাদের জাহাজে থাকুক। প্রয়োজন আপনি ওদের জন্যে প্রহরী রাখুন। ফ্রান্সিস হ্যারি আর আমি তো এখানে আপনার দুর্গেই থাকবো। ওরা আমাদের ফেলে রেখে তো পালিয়ে যেতে পারবেনা।

রাজা ফ্রেডারিক অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন — বেশ। তবে প্রহরী থাকবে তোমাদের জাহাজে।

মারিয়া হেসে বলল—মহামান্য রাজার জয় হোক। বিচার শেষ হল।

ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে এল এলাইমো। তারপর আহত বন্ধুটিকে ধরাধরি করে বিস্কো ওরা বেরিয়ে এল। আহত বন্ধুটি তখনও দাঁত চেপে ব্যথা কষ্ট সহ্য করছে।বন্ধুটি বলল—ফ্রান্সিস—কী ব'লে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না। তুমি ফাঁসির হাত থেকে আমাদের বাঁচালে। তারপর আমাদের ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। ফ্রান্সিস বন্ধুটির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিল।

পাঁচ জন প্রহরীর পাহারায় বিস্কো ওরা জাহাজঘাটার দিকে চলল। ওরা এই ভেবে আশ্বস্ত হল যে কয়েদঘরের বদ্ধ ঘরে ওদের বন্দীজীবন কাটাতে হবে না। বন্ধুদের মধ্যে ওদের নিজেদের জাহাজেই — বন্দী থাকতে হবে। বন্ধুদের মুখ তো দেখতে পাবো। নীল আকাশ সমুদ্র উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখতে পাবো।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—এতবড় ঝুঁকি নিলে কেন?

—কী করবো। ওদের প্রাণে বাঁচাতে এছাড়া অন্য পথ ছিল না। একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ্রান্সিস বলল — হ্যারি মারিয়া — এবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের হদিশ বার করতেই হবে। একটু থেমে ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল — শুধু একটা ক্ষীণ সূত্র চাই। কাউন্ট রজার নিশ্চয়ই কোন সূত্র রেখে গেছেন। সেটা যেখানে যেভাবে থাকুক তার হদিশ বার করতেই হবে।

•

পরদিন দুপুরেই ফ্রান্সিসদের জন্যে রাজবাড়ির একটা চার ঘোড়ার গাড়ি আনা হলো। গাড়িটা পুরোনা হলেও দেখতে সুন্দর। ফ্রান্সিসরা উঠল গাড়িটায়। গাড়িদুর্গ থেকে বেরিয়ে ছুটল কাতানিয়ার দিকে। বিকেলের মধ্যেই ওরা কাতানিয়া পৌঁছল. এটাও একটা বন্দর শহর। তবে সিরাকসের মতো অত জমজমাট নয়। সাভোনার নির্দেশে গাড়ি একটা বিরাট গীর্জার সামনে এসে থামল। গীর্জার মাথায় নানা কারুকাজ করা।

গীর্জার বড় দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সাভোনা বলল, এই গীর্জাটাও কাউন্ট রজার তৈরি

করেছিলেন। তবে এটা সর্বসাধারণের জন্যে। ভেতরে সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীস্টের বড় মূর্তি। দেওয়ালে যীশুর জীবনবিষয়ক ছবি। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল এই গীর্জার মেঝেতেও মোজেকের নানা রঙদার কাজ। এসব দেখতে দেখতে একটা কথা হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, দুটো গীর্জাই কাউন্ট রজার তৈরি করিয়েছিলেন। ওপরের কাঠামো জীর্ণ হয়েছিল বলে রাজা ফ্রেডারিক ওপরের কাঠামো সংস্কার করিয়েছিলেন। কিন্তু মেঝে ভাঙা হয়নি। সংস্কারও করা হয়নি। কাজেই অক্ষত মেঝেটাই কাউন্ট রজারের নির্দেশে তৈরি। কাজেই মেঝেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার ফ্রান্সিস খুব খুঁটিয়ে মেঝের রঙিন মোজেকের নকশাগুলো দেখতে লাগল। তবে ওর তো ছবি-আঁকিয়ের চোখ নয়। নকশাগুলোর ফুল-পাতা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ও মারিয়াকে বলল, মারিয়া, তুমি তো সেলাই করো, ছবি, নকশা বোঝ— এই মেঝের নকশাটা লক্ষ্য করো তো। ম্যামিয়েস দুর্গের গীর্জার মেঝেতেও নকশা দেখেছিলাম। দুটো নকশাই কি একরকম? মারিয়া কিছুক্ষণ মেঝের নকশার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মনে হচ্ছে একই রকম নয়, হবে ম্যামিয়েশের গীর্জাটা ছোট। নকশাগুলোও ছোট। এটা বড় কারণ মেঝেটাও বড়।

— হুঁ। তুমি ভালো করে নকশাগুলো দেখ। পরে ম্যামিয়েসের গীর্জার মেঝের সঙ্গে মেলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

— ঠিক আছে। মারিয়া বলল। তারপর মেঝেটায় ঘুরে ঘুরে সব নকশা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

গীর্জার শান্ত পরিবেশ থেকে সবাই বেরিয়ে এল। সাভোনা বলল, এরকম অনেক গীর্জা বাড়িঘরে বিচিত্র স্থাপত্যরীতি দেখা যায়। রোমীয় বাইজেণ্টাইন আরবীয় আবার সিসিলির নিজস্ব রীতি সব মিলেমিশে একাকার।

হ্যারি বলল, এই অঞ্চলে মিশ্রণটা বেশী হয়েছে। ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল না। ও ডুবেছিল নিজের চিন্তায়।

মারিয়া বলে উঠল, সিসিলি এলাম অথচ এটনা আগ্নেয়গিরি দেখবো না?

সাভোনা হেসে বলল, উত্তরে তাত্তরমিয়ার দিকে কিছুটা গেলেই এটনা আগ্নেয়গিরি ভালোভাবে দেখা যাবে।

তাই চলুন। মারিয়া খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। দেখল, ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় মগ্ন। হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস, এটনা দেখতে যাবে?

ফ্রান্সিস অন্যমনস্ক, ভঙ্গিতে হাসল। বলল, চলো। মারিয়া ... তে চাইছে।

গাড়ি চলল উত্তরে তাত্তরমিয়ার দিকে। পথে দেখা ... একই দৃশ্য। গাধা খচ্চরের পিঠে গমের বস্তা চাপিয়ে চাষীরা চলেছে। গাধা খচ্চরের গলায় বাঁধা ঘন্টার শব্দে চারিদিক ভরে উঠেছে। পথের দুপাশে সিট্রাস গাছ। গমের ক্ষেত, নানা শাকসবজির চাষের জমি। কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে সাভোনা বলে উঠল, ঐ যে এটনা আগ্নেয়গিরি। গাড়ি থামল। সবাই নেমে একটা ছোট্ট টিলায় উঠল। দেখা গেল এটনা আগ্নেয়গিরি বিকেলের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টা ছাই রঙের। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকের শান্ত পরিবেশের মধ্যে এটনার ভাবগম্ভীর রূপ দেখে ফ্রান্সিসরা অভিভূত হলো। এখন শান্ত এটনা। অতীতে কতবার

আগুন ছাই লাভা ধোঁয়া উদগীরণ করেছে! ভূমিকম্প ঘটিয়েছে। না জানি কত ঘরবাড়ি ভেঙেছে। কত মানুষ গৃহহীন হয়েছে। মারাও গেছে কত।

এবার ফেরার পালা। কাতানিয়া নগরে ওরা সন্ধ্যের আগেই ফিরে এল। সাভোনা বলল, ফ্রান্সিস এখন কোথায় যাবে?

- যে বাড়িতে কাউন্ট রজার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

সাভোনার নির্দেশমতো গাড়ি চলল। নগরে মানুষজনের ব্যস্ততা। অনেকেই ফ্রান্সিসদের বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখল। ভিনদেশিগুলো রাজবাড়ির গাড়িতে যাচ্ছে। কারা এরা?

বিরাট একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল। সবাই গাড়ি থেকে নামল। বাড়িটার সদর দরজা হাট করে খোলা। ঢুকল সবাই। বড় চত্বরটায় অশ্বশালা। অনেক ঘোড়া বাঁধা। কিছু লোক ঘোড়াগুলোর তদারকিতে ব্যস্ত। অন্যপাশে অনেক মাছধরা জাল শুকোচ্ছে। কয়েকজন বসে জাল বুনছে। ওদিকের ঘরগুলোতে অনেক পরিবারের বাসা। সাভোনা বলল, এখানে সৈন্যদের অশ্বশালা হয়েছে। ওদিকে জেলেদের বসতি। কাউন্ট রজারই নাকি ওদের এখানে বাস করার অধিকার দিয়েছিলেন। এরা পুরুষানুক্রমে সমুদ্রে মাছ ধরে।

দক্ষিণ কোনার দিকে সাভোনা চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। কোনায় পাথর দিয়ে তৈরি বেশ বড় একটা ঘর। ঘরটার সামনে জেলেদের পোশার-পরা একটি লোক বসে আছে। সাভোনা লোকটার সঙ্গে কথা বলল। লোকটি উঠে গিয়ে ঘরটার তালা খুলতে লাগল। সাভোনা বলল, কাউন্ট রজারের স্মৃতিবিজড়িত এই ঘরটা এখানকার জেলেরাই দেখাশুনো করে।

তালা খোলা হলো। ঘরটায় ঢুকল সবাই। একটু অন্ধকারমতো ঘরটা। তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনো আসবাবপত্র নেই। শুধু কোনায় রাখা রয়েছে একটা খাপে ঢাকা তরোয়াল, লোহার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। সাভোনা বলল, এই সবই নাকি কাউন্ট রজারের। ঘরটার মেঝেয় সুন্দর মোজেকের কাজ করা। ফ্রান্সিস মেঝের মোজেকের কাজ দেখতে দেখতে বলল, মারিয়া, আগের গীর্জা দুটোয় যে নকশা দেখেছিলে এগুলোও কি তেমনি, মানে একই নকশা?

মারিয়া দেখতে দেখতে বলল, না। আগের দুটোয় লতাপাতা বেশি ছিল। এটায় ফুলের সংখ্যা বেশি।

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সাভোনা হেসে উঠে বলল, এখানেও গান? ফ্রান্সিস বলে উঠল, কী ব্যাপার সাভোনা? সাভোনা বলল, তোমাদের বলেছিলাম না কাউন্ট রজার শেষ বয়েসে খুব খ্রীস্টভক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি কিছু ভক্তিগীতি লিখেছিলেন। সেই ভক্তিগীতিরই একটা এখানে ফুল লতাপাতা দিয়ে মোজেকের কাজের মধ্যে দিয়ে লিখিয়েছেন। অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলাম। তখন লক্ষ্য করিনি। আজকে দেখছি একটা গান লেখা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই চমকে উঠল। ফ্রান্সিস বলল, পড়ে বলুন তো গানটা কী?

সাভোনা মেঝের দিকে তাকিয়ে পড়ে পড়ে বলে গেল -

কোথাও নাই শান্তি
যীশুর চরণে ক্ষান্তি
সব দুঃখ সব ভ্রান্তি।

হৃদয়ে রাখো ভক্তি।

ফ্রান্সিস মন দিয়ে শুনল সবটা। হ্যারি বলল, আমি লো ল্যাতিন ভাষা শুনলে বুঝি বলতেই কিছু পারি। কিন্তু অক্ষর খুব ভালো চিনি না। ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, আপনি এই গান লেখা দেখে হাসলেন কেন?

- আরে, এইরকম মেঝের মোজেকের কাজের মধ্যে কাউন্ট রজার গান লিখিয়েছেন আগের দুটো গীর্জার মেঝেতেও। আমি জানতাম গীর্জার মেঝেতেই লিখিয়েছেন। এখন দেখছি এখানেও লিখিয়েছেন।

ফ্রান্সিস বলে উঠল, ঐ গান দুটো আপনার মনে আছে?

- কেন নয়? বহুদিন ধরে বড়দিন বা গুডফ্রাইডের উৎসবের দিনে ঐ গান দুটো গাওয়া হয় এই দক্ষিণ সিসিলিতে। শুনুন গান দুটো। বলে সাভোনা চোখ বুঁজে আস্তে আস্তে গাইতে লাগল -

লোভ হিংসায় কাতর
হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর
হৃদয় শ্বেত পাথর
যেমন যীশুর ঘর।

গান থামিয়ে সাভোনা বলল , এই গানটা লেখা আছে ম্যামিয়েস দুর্গের সেই ছোট গীর্জাটায়। ফ্রেডারিক ঐ জায়গায় দুর্গ নির্মাণের আগে ঐ গীর্জাটায় কিন্তু সব মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। সাভোনার গানের সুর বড় সুন্দর লাগল ফ্রান্সিসদের।

মারিয়া বলল, আর একটা গান করুন না।

সাভোনা হেসে বলল, এই গানটা লেখা আছে এই কাতানিয়ায় যে বিরাট গীর্জা দেখে এলাম তার মেঝেতে। বলে সাভোনা চোখ বুঁজে আস্তে আস্তে গাইল -

নীরবে সহ যন্ত্রণা
কর যীশুর বন্দনা
ভুলে যাও সব মন্ত্রণা
হৃদয়ে পাবে সান্ত্বনা।

গানের কথা এবং সুর ঘরটায় একটা সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া তন্ময় হয়ে গেল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথায় একটা চিন্তা বিদ্যুৎচ[illegible]া খেলে গেল-এই গানগুলোর মধ্যেই আছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের চাবিকাঠি। থাকতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনো সূত্র নেই।

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের মেঝের মোজেকের কাজগুলো দেখল। এখানেই লেখা আছে গানটা। কিন্তু গুপ্তধনের সঙ্গে এই গানের কী সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারল না। হতাশায় মাথা নেড়ে বলল,চলুন বড় গীর্জাটায় যাবো।

গাড়ি চলল। আবার বড় গীর্জাটায় ঢুকল সবাই। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দুজন ধর্মযাজক

মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছেন। গীর্জাঘর মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠল। সেই আলোয় মেঝের মোজেকের কারুকাজ বুঝতে অসুবিধা হলো না। ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা,এখানকার গানটি মুখে বলুন।

সাভোনা আস্তে আস্তে বলল,

নীরবে সহ যন্ত্র ণা
কর যীশুর বন্দনা
ভুলে যাও সব মন্ত্রণা
হৃদয়ে পাবে সান্ত্বনা

ফ্রান্সিস গানটা কয়েকবা র মুখে মুখে আওড়াল। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। এ তো ভক্তিগীতিই। এছাড়া কিছু নয়। তবে গানগুলির গুরুত্ব আছে এইজন্যে যে এগুলি কাউন্ট রজারের রচনা।

ম্যামিয়েস দুর্গে ফিরে আসতে একটু রাতই হলো। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস,কিছু হদিস করতে পারলে?

না। তবে এখানকার গীর্জাটা কালকে ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলল, আমার মনে হয় গানগুলোর মধ্যেই কোনো সূক্ষ ইঙ্গিত আছে।

হ্যারি বলল, আচ্ছা সাভোনা, কাউন্ট রজারের এরকম আরো গান আছে?

হ্যাঁ,আছে, তবে সেসবের এখন খুব বেশি চল নেই। গীর্জার মেঝেয় লেখা গানগুলোরই চল বেশি। প্রায় একশো বছর ধরে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

ফ্রান্সিস বলল, এই গানই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই গান দুটোই সকলে জানে। গীর্জার মেঝেতেও লেখা রয়েছে। ম্যামিয়েস দুর্গের গীর্জায় তো আগে সকলেই যেতে পারতো।

আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তখনও জেগে। নানা চিন্তা মাথায়। তার ওপর কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য ও জীবনটাই বাজি ধরেছে। ভাবতে ভাবতেই একসময় ওর দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

গভীর রাতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল। ঘরে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল হ্যারি শুয়ে চোখে দু হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারির গায়ে হাত রাখল। আস্তে ডাকল, হ্যারি। হ্যারির ফোঁপানি বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল, কী হয়েছে?

হ্যারি কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি এভাবে নিজের জীবনটাকে বাজি ধরলে? একবার কারো কথা ভাবলে না? তোমার বাবা, মারিয়া, আমরা - কারো কথা না?

ওদের কথাবার্তায় মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়া বলে উঠল, হ্যারি, কেঁদো না। তোমাকে কাঁদতে দেখলে ফ্রান্সিসের মন দুর্বল হয়ে পড়বে। দেখ আমি তো কাঁদছি না।

সাভোনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে সাভোনা আস্তে আস্তে বলল, সত্যি তোমাদের মধ্যে এমন ভালোবাসা কমই দেখা যায়। একটু থেমে বলল, মানুষকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, সাভোনা, কাউন্ট রজারের গানটা শোনান না!

এত রাত্রে গান? সাভোনা হেসে বলল।

করুন না। হ্যারি বলল। সাভোনা শুয়েই আস্তে আস্তে গাইতে লাগল -

লোভ হিংসায় কাতর
হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর
হৃদয় শ্বেতপাথর
যেমন যীশুর ঘর।

গান শেষ হলো। হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা সাভোনা, লক্ষ্য করেছেন আর দুটো গানের পঙতি চারটে। শুধু এই গানটা, মানে যেটা এখানকার গীর্জার মেঝেতে লেখা সেই গানটার কিন্তু পঙক্তি পাঁচটা।

সাভোনা একটু হিসেব করল। হেসে বলল, ঠিক বলেছো, আমি তো কোনেদিন খেয়াল করিনি।

ওদের মধ্যে আর কথাবার্তা হলো না। ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

মোরাবিত চুপ করে শুয়ে এতক্ষন সাভোনার গান শুনছিল। ওর মন একেই ভালো নেই। তার ওপর এই গানটা শুনে ওর মন আরো খারাপ হয়ে গেল। কত কাজ এখন। লিপারি দ্বীপে লড়াইয়ে হেরে গেছে ওরা। বেশ কয়েকজন বিদ্রোহী বন্ধু লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে। ও নিজেও রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সাভোনা ওকে জোর করে লড়াই থেকে নিরস্ত করেছিল। ভীষণভাবে আহত ওকে অনেক কষ্টে সাভোনা প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। মোরাবিত বার বার নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছে। বলেছে - সাভোনা বন্ধুদের এভাবে ফেলে রেখে আমি পালাবো না। সাভোনা বলেছে - মোরাবিত - তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। এই লড়াই আমরা হেরে গেছি। তুমি প্রাণ দিলেও এই লড়াই আমরা জিতবো না। কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে আবার আমরা বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে পারবো। আরো দেশবাসীকে একত্র করতে পারবো। সময় সুযোগ বুঝে আবার আমরা আরো শক্তি সংগ্রহ করে রাজা ফ্রেডারিককে বিদেশী নর্মানদের অত্যাচারী ভূস্বামীদের সিসিলি থেকে তাড়াতে পারবো। কিন্তু তুমি মরে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সাভোনা অনেক কষ্টে ওকে সমুদ্রতীরে নিয়ে আসতে পেরেছিল। তারপর নৌকোয় লুকিয়ে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু - দুর্ভাগ্য ধরা পড়তে হল।

মোরাবিত ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব সাতপাঁচ ভাবছিল। ওর ঘুম আসছিল না। ঘরের জ্বলন্ত মশালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মোরাবিত সিদ্ধান্ত নিল - পালাতে হবে। সিমেতো নদীর ওপারের জঙ্গলে বিদ্রোহীদের পুরোনো আস্তানায় যাবে। আবার সব বিদ্রোহী সঙ্গীসাথীদের একত্র করবে। এলাকার আরো লোক একত্র করবে। অস্ত্র তৈরি করবে। সবাইকে তালিম দিয়ে রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যদের চেয়েও শক্তিশালী নিপুণ যোদ্ধা তৈরি করবে। তারপর আক্রমন করবে ম্যমিয়েস দুর্গ। অনেক কাজ - অনেক কাজ - মাথা ঝাঁকাতে

ঝাঁকাতে মোরাবিত মনে মনে বারবার বলল কথাটা।

রাত বাড়তে লাগল। মোরাবিতের চোখে ঘুম নেই। ও দুচোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

শেষ রাতের দিকে মোরাবিতের একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। মোরাবিত বিছানায় উঠে বসল। দেখল - সাভোনা ফ্রান্সিসরা গভীর ঘুমে। একবার ভাবল - সাভোনাকে পালাবার কথা বলি। পরক্ষণেই সাবধান হল। না - সাভোনাকে কিছু বলা চলবে না। সাভোনা কিছুতেই ওকে এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিতে দেবে না।

মোরাবিত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাথরের বারান্দায় মশালের আলোয় দেখল একজন সৈন্য পাথরের দেয়ালে পিঠ রেখে ঝিমুচ্ছে। মোরাবিত নিঃশব্দে দেয়ালে পিঠ ঘষে ঘষে মশালের আলোর এলাকা থেকে বাইরে অন্ধকারে নেমে এল। সদর দেউড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল চার পাঁচ জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। এ ম্যামিয়েস দুর্গে এখন রাজা ফ্রেডারিক আছেন। কাজেই জোর পাহারার ব্যবস্থা এখন। পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে দেউড়ি দিয়ে পালানো অসম্ভ ব। মোরাবিত চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল। পাথরের উঁচু ঘেরা দেয়ালের প্রায় সব জায়গাতেই মশাল জ্বলছে। দেখতে দেখতে লক্ষ্য করল দক্ষিণ কোনায় দুটো মশাল নিবু নিবু। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। নীল্‌চে কুয়াশাও ছড়িয়ে আছে ওদিকে।

মোরাবিত অন্ধকারে পাথর বাঁধানো চ্‌ত্বরে বুক পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর শরীর টেনে টেনে চলল ঐ দক্ষিণ কোনায় দেয়ালের দিকে। হাঁটুর বুকের ঘা তখনও সম্পূর্ন সারে নি। একটা কোনা উচুঁ পাথরে হাঁটুটা ঘষটে গেল। মোরাবিত প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে মুখে জোরে হাতচাপা দিল। একটু থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। একটু পরে যন্ত্রণা একটু করল। প্রায় অন্ধকারে ডান হাঁটুর দিকে তাকিয়ে বুঝল রক্ত পড়ছে। ও মুখ বুঁজে যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে আবার বুক হিঁচড়ে চলল।

দেয়ালের কাছেএসে একটু বিশ্রাম নিল। ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। একটু পরে হাঁপ ধরা ভাবটা কমল।

মোরাবিত উঠে দাঁড়াল। তারপর বেশ অন্ধকারে দেয়ালের পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে বেশ কষ্ট করে দেয়ালের ওপরে উঠেই ঘুরে দেয়ালের ওপাশের পাথুরে রাস্তায় লাফিয়ে নামল। দ্রুত নামতে গিয়ে ও লক্ষ্যই করে নি যে দেয়ালের বাইরেও কাছাকাছি তিন চারজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। রাজা ফ্রেডারিক আছেন দুর্গে। কাজেই কড়া পাহারা চলছে।

পাথুরে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তেই শব্দ হল! দুজন পাহারাদার সেই শব্দ শুনল। একজন চিৎকার করে উঠল - কে? দুজনেই অল্প অন্ধকারে খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসতে লাগল মোরাবিতের দিকে।

মোরাবিত সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে পড়িমরি ছুটল সামনের অন্ধকার গলিটা লক্ষ্য করে। পাহারাদার দুজন ততক্ষণে চিৎকার করে অন্য পাহারাদারদের ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। তারা কাছাকাছি আসার আগেই মোরাবিত গলির অন্ধকারে মিশে গেল। ছুটল প্রাণপণে। আস্তে আস্তে

পাহারাদারদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ হ্যারি উত্তেজিত স্বরে ডাকাডাকিতে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও দ্রুত বিছানায় উঠে বসল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস - সর্বনাশ হয়েছে। মোরাবিত পালিয়ে গেছে।

- বলো কি। ফ্রান্সিস মোরাবিতের শোবার জায়গাটার দিকে তাকাল। দেখল - ফাঁকা। পাশেই সাভোনা মাথা নিচু ক'রে বসে আছে। সাভোনা চুপ করে আছে। তখনই মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেল। মশালের আলোয় মারিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল - ঢালা বিছানার কোথাও মোরাবিত নেই। মারিয়া বেশ ঘাবড়ে গেল। মোরাবিত পালিয়ে গিয়ে ওদের ভীষণ বিপদে ফেলে গেল।

ফ্রান্সিস কদিন যাবৎই লক্ষ্য করছিল মোরাবিত চুপ চাপ শুয়ে বসে থাকে। কে জানে কী ভাবে। কোন কথাও বলতো না। সাভোনার সঙ্গেও কথা বলতো না। ওরা বাইরে বেরুতো। মোরাবিতও ওদের সঙ্গে প্রথম দিন বেরিয়েছিল। পালাবার চেষ্টা করেছিল। ফ্রান্সিসের তৎপরতায় পারে নি। তারপর থেকেই মোরাবিত কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে বাইরেও বেরুতো না।

ফ্রান্সিস ডাকল — সাভোনা। সাভোনা মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল - মোরাবিত কেন পালালো বলতে পারবে। সাভোনা মাথা এপাশ ওপাশ করল।

- মোরাবিত তো আমাদের ভীষণ সমস্যায় ফেলে গেল। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল - উপায় নেই - মোরাবিতকে ধরে নিয়ে আসতে হবে।

- কিন্তু মোরাবিত কোথায় গেছে তার হদিশ পাবে কী করে? মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস বলল - সাভোনা বলুন তো মোরাবিত পালিয়ে কোথায় যেতে পারে?

সাভোনা আস্তে আস্তে বলল - ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে লিপারি দ্বীপে যায় নি। ওখানকার ঘাঁটি এলাইমো নিশ্চয়ই এতদিনে ভেঙে দিয়েছে।

- ঐ দ্বীপ ছাড়া আর কোথায় মোরাবিত আত্মগোপন করেছে বলে আপনার মনে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

- এখান থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে আছে সিমেতো নদী। নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে আমরা প্রথম ঘাঁটি গেড়েছিলাম। পরে এলাইমোর সৈন্যদের তাড়া খেয়ে আমরা লিপারি দ্বীপে ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লিপারিতে আমরা যুদ্ধ হেরে গেছি। তাড়া খেয়ে বিদ্রোহী বন্ধুরা নিশ্চয়ই পুরোনো আস্তানায় ফিরে এসেছে। মোরাবিত নিশ্চয়ই ঐ আস্তানায় আত্মগোপন করেছে। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল - ঐ সিমেতো পেরিয়ে জঙ্গলের আস্তানায় যেতে হবে। পাথরের জানালা দিয়ে ফ্রান্সিস বাইরে তাকাল। দেখল - বাইরেটায় আর অন্ধকার তেমন নেই। তার মানে রাত শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ঘরের পাথরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল।

ভোর হল। বেলা একটু বাড়ল। দুজন সৈন্য ওদের সকালের খাবার নিয়ে এল। কাঠের থালায় গোল করে কাটা রুটি আর নানা সব্জিমেশানো ঝোলমত। ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসে খেয়ে নিল।

এঁটো থালা নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি - চলো সিমেতো নদীর ওপারে জঙ্গলে যাবো। মোরাবিতকে খুঁজে বের করতেই হবে। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। কোমরবন্ধনী ভালো

করে এঁটে যাবার জন্যে তৈরি হল।

মারিয়া বলল - আমিও যাবো।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল - না মারিয়া। যদি আমরা দুজনে বিপদে পড়ি তুমি অন্ততঃ জাহাজে বন্ধুদের সে খবরটা দিতে পারবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে সে উপায় আর থাকবে না।

সাভোনা বলল - চলো - আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।

- না সাভোনা - ফ্রান্সিস বলল - শুধু মারিয়া একা এখানে থাকলে রাজার মনে সন্দেহ হতে পারে। মোরাবিত পালিয়েছে এটা যেন এখানে কেউ না জানে। তুমি থাকলে কারো মনে সন্দেহ জাগবে না। তুমি আর মারিয়া থাকো।

ফ্রান্সিস বলল - মারিয়া - যদি দেখ যে আমরা কাল পরশুর মধ্যে ফিরে এলাম না তাহলে জাহাজে বন্ধুদের খবর দিও। সাভোনাকে নিয়ে আমাদের খুঁজতে যেও।

গত কয়েকদিনের মত নিশ্চিন্তভঙ্গিতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুর্গের সদর দেউড়ির দিকে চলল। ওরা এসময় বাইরে বেরোয় এটা পাহারাদাররা দেখেছে। ওরা কোন সন্দেহ করল না। ওদের দেখাশুনো করার জন্যে ওদের কাজে সাহায্য করার জন্যে রাজা ফ্রেডারিক যে দুজন সৈন্যকে রেখেছিলেন তারা এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। হ্যারি বলল - ভাই - আজকে আর তোমাদের দরকার নেই। আজ আমরা নিজেরাই সব খোঁজ খবর করবো। গাড়িরও দরকার নেই। সৈন্য দুজন ফিরে গেল।

দুর্গের বাইরে এসে ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল - হ্যারি - জোরে পা চালাও। দুজনে দ্রুতপায়ে দক্ষিণমুখো রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বসতি এলাকা ছেড়ে ওরা একটা পাহাড়ি এলাকায় এলো। উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ ধরে চলল।

দুপুর হল। সূর্য মাথার ওপরে। বেশ রোদের তেজ। হেঁটে চলল ওরা।

কিছু পরেই একটা পাহাড়ি গ্রাম পেল। পাথরের বাড়িঘর। ঘাসের ছাউনি। মাত্র কয়েকটা ঘরবাড়ি। একটা বাড়ির ঘরের সামনে চেস্টনাট গাছের নিচে একজন বয়স্ক লোক পাথরের ওপর বসেছিল। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি - জিজ্ঞেস করো তো - সিমেতো নদী কতদূরে?

হ্যারি লোকটির কাছে গেল। বলল - আচ্ছা সিমেতো নদী এখান থেকে কতদূর?

লোকটি একটু পাহাড়ি টানের ভাষায় বলল - আর বেশি দূরে না। কাছেই। তারপর ফ্রান্সিসদের পোশাক দেখে বল - মনে হচ্ছে আপনারা বিদেশী।

- হ্যাঁ আমরা ভাইকিং জাতি। হ্যারি বলল।

- এত বেলা হয়েছে - বিদেশী আপনারা - নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে লোকটি বলল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস - বলছে আমরা ক্ষুধার্ত কিনা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল - বলো যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। হ্যারি হেসে বলল সে কথা। লোকটি পাথরের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ঘর থেকে বৌঝিরা বেরিয়ে এল। লোকটি তাদের কী বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের বসতে ইঙ্গিত করল।

ক্লান্ত হ্যারি চেস্টনাট গাছের ছায়ায় লম্বাটে পাথরটায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির মেয়েরা বড় পাতায় রুটি পাখির মাংসের ঝোল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হ্যারি হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল। যা খিদে পেয়েছিল। হাপুস হুপুস করে খেয়ে নিল।

খেয়ে দেয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ওরা চলল সিমেতো নদীর উদ্দেশ্যে। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি - দেখ এই যে বিদেশ বিঁভুইয়ে আমরা আতিথ্য পেলাম ক্ষুধার মুখে খাদ্য পেলাম - অচেনা অজানা মানুষের ভালবাসা পেলাম আমাদের জীবনে এর মূল্য কি কম?

হ্যারি হেসে বলল -মোটেই না।

বরং প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ওরা সিমেতো নদীর ধারে পৌঁছল। নদীটা খুব বড় নয়। পাহাড়ি নদী। খুব স্রোত। এদিকটায় প্রচুর গাছপালা। নদীর ওপারেও ঘন বন জঙ্গল। তবে গাছপালা খুব দীর্ঘ নয়। গাছগাছালির নিচে বুনো ঘাস। লম্বা লম্বা।

এবার সমস্যা এই খরস্রোতা নদী পার হওয়া যাবে কী করে। তখনই ওরা দেখল নদীটার এপারের একটা গাছে মোটা কাছি বাঁধা। কাছিটা টেনে নিয়ে ওপারের একটা গাছে বাঁধা হয়েছে। কাছি নদীর জলের কিছু ওপরে ঝুল্‌ছে। ওরা বুঝল এই কাছি ধরে ধরেই এখানকার লোকেরা নদীটা পারাপার করে। যে প্রচণ্ড স্রোত তাতে পা ঠিক রাখা অসম্ভব। দড়ি ধরেই এই স্রোতকে ঠেকাতে হয়।

ফ্রান্সিস হ্যারি - দুহাতে দড়ি ধরে ধরে নদীর জলে নামল। নদীর জল বেশ ঠান্ডা। আস্তে আস্তে দড়ি ধরে ধরে নদীর স্রোত ধারার মধ্যে দিয়ে পেছল পাথরগুলিতে পা রেখে রেখে বেশ কসরৎ করে নদী পার হল দুজনে। দড়ি না ধরে পার হওয়া অসম্ভব। প্রচন্ড স্রোতের ধাক্কায় কোথায় ছিট্‌কে যাবে তার ঠিক নেই।

ওপারে পৌঁছে কিছুক্ষণ পরিশ্রান্ত দুজনে বিশ্রাম করল। তারপর বনের মধ্যে ঢুকল। বনের গাছপালার নিচে লম্বা লম্বা ঘাস। তার মধ্যে দিয়ে ওরা চলল।

আসার সময় সাভোনা বলে দিয়েছিল ডানদিকে ছাড়া ছাড়া তিনটে উঁচু টিলামত পড়বে। একেবারে তৃণশূণ্য টিলাটার নিচেই বিদ্রোহীদের পুরোনো আস্তানা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চলল। কিছুটা যেতেই ডানদিকে দেখল উঁচু টিলা একটা। টিলাটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। এই টিলাটা নয়।

আবার চলল দুজনে। বেশ কিছুটা ঘাসের জঙ্গল ঠেলে যাবার পর দেখল ডানদিকে বেশ কিছুটাদূরে আর একটা উঁচু টিলা। আশ্চর্য! টিলাটা একেবারে তৃণশূন্য। শুধু ছাই রঙা পাথরের। বিকেলের নরম আলো টিলাটার মাথায় পড়েছে। এটার নিচেই কোথাও আছে বিদ্রোহীদের আস্তানা।

ওরা টিলাটা লক্ষ্য করে চলল। বিকেল হয়ে গেছে। গাছ গাছালির নিচে এর মধ্যেই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা ঠাহর করে করে চলল।

হঠাৎ চারপাশের ঘাসের বনে ছড়্ ছড়্ শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল - ওদের চারপাশে ঘাসের জঙ্গলের আড়াল থেকে আট দশজন যোদ্ধা

খোলা তরোয়াল বর্শা হাতে উঠে দাঁড়াল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল-লড়াই নয়। আমরা সাভোনা মোরাবিতের বন্ধু। একটু থেমে আবার বলল কথাটা। ফ্রান্সিস ভেবে আশ্বস্ত হল যে সঙ্গে হ্যারিকে এনে বুদ্ধির কাজই করেছে। ও একা এলে লো ল্যাতিন ভাষা বলতে পারতো না। কাজেই প্রাণ সংশয় হত।

যোদ্ধারা অস্ত্র নামাল। ওদের মধ্যে বয়স্ক একজন এগিয়ে এল। বলল-তোমরা কারা?

—আমরা ভাইকিং। আমরা মোরাবিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। হ্যারি বলল।

—কেন? যোদ্ধাটি বলল।

—সেটা মোরাবিতকেই বলবো। হ্যারি বলল।

—হুঁ—এসো। যোদ্ধাটি পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। অন্য যোদ্ধারাও চলল। পেছনে চলল ফ্রান্সিস আর হ্যারি।

ন্যাড়া উঁচু টিলারের নিচেই ওরা দেখল প্রায় আট দশটা ঘর। শুকনো ঘাসের ছাউনি। দেয়ালও শুকনো ঘাস গেঁথে গেঁথে তৈরি করা হয়েছে। ওরা ঘরগুলোর কাছে এল। বয়স্ক যোদ্ধাটি একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল—এই ঘরে এসো।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নিচু করে ঘরটায় ঢুকল। ঘরটায় আলো জ্বালা হয় নি। অন্ধকারে ওরা আন্দাজেই বুঝল মোটা কাপড় পাতা বিছানায় কে বসে আছে। হ্যারি ডাকল—মোরাবিত। মোরাবিত বিছানা ছেড়ে উঠল। একটু খুঁড়িয়ে কয়েক পা এসে হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের ডান হাতটা ধরল। ফ্রান্সিস হেসে ওর হাতে চাপ দিল। মোরাবিত এবার হ্যারির হাতও ধরল। হাতে চাপ দিল। হ্যারি বলল—তোমার হাঁটুর ঘাটা শুকোয় নি?

—শুকিয়ে এসেছিল পালাতে গিয়ে পাথরে ঘষটানি লাগে—হাঁটতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। মোরাবিত বলল।

—তুমি বিছানায় বসো। হ্যারি বলল।

—আপনারাও বসুন। মোরাবিত বসল। মোরাবিত বলল—আপনাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি।

—না-না—হ্যারি বলল—আমরা আসার পথে খেয়ে নিয়েছি।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—মোরাবিতকে বলো ও পালিয়ে এল কেন?

হ্যারি সেটা মোরাবিতকে বলল।

মোরাবিত একটু চুপ করে থেকে বলল—আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা এখানে লিপারি দ্বীপ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—কী কষ্টের জীবন কাটাচ্ছে ওরা। এইসব জেনে বুঝেও আমি রাজার দুর্গে পেটপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাবো—অসম্ভব। তাই আমি পালিয়ে এসেছি। আবার সব বিদ্রোহীকে একত্র করবো। অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাবো। তারপর চূড়ান্ত যুদ্ধে নামবো ঐ ভিনদেশি রাজা ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে। হ্যারি মোরাবিতের কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—আমি যা বলছি তা তুমি মোরাবিতকে বুঝিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলতে লাগল-মোরাবিত-তুমি সাভোনা খাঁটি দেশপ্রেমিক এ সম্বন্ধে আমার মনে

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু আমি বলবো - তুমি এভাবে পালিয়ে এসে ভালো করো নি।

কথাটা শুনে মোরাবিতের মুখ গম্ভীর হল। একটু তিক্তকণ্ঠে ও বলল - তার মানে আমি পালিয়ে আসায় আপনারা বিপদে পড়েছেন। কথাটা বুঝে নিল ফ্রান্সিস। কথাটা ফ্রান্সিসের মনে খুব লাগল। দুঃখার্তস্বরে ও বলল শুধু আমাদের বিপদ হলে কিছু বলতাম না। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন তোমাদেরই সাভোনা। - সাভোনাকেও আমরা মুক্ত করে নিয়ে আসবো। মোরাবিত বলল। কথাটা বুঝে নিয়ে ফ্রান্সিস এবার বলল - মোরাবিত - রাজা ফ্রেডারিককে আমি কী বলেছিলাম সেটা আমার ভাষা জানো না বলেই তুমি বোঝো নি। - কী বলেছিলেন আপনি? মোরাবিত বলল।

- রাজাকে বলেছিলাম যদি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কার করতে না পারি তাহলে তোমাদের দুজনের সঙ্গে আমিও ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করবো। মোরাবিতকে ফ্রান্সিসের এই সঙ্কল্পের কথা সাভোনা বলেছিলেন। কিন্তু মোরাবিত তখন বেশ অসুস্থ। সব কথা বোঝবার মত মনের অবস্থা ওর ছিল না। মোরাবিত ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। ঘরটায় তখনও আলো জ্বালা হয় নি। ফ্রান্সিসের মুখটা ও স্পষ্ট দেখতে পেল না। মোরাবিত কোন কথা বলল না। চুপ করে ফ্রান্সিসের এই সঙ্কল্পের কথা ভাবতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল - দেখ মোরাবিত - তোমাদের দেশের সমস্যা তোমরা যে ভাবে পারো মেটাও আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু আমরা এখানে রয়েছি কাউন্ট রজারের নিখোঁজ গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে। এখন তোমরা দুজনে পালিয়ে এলে রাজা ফ্রেডারিক আমাদের বন্দী করবেন। কারণ তোমাদের সব দায়িত্ব আমি নিয়েছি। তাহলেই বুঝতে পারছো যে কাজের জন্যে আমরা দেশে ফিরলাম না সেই কাজটাই তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে আমার বন্ধুরা আমাদের মুক্ত করতে লড়াইয়ে নামবে - অযথা রক্তপাত মৃত্যু। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল - একটু ভেবে দেখো মোরাবিত - এখন অন্ততঃ আমাকে সুযোগ দাও যাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে গুপ্তধনের খোঁজ করতে পারি। গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারলে রাজা ফ্রেডারিক তোমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য। এইশর্ত আমি রাজাকে দিয়ে আগেই করিয়ে নিয়েছি। হ্যারি ফ্রান্সিসের কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে মোরাবিত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল - ঠিক আছে - আমি দুর্গে ফিরে যাবো। সাভোনা যা বলবেন আমি তাই করবো।

- বেশ তোমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। এক্ষুনি। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি কথাটা বুঝিয়ে বলতেই মোরাবিত বলে উঠল - বলেন কি! আমি এখনও ভালো করে হাঁটতে পারছি না। কয়েকদিন ওষুধ বিশ্রাম -। কথাটা বুঝে নিয়ে ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল - না - তোমাকে এক্ষুমি আমাদের সঙ্গে ম্যামিয়াস দুর্গে ফিরে যেতে হবে।

- আপনি আমাকে এক্ষুণি যেতে বলছেন কেন? মোরাবিত জানতে চাইল।

- কারণ - ফ্রান্সিস বলল - তুমি পালিয়ে গেছো এটা জানাজানি হয়ে গেলে রাজা ফ্রেডারিক সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবেন। তখন সাভোনাকেও তোমরা মুক্ত করতে পারবে না। আমাদের মুক্তির আশা না হয় ছেড়েই দিলাম। মোরাবিত একটুক্ষণ ভাবল। বলল - পারবো এতটা পথ হেঁটে যেতে?

- আমাদের দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তুমি যাবে। পথে ঘোড়ায় টানা শস্যের গাড়ি যোগাড়

করবো হয়তো একটা ঘোড়া বা খচ্চর। কোন কষ্ট হবে না তোমার। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে বলল। মোরাবিত আর কোন কথা বলল না। বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তখনই একজন বৃদ্ধা একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকল। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় পোঁতা লোহার চোঙে জ্বলন্ত মোমবাতিটা বসিয়ে দিল। মোরাবিত মৃদুকণ্ঠে বৃদ্ধাকে কী বলল। বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। মোরাবিত ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল - চলুন।

ওরা ছোট্ট ঘরটার বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল - মোরাবিতের বিদ্রোহী বন্ধুরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মোরাবিত সবাইকে লক্ষ্য করে কী বলতে লাগল। হ্যারি বলল - মোরাবিত ওর বন্ধুদের বলছে ওরা যেন মনোবল না হারায়। ও সাভোনাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আবার রাজা ফ্রেডারিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ওরা। ওদের জয় হবেই। মোরাবিতের বিদ্রোহী বন্ধুরা খোলা তরোয়াল বর্শা উচুঁ করে হৈ হৈ করে উঠল।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারি আর মোরাবিত হাঁটতে শুরু করল। মোরাবিত বেশ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করতে। মোরাবিত হেসে বলল - যতটা পারি হাঁটি। না পারলে তবেই আপনাদের সাহায্য নেবো। ফ্রান্সিস হেসে মোরাবিতের কাঁধে আস্তে চাপড় দিয়ে বলল - এই তো বীরপুরুষের মত কথা।

সিমেতো নদীতে বাঁধা কাছি ধ'রে ধ'রে পার হ'তে মোরাবিতের বেশ কষ্টেই হ'ল। ফ্রান্সিস পেছন থেকে সর্বক্ষণ ওকে ধ'রে থেকে সাহায্য করল।

সিমেতো নদীর ওপারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওদের আবার যাত্রা শুরু হ'ল।

একটা পাহাড়ি গ্রাম ছাড়াতেই উত্তর পূব কোনায় চাঁদ উঠল। আধভাঙা চাঁদ। মোটামুটি উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না ছড়াল পাহাড়ি এলাকায় রাস্তায় দু'পাশের ফিকাস ওক গাছের মাথায়। মোরাবিত ভাষণ হাঁপাচ্ছে তখন। ফ্রান্সিস পিছিয়ে এসে মোরাবিতের বাঁ হাতটা কাঁধে তুলে নিল।

মোরাবিত হেসে বলল-সবটা যেতে পারলাম না। ফ্রান্সিসও হেসে বলল-বন্ধু লড়াইটাই বড় কথা। জেতা হারাটা বড় কথা নয়। চলো—।

রাত বাড়ল। চাঁদটা মাথার ওপর চলে এল। এত রাতে পথে গাড়ি ঘোড়া কিছুই পেল না ওরা। হেঁটেই আসতে হল সারাটা পথ।

ম্যামিয়াস দুর্গে যখন ওরা পৌঁছল তখন শেষ রাত।

মারিয়া জেগেই ছিল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকতেই মারিয়া ছুটে এল। ফ্রান্সিস বলল—পাহারাদার সৈন্যরা কোন সন্দেহ করে নি তো?

—না। আমি দুপুরে খাওয়ার সময় বলেছি তোমরা কাতানিয়া গেছো। কাল সকালে ফিরবে। পাহারাদাররা আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস ক্লান্তমুখে একটু হাসল—মারিয়া— তোমার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

ওদের কথাবার্তায় সাভোনার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সাভোনা বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাড়াঁল। মোরাবিত প্রায় ছুটে এসে সাভোনাকে জড়িয়ে ধরল। সাভোনাও ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসরা দেখল সাভোনার দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। নিঃশব্দে কাঁদছে সাভোনা। মারিয়া মৃদুস্বরে বলল-ফ্রান্সিস-বোধহয় একেই বলে স্বর্গীয় দৃশ্য।

কথাটা হ্যারির কানে গেল। অভিভূত হ্যারি বলল- ঠিক বলেছেন রাজকুমারী। ফ্রান্সিস কোন কথাই বলতে পারল না।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, চলুন গীর্জাটা দেখতে যাবো।

সবাই গীর্জার সামনে এল। গীর্জার সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, গানটা কোথায় লেখা আছে?

সাভোনা আঙুল দিয়ে মেঝেটা দেখিয়ে বলল, ফুল লতা-পাতা নকশা দিয়ে এখানেই জড়িয়ে জড়িয়ে লেখা, লোভ হিংসায় কাতর—

পড়ুন তো। ফ্রান্সিস বলল। সাভোনা পড়তে লাগল। চার পঙক্তি পড়ে বলল, আরে পাঁচের পঙক্তিটা তো এখানে লেখা নেই!

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল, ভালো করে দেখুন মেঝের কোথাও লেখা আছে কিনা।

সাভোনা মেঝের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল। বলল, উঁহু, এখানে তো লেখা নেই।

নিশ্চয়ই কোথাও লেখা আছে। বাইরের ছোট বারান্দায়ও তো মোজেকের কাজ আছে। চলুন তো। ফ্রান্সিস বলল।

গীর্জাঘরের দরজার বাইরে ছোট একটু বারান্দা। মেঝেয় মোজেকের কাজ। তবে খুব বেশি লতাপাতা ফুল জড়ানো নয়। এখানে দাঁড়িয়েই সাভোনা হাসল, এই এখানে লেখা—যেমন যীশুর ঘর-শেষ পঙক্তিটা।

ফ্রান্সিস ভাবল, যীশুর ঘর-তার মানে গীর্জা।

ফ্রান্সিস মেঝের উপর উবু হয়ে বসল। ফুল লতাপাতায় লেখাগুলো দেখতে লাগল। ও গভীরভাবে ভাবতে লাগল, বেশী পঙক্তিটা আলাদাভাবে এখানে লেখা কেন? ভাবতে ভাবতে যখন মেঝের এদিক ওদিক দেখছে তখনই হঠাৎ দেখল লেখাটার ঠিক ওপরেই দুটো লম্বাটে পাথর বসানো, আর ঐ দুটো পাথরকে কেন্দ্র করেই ফুল-লতাপাতার নকশা আঁকা হয়েছে। পাথর দুটো রঙিন। রঙ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ভালো করে দেখতেই দেখল, একটা পাথরের রঙ হলুদ, অন্যটার লাল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের গানের দুটো পংক্তি মনে পড়ল—

হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর

ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল- এই গানটার পঙক্তির পাঁচ এবং শেষেরটা আলাদা লেখা। অন্য কোনো গানে পাথরের কথা নেই। তবে এই পাথর দুটো তো হলুদ আর লাল রঙের। তবে কত দিন আগের। রঙ অনেক ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওপরে ছাত আছে। তাই জল ঝড়ে রঙটা একেবারে মুছে যায় নি। ফ্রান্সিস আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু নিজেকে সংযত করল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হলুদ লাল পাথর দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যারি, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন পোঁতা আছে এই হলুদ লাল পাথর দুটোর নিচে।

বলো কি! হ্যারি পাথর দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। মারিয়া আর সাভোনা দুজনেই পাথর দুটোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, রাজা ফ্রেডারিককে খবর দিন। এই পাথর দুটো তুলে ফেলার

ব্যবস্থা করতে হবে।

কী করে বুঝলে যে-সাভোনা বলতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল, ভুলে যাবেন না এই গীর্জার ওপরটাই রাজা ফ্রেডারিক পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন। মেঝেটা তৈরি করিয়েছিলেন কাউন্ট রজার। এটা কিন্তু আজও অক্ষত আছে।

সাভোনা আর কোনো কথা না বলে ছুটল দুর্গের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজা ফ্রেডারিক এলেন। ফ্রান্সিসকে বললেন, আপনি কি নিশ্চিত এই লাল হলুদ পাথরের নিচেই আছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন?

হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল, আর শুধু একটা কথার ধাঁধা। হৃদয় শ্বেতপাথর। এই দুটো পাথর খুলে তুললে যদি একটা শ্বেতপাথর পাওয়া যায় তাহলে সব ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে। গানে আছে, দূর কর এই দোসর। হৃদয় শ্বেতপাথর।

রাজা ফ্রেডারিকের নির্দেশে মোজেকের কয়েকজন কারিগরকে নিয়ে আসা হলো। ওরা বাঁকানো লোহার দু-তিনরকম যন্ত্র বের করে পাথর দুটো অল্পক্ষণের মধ্যেই আলগা করে ফেলল। যখন সবাই মিলে টেনে পাথর দুটো তুলে ফেলল, দেখা গেল একটা লম্বা শ্বেতপাথর বসানো। মারিয়া খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হ্যারি, সাফল্য।

এবার শ্বেতপাথরটা কারিগর কয়েকজন মিলে বেশ কসরৎ করে তুলে ফেলল। দেখা গেল একটা লম্বাটে ওক কাঠের বাক্স। তাতে সোনারুপোর লতাপাতার কাজ। এবার বাক্সটা তোলা হলো। ভারি বাক্সটা রাখা হলো মেঝেয়। রাজা ফ্রেডারিক এগিয়ে এলেন। ওপরের কাঠের ঢাকনাটা আস্তে আস্তে তুললেন। দেখা গেল অনেক সোনার ছোট ছোট চাকতি সারা বাক্সটায় ছড়ানো। সেগুলো রাজা ফ্রেডারিক কিছুটা সরাতেই দেখা গেল কতরকম দামী পাথর বসানো মিনেকরা অলঙ্কার। সোনা দিয়ে বাঁধানো আয়না। সোনার চিরুনি। সকালের রোদ পড়েছে ঐ সোনার চাকতি অলঙ্কারগুলোর ওপর। ঝিকিয়ে উঠছে সব। আয়না চিরুনি। রাজা অমাত্যরা কারিগররা সাভোনা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ঐ মহামূল্যবান গুপ্তসম্পদের দিকে। শুধু হ্যারি ফ্রান্সিস মারিয়া খুব একটা অবাক হলো না। ফ্রান্সিসের উদ্ধার করা গুপ্তধন ওরা তো আগেও দেখেছে। তবে মারিয়া তো মেয়ে। অলঙ্কারগুলো দেখতে লাগল। কী সুন্দর গড়ন অলঙ্কারগুলোর! ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। উদগত কান্নায় ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হ্যারি, এখনও কিন্তু আমাদের কিছু কাজ বাকি।

হ্যারির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফ্রান্সিস রাজা ফ্রেডারিকের সামনে এল। বলল মহামান্য রাজা, আমি আমার কর্তব্য করেছি। এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন।

রাজা ফ্রেডারিক সে কথার জবাব দিলেন না। আশ্চর্য হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার এত আত্মবিশ্বাস!

ফ্রান্সিস হাসল। তারপর বলল, এবার তাহলে মোরাবিত আর সাভোনাকে মুক্তি দিন। রাজা আস্তে আস্তে বললেন, নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমরা এই গুপ্তধন উদ্ধার করেছো, তোমাদেরও তো কিছু প্রাপ্য আছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে হাসল। বলল, এই গুপ্তধন আপনাদের দেশের, আপনাদের। আমরা কিছু নেব না। এখানকার আদিম বাসিন্দা সারাসেন জাতি, মানে মোরাবিতরা, তাদের

তালা খুলতেই ঝকমক করে উঠলো রত্নগুলো।

কল্যাণের জন্যে আমাদের যা প্রাপ্য সব দিলাম। আমার অনুরোধ, আপনি ওদের ওপর সদয় হোন। ওদের ভালোবাসুন। ওদের কল্যাণে আমাদের প্রাপ্য অংশ ব্যয় করুন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারির দিকে তাকাল।

তিনজনে চলল দুর্গের দিকে। পেছন ফিরে ফ্রান্সিস দেখল সাভোনা ছুটতে ছুটতে আসছে। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সাভোনা ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দু হাত জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল। সাভোনা কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি আমার সন্তানতুল্য। সেই তোমাকে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তোমার মতো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, অনেক আছে সাভোনা। আমরা জানি না তাই। আচ্ছা চলি— মোরাবিতের সঙ্গে দেখা হলো না। ওকে আমার অন্তরের স্নেহ জানাবেন।

ওদিকে সমস্ত নগরে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা ততক্ষণে রটে গেছে। যে কারিগররা পাথর তুলেছিল, তারাই বাইরে এসে বলেছে।

তিনজন দুর্গের বাইরে আসতে দেখে হাজার হাজার নগরবাসী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরাও খবর শুনে ছুটে এসেছে। ফ্রান্সিসরা দুর্গ থেকে বেরোতেই বন্ধুরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে ধ্বনি দিল—ও হো হো।

উপস্থিত নগরবাসীরা ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা বুঝতে পারল না একজনকে নিয়ে এত লোক মাতামাতি করছে কেন?

সমাপ্ত

উৎসর্গ

কবি প্রভাত বসু

বন্ধুবরেষু

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের কয়েকটি বই

সোনার ঘন্টা
হীরের পাহাড়
মুক্তোর সমুদ্র
তুষারে গুপ্তধন
রুপোর নদী
বিষাক্ত উপত্যকা
মণিমাণিক্যের জাহাজ
চিকামার দেবরক্ষী
চুনীপান্নার রাজমুকুট
কাউন্ট রজারের গুপ্তধন
সর্পদেবীর গুহা
সাহারার রহস্য
ফ্রান্সিস সমগ্র ১/২

যোদ্ধামূর্তি রহস্য

তখন বিকেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ পালমা বন্দরে নোঙর ক'রে রয়েছে। ফ্রান্সিসের বীর বন্ধু ভাইকিংরা অনেকেই জাহাজের ডেক-এ উঠে এসেছে। কেউ কেউ শুয়ে বিশ্রাম করছে। অনেকেই বসে আছে। জাহাজের রেলিঙ ধ'রে তাকিয়ে দেখছে পালমা বন্দরের ব্যস্ততা। ফ্রান্সিসদের জাহাজের কাছাকাছি আরো তিন চারটে ভিনদেশি জাহাজ নোঙর করা। নানা দেশের পতাকা উড়ছে সেইসব জাহাজে। সেইসব জাহাজের বন্দরের কর্মীরা বাদাম তেলের পিপে তুলছে। ডুমুর খুবানির বস্তা তুলছে জাহাজঘাটা থেকে।

নিজেদের কেবিনঘরে ফ্রান্সিস বিছানায় বসে আছে কাঠের দেয়ালে পিঠের ভর রেখে। মারিয়া বিছানার একপাশে বসে সুঁচ সুতো দিয়ে নিজের একটা পোশাকের সেলাই ছিঁড়ে যাওয়া জায়গাটা সেলাই করছিল।

বিকেলের আলো কমে এসেছে। মারিয়া সেলাই বন্ধ ক'রে সবকিছু একটা চামড়ার পেটিতে তুলে রাখতে রাখতে বলল, — ফ্রান্সিস — আর কোথাও নয়। এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাতে বলো। ফ্রান্সিসও এই কথাটাই ভাবছিল। অনেকদিন হয়ে গেল ওরা দেশ ছেড়ে এসেছে। কতদিন কত রাত কেটে গেল সমুদ্রে বিদেশের মাটিতে। বন্ধুদের মনের অবস্থা ও ভালো করেই বুঝতে পারছে। মারিয়া তো দেশে ফেরার কথা বলবেই। এতদিন ও কখনো বাবা-মাকে ছেড়ে থাকেনি। ফ্রান্সিস হ্যারি আর বন্ধুদের তো বিদেশের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ানো কত বিচিত্র মানুষদের জীবন ওরা দেখেছে। কখনো সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও বন্দীদশার জীবন তো কাটিয়েছে। এবার ওরা তো ফিরতে চাইবেই।

ফ্রান্সিস এসব ভাবছে তখনই হ্যারি এল। ফ্রান্সিসের পাশে বসল। মারিয়া বলল, হ্যারি — বন্ধুকে বুঝিয়ে বলো এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাতে। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস — এবার দেশেই ফিরে চলো।

— দেখ হ্যারি, — ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল — তুমি ভালো ক'রেই জানো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অলস জীবন আমাকে কোনদিন টানেনি। আমি ভালোবাসি অভিযাত্রীর জীবন। ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা দেশ মানুষজন তাদের জীবন তাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্বন্ধ। হ্যারি বলল — আমি জানি ফ্রান্সিস। কিন্তু তোমার জীবন সম্পর্কে এই ধারণা যে সবাই বোঝে না। প্রায় সকলেরই ঘরমুখী মন। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল — ঠিক আছে। এখন তো আমরা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আছি। জাহাজ-চালককে বলো দেশের দিকে জাহাজ চালাতে।

খবরটা জাহাজে রটে গেল। বন্ধু ভাইকিংরা লেগে পড়ল দড়িদড়া বাঁধা আর পাল খাটানোর কাজে। সন্ধ্যে নাগাদ জাহাজে পাল খাটানো শেষ হ'ল। সমুদ্রে শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ছুটেছে। ঘড় ঘড় শব্দে জাহাজের নোঙর তোলা হ'ল। নজরদার পেড্রো জাহাজের মাস্তুলে জড়ানো দড়ি বেয়ে বেয়ে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। পালগুলো হাওয়ার তোড়ে ফুলে উঠল। জাহাজ চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে।

জাহাজ চলেছে। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ভাইকিংরা পালা করে জাহাজ পাহারা

দিচ্ছে। আকাশে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। বেশ দূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। নজরদার পেড্রো নজর রাখছে চারিদিকে। যদি হঠাৎ কখনো জলদস্যুদের জাহাজ নজরে পড়ে তবে আগে থেকেই সাবধান হওয়া যাবে।

রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল।

পরদিন সকালে বাতাস বেশ পড়ে গেল। জাহাজের গতিও কমে গেল। ফ্রান্সিসকে খবর দেওয়া হ'ল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজচালকের কাছে এল। বলল — তোমার কি মনে হয়? বাতাসের গতি কমে গেল কেন? জাহাজের হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে জাহাজচালক বলল — চারপাশের সমুদ্রের ঢেউ দেখে বাতাসের গতি বুঝে মনে হচ্ছে আমরা এখনও ভূমধ্যসাগর এলাকার মধ্যেই আছি। এই বাতাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া গুমোট ভাব এই সব কিছু ঝড়ের পূর্বাভাস ব'লে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল, — তা'হলে তো আমাদের সাবধান হতে হবে।

— ঝড়ের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের তো তৈরি হতেই হবে। হ্যারি বলল। জাহাজচালক বলল, — যদি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ঝড় ছুটে না আসে তবে আবার বাতাসের বেগ বাড়বে, গুমোট ভাবটা, আর থাকবে না। কিন্তু ফ্রান্সিস সেই অনুমানের ওপর খুব ভরসা করতে পারল না। ও বিস্কোকে ডাকল। বিস্কো এল। ফ্রান্সিস বলল, — সবাইকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলো। ঝড়ের আশঙ্কা আছে। সব পাল গুটিয়ে ফেলে তৈরি হও সবাই।

বিস্কো জাহাজের ডেক--এর বন্ধুদের সাবধান হ'তে বলল। কেবিনঘরে গিয়ে খবর দিল সবাইকে। রসুইঘরে গিয়ে রাঁধুনি বন্ধুদের তাড়া দিল তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করার জন্য।

দুপুরের আগেই খাওয়াদাওয়া সেরে সব ভাইকিংরা তৈরি হ'তে লাগল যদি ঝড় আসে তবে ঝড়ের সঙ্গে লড়বার জন্য।

আশ্চর্য। জাহাজচালকের আশঙ্কাই সত্যি হ'ল। একটু বেলা হতেই দক্ষিণ দিক থেকে হাল্‌কা মেঘের সারি উড়ে আসতে লাগল। একটু পরেই ভারি কালো মেঘের সারি ছুটে আসতে লাগল। কালো মেঘ জমতে লাগল। সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। তারপরই প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্ত বাতাস।

ততক্ষণে ভাইকিংরা সব পাল গুটিয়ে ফেলেছে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এসেছে। মাস্তুল ঘিরে, রেলিঙের ধারে ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ভাইকিংরা। মাস্তুলের লম্বা টানা দড়ি, পাল খাটানোর কাঠে বাঁধা ঝোলানো দড়ি সব টেনে ধ'রে ভাইকিংরা ঝড়ের প্রথম প্রচণ্ড ঝাপ্টা সামলাল। জাহাজটা প্রথম ধাক্কায় কাত হ'য়ে গেলেও ভাইকিংদের অভিজ্ঞ হাতে টানা দড়ির টানে আবার সোজা হয়ে গেল। এবার মেঘের গায়ে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের আলো চমকাতে লাগল। ঘন ঘন বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি। মাস্তুলের টানা দড়ি, রেলিঙের দড়িদড়া, পাল খাটানো কাঠের ঝোলানো দড়ি প্রাণপণে টেনে ধরে ভাইকিংরা ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লাগল। জাহাজের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে ওরা জাহাজের সঙ্গেই উঠতে পড়তে লাগল। কিন্তু কেউ নিজের জায়গা ছাড়ল না।

ফ্রান্সিসদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বিকেলের আগেই ঝড় থেমে গেল। হাওয়ার বেগ কমল। আকাশে আর মেঘ নেই। পশ্চিম দিকে সূর্য নেমে এসেছে। রোদের তেজও কমে এসেছে।

ঝড়বৃষ্টি বেশিক্ষণ ছিল না। ঐটুকু সময়ই ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই ক'রে ভাইকিংরা ক্লান্ত

হ'য়ে পড়েছিল। ক্লান্তিতে ডেক-এর ওপরেই এখানে ওখানে কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বসে পড়েছে।

নজরদার পেড্রো মাস্তুলের দড়িদড়ায় পা রেখে উঠতে লাগল মাস্তুলের মাথায়। নিজের জায়গায় গিয়ে বসে চারদিকে নজর রাখাই তো ওর কাজ। নিজের জায়গায় মাস্তুলের মাথায় পৌঁছোবার পর ওর নজরে পড়ল পুবদিকে পাথুরে ডাঙা। পেড্রো চেঁচিয়ে উঠল — ডাঙা — ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডেক-এর ওপরে যে ভাইকিংরা শুয়ে বসে ছিল তাদের কয়েকজন এসে রেলিঙ ধ'রে দাঁড়াল। ওরাও দেখল পাথুরে ডাঙা। বিস্কোও ছিল তাদের মধ্যে। ও একজন ভাইকিং বন্ধুকে বলল, — ফ্রান্সিস হ্যারিদের আসতে বলো। বন্ধুটি ছুটল সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেবিনঘরের দিকে।

কেবিনঘরে ক্লান্ত ফ্রান্সিস শুয়ে বিশ্রাম করছিল। মারিয়া এমব্রয়ডারির কাজ করছিল। দরজায় টোকা পড়তে মারিয়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ভাইকিং বন্ধুটি বলল — ফ্রান্সিস ডেক-এ এসো। পেড্রো ডাঙা দেখতে পেয়েছে। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। চলল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে। মারিয়াও চলল পেছনে পেছনে।

ডেক-এ উঠে রেলিঙের ধারে এল ফ্রান্সিস। বিস্কো আঙ্গুল দিয়ে পুবদিকটা দেখাল। বিকেলের আলো অনেকটা কমে এসেছে। তবু দেখা গেল উঁচুনিচু পাথুরে জমি। কিছু কাঠপাথরের বসতি এলাকাও দূরে দেখা গেল। আর পড়ন্ত রোদে দেখা গেল উঁচু মিনারের মত। শঙ্কুর আকারের। নিচের দিকটা গোল, ছড়ানো। পাথরের দেয়াল। এখানে একটা বেশ বড় খাঁড়ির মত। সমুদ্রের জল অনেকটা ভেতরে চলে গেছে।

ততক্ষণে হ্যারিও এসে পড়েছে। সবাই উৎসুক চোখে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল — হ্যারি, কিছু বুঝতে পারছ?

— কোন দ্বীপটিপ হবে ব'লে মনে হচ্ছে। বসতি এলাকা খুব বড় নয় বলেই মনে হচ্ছে। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা তখনই একটু উত্তরমুখো হ'ল। এবার দেখা গেল বন্দর এলাকা। বড় খাঁড়ির মুখে জাহাজঘাটা। দু'টো জাহাজ নোঙর করা। একটা জাহাজ বড়। যুদ্ধ জাহাজ। তবে মালবহনের কাজও করে। অন্য জাহাজটা ছোট। ঝক্‌ঝকে সবুজসাদা রঙ করা। বেশ শৌখিন জাহাজ। পালগুলো গুটোনো। মাস্তুল ডেকও রঙ করা। সবুজ রঙের মোটা দড়ির রেলিং। তা'তে ছোট ছোট পতাকা বসানো। হাওয়ায় উড়ছে পতাকাগুলো। জাহাজটার মাথায় একটা সবুজরঙের দামি কাপড়ের পতাকা উড়ছে। তা'তে কিছু একটা নকশা আঁকা। শেষ বিকেলের আলোয় ঠিক বোঝা গেল না কিসের নকশা। আলো কমে আসায় আর বিশেষ কিছু দেখা গেল না। জাহাজদু'টোয় মাত্র কয়েকজনকে দেখা গেল। তারা পাহারাদার সৈন্য না আরোহী বোঝা গেল না। ফ্রান্সিস বলল — হ্যারি, কী করবে?

— আমরা বন্দরের দিকে যাবো না। খাঁড়ির এপাশে বেশ দূরে আমাদের জাহাজ নোঙর করবো। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল, বেশ। জাহাজচালককে তাই বলো। বিস্কো জাহাজ-চালককে নির্দেশ দিতে চলে গেল। মারিয়া বলল, — কিন্তু কোথায় এলাম। এটা কোন দ্বীপ না দেশ সেটা তো জানতে হবে।

— তাহলে তো আমাদের এখানে নামতে হবে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, — হ্যারি — সেটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু খোঁজটা নেবো কী ক'রে? হ্যারি বলল, — যা বুঝতে পারছি — ঐ জাহাজদু'টোয় যারাই থাকুক — তাদের কারো কাছ থেকে এসব জানতে গেলে বিপদ হতে পারে।

— হুঁ ঠিকই বলেছো — ফ্রান্সিস বলল, ঐ সুন্দর ঝকঝকে জাহাজটা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে নিশ্চয়ই ওটা কোন রাজা বা ধনী ব্যবসায়ীর। তাদের কাছে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা কম। উল্টে আমাদের ওরা জলদস্যুর দল ভেবে আক্রমণ করতে পারে। তাতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য লড়াইয়ে নামতে হতে পারে। আমরা কোন লড়াই বা ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে যাবো না। আমাদের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু আমরা করবো না। হ্যারি বলল, — হ্যাঁ — আমারও তাই মত। একটু থেমে বলল — সবচেয়ে ভালো হয় — একটু রাত হ'লে নৌকায় চড়ে আমরা খাঁড়ির গায়ে গিয়ে নামবো। ধারে কাছের বাড়িগুলোর কোনটাতে গিয়ে কোথায় এলাম এটা জেনে নিয়ে চলে আসবো।

— ঠিকই বলেছো হ্যারি — এতে বিপদের আশঙ্কা কম। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ এতক্ষণে থেমে গেছে। বেশি শব্দ না ক'রে আস্তে আস্তে নোঙর ফেলা হ'ল।

সন্ধ্যে হ'ল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। রাতে বেরুতে হবে নৌকোয় চড়ে।

রাত হ'ল। ভাইকিং বন্ধুরা সব খাওয়াদাওয়া সেরে নিচ্ছে তখন হ্যারি এসে ওদের ব'লে গেল খাওয়াদাওয়ার পরে ওরা সবাই যেন ডেক-এ উঠে আসে ফ্রান্সিস তাদের কিছু বলবে।

খাওয়াদাওয়ার পরে সবাই জাহাজের ডেক-এ জড়ো হ'ল। একটু পরে — পোশাক পরে কোমরে তরোয়াল নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো এল। মারিয়াও এল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, — ভাইসব — যে ডাঙা আমরা দূরে দেখছি আমরা জানি না সেটা কোন দ্বীপ না দেশ। সেটা না জানতে পারলে আমরা কোথায় এলাম, আমাদের দেশ কতদূর এসব কিছুই বুঝতে পারবো না। তাই এসব খোঁজখবর নিতে আমি হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে তীরে যাবো। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে আসবো। সে কাজটা এমনভাবে সারতে হবে যাতে আমরা কোন বিপদে না পড়ি। তোমরা ঘুমোও কিন্তু কয়েকজনকে ডেক-এ সতর্কভাবে থাকতে হবে। যদি কোন বিপদে পড়ি তা'হলে যা'তে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অঞ্চল থেকে পালাতে পারি। ফ্রান্সিস থামল। তারপর হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে চলল জাহাজের পেছন দিকে। হালের কাছে এসে ফ্রান্সিস দেখল — একটা নৌকো জলে নামানো হয়েছে। ঢেউয়ে অল্প অল্প দু'লছে নৌকোটা। প্রথমে ফ্রান্সিস তারপরে শাঙ্কো আর হ্যারি জাহাজের বড় হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নৌকোয় নেমে ব'সে পড়ল। জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে ফ্রান্সিস নৌকো ছেড়ে দিল। দাঁড় টানতে লাগল। ঢেউয়ের দোলায় দু'লতে দু'লতে নৌকো তীরের দিকে চলল।

জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল মারিয়া। ফ্রান্সিসদের নৌকোটা দেখতে লাগল। ওর মন খারাপ হয়ে গেল। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কে জানে কোন বিপদে পড়ে কিনা ফ্রান্সিসরা। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কোনভাবেই সংকল্পচ্যুত করা যাবে না এটা মারিয়া জানে। ভয় কাকে বলে ফ্রান্সিস জানে না। ওর আত্মবিশ্বাসও প্রবল।

নৌকো চলেছে। সমুদ্র বেশ শান্ত। হাওয়ার বেগও বেশি নয়। তবু দূরবিস্তৃত সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দটা শোনা যাচ্ছে।

নৌকো চলেছে। দাঁড় বাইছে ফ্রান্সিস। আর একটা দাঁড় হালের মত ধ'রে চুপ ক'রে বসে আছে শাঙ্কো নৌকোর অন্য কোনাটায়। মাঝখানে হ্যারি।

আকাশে তারার মেলা বসে গেছে। ভাঙা চাঁদ। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে

অস্পষ্ট হ'লেও ফ্রান্সিস দেখল ওদের নৌকো খাঁড়িটার এপাশে তীরের কাছে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় দেখে দেখে নৌকোটা খাঁড়িটায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর তীরের কাছ দিয়ে দিয়ে নৌকো চালাতে লাগল। খাঁড়ির পার ধ'রে চলেছে উঁচু উঁচু বিরাট পাথরে চাঁই। খাঁড়ির ওপারে দেখা যাচ্ছে সেই তলামোটা মিনার মত। বেশ উঁচু। কিন্তু ওপর থেকে অনেকটা ভাঙা, যেন ধ্বস নেমেছিল। ধ্বসের মধ্যে চৌকোনো বড় বড় পাথরের চাঙ্‌ ছড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে ঐ মিনারেরই ভগ্নস্তূপ। খাঁড়ি শেষে যে তলামোটা মিনারটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু অটুট। পাথর-বাঁধানো। পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঐ তলামোটা মিনারগুলো কি ফ্রান্সিসরা বুঝতে পারলো না।

খাঁড়ির জলে তেমন ঢেউ নেই। অল্প জ্যোৎস্নার আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস খাঁড়ির ধারের উঁচু উঁচু পাথরের চাঁইগুলোর দিকে নজর রেখে চলল যদি সমতল এলাকা পায়। সমতল এলাকাতেই বাড়িঘর থাকবে। লোকজনের বাস সেখানেই তো হবে।

দু'তিনটে পাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে খাঁড়ির জল অনেকটা ঢুকে গেছে। এখানটায় আসতেই ফ্রান্সিস দেখল পাথরের চাঁইগুলোর আড়াল থেকে একটা এদেশীয় নৌকো দ্রুত ওদের নৌকোর দিকে ছুটে আসছে। নৌকোটায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিসরা কিছু বোঝার আগেই নৌকোটা ওদের নৌকোর গায়ে এসে লাগল। ঝাঁকুনি সামলে তিনজন সশস্ত্র লোকই ফ্রান্সিসদের নৌকোয় লাফ দিয়ে নামল। শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল — তরোয়াল নামাও। শাঙ্কো তরোয়াল নামাল। ফ্রান্সিস পোর্তুগীজ ভাষায় বলল — আমরা বিদেশী — লড়াই চাই না। লোক তিনটি কিছুই বুঝল না। তবে তরোয়াল নিয়ে আক্রমণও করল না। নিজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এবার হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় ব'লে উঠল — আমরা বিদেশী — ভাইকিং — লড়াই নয় বন্ধুত্ব চাই। এবার লোক তিনজন বুঝল। ওরা তরোয়াল নামাল। আস্তে আস্তে টাল সামলে নৌকোটায় বসে পড়ল। লোকগুলোর গায়ে এখানকার জেলেদের জোব্বামত পোশাক। অল্প চাঁদের আলোয় দেখে হ্যারি বুঝল ওদের পোশাক জলে ভেজা। ওদের মধ্যে রোগা আর লম্বামত লোকটি লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, — তোমরা বিদেশী ভাইকিং — এখানে এসেছ কেন?

— সে অনেক কথা — হ্যারি বলল, — শুধু এটুকু বলছি যে আমরা মোজারকা দ্বীপ থেকে আসছি। যাবো পোর্তুগালের দিকে। এটা কি কোনো দ্বীপ?

— হ্যাঁ। — এটা সার্দিনিয়া দ্বীপ। এটা সার্দিনিয়া দ্বীপের উত্তরের সাসারি বন্দর। কিন্তু তোমরা এখানে এসেছো কেন?

— একটু দূরে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। আমরা কোথায় এলাম তার

হদিশ জানতে এসেছি। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, জিজ্ঞেস করোতো ঐ তলামোটা মিনার মত — ওগুলো কী? ফ্রান্সিস কথাটা বলল স্পেনীয় ভাষায়। দেখা গেল লোকগুলো স্পেনীয় ভাষা বুঝল। লম্বামত লোকটা পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বলল — ওগুলো নুরাঘি। সার্দিনিয়ার অনেক জায়গায় নুরাঘি আছে।

— এগুলো কি দুর্গ? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, — হ্যাঁ। — সৈন্যরা থাকে।

— তোমার নাম কি ভাই?

— দোনিয়া। লোকটি বলল।

হঠাৎ পেছন ফিরে কী দেখেই দোনিয়া এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলে উঠল -- রাজার জাহাজ। পালাও। দোনিয়ার সঙ্গী দু'জনও উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিসরা পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই সুদৃশ্য সুন্দর ছোট্ট জাহাজটা নিঃশব্দে এদিকেই আসছে। সেই জাহাজের সম্মুখে দু'টো ছোট নৌকো খুব দ্রুত আসছে। নৌকো দু'টো সাধারণ মাছধরা নৌকো না। বেশ শৌখিন সুন্দর নৌকো। নৌকো দু'টোয় প্রায় জনাদশেক সৈন্য। খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সৈন্যদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে লোহার বর্ম আঁটা।

দোনিয়া আর তার সঙ্গী দু'জন নিজেদের নৌকোয় লাফিয়ে উঠতে গেল। নৌকোটা টাল খেল। টাল সামলাতে না পেরে একজন সঙ্গী জলে পড়ে গেল। তাকে হাত বাড়িয়ে নৌকোয় তুলতে গিয়ে দোনিয়ার দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণ সৈন্যবোঝাই নৌকো দু'টো অনেক কাছে চলে এসেছে। সৈন্যদের নৌকো থেকে কে যেন চিৎকার ক'রে বলল, — দোনিয়া — পালাবার চেষ্টা করবেন না। আজকে আপনাকে ধরা দিতেই হবে।

দোনিয়া ততক্ষণে সঙ্গীটিকে নৌকোয় তুলে ফেলেছে। দোনিয়া দেখল — রাজার নৌকো জাহাজ অনেক কাছে চলে এসেছে। এত সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। দোনিয়া পাথরের চাঁই-ওঠা তীরের দিকে তাকাল। ওর লক্ষ্য — সাঁতার দিয়ে তীরে উঠে পালানো। কিন্তু দেখল — তীরে পাথরের চাঁইয়ের ওপর খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা গেল সৈন্যরা আটঘাট বেঁধেই নেমেছে যাতে দোনিয়া কোনভাবেই পালাতে না পারে।

দোনিয়া বুঝল -- পালাবার কোন উপায় নেই। ও কোমরে গোঁজা তরোয়াল খুলে নৌকোর গলুইয়ে ফেলে দিল। সঙ্গী দুজনও তাই করল। তারপর নৌকায় বসে পড়ল।

সৈন্যভর্তি একটা নৌকো ফ্রান্সিসদের নৌকো ছাড়িয়ে দ্রুত দোনিয়াদের নৌকোর গায়ে গিয়ে লাগল। দু'জন সৈন্য তরোয়াল কোমরের খাপে ভ'রে দোনিয়াদের নৌকোয় উঠল। নৌকো থেকে মোটা দড়ির মাথা ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল। সৈন্য দু'জন দোনিয়ার নৌকোটার হালের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধল।

এদিকে অন্য নৌকোটা ফ্রান্সিসদের নৌকোর গায়ে এসে লাগল। চাঁদের অল্প আলোয় ফ্রান্সিসদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখেই বুঝল — এরা বিদেশী।

সকলের সামনের সৈন্যটি খোলা তরোয়াল হাতে লাফিয়ে ফ্রান্সিসদের নৌকোয় উঠল। লো ল্যাতিন ভাষায় বলল — তোমরা কারা? হ্যারি উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নৌকোর গলুইয়ে রাখল। বলল — আমরা বিদেশী, ভাইকিং। আমরা লড়াই চাই না। আপনাদের বন্ধুত্ব চাই। সৈন্যটি খোলা তরোয়াল কোমরে গুঁজে রাখল। হাত বাড়িয়ে সৈন্যদের নৌকো থেকে বাড়িয়ে ধরা দড়ির মাথাটা নিল। ফ্রান্সিসদের নৌকোর গলুইয়ের কাঠের সঙ্গে দড়িটা বাঁধল। বলল -- তোমাদেরও বন্দী করা হ'ল।

কালকে রাজা এনজিওর কাছে হাজির করা হবে তোমাদের। রাজা যা বিচার করবেন তাই করা হবে।

দু'তিনজন ফ্রান্সিসদের নৌকোতেও উঠল। এবার নৌকো দু'টো দড়ি দিয়ে বাঁধা দোনিয়া ও ফ্রান্সিসদের নৌকো টেনে বাঁধল। দোনিয়াদের নৌকোর সৈন্যটি তরোয়াল উঁচিয়ে দূরের নুরাঘিটা দেখিয়ে বলল -- নুরাঘিতে টেনে নিয়ে চলো। নৌকো দু'টো আগে আগে চলল। পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা দোনিয়া ও ফ্রান্সিসদের নৌকো।

রাজার জাহাজটা দেখা গেল খাঁড়ির মুখের দিকে চলে যাচ্ছে।

দড়িবাঁধা দোনিয়া ও ফ্রান্সিসদের নৌকো দু'টো টেনে নিয়ে চলেছে সৈন্যদের নৌকো দু'টো। শাঙ্কো আস্তে আস্তে নৌকোর গলুইয়ের ধারে সরে এল। ও তখন দ্রুত ভাবছে আর দেরি করলে চলবে না। রাত থাকতে থাকতেই পালাতে হবে। জাহাজে ফিরে বন্ধুদের সব জানাতে হবে। কালকে রাজা বিচার করবে। ওদের কী শাস্তি দেবে কে জানে। ওদের কাউকে কালকে সকালেও ফিরতে না দেখলে বন্ধুরা চিন্তায় পড়ে যাবে। হয়তো ওদের খোঁজ নিতে জাহাজ চালিয়েই ওরা খাঁড়িতে ঢুকে পড়বে। রাজার জাহাজে অন্য জাহাজটায় অনেক সৈন্য আছে। হয়তো লড়াই হতে পারে। সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে বন্ধুরা হারবে। মৃত্যু হবে অনেক বন্ধুর। বন্দীও হবে অনেকে। কাজেই যে ক'রে হোক ওদের সব খবর দিয়ে সাবধান ক'রে দিতে হবে।

শাঙ্কো আরো স'রে এল। গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডাকল — ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের কানে ডাক গেল। কিন্তু ও মাথা ঘুরিয়ে শাঙ্কোর দিকে তাকাল না। আঙুল দিয়ে বা কানটা ছুঁল। তার মানে ও ডাক কানে শুনতে পেয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে তাকালে সৈন্য দু'জনের সন্দেহ হতে পারতো — কী কথা বলছে ওরা? শাঙ্কো আগের মতই চাপা গলায় বলল— আমি সাঁতরে পালাচ্ছি। বন্ধুদের খবর দেব। ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা ওঠানামা ক'রে সম্মতি জানাল। তবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল -- সাবধানে।

শাঙ্কো সৈন্য দু'জনের দিকে তাকাল। দেখল সৈন্য দু'জন তখনও খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দূরের নুরাঘিটার দিকে।

শাঙ্কো নৌকো থেকে আস্তে আস্তে দু'পা জলে নামাল। তারপর সৈন্য দু'জনের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে দু'হাতে ভর দিয়ে জলের মধ্যে শরীরটা ছেড়ে দিল। টুপ ক'রে জলে ডুবে গেল শাঙ্কো। সৈন্য দু'জন কিছুই বুঝতে পারল না।

শাঙ্কো এক ডুবে যতটা সম্ভব দূরে এসে আস্তে আস্তে মাথা ভাসাল। দেখল নৌকোগুলো অনেক দূরে চলে গেছে। শাঙ্কো জলে কোনরকম শব্দ না ক'রে আস্তে আস্তে সাঁত্‌রাতে লাগল তীরের দিকে।

কিছু পরে নৌকোগুলো নুরাঘির কাছে এল। তখনও অন্ধকার কাটেনি। দেখা গেল জলের ধারটা পাথরবাঁধানো। রাস্তা চলে গেছে ওখান থেকে নুরাঘির সদর প্রবেশপথের দিকে। প্রবেশপথের কাঠের দরজা। তার মাথায় মশাল জ্বলছে। পাথরের টানা দেওয়ালের মাথায় এখানে ওখানে আরো মশাল জ্বলছে। কয়েকজন পাহারাদার সৈন্য নুরাঘি পাহারা দিচ্ছে। তবে তাদের তরোয়াল কোষবদ্ধ।

পাথরবাঁধানো তীরে নৌকোগুলো ভিড়ল। আস্তে আস্তে সবাই নামতে লাগল। সৈন্যরা নেমে সারি দিয়ে দাঁড়াল। সৈন্যদের দলনেতা গলা চড়িয়ে বলল -- সব বন্দীরা উঠে এসো। ফ্রান্সিস হ্যারি দোনিয়া তার সঙ্গী দু'জন -- সবাই আস্তে আস্তে তীরে নামল।

সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল নুরাঘির প্রধান ফটকের দিকে। ততক্ষণে ফটকের বড় কাঠের দরজা পাহারাদার সৈন্যরা ঠেলে খুলে দিয়েছে। রাস্তা পার হয়ে

ফ্রান্সিসরা প্রধান ফটক দিয়ে নুরাঘির ভেতরে ঢুকল।

ছোট পাথরের চত্বরের পর নুরাঘি। গোল তলাটা। অনেকগুলো ঘর। ফ্রান্সিস মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল -- গোল নুরাঘি ওপরের দিকে উঠে গেছে। ওপরেও বেশ কিছু লোহার গরাদবসানো জানালা। তার মানে ওপরেও আরো ঘর আছে।

দলনেতার নির্দেশে ফ্রান্সিসদের একটা ঘরে ঢোকানো হ'ল। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখল ঘরটা খুব বড় নয়। পাথরের মেঝেয় শুকনো ঘাসের ওপর কাপড়পাতা বিছানা। পাঁচ ছ'জন সৈন্য ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার শব্দে দু'একজন সৈন্যের ঘুম ভেঙে গেল। একজন উঠে বসে হাই তুলল।

ফ্রান্সিস বুঝল এটা সৈন্যাবাস। -- কয়েদ ঘর নয়। ও এতে খুশি হ'ল। কয়েদঘরের বন্দীদশার হাত থেকে বাঁচা গেল। এখন দেখা যাক -- রাজা ওদের কী শাস্তি দেয়।

দোনিয়া ঘাসের বিছানায় বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল -- দোনিয়া খুবই ক্লান্ত। ফ্রান্সিসরাও ঘাসের বিছানায় বসল। একপাশে হ্যারি বসল। অন্যপাশে বসল দোনিয়ার সঙ্গী দু'জন।

দেখা গেল দরজায় কোন পাহারাদার নেই। তবে কিছু সশস্ত্র সৈন্য ঘোরাফেরা করছে দরজার কাছে।

রাত শেষ হ'য়ে আসছে। কিছু সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র খুলে ঘরগুলোয় ঢুকছে। বোধহয় শুয়ে বিশ্রাম করবে এখন।

ফ্রান্সিস এবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারিকে বলল — হ্যারি শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম কর। হ্যারিও শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল -- শাঙ্কো পালিয়েছে। খুব বাঁচোয়া যে ওর কোন বিপদ হয়নি। মারিয়া বন্ধুরা অন্তত নিশ্চিত হবে শাঙ্কোর কাছে খবর পেয়ে যে আমাদের এখনও কোন বিপদ ঘটে নি। আমরা ভালো আছি। হ্যারি বলল -- ভালোই হ'ল। শাঙ্কো খুব কায়দা ক'রে পালিয়েছে। আমি তো বুঝতেই পারিনি। একটু চুপ ক'রে থেকে হ্যারি বলল -- আমরা বিপদ থেকে বাঁচবো কিনা সেটা এখন নির্ভর করছে রাজা এনজিওর মর্জি-মেজাজের ওপর।

-- দেখা যাক কপালে কী আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ওদিকে শাঙ্কো সাঁত্রাতে সাঁত্রাতে যাচ্ছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখল রাজার জাহাজটা ঠিক খাঁড়ির মুখে নোঙর ক'রে আছে। শাঙ্কো বুঝল -- ওদিক দিয়ে পালানো যাবে না। ও সাঁত্রাতে সাঁত্রাতে তীরের কাছে এল। দেখল, এখানে তীরের কাছটা পাথরছড়ানো মাটি। অনেকটা সমতল। ও তীরের কাছে পায়ের নিচে পাথুরে মাটি পেল। কোমরজলে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করল। ও তখনও হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে হাঁপ ধরা ভাবটা যেন কমল।

শাঙ্কো ছোট ছোট পাথরকুঁচি ছড়ানো মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে জল থেকে তীরে উঠল। ও স্থির করল পশ্চিমমুখো হেঁটে ঠিক খাঁড়ির মুখ থেকে দূরে চলে যাবে। তারপর সমুদ্রের জলে নেমে সাঁত্রে নিজেদের জাহাজে ফিরবে।

পাথুরে জমি পেরিয়ে বেশ একটা টানা সমতল এলাকা পেল শাঙ্কো। চলল পশ্চিমমুখো। হাঁটতে লাগল শাঙ্কো। সমতল হলেও এখানে ওখানে পাথর ছড়িয়ে আছে। কাজেই শাঙ্কোকে বেশ সাবধানেই হাঁটতে হচ্ছিল। গায়ে জলে ভেজা পোশাক। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বেশ শীত শীত লাগছিল।

একসময় সমুদ্রের ধারে এল শাঙ্কো। দেখল খাঁড়ির মুখে রাজার জাহাজ অনেক দূরে।

শাঙ্কো পা টিপে টিপে পেছল পাথরের ওপর পা রেখে রেখে সমুদ্রের জলে নামল।

দূরে ওদের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। শাঙ্কো ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে সাঁতরাতে লাগল।

একটু পরেই মাথার ওপর কালো আকাশের অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। শাঙ্কো মুখ তুলে পুবদিকে তাকাল। দেখল -- লালচে হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব দিগন্তের আকাশে সূর্য উঠতে দেরি নেই।

শাঙ্কো এবার যতটা সম্ভব দ্রুত সাঁত্‌রাতে লাগল। রোদ চড়া হ'লে বিপদ হতে পারে। অনেকটা দূর হলেও রাজার জাহাজ থেকে কারো নজরে পড়ে যেতে পারে ও। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে।

শাঙ্কো সাঁত্‌রে চলল। হাত-পা যেন আর চলছে না। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু শাঙ্কো গতি কমাল না। পাথরের মত ভারি হাত পা। তবু প্রাণপণে সাঁতার কেটে চলল শাঙ্কো।

পুবআকাশে সূর্য উঠল। নরম আলো ছড়ানো শান্ত সমুদ্রের জলে। রোদ চড়া হ'তে লাগল। শাঙ্কো সাঁতরে চলল।

ওদের জাহাজের কাছে যখন এল তখন রাজার জাহাজ অনেক দূরে। নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। চারদিকে তাকাচ্ছে তখনই হঠাৎ দেখল জলের ওপর চলন্ত পাখনা। শাঙ্কোর বুক কেঁপে উঠল। হাঙর। জল কেটে ঘুরছে। শাঙ্কো ভালো ক'রে আবার চারিদিকে তাকাল। না। আর কোন চলন্ত পাখনা জল কেটে ছুটছে না। শাঙ্কো যখন সাঁত্‌রাতে শুরু করে তখন তরোয়ালটা কোমরে গোঁজা ছিল। কিন্তু হাত পা চালিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে পায়ে খাপছাড়া খোলা তরোয়ালের খোঁচা লেগে কেটে ছড়ে যাচ্ছিল। তরোয়ালটা নানাভাবে পিঠের নিচে পোশাকে ঢুকিয়ে বুকের কাছে পোশাকে ঢুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। এতে পরিশ্রমই বেশি হতে লাগল। তরোয়ালের খোঁচার হাত থেকে বাঁচা গেল না। কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় সমুদ্রের নোনা জল লেগে ভীষণ জ্বালা করছিল। তখন শাঙ্কো তরোয়ালটা ফেলে দিয়েছিল। এখন বুঝল -- খুব ভুল হয়েছে। হাঙরের কামড় থেকে বাঁচবার আর কোন উপায় রইল না। শাঙ্কো সাহস সঞ্চয় করল। এখন ভয় পেলে চলবে না। হাঙর যাতে দূরে দূরে স'রে যায় তার জন্যে শাঙ্কো জলে দু'পা দাপাতে দাপাতে সাঁত্‌রাতে লাগল। এতে হাঙরটা দ্রুত আক্রমণ করতে পারল না। শাঙ্কোর চারপাশে পাক খেতে লাগল। বুঝে নিচ্ছে -- লোকটা সশস্ত্র কিনা।

জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল মারিয়া। সারারাত ঘুমোয় নি মারিয়া। রেলিঙের ধারে কখনো বসেছে, কখনও উঠে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টি খাঁড়ির মুখের দিকে। ফ্রান্সিসরা ফিরল কিনা। শাঙ্কোকে প্রথম মারিয়াই দেখতে পেল। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে ডাকল, -- বিস্কো -- তোমরা শিগগির এসো। শাঙ্কো সাঁতরে আসছে। মারিয়ার ডাকে ডেক-এ ঘুমন্ত ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল।

মারিয়া তখনই দেখল শাঙ্কোর ঠিক ডান পাশে হাতকয়েক দূরে হাঙরের চলন্ত পাখনা। ভয়ে মারিয়ার বুক কেঁপে উঠল। মারিয়া কারো জন্যে অপেক্ষা না করে ছুটে হালের কাছে গেল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে দ্রুত নেমে এল দড়িবাঁধা একটা নৌকোয়। দড়ি খুলে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল।

ততক্ষণে বিস্কো ও আরো পাঁচ ছ'জন ভাইকিং রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে মারিয়া নৌকো চালিয়ে চলেছে শাঙ্কোর দিকে। ওরা প্রথমে বুঝল না মারিয়া এত দ্রুত নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে কেন। তখনই হাঙরের পিঠের চলন্ত পাখনা জলের ওপর ভেসে উঠল। ওরা চমকে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হাঙর! বিস্কো চিৎকার করে বলল, -- রাজকুমারী -- হাতের দাঁড়টা জলে জোরে জোরে ফেলুন যাতে বেশিদূর পর্যন্ত জল ছিটকোয়। হাঙর তাড়াবার এসব নিয়ম মারিয়ার জানার কথা নয়। বিস্কো বার বার চিৎকার ক'রে কথাটা বলতে লাগল। মারিয়া বিস্কোর নির্দেশমত তাই করতে লাগল। সত্যি হাঙরটা দূরে সরে গেল। ততক্ষণে শাঙ্কো নৌকোর গায়ে হাত রেখেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে নৌকোর ওপরে কোমর পর্যন্ত তুলে লাফিয়ে উঠল। তারপর পা দু'টো তুলে নৌকোর গলুইয়ের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল। একেবারে মড়ার মত পড়ে রইল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। চোখবোঁজা। মারিয়া নৌকো চালাল ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে। জাহাজ থেকে তখন সমস্ত ভাইকিংরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল -- ও -- হো -- হো --। ওরা চিৎকার ক'রে মারিয়াকে উৎসাহ দিতে লাগল।

মারিয়ার নৌকো জাহাজের গায়ে এসে লাগল। মারিয়া হালের কাছে এসে হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে জাহাজে উঠে এল। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে ঝুলে পড়ে নৌকোটায় নামল। ততক্ষণে ভাইকিং বন্ধুরা জালের মত বাঁধা দড়িদড়া নামিয়ে দিল নৌকোর ওপর। বিস্কো শাঙ্কোকে অনেক কষ্টে ধ'রে ধ'রে দাঁড় করিয়ে সেই দড়ির জালে বসিয়ে দিল। বন্ধুরা দড়ি টেনে টেনে শাঙ্কোকে জাহাজের রেলিঙের কাছে নিয়ে এল। তারপর ওকে টেনে ধরে নামিয়ে জাহাজের ডেক-এ শুইয়ে দিল। বিস্কো ততক্ষণে নৌকো থেকে জাহাজের ডেক-এ উঠে এসেছে। বিস্কো আর দু'তিনজন ভাইকিং শাঙ্কোকে কাঁধে ক'রে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে চলল। আস্তে আস্তে ওরা শাঙ্কোকে নামিয়ে এনে ওর কেবিনঘরে নিয়ে গেল। গায়ের ভেজা পোশাক খুলে ওকে শুকনো পোশাক পরিয়ে দেওয়া হ'ল। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। শাঙ্কো অসাড় শুয়ে রইল। সকলের মনেই তখন প্রশ্ন -- ফ্রান্সিস হ্যারির কী হ'ল? ওরা কোথায়? কিন্তু ঐ অবস্থায় শাঙ্কোকে কিছু জিজ্ঞেস করা বৃথা। ও তখন কথাও বলতে পারছে না। ও চোখ বুঁজে তখনও হাঁপাচ্ছে। হাত পা ছড়িয়ে একইভাবে পড়ে আছে।

ভয়ে আশঙ্কায় মারিয়ার বুক কাঁপছে তখন। এতক্ষণের উত্তেজনায় যে কথা মারিয়া ভুলে গিয়েছিল সেটাই মনে পড়ল তখন। ফ্রান্সিস হ্যারির কী হয়েছে? পুরুষ ভাইকিং বন্ধুরা দুঃসাহসী। কিন্তু মারিয়া তো মেয়ে। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিস্কো সান্ত্বনা দিতে লাগল -- কাঁদবেন না রাজকুমারী। আপনাকে কাঁদতে দেখলে শাঙ্কো আরো নিস্তেজ হ'য়ে পড়বে। মারিয়া দু'হাতে চোখ মুছে শান্ত হবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস হ্যারির কথা মনে হতেই আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল।

একটু পরে শাঙ্কো আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। বিস্কো শাঙ্কোর মুখের ওপর ঝুঁকে চেঁচিয়ে থেমে থেমে বলল -- শাঙ্কো -- ফ্রান্সিস আর হ্যারি -- ভালো থাকলে -- মাথাটা আস্তে আস্তে -- ওঠানামা করো। বিস্কো কথাটা দু'বার বলল। বিস্কোর কথা শেষ হ'তেই মারিয়া আর অন্য ভাইকিং বন্ধুরা সাগ্রহে শাঙ্কো মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো

অনেক কষ্টে একটু হাসল -- তারপর আস্তে মাথা ওঠানামা করল। সবকিছু ভুলে ভাইকিং রা চিৎকার ক'রে উঠল -- ওহো - হো --। মারিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নিজের কেবিনঘরে চলে এল। আস্তে আস্তে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। ফোঁপাতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা আস্তে আস্তে ডেক-এ উঠে এল। ওরা তখন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'ল যে ফ্রান্সিস আর হ্যারির কোন বিপদ হয়নি। ওরা ভালো আছে।

ওদিকে নুরাঘির সৈন্যদের ঘরে ঘাসের বিছানায় ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। পাশে হ্যারি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে দু'একটা পাখির ডাক শোনা গেল। রাত শেষ হ'য়ে এসেছে। দোনিয়া তখনও ঘুমুচ্ছে। দোনিয়ার একজন সঙ্গী শুয়ে আছে। অন্য সঙ্গীটা দু হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে।

ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে ভাবছে তখনও। এরপরে ওরা কী করবে? রাজা এনজিও কী বিচার করবে কে জানে। ঠিক তখনই দোনিয়া মুখে কী বিড়বিড় ক'রে বলে পাশ ফিরল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকাল। হঠাৎই মনে হ'ল -- দোনিয়া কে তা তো জানা হয়নি। সৈন্যদের দলপতি দোনিয়াকে 'আপনি' ক'রে বলছিল। তার মানে দোনিয়া সামান্য মাছ-ধরা পেশার জেলে নয়। দোনিয়ার পরিচয়টা তো পেতে হবে। উনি জেলেদের পোশাক পরে জেলেদের সঙ্গে গভীর রাতে নৌকোয় চড়ে ঘুরে বেড়ান কেন?

ফ্রান্সিস উঠে বসল। হাঁটুতে হাত রেখে মাথা পেতে বসে ছিল দোনিয়ার যে সঙ্গীটি তার হাত ধ'রে একটু টানল। লোকটা মাথা তুলল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় বলল, -- ভাই। তুমি স্পেনীয় ভাষা জানো? লোকটি মাথা কাত ক'রে স্পেনীয় ভাষায় বলল, -- হ্যাঁ -- তবে কাজচলা গোছের। -- আমার তা'তেই হবে -- ফ্রান্সিস বলল, -- আচ্ছা ভাই -- দোনিয়া কে? কেনই বা তোমরা গভীর রাতে নৌকোয় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে? লোকটি বলল, -- সেসব দোনিয়া জানেন। তবে দোনিয়ার কথা বলছি -- শুনুন। একটু থেমে লোকটা বলতে লাগল -- দোনিয়া এখানকার প্রাচীন এক অভিজাত বংশের সন্তান। কিন্তু উনি বরাবরই বংশের আভিজাত্যের ব্যাপারটা মানতেন না। উনি তিনচারটে ভাষা জানেন। লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। অবসর সময়ে আমাদের জেলেপল্লীতে চাষীদের বাড়িতে চলে আসেন। আমাদের সুখদুঃখের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। নিজের উচ্চ বংশ নিয়ে উনি কখনও গর্ব করেন না। অন্য অভিজাত পরিবারের বাড়িতে উনি কখনও যান না। এই সাসারির এমন-কি রাজধানী কাগলিয়ারির গরিব মানুষেরা দোনিয়াকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু গভীর রাতে নৌকোয় চড়ে এই খাঁড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়ান কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

-- দোনিয়া মাঝে মাঝেই মূল ভূখণ্ডের জেনোয়া পিসায় চলে যান। লোকে বলে উনি নাকি ওখানে পড়াশুনো করতে যান। লোকটি থামল। তারপর বলতে লাগল -- মাস ছয়েক আগে তিনি হঠাৎই ফিরে আসেন। একদিন সন্ধেবেলা আমাদের জেলে পাড়ায় আসেন। আমরাও তাঁর কাছে গেলাম। উনি বললেন -- একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমার কয়েকজন সাহসী সঙ্গী চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য করবে? আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলাম। সেই রাতেই তিনি আমাদের দু'জন বন্ধুকে নিয়ে গেলেন। এরকম ক'রে দিন কয়েক পরে পরেই রাত হ'লে আসেন আর দু'জন করে সঙ্গী বেছে নিয়ে যান। লোকটি থামল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল -- গত সাতদিন ধ'রে আমরা দু'জন তাঁর সঙ্গে আছি।

-- কী কর তোমরা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

-- রাত একটু বাড়লেই এই ক্যালে মানে খাঁড়ির ধারে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা নৌকোয় চড়ে খাঁড়িটায় ঘুরে বেড়াই। এসময় দোনিয়া একটা লম্বা দড়ির মাথায় বাঁধা লোহার বড় বড় বঁড়শির মত কী যেন খাঁড়ির জলের নিচে ফেলে দেন। তারপর নৌকো চলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দড়িবাঁধা বঁড়শিগুলো টেনে নিয়ে চলেন। সারারাত এই বঁড়শিটানা চলে। ভোর হবার আগেই নৌকো লুকিয়ে রেখে চলে আসি আমরা।

-- কিন্তু বঁড়শি টেনে দোনিয়া কি কিছু খোঁজেন? ফ্রান্সিস বলল।

-- হ্যাঁ, একদিন রাতে আমি জানতে চাইলাম -- দোনিয়া – সারা রাত জেগে বঁড়শি ফেলে আপনি কী খোঁজেন? দোনিয়া বললেন -- তোমরা ঠিক বুঝবে না। শুধু এটুকু জেনে রাখো আমি কয়েকটা যোদ্ধামূর্তি খুঁজছি। কথাটার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। লোকটি থামল। ফ্রান্সিস আপন মনে বলল -- যোদ্ধামূর্তি! ফ্রান্সিস বার বার জানতে চাইল সেই যোদ্ধামূর্তি লোহার না অন্য কোন দামি ধাতুর তৈরি। লোকটি বারবারই মাথা নেড়ে বলল -- সে সব আমরা কিছুই জানি না। দোনিয়া সব জানেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকাল। দেখল—দোনিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে। দোনিয়া চোখ খুলে দু'হাত ওপরে তুলে হাই তুলল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল--দোনিয়া - যদি কিছু মনে না করেন আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানার ছিল। দোনিয়া ফ্রান্সিসসের দিকে তাকাল। বলল - বলুন। — আপনার সঙ্গীর কাছে শুনলাম - আপনি এই সার্দিনিয়ার এক অভিজাত পরিবারের মানুষ। দোনিয়া সামান্য হাসল, একটু মাথা নেড়ে বলল— অভিজাত হ'লেই সে হৃদয়বান সৎ নির্লোভ মানুষ হয় না। কত অভিজাত মানুষ দেখেছি - নৃশংস, লোভী অর্থপিশাচ অত্যাচারী। বংশের আভিজাত্য নয় — একজন মানুষের পরিচয় তার কথায় ব্যবহারে মানবিকতাবোধে। দোনিয়া কথা থামিয়ে দরজার দিকে তাকাল। দেখল - বাইরে রোদ উঠেছে। তবে ঘরটার অন্ধকার এখনও সবটা কাটে নি। মশালও নেভানো হয় নি।.

তখনই দু'জন সৈন্য সাধারণ পোশাকে ঘরে ঢুকল। তাদের হাতে চীনে মাটির বড় থালা বাটি। তাতে সকালের খাবার। থালায় গোল কাটারুটি, বাটিতে বিভিন্ন শাকসব্জির ঝোলমত। খাবার থালাগুলো সঙ্গীদের সামনে বিছানায় রাখল ওরা। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। হ্যারি উঠে বসলো। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। সকলেরই খুব খিদে পেয়েছে তখন।

ফ্রান্সিস খেতে খেতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ঘরের সৈন্যরা জেগে আছে। ফ্রান্সিস ভাবল সৈন্যদের সামনে দোনিয়াকে সব জিজ্ঞেস করে জানাটা ঠিক হবে না। দোনিয়াও হয়তো সব কথা বলতে চাইবে না। ফ্রান্সিসদের খাওয়া হ'য়ে গেল। একটা বড় কাঠের পাত্র থেকে ওরা জল নিল। সৈন্য দু'জন চলে যেতেই ঘর প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। বিছানার কোনার দিকে দুজন সৈন্য তখনও ঘুমুচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল — হ্যারি, একটা বেশ রহস্যময় ঘটনার কথা শুনেছি। পরে তোমাকে সব বলবো। ফ্রান্সিস এবার দোনিয়াকে বলল - আপনার অনেক কথাই আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু যোদ্ধামূর্তির ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। দোনিয়া চোখ খুলে বলল — আমার সঙ্গী এ ব্যাপারটা আপনাকে না বললেই ভালো হত। যাক গে, আমার শুধু একটাই প্রশ্ন — আপনার এই ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন? এবার হ্যারি বলল, — দেখুন - ওর নাম ফ্রান্সিস। আমার বাল্যবন্ধু। ফ্রান্সিস এর আগে অনেক রহস্যের সমাধান করেছে। মূল্যবান সোনার ঘন্টা, গুপ্তধন ফ্রান্সিস আবিষ্কার করেছে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে। — হুঁ - তাহলে মূল্যবান ধনভাণ্ডার নিখোঁজ মূল্যবান জিনিসের প্রতি আপনার লোভ আছে। দোনিয়া বলল। — বিন্দুমাত্র না

--ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল। -- তবে আপনার আগ্রহ হয় কেন? দোনিয়া বলল। — বলতে পারেন এটা আমার এক জীবনদর্শন। আমি ভালোবাসি ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, দেশবিদেশের মানুষের সঙ্গ, তাদের ভালোবাসা পাওয়া। স্বার্থান্ধ হয়ে কারো কোন ক্ষতি আমি কোনদিন করি নি, করবোও না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। হ্যারি বলল, এসব ফ্রান্সিসের মুখের কথা নয়। এসব ওর গভীর বিশ্বাসের কথা। ফ্রান্সিসের সঙ্গে মিশলেই আপনি ওকে ঠিক বুঝতে পারবেন। দোনিয়া একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, — দেখুন যোদ্ধামূর্তির ব্যাপারটা বুঝতে হলে আপনাকে এই সার্দিনিয়ার অতীত ইতিহাস একটু জানতে হবে।

— আমার অনুরোধ, আপনি সব বলুন। আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা মজার কথা বলি। অতীতে গ্রীক ব্যবসায়ীরা এই সার্দিনিয়া দ্বীপের নাম দিয়েছিল ইচনুসা অর্থাৎ মানুষের পায়ের ছাপ। এই দ্বীপটি দেখতে ওরকমই। প্রায় দু'শো বছর আগের ঘটনা — দোনিয়া আস্তে আস্তে বলতে লাগল — তখন সার্দিনিয়ার রাজা প্রথম ফ্রেডারিক। স্পেনের দোনিয়া অঞ্চলের আরবীয় সুলতান মুজাহিদ সার্দিনিয়া আক্রমণ করেছিল। কয়েকটি যুদ্ধজাহাজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুজাহিদ প্রথমে এই সাসারি বন্দর আক্রমণ করে সহজেই এই উত্তর সার্দিনিয়া দখল করে নিয়েছিল। রাজধানী কাগ্‌লিয়ারি দক্ষিণ সার্দিনিয়ায়। সেখানে যতদিনে খবর পৌঁছল ততদিনে মুজাহিদ্ এই উত্তর সার্দিনিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছিল। রাজা প্রথম ফ্রেডারিক কাগ্‌লিয়ারি থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এখানে এসেছিলেন স্থলপথে। তাঁতে বেশ সময় লেগেছিল। যাহোক – মুজাহিদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফ্রেডারিকের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল এই সাসারিতে। যুদ্ধে ফ্রেডারিক হেরে গিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে একটা ছোট জাহাজে চড়ে অনেক কষ্টে পালাতে পেরেছিলেন। তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন মূল ভূখণ্ডের জেনোয়ায়। বছরখানেক পরে জেনোয়া আর পিসার শাসকদের সহায়তায় অনেক যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য নিয়ে তিনি সাসারি আক্রমণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে মুজাহিদের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছিল। সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল সাসারির এই অঞ্চল দিয়ে। সেই সুযোগে মুজাহিদ একটা ছোট্ট জাহাজে চড়ে স্পেনে পালাতে পেরেছিল। এই হল ইতিহাসের ঘটনা। দোনিয়া থামল।

— আমার মনে হয় এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নিশ্চয়ই আছে। হ্যারি বলল। মাথা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে দোনিয়া বলল- ঠিক। এবার শুনুন সেটা। মুজাহিদ যখন সাসারি দখল করে তখন এখানে এই নুরাঘিটা তো ছিলই আর একটা নুরাঘি ছিল খাঁড়ির বাঁদিকের তীরে। কী কারণে জানা যায় না সেই নুরাঘিটার অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছিল। এখন তো প্রায় ধ্বংসস্তূপ। এই নুরাঘিটা তখনও ভেঙে পড়ে নি। মুজাহিদ তার লোকজন দিয়ে এই নুরাঘিটা খুব মজবুত করেছিল। এই নুরাঘির দোতলায় সে তার রাজসভা বসাত। একেবারে ওপরের ঘরটা ছিল ফ্রেডারিক প্রতিষ্ঠিত গির্জা। এখনও সেই গির্জা আছে। গির্জায় যিশুর মূর্তি এখনও আছে। বেদীর কাছেই ছিল সাতটি ঝুলন্ত সৈন্যমূর্তি। সেই সৈন্যমূর্তিগুলোয় দু'টো রুপোর হাতলমতো দিয়ে, ঘা দিয়ে দিয়ে একজন বাদ্যকর সুন্দর সুরধ্বনি তুলতেন। গির্জার ঘন্টার কাজ করত সেই সুরধ্বনি। প্রতিদিন ভোরবেলা একজন নির্দিষ্ট বাদ্যকর এই বাজনা বাজাতেন। সেই সুরধ্বনি নিশ্চয়ই ছিল স্বর্গীয়। নিশ্চয়ই এক গভীর সান্ত্বনার পরিবেশ সৃষ্টি হত এখানে। আমাদের দুর্ভাগ্য আজকের আমরা কেউ সেই সুরধ্বনি শুনিনি। দোনিয়া থামল। — কেন বলুন তো? ফ্রান্সিস বলল।

— কারণ মুজাহিদ সেই সাতটি সৈন্যমূর্তি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যখন সে একটা ছোট জাহাজে চড়ে পালাচ্ছিল। দানিয়া বলল।

— মূর্তিগুলো কি মূল্যবান ছিল? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

— হ্যাঁ, সবকটাই ছিল সোনার। প্রায় একফুট করে উচ্চতা ছিল মূর্তিগুলোর। শুধু পঞ্চম সৈন্যমূর্তিটি ছিল উচ্চতায় চারফুট আর শুধু ওটাই ছিল নিখাদ সোনার। কাজেই সবচেয়ে মূল্যবান। দোনিয়া বলল।

— তাহ'লে তো মুজাহিদ সেসব মূর্তি নিজের দেশেই নিয়ে চলে গেছে। হ্যারি বলল।

— এতদিন আমরাও তাই শুনে এসেছি। কিন্তু বছরখানেক আগে পিসার এক অভিজাত পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় পড়াশুনো করবার সময় আমি একটা আরবী ভাষায় লেখা জোতিষবিদ্যার চামড়ায় তৈরি গ্রন্থে হঠাৎই একটা ছেঁড়া পাতা পাই। একটা চিঠি। আলগা চামড়ায়, লেখা। গ্রন্থটায় গুঁজেরাখা।

— কার চিঠি? ফ্রান্সিস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

— চিঠিটা আমার পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে। বলছি শুনুন। দোনিয়া আস্তে আস্তে বলতে লাগল —

ভাই আবু —

সার্দিনিয়া অঞ্চলের সকলেই জানে সে সুলতান মুজাহিদ গির্জা হইতে সাতটি সোনার সৈন্যমূর্তি চুরি করিয়া স্পেনে লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুজাহিদ সাসারি হইতে পলাইবার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সুলতানের কয়েকজন দেহরক্ষী সৈন্য একটি হালভাঙা জাহাজ জোগাড় করিয়া ছিল। সেই জাহাজের পিছনে একটি নৌকা বাঁধা ছিল।

তখন গভীর রাত্রি। আমরা সকলেই সাসারির নুরাঘিতে সুলতানের সঙ্গে জাগিয়া ছিলাম। সকলেরই চিন্তা কী করিয়া সাসারির খাঁড়ি পার হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িব।

ভাগ্য ভাল। হঠাৎই সমুদ্রের উপর প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসিয়া সাসারির বন্দর এলাকায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। সুলতান মুজাহিদ আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন — এই সুযোগ। জাহাজ ছাড়। সুলতান নুরাঘি হইতে বাহির হইলেন। আমরা সুলতানের পিছনে পিছনে আসিতেছিলাম। হঠাৎ সুলতান আমাদের কয়েকজনকে বলিলেন গির্জা হইতে সমস্ত সোনার সৈন্যমূর্তিগুলি লইয়া পিছনের নৌকায় রাখ। আমরা ছুটিয়া গিয়া গির্জায় উঠিলাম। সবগুলি সৈন্যমূর্তি খুলিয়া লইয়া ছুটিতে লাগিলাম জাহাজ-ঘাটার দিকে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কোনরকমে মূর্তিগুলি নৌকায় রাখিলাম। সুলতান এই সংবাদ পাইয়া জাহাজ চালাইতে হুকুম দিলেন।

অন্ধকারে প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জাহাজ চলিল। দু'ই-পার্শ্বের পাহাড়ি এলাকা হইতে তখনও রাজা ফ্রডারিকের সৈন্যরা স্লিংএ চড়াইয়া বড় বড় পাথরের টুকরা আমাদের জাহাজ নৌকা লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝেই ছুঁড়িতেছিল। একটা বড় পাথরের চাঁই আমাদের নৌকার মুখে আসিয়া পড়িল। জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে ঝড়ের প্রবল ধাক্কায় আমাদের নৌকা কাত হইয়া ডুবিতে লাগিল। নৌকায় আমার একমাত্র সঙ্গীটিকে বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলাম না।

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া অন্ধকারের ঝড়বিক্ষুব্ধ খাঁড়ির জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আজ আর আমি জানি না কীভাবে আমি তীরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলাম।

যাহা হউক, আমি সাসারিতে কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া ছিলাম। এক্ষণে আমি

পিসায় আসিয়া নিম্নলিখিত সরাইখানায় আছি। তুমি আমাদের দুইজনের পরিচিত কয়েকজনকে লইয়া আমার পত্র পাওয়ামাত্র পিসায় আস। সাসারির ঐ খাঁড়ি অঞ্চলে নৌকায় চড়িয়া সন্ধান করিতে পারিলে আমরা সাত সৈন্যমূর্তি জলের তলা হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। মূর্তি গলাইয়া সোনা বিক্রয় করিয়া আমরা অচিরেই ধনী হইতে পারিব।

তোমরা আসিলে নিখোঁজ সাত মূর্তির সন্ধান আরম্ভ করিব।

ইতি — মুবারক।

দোনিয়া এত বড় চিঠি নির্ভুল মুখস্থ ব'লে গেল এই শুনে ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই বেশ আশ্চর্য হল। হ্যারি বলল—

— দোনিয়া, - আপনি শুধু বিদ্বান নন, জ্ঞানীও।

দোরিয়া মৃদু হাসল।

— তারপর আপনি কী করলেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— আমিও আগ্রহী হলাম। স্থির করলাম, - আমিও চেষ্টা করবো ঐ সাত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের জন্যে । মাসকয়েক আগে আমি সাসারিতে এলাম। গেলাম রাজধানী কাগলিয়ারিতে। রাজা এনজিওর সঙ্গে দেখা করলাম। মুবারকের চিঠির কথা বললাম না। শুধু বললাম - কোন এক সূত্র থেকে আমি জানতে পেরেছি যে মুজাহিদ সাত স্বর্ণমূর্তি নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারে নি। সাসারির খাঁড়ি অঞ্চলে যে নৌকোয় রেখে স্বর্ণমূর্তিগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা ঐ খাঁড়ি অঞ্চলে কোথাও ডুবে গিয়েছিল। আমার স্থির বিশ্বাস - ঐ সাত মূর্তি আছে ঐ খাঁড়ি অঞ্চলেই জলের নিচে কোথাও। আপনি অনুমতি দিলে আমি সন্ধানকার্য চালাতে পারি। রাজা এনজিও তো খুশিতে আটখানা। একটুক্ষণ থামলো দোনিয়া। ফ্রান্সিস আস্তে বলল - বুঝলাম পরে রাজা সম্মতি দেন নি। দোনিয়া ম্লান হেসে বলল - আপনি বেশ বুদ্ধিমান। ঠিকই অনুমান করেছেন। একটু থেমে দোনিয়া বলতে লাগল— আসলে ছোটবেলা থেকেই সংসারের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। গানবাজনা পড়াশুনা এসব নিয়েই থাকতাম। তাই স্বার্থান্ধ মানুষ কতটা নীচ হীনমনা হতে পারে এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা গড়ে ওঠে নি। যাক গে, - রাজা এনজিওর বয়স কম। রাজাকে চালায় স্পিনোলা নামে অভিজাত পরিবারের এক প্রৌঢ়। পরের বার দেখা করলাম রাজা এনজিওর সঙ্গে। আবার অনুমতি চাইলাম। রাজা এনজিও বলল - কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে ঐ খাঁড়িতেই সাত সৈন্য মূর্তি নিয়ে নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল ? বুঝলাম স্পিনোলা রাজাকে অন্যরকম বুঝিয়েছে। বললাম - আমি সন্ধানকার্য চালাবো। যদি মূর্তিগুলো না পাই তাহলে তো আমারই পণ্ডশ্রম। কতদিন ধ'রে এই সন্ধানকার্য চালাতে হবে কে জানে। আমি যদি নিশ্চিতই না হবো তাহলে বোকার মত এত

কষ্ট স্বীকার করবো কেন? এবার স্পিনোলা একটু হেসে বললেন - আচ্ছা দোনিয়া- এত কষ্ট ক'রে আপনি সোনার মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে চান কেন?

— আমাদের দেশের সম্পদ, তাই। আমি বললাম। স্পিনোলা বললেন - বুঝলাম। ধরুন ঐ মূর্তিগুলো উদ্ধার করলেন। ঐ সোনার মূর্তিগুলো বিশেষ ক'রে সবচেয়ে বড় নিরেট সোনার মূর্তিটা - অনেক মূল্য ঐ মূর্তিগুলোর। আপনি সে সব উদ্ধার ক'রে কী করবেন? বিক্রি ক'রে আরো বড়লোক হবেন? আমি বললাম, -না - আমি সেসব রাজা এনজিওকে দেব। বদলে সমমূল্যের অর্থ তিনি আমাকে দেবেন। এবার রাজা এনজিও বলল, সেই অর্থ নিয়ে আপনি কী করবেন? এবার আমি আসল কথাটা বললাম— ঐ অর্থ দিয়ে আমি এখানকার দরিদ্র জেলেদের বেশ শক্তপোক্ত নৌকো তৈরি করিয়ে দেবো, মাছধরার উন্নতমানের সাজসরঞ্জাম দেবো যাতে তারা গভীর সমুদ্রে গিয়ে নিশ্চিন্তে বেশি মাছ ধরতে পারে। উত্তর সার্দিনিয়ায় আমি ঘুরে বেড়াবো ও চাষযোগ্য জমি উদ্ধার করবো। চাষিদের চাষবাসের ভালো সরঞ্জাম কিনে দেবো যাতে তারা বেশি ফসল ফলাতে পারে। জেলে ও চাষিদের বসতি এলাকার বাড়িঘর নতুন করে তৈরি করিয়ে দেবো। চিকিৎসা আর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে দেবো যাতে দরিদ্র জেলে আর চাষিরা সুখে স্বচ্ছন্দে তাদের জীবন কাটাতে পারে। আমার স্বপ্নের কথা আশা আকাঙক্ষার কথা রাজা এনজিও কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনল। স্পিনোলা হেসে উঠলেন -- এ সব আপনার মুখের কথা। মূর্তিগুলো পেলে আপনি সেসব নিয়ে সাসারি থেকে পালিয়ে জেনোয়া কি পিসায় চলে যাবেন। সেসব গালিয়ে বিক্রি করে বিদেশে গিয়ে রাজার হালে বাকি জীবন কাটাবেন। স্পিনোলার কথা শুনে দুঃখে বেদনায় চোখে জল এসে গেল। মানুষ এত নীচ হয়?

— রাজা এনজিও কী বললেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

— সেদিন কিছু বলল না। কয়েক দিন পরে আসতে বলল। গেলাম কয়েকদিন পরে। রাজা এনজিও পরিষ্কার বলল - আমরা ভেবেচিন্তে দেখলাম। শুধু আপনার মুখের কথার ওপর বিশ্বাস করে আমি অনুমতি দিতে পারবো না। আমি বললাম - অত মূল্যবান মূর্তিগুলো জলের নিচে পড়ে থাকবে? আমি বেশ দুঃখের সঙ্গেই বললাম। স্পিনোলা বলে উঠলেন - আপনার অনুমান তো সত্যি নাও হ'তে পারে। মুজাহিদ হয়তো সেই মূর্তিগুলো নিয়ে নিজের দেশ স্পেনে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। দোনিয়া থামল। হ্যারি বলল - তারপর? দোনিয়া বলল - আমি নানাভাবে রাজা এনজিওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রাজা এনজিও আমাকে কিছুতেই অনুমতি দিলনা। বুঝলাম - গোপনেই আমাকে এই সন্ধান চালাতে হবে। তাই কয়েকজন পরিচিত জেলেকে নিয়ে রাতের পর রাত জেগে নৌকোয় চড়ে সন্ধান চালাতে লাগলাম।

— তারপর? হ্যারি বলল। দোনিয়া বলল - জানি না কী ক'রে আমার এই গভীর রাতে সন্ধানের কথা স্পিনোলার কানে গেল। স্পিনোলা সঙ্গে সঙ্গে রাজা এনজিওকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন। তারপর রাজা এনজিওর ব্যক্তিগত জাহাজটায় রাজাকে নিয়ে এখানে এলেন। এখানকার রাজপ্রাসাদে এসে উঠলেন। নৌবাহিনীর চারজন বাছাই করা সৈন্যকে হুকুম দিলেন যে ক'রেই হোক আমাকে বন্দী করতে হবে। ঐ সৈন্যদের হাত থেকে বারকয়েক পালাতে পেরেছিলাম। গত রাতে আর পারলাম না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তাই ধরা পড়তে হল। দোনিয়া থামল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর হ্যারি বলল - আমরা দুঃখিত। আমাদের জন্যই আপনারা ধরা পড়লেন। দোনিয়া কোন কথা বলল না।

ফ্রান্সিস সমস্ত ঘটনাটা ভাবল। তারপর বলল - দোরিয়া আপনার অন্তঃকরণ মহৎ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার মত মানুষ আমি কমই দেখেছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল - তবে আপনি কিছু ভুল করেছেন। একেবারে সাদা মনের মানুষ ব'লে রাজা এনজিওকে আপনি সব কথাই বলেছেন। স্পিনোলার মত মানুষ সেই সুযোগটাই নিয়েছেন। তবে মুবারকের চিঠির ব্যাপারটা গোপন করে খুব বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। স্পিনোলা চিঠির কথা জানতে পারলেই আপনার কাছে মূল চিঠিটা চাইতেন, আপনিও দিতেন। তখন স্পিনোলা নিজেই ঐ মূর্তি উদ্ধারের কাজে লাগতেন। আপনার সব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত। দোনিয়া মাথা ওঠানামা করল। বলল - আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—

— যদি কিছু না মনে করেন তাহলে বলি।

— বলুন। দোনিয়া বলল।

— স্বর্ণমূর্তির মূল্যের সমান অর্থ দিতে আপনি রাজা এনজিওকে বলেছিলেন।

কোন কথা না বলে দোনিয়া মাথা ওঠানামা করল।

এক্ষেত্রে সমমূল্য চাওয়াটা কিন্তু ভুল হয়েছে। আপনার মত উদার মন তো সকলের নয়। স্পিনোলা এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছেন। রাজাকে বুঝিয়েছেন আপনার সমান মূল্যের অর্থ চাওয়া মানেই আপনি অর্থলোভী। হয়তো দরিদ্র জেলে চাষিদের জন্য কিছু খরচ করবেন বাকি অর্থ আপনি নিজে আত্মসাৎ করবেন। দোনিয়া একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল - হ্যাঁ - স্পিনোলা যে রকম মানুষ তাতে রাজাকে এরকম ভুল বোঝাতে পারেন।

-- সবচেয়ে ভালো হত যদি আপনি মোট মূল্যের চারভাগের একভাগ চাইতেন। তা'হলে স্পিনোলা রাজাকে আপনার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারতো না। স্পিনোলা তো বটেই রাজা এনজিও নিজেও অর্থগৃধ্নু। তিনভাগ অর্থ দিতে হবে না এই ভেবেই তাঁরা খুশি হতেন। আপনাকে অনুমতি দিতেন। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একটুক্ষণ ভাবল। বলল - তা ঠিক। কিন্তু চারভাগের একভাগ তো খুব বেশি নয়।

-- সেটা মূর্তিগুলো উদ্ধারের পর সোনা দেখে সঠিক মূল্য পেয়ে হিসেব করে বোঝা যেত। এখনো তো মূর্তিগুলো উদ্ধারই করা যায় নি। আগে নিখোঁজ মূর্তিগুলো তো উদ্ধার করুন। ফ্রান্সিস বলল।

-- দেখি আপনার কথাটা ভেবে। দোনিয়া বলল। হ্যারি বলল - দেখুন দোনিয়া - এত বড় খাঁড়িটায় শুধু ঐ দড়িবাঁধা বঁড়শিগুলো দিয়ে খুঁজে খুঁজে কি মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবেন?

-- জানি না পারবো কি না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি ঠিকই বলেছে। অতবড় খাঁড়ির জলে কোথায় ডুবো নৌকাটা। একটা বড়শি ফেলে ফেলে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এভাবে কতদিন আর খোঁজ চালিয়ে যেতে পারবেন। তাছাড়া আপনাকে খোঁজ চালাতে হবে রাতে। রাতের পর রাত জেগে কতদিন পারবেন?

-- কিন্তু আমাকে যে গোপনেই খোঁজ চালাতে হবে। দোরিয়া বলল।

-- ঠিক আছে। রাজা এনজিওর কাছে তো আমাদের নিয়ে যাওয়া হবেই। তখন আমি চেষ্টা করবো রাজার অনুমতি আদায় করতে। শুধু আপনি আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আমাকে সমর্থন করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

-- বেশ। কিন্তু আপনি কি পারবেন অনুমতি আদায় করতে? দোনিয়া বলল।

-- দেখি চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল - দেখ ফ্রান্সিস, আমার কেমন মনে হচ্ছে নৌকোটা সোনার মূর্তিগুলো নিয়ে খাঁড়ির কোথায় ডুবে গিয়েছিল তার কোন না কোন সূত্র মুবারক নিশ্চয়ই কোথাও যেভাবে হোক রেখে গেছে।

-- আমারও তাই বিশ্বাস। তবে সব না দেখে শুনে এখনই ঠিক বলতে পারছি না মুবারক কোথায় কীভাবে জায়গাটার হদিশ রেখে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

-- আচ্ছা এও তো হতে পারে যে মুবারক তার বন্ধুদের সাহায্যে পরে জলের তলা থেকে মূর্তিগুলো সব তুলে নিয়ে গেছে। হ্যারি বলল।

-- আমার তা' মনে হয় না। কারণ সেই চিঠিটা মুবারক লিখেছিল তার স্বদেশের বন্ধুদের কাছে - স্পেনের দোনিয়ায়। কিন্তু চিঠিটা আমি পেয়েছি পিসায়। চিঠিটা যদি স্পেনে চলেই যেত তাহলে পিসায় চিঠিটা আমি পেতাম না। দোনিয়া বলল।

ফ্রান্সিসরা কথাবার্তা বলছে তখনই একজন সৈন্য এসে বলে গেল ওরা যেন স্নানখাওয়া সেরে নেয়।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হল। চিনে মাটির বড় থালায় বড় বড় দু'টো গোল রুটি। বাটিতে ভেড়ার মাংস ঝোল। ঐ ঘরেই ঘাসের বিছানায় বসে ওরা খেতে লাগল। খেতে খেতে হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এবার কী করবে?

-- সেটা নির্ভর করছে রাজা এনজিও কী বলে তার ওপর। ফ্রান্সিস বলল।

-- যদি মূর্তি উদ্ধার করতে দিতে সম্মতি দেয়? হ্যারি বলল।

-- তাহলে লেগে পড়বো। ফ্রান্সিস বলল।

-- কিন্তু মারিয়া আর বন্ধুরা কি আর এই সার্দিনিয়ায় অপেক্ষা করতে চাইবে? হ্যারি বলল।

-- দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি আর কিছু বলল না।

ওদের খাওয়া শেষ হল। তখনই একজন বেশ মোটা দাড়িগোঁফঅলা একজন সশস্ত্র লোক ঘরে ঢুকল। তার পেছনে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য। দোনিয়া গলা নামিয়ে আস্তে বলল - ইনিই সেনাপতি। সেনাপতি বেশ গম্ভীর ভঙ্গীতে বলল - দোনিয়া - আপনারা আর ঐ বিদেশীরা চলুন। রাজা এনজিও আপনাদের প্রাসাদে নিয়ে যেতে বলেছেন।

-- আমাদের কি বন্দী করা হবে? দোনিয়া বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল।

-- এখনো তো আপনাদের হাত পা বাঁধা হয়নি। রাজা এনজিও পরে যা হুকুম দেবেন তাই হবে। সেনাপতি বলল। নুরাঘি থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিসরা পাথরবাঁধানো পথ দিয়ে চলল। সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে কয়েকজন সৈন্য। সবার সামনে সেনাপতি। সেনাপতির শিরস্ত্রাণ আর বুকে বাঁধা বর্ম পেতলের। সৈন্যদের মত লোহার নয়।

পথের দু'পাশে পাথরের বাড়িঘর। এখানে লোকের বসতি আছে। বাড়ির জানালা দরজা দোকান থেকে লোকজন ফ্রান্সিসদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ওরা দোনিয়াকে চেনে এটা ওদের মুখ দেখেই বোঝা গেল। ফ্রান্সিসদের চেহারা পোশাক দেখে ওরা একটু আশ্চর্য হল। এই বিদেশীদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন এটা ওরা বুঝে উঠতে পারল না।

পাথুরে পথ ধরে কিছুটা যেতেই একটা ঘাসেঢাকা উপত্যকামত। সেখানেই ছাই ছাই রঙের পাথরে তৈরি একটা লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। বেশ বড় বাড়ি। বোঝা গেল এটাই এখানকার রাজপ্রাসাদ। রাজা এনজিও এখন এখানেই আছেন।

প্রাসাদের বেশ বড় সদর দরজাটা খোলা। দরজাটা ওক কাঠের। কাঠের দরজায় কুঁদে

কুঁদে পাতা ফুল লতার পাখির নকশা তোলা। দরজার দু'ধারে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরীরা। সকলেই মাথা একটু নুইয়ে সেনাপতিকে সম্মান জানাল।

সদর দরজাটা পার হতে একটা পাথরবাঁধানো চত্বর। তারপর একটা পাথরের তৈরি ঘর। ঘরে ঢোকার দরজার পাশে দ্বাররক্ষী দু'জন। ওদের হাতে চক্‌চকে পেতলের বর্শা। দ্বাররক্ষী দু'জনও সেনাপতিকে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল।

চত্বর পার হচ্ছে যখন তখনই ফ্রান্সিস দোনিয়াকে জিজ্ঞেস করল -- রাজা এনজিও কি এখানেই বরাবর থাকেন?

-- না। রাজধানী কাগলিয়ারিতে বিরাট প্রাসাদে থাকে। আমার নিখোঁজ মূর্তি সন্ধানের খবর পেয়ে মাস তিনকে হল এখানে এসেছে। উদ্দেশ্য -- আমাকে বন্দী করা। রাজার সৈন্যদের হাত থেকে বার কয়েক পালিয়েছি। কাল রাতেই ধরা পড়ে গেলাম। দোনিয়া বলল।

ওরা ঘরটায় ঢুকল। প্রশস্ত ঘর। মেঝের পাথরে মোজেকের কাজ করা। লোহার গরাদ বসানো পাথরের জানালা দিয়ে রোদ পড়েছে ঘরটার একপাশে। ঘরটার শেষের দিকে এক মানুষ সমান উঁচু পিঠঅলা চেস্টনাট কাঠের সিংহাসন। তার গায়ে কুঁদে কুঁদে নানা কাজ করা। সিংহাসনের লাল ভেলভেট-ঢাকা আসনে রাজা এনজিও বসে আছে। ফ্রান্সিস দেখল রাজাকে। বয়েস বেশি নয়। ওদেরই বয়েসী। দুধেআলতায় গায়ের রঙ। মুখে দাড়িগোঁফ কামানো। মাথায় তিনকোনা-ওঠা সোনার মুকুট। গায়ে দামি কাপড়ের সোনারুপোর সুতোর কাজ করা। গলায় মুক্তোর মালা। সিংহাসনের বাঁপাশে পাথরের কয়েকটা আসন। আসনগুলো নীল ভেলভেট কাপড়ে ঢাকা। আসনে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। গায়ে হলুদরঙের জোব্বামত। মাথার চুল দাড়িগোঁফ সব সাদা। ফ্রান্সিস বুঝল - ইনিই স্পিনোলা। রাজা এনজিওর পরামর্শদাতা। সম্মানিত অমাত্য।

ফ্রান্সিসদের সিংহাসনের সামনে নিয়ে আসা হল। সেনাপতি মাথা অনেকটা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় এক নাগাড়ে কী বলে গেল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে বলল - সেনাপতি কীভাবে আমাদের ধরা হয়েছে তার কথা বলল। আমাদের কথাও জানাল। আমরা বিদেশি এটাও বুঝেছে কিন্তু কোন দেশি তা জানেনা। রাজা এনজিও আর স্পিনোলা দু'জনেই মন দিয়ে সেনাপতির কথা শুনলেন।

রাজা দোনিয়ার দিকে তাকাল। বলল - দোনিয়া, আপনি আমার সম্মতি না নিয়ে যা করে চলেছিলেন তা'তে অন্য কেউ হ'লে তাকে কয়েদঘরে পাঠাতাম। নেহাৎ আপনি সার্দিনিয়ার এক অভিজাত বংশের সন্তান। ঐ শাস্তি আপনাকে দেব না। তবে শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। এবার স্পিনোলা গলা খাঁকারি দিল। হেসে বলল--মাননীয় রাজা মহাশয়, অভিজাত পরিবারের হলেও পরিবার পরিজনদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই।

চাষাভুষো জেলেদের সঙ্গেই তাঁর যত সম্পর্ক। যাক--গে মনে হয় একটা শাস্তি দিলেই দোনিয়াকে শায়েস্তা করা যাবে।

-- ঠিক আছে। বলুন সেটা কী? রাজা বলল।

-- দোনিয়া কোনদিন এই সাসারিতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাসারিতে তাকে দেখলেই বন্দী করা হবে এবং তৎক্ষণাৎ বিনা বিচারে এখানকার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হবে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথাবার্তা বুঝিয়ে বলছিল। স্পিনোলা যে কত বড় ধূর্ত আর কুচক্রী স্পিনোলার বক্তব্য শুনেই ফ্রান্সিস বুঝল। দোনিয়াকে যদি সাসারিতে ঢুকতে না দেওয়া হয় তাহলে দোনিয়ার সব চেষ্টাই বানচাল হয়ে যাবে। কারণ এই সাসারির খাঁড়িতেই তো জলের তলায় রয়েছে সাত সৈন্যমূর্তি। ফ্রান্সিস এও বুঝল যে এক্ষুণি এই শাস্তিদান বন্ধ করতে হলে ওকে এগিয়ে আসতে হবে। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল -রাজাকে বলো যে আমরা স্পেনীয় ভাষায় কিছু বলতে চাই। উনি এবং স্পিনোলা যেন স্পেনীয় ভাষায় যা বলার বলেন। হ্যারি ডান হাতটা তুলে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রাজা বলল,-- হ্যাঁ। শুনলাম তোমরা বিদেশি। তোমরা কোন্ দেশের লোক এবং এখানে এসেছো কেন?

-- আমরা জাতিতে ভাইকিং। হ্যারি বলল। রাজা স্পিনোলাকে বলল - স্পিনোলা, ভাইকিংদের কথা আপনি জানেন?

হ্যাঁ, মহামান্য রাজা। এরা খুব দুঃসাহসী। জাহাজ চালনায় কোন জাতিই এদের সমকক্ষ নয়। তবে এদের দুর্নামও আছে জাহাজ লুণ্ঠনকারী বলে। স্পিনোলা বলল। হ্যারি বলল, মহামান্য রাজা, - শৌর্যেবীর্যে আমাদের সঙ্গে যারা পেরে ওঠেনা তারাই আমাদের দুর্নাম দেয়। একটু থেমে হ্যারি বলল -- আমরা বীরের জাতি। বীরত্বকে মানবিকতাকে বিশ্ববাসীর ভ্রাতৃত্ববোধকে শ্রদ্ধা করি। হ্যারি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল - এর নাম ফ্রান্সিস। আমার বাল্যবন্ধু। ফ্রান্সিস অনেক রহস্যের সমাধান করেছে। শুধু সাহসে ভর ক'রে অনেক মহামূল্যবান গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। ফ্রান্সিস আপনাকে কিছু বলতে চায় স্পেনীয় ভাষায়। আপনিও ঐ ভাষায় আপনার বক্তব্য বলুন।

-- বেশ। রাজা বলল। তারপর ফ্রান্সিসকে বলল - তোমরা এখানে এসেছো কেন? ফ্রান্সিস বলল - মহামান্য রাজা - আমরা দূর দূর দেশে ঘুরে বেড়াই। কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডার বা নিখোঁজ মূল্যবান কিছুর সংবাদ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল। স্পিনোলা হেসে বলল - তারপর সেসব লুকিয়ে চুরিয়ে দেশে পাচার কর।

-- খুবই দুঃখ পেলাম মাননীয় স্পিনোলা। সৎ, নির্লোভ মানুষও যে পৃথিবীতে আছে এটা বোধহয় আপনি বিশ্বাস করেন না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল। স্পিনোলা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। শূন্যে ডানহাতটা ঘুরিয়ে ফ্রান্সিসের কথাটা উড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস বলল -- যাকগে, - আমার একটা নিবেদন আছে।

-- বলো। রাজা বলল।

-- মহামান্য রাজা, - ফ্রান্সিস বলতে লাগল - দোনিয়ার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সাত সোনার যোদ্ধামূর্তির কথা শুনেছি। পরে আরো কিছু জানতে হবে। দোনিয়া দীর্ঘ ছ'মাস আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই মূর্তিগুলো জলের তলা থেকে উদ্ধার করতে পারেন নি। আমার মনে হয় - প্রায় দুশো বছর আগে ডুবে যাওয়া ঐ মূর্তিগুলি শুধুমাত্র কয়েকটা বঁড়শি ডুবিয়ে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্য কোন সূত্র চাই।

-- কোন্ সূত্র? স্পিনোলা বললেন।

--সেটা আমি এখুনি বলতে পারছি না। তার জন্যে আমার সময় প্রয়োজন। রাজা

বলল--তুমি কি সেই চেষ্টা করতে চাও নাকি?

-- তাহলে তো ভালোই হয়। স্পিনোলা বললেন।

-- কিন্তু মহামান্য রাজা -- আপনি অনুমতি না দিলে তো তা হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

-- ধরো, - আমি অনুমতি দিলাম। রাজা বলল।

-- তাহ'লে আমি আমার স্ত্রী ও কয়েকজন বীর বন্ধুকে নিয়ে সেই মূর্তিগুলোর সন্ধান চালাবো।

-- মূর্তিগুলোর মোট মূল্য কত জান? স্পিনোলা বলল।

-- আমি সে সব জানা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারলে আমি সব মহামান্য রাজাকেই দেব। কারণ সেসব এই দেশের রাজার সম্পত্তি। ফ্রান্সিস বলল।

-- তোমরা তো পারিশ্রমিক চাইবে। স্পিনোলা বললেন।

-- একটি স্বর্ণমুদ্রাও চাইবো না। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। স্পিনোলা বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কত কষ্ট ক'রে এত মূল্যবান মূর্তিগুলি উদ্ধার করবে অথচ একটা স্বর্ণমুদ্রাও নেবে না - এরকম বোকা লোক আছে না কি? ফ্রান্সিস বলল - তবে দোনিয়া তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি আপনাদেরই দেশবাসী। তিনি নিশ্চয়ই কিছু পারিশ্রমিক চাইতে পারেন।

-- দোনিয়া সোনার মূর্তিগুলির সমমূল্যের অর্থ চেয়েছিলেন। আমি তা দেবনা। রাজা বলল। ফ্রান্সিস বলল - ঠিক আছে। দোনিয়ার হয়ে আমি বলছি - আমরা তো কিছু নেব না শুধু দোনিয়াকে আপনারা সমমূল্যের চারভাগের এক ভাগ অর্থ দেবেন। দোনিয়া তাতেই সম্মত হবেন।

স্পিনোলা নিজের আসন থেকে উঠে রাজার কাছে গেলেন। দু'জনের চাপা গলায় কী কথাবার্তা হ'ল। স্পিনোলা নিজের আসনে ফিরে এলেন। রাজা বলল - ঠিক আছে। আমিও এই প্রস্তাবে সম্মত। স্পিনোলা বললেন, দোনিয়া; আপনি পরে বেঁকে বসবেন না তো? ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল -- মান্যবর স্পিনোল, আমরা কিন্তু এখনও অন্ধকারে। মূর্তিগুলো জলের তলায় কোথায় আছে আমরা এখনো তার বিন্দুবিসর্গও জানিনা। উদ্ধার করা তো অনেক পরের কথা। রাজা ও স্পিনোলা ফ্রান্সিসের কথা শুনে বেশ বিব্রত হ'ল। স্পিনোলা একটু কেশে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। মহামান্য রাজা এই প্রস্তাবে তাঁর সম্মতির কথা তো আগেই জানিয়েছেন। এখন কথা হ'ল আপনারা কীভাবে সন্ধান চালাবেন।

-- সে সব আমরা ভেবে স্থির করবো। ফ্রান্সিস বলতে লাগল - শুধু মহামান্য রাজাকে অনুরোধ, আপনি আমাদের একটা বেশ শক্তপোক্ত নৌকো দেবেন। আমার স্ত্রী আমাদের জাহাজেই থাকবেন। শুধু সন্ধান চালাবার সময়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। দোনিয়া সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা এই নুরাঘিতেই থাকবো। আর সারাদিন যতক্ষণ সম্ভব খোঁজাখুজি করব। রাতে নয়। দোনিয়া রাতের অন্ধকারে গোপনে সন্ধানের কাজ চালিয়েছিলেন। সেইজন্যই ব্যর্থ হয়েছেন।

-- তুমি কি মনে করো তুমি পারবে? স্পিনোলা বললেন।

-- আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে এখন না । সব জেনে দেখে শুনে তবেই আমি বলতে পারবো - এটা সম্ভব কি না। ফ্রান্সিস বলল।

-- ঠিক আছে। দেখা যাক। স্পিনোলা মাথা ওঠানামা করে বলল। ফ্রান্সিস এবার রাজাকে বলল - মহামান্য রাজা। আর একটি অনুরোধ - আপনি হুকুম জারি ক'রে দিন

আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেউ যেন বাধা না দেয়।

-- বেশ। হুকুম জারি করা হবে। রাজা বলল। তারপর একটু ভেবে বলল - আমি তো এখানে আর বেশিদিন থাকতে পারবো না।। আমাকে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। তাই বলছিলাম - মূর্তিগুলো খুঁজে উদ্ধার করতে কতদিন লাগবে?

-- আমি দিন সাতেক সব দেখেশুনে মোটামুটি কতদিন লাগবে তা আপনাকে বলতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

-- বেশ। তোমরা এবার যেতে পারো। রাজা বলল।

ফ্রান্সিসরা মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে এল। দেখল - রাজপ্রাসাদের সামনে মোটামুটি সমতল উপত্যকাটা ঘাসে ঢাকা। সেখানে উষ্ণীষ বর্ম পরে কোমরে তরোয়াল গুঁজে প্রায় পঁচিশ তিরিশজন সৈন্য কুচকাওয়াজ করছে। ফ্রান্সিস বুঝল - গ্রীক সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা রণকৌশল এখানকার সব রাজারাই গ্রহণ করেছে। ও ভাবল দেশে ফিরে গিয়ে ওদের রাজাকে এই ভাবেই সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে বলবে।

সেনাপতি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছিল। ফ্রান্সিস দোনিয়াদের দেখে এগিয়ে এল। বলল - দোনিয়া, আপনাদের জন্যে এই নুঘিয়াতেই একটা ঘর নির্দিষ্ট করেছি। আপনারা ওখানেই থাকবেন।

নুরাঘির সদর দরজার কাছে এল সবাই। ফ্রান্সিস বলল - দোনিয়া - আপনি আপনার সঙ্গীদের নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে বলুন। এখন থেকে আমরাই আপনার সঙ্গী। দোনিয়া তার সঙ্গীদের বলল - ভাই, তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছো। এবার তোমরা ঘরে যাও। এই বিদেশী বন্ধুরা এখন থেকে আমাকে সাহায্য করবে। দেখি মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারি কিনা। দোনিয়া ডান হাতটা বাড়াল। সঙ্গী দু'জন তার হাতটা ধ'রে একটু মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেল।

সবাই নুরাঘিতে ঢুকল। সেনাপতির নির্দেশে একজন সৈন্য ওদের নিয়ে চলল। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে সবাই ওপরে উঠল। বাঁদিকে একটা ছোট ঘর। সৈন্যটি ঘরটা দেখিয়ে বলল - আপনারা এই ঘরে থাকবেন। সৈন্যটি চলে গেল।

ঘরে ঢুকল সবাই। মেঝেয় কয়েকটা কাঠের তক্তার ওপর দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধা বিছানামত। ওপরে মোটা কাপড় পাতা। ফ্রান্সিস বাঁদিকের গরাদ-আঁটা প্রায় চৌকোনো ছোট জানালাটা দিয়ে তাকাল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খাঁড়ি, সমুদ্র, খাঁড়ির মুখে রাজার জাহাজ। ওদের জাহাজটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রের জোর হাওয়া ঢুকছে ঘরটায়।

ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বিছানায় দোনিয়া আর হ্যারি বসে পড়েছে। ফ্রান্সিসও এসে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। মাথার পেছনে দু'হাত রেখে পাথরের ছাত দেখতে লাগল।

ঘরটা ছোট। কিন্তু তিনজনের পক্ষে খুব ছোট নয়। ফ্রান্সিস সমুদ্রের দিকে জানালাটার দিকে তাকাল। তখনই নজরে পড়ল - জানালাটার পাশে পাথুরে দেয়ালে বেশ অস্পষ্ট কী যেন লেখা। সব বিষয়েই ফ্রান্সিসের খুব কৌতূহল। ও তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। জানালার ধারে গেল। পাথুরে দেয়ালের অস্পষ্ট লেখাগুলো দেখতে দেখতে বলল - দোনিয়া, এখানে কি কিছু লেখা আছে। দোরিয়া হেসে বলল - সংগীত সুর এসব সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলে বুঝতেন ওগুলো স্বরলিপি।

-- গানের? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

-- না। সুরের। একটু চুপ ক'রে থেকে দোনিয়া বলল -এখানকার রাজপ্রাসাদের মাটির নিচের ঘরে ভেড়ার চামড়ায় প্রাচীন ল্যাতিন ভাষায় লেখা কিছু ছেঁড়াখোরা গ্রন্থ পেয়েছিলাম। সে সব খুব সম্ভব এই প্রাসাদ যিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন সেই রাজা ফ্রেডারিক যত্ন ক'রে সংরক্ষণ করেছিলেন। রাজা ফ্রেডারিক সংগীতবোদ্ধা ছিলেন। সুর সঙ্গীত ভালোবাসতেন। নিজেও গ্রীক দেশীয় বীণা বাজাতে পারতেন। সেই ছিন্ন গ্রন্থগুলি থেকে সার্দিনিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। দোনিয়া থামল।

-- কিন্তু এই দেয়ালে লেখা স্বরলিপিগুলি কার লেখা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। দোনিয়া বলল - বলছি। রাজা ফ্রেডারিক এই সাসারিতে খুব প্রাচীন একটা ব্রোঞ্জের সৈন্যমূর্তি পেয়েছিলেন। অনেক ভেবে ঐ রকম সাতটি সুর বাজে এরকম সাতটি সৈন্যমূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন পিসার এক কর্মকারকে দিয়ে। তাই ওটা ছিল বড় আর নিখাদ সোনার মূর্তি। পঞ্চম সুরধ্বনিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

-- তাহ'লে ঐ সৈন্যমূর্তিগুলোই আমরা খুঁজে বের করবো? হ্যারি জানতে চাইল।

-- হ্যাঁ । দোনিয়া বলল - সাতটি সুর বেজে ওঠে এরকম সেই মূর্তিগুলো ওপরের গির্জায় রাখলেন। সেগুলো বাজাবার জন্যে জেনোয়া থেকে এক বাদ্যকরকে এনেছিলেন। বাদ্যকর প্রথম প্রথম নাকি ভালো বাজাতে পারতেন না। আস্তে আস্তে সেই বাদ্যকর অপূর্ব সুরমূর্ছনা সৃষ্টি করতে শিখলেন। দোনিয়া থামল। তারপর বলল - দেয়ালে লেখা ঐ স্বরলিপি সেই বাদ্যকরের।

-- বলেন কি ? এতো অনেকদিন আগের কথা। ফ্রান্সিস বলল।

-- হ্যাঁ, আরো শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই বাদ্যকর তখন ছিলেন অন্ধ। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই চমকে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। দু'জনেই নির্বাক তাকিয়ে রইলো দেয়ালের গায়ে লেখা বেশ অস্পষ্ট স্বরলিপিগুলোর দিকে।

-- সেই বাদ্যকর এই ঘরেই থাকতেন। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস হ্যারির চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর।

বিকেল হয়ে এল। ওরা তিনজনেই বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছিল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

-- আমাদের জাহাজে যাবো। বন্ধুদের তো বোঝাতে হবে সৈন্যমূর্তির কথা, সেগুলো উদ্ধারের কথা। তার জন্যে এখানে তো থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

-- রাজকুমারী মারিয়া, বন্ধুরা রাজি হয় কিনা দেখ। হ্যারি বলল।

-- হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর দোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল - দোনিয়া আপনিও আমাদের জাহাজে আসুন। আজ রাতটা জাহাজে থাকবো আমরা। কালকে সকাল থেকে কাজে নামবো।

-- বেশ - চলুন। দোনিয়া রাজি হ'ল।

তিনজনে নুরাঘি থেকে বেরিয়ে এল। সামনের পাথরের ঘাটে দেখল একটা সুন্দর নৌকো বাঁধা। দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল - এটা কাল রাতের সেই রাজার নৌকো। রাতের অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যায় নি। এখন দেখল - নৌকোর দু'পাশে ছ'ইঞ্চি লোহা দিয়ে বাঁধানো। দু'কোনায় দু'টো শক্ত দাঁড়। নৌকোর গলুইয়ের ওপর দামি কাঠের আচ্ছাদন। তার ওপর ঘাসের গদিমত পাতা। শৌখিন নৌকো। তবে বেশ মজবুত।

একজন সৈন্য এগিয়ে এল। দোনিয়াকে বলল - মহামান্য রাজা এই নৌকোটা আপনাদের ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন। ফ্রান্সিস নিজেদের নৌকোটা খুঁজল। দেখল, একটু

দূরে ওদের নৌকোটা আর দোনিয়ার নৌকোটা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। ফ্রান্সিস বলল - হ্যারি, - আমাদের নৌকোটা তুমি নিয়ে এসো। আমাদের অনেক সুখদুঃখের সঙ্গী এই নৌকোটা। নতুন নৌকো পেয়ে এটাকে তো ভুলে যেতে পারি না।

সবাই ঘাটে নামল। ফ্রান্সিস রাজার নৌকোটায় উঠল। হ্যারি ওদের নৌকোয়। দোনিয়া তার নৌকোয়। দোনিয়ার নৌকোয় রয়েছে তার সেই বড় বড় বড়শিবাঁধা লম্বা দড়িটা।

ওরা নৌকো বেয়ে চলল খাঁড়ির মুখের দিকে। একটু পরই ওরা রাজার জাহাজের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে পড়ল। নৌকোগুলো চালাল ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন। পশ্চিম আকাশ তখন লালে লাল। মধ্য আকাশে অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে হালকা মেঘগুলোয়। মনে হচ্ছে যেন পাহাড় বন নদীর ছবি। নৌকো বাইতে বাইতে আকাশে এই রঙের খেলা দেখছিল ফ্রান্সিস। হঠাৎই ওর মনটা ভারি হ'য়ে উঠল। দেশের কথা বাড়ির কথা মনে পড়ল। বাড়িতে থাকলে এসময় ও বাগানের শ্বেতপাথরের আসনটায় এসে বসে। মনে পড়ল - কতদিন মার সঙ্গে ঐ আসনে বসে আকাশে তারা ফুটে উঠতে দেখেছে। অবশ্য শীতের দেশ ওদের। সবসময় আকাশে তারা দেখা যায়না। তাই যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে তারা দেখা যায় সেদিন ফ্রান্সিসের খুব আনন্দ হত। মাও হেসে বলতো- দ্যাখ্ - আজ আমি তোর পাশে আছি - তাই তারা দেখতে পেলি। একদিন হঠাৎই এসময় মা বলেছিল, জানিস্ - এই পৃথিবীতে যারা মানুষের উপকার করে সব মানুষকেই ভালোবাসে কাউকে দুঃখ দেয় না, কারো ক্ষতি করে না তারা মৃত্যুর পর আকাশের এক-একটি তারা হ'য়ে যায়। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে আবার তাকাল। অন্ধকার হ'য়ে আসছে আকাশ। তারা ফুটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসের দাঁড়- - বাওয়া হাত থেমে গেল। হ্যারি দোনিয়ার নৌকো অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন। ফ্রান্সিসের কী হল। - ও নৌকোয় উঠে দাঁড়াল - আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে প্রায় চিৎকার ক'রে বলে উঠলো - মা - কোন্ তারাটা তুমি? মা --। সমুদ্রের বাতাসের শব্দ ঢেউয়ের শব্দের মধ্যেও হ্যারি ফ্রান্সিসের গলার শব্দ চিনল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোয় উঠে পেছন ফিরে চিৎকার ক'রে ডাকল - ফ্রান্সিস? তখন ফ্রান্সিস ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ব'সে পড়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। হ্যারি ভীষণ চিন্তায় পড়ল। কী হ'ল ফ্রান্সিসের। ও নৌকো ঘোরাল। ফ্রান্সিসের নৌকোর কাছে এসে দেখল - ফ্রান্সিস দু'হাতে মুখ ঢেকে নৌকোয় বসে আছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসের নৌকোয় উঠতে গেল। কিন্তু হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। ও প্রায় সমুদ্রের জলে পড়ে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল সেটা। ও দ্রুত উঠে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, তুমি কাঁদছিলে?

-- হ্যাঁ। মার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ফ্রান্সিস আস্তে বলল। হ্যারি জোরে ফ্রান্সিসকে বুকে চেপে ধরল। ওর চোখেও জল।

দোনিয়াও নৌকো চালিয়ে ফিরে এল। অল্প আলোয় দুই বন্ধুকে কাঁদতে দেখল। দোনিয়া কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। ফ্রান্সিস বলল হ্যারিকে, তুমি আমার নৌকোতেই থাকো। আমাদের নৌকোটা পেছনে বেঁধে নিচ্ছি।

আবার তিনটে নৌকো চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। দোনিয়া ফ্রান্সিসকে বলল - সত্যি -আপনাদের বন্ধুত্বের গভীরতা অনুভব ক'রে আমি আশ্চর্য হলাম। ফ্রান্সিস ও হ্যারি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু। জাহাজের কাছাকাছি আসতে দেখল মারিয়া ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ফ্রান্সিসদের আসতে

দেখে বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল -ও -হো -হো- হো। মারিয়া হাসতে হাসতে হাতের রুমাল তুলে নাড়তে লাগল। মারিয়া সকাল থেকেই জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছিল। দুপুরে একবার খেতে গেছে শুধু। বিস্কোরা বারবার এসে বলেছে - রাজকুমারী - এভাবে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। মারিয়া কোন কথাই শোনেনি। অনড় দাঁড়িয়ে থেকেছে রেলিং ধ'রে।

ফ্রান্সিসরা জাহাজের ডেক-এ আসতেই বন্ধুরা ওদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস দোনিয়াকে দেখিয়ে বলল, মারিয়া, ইনি দোনিয়া। এই সার্দিনিয়ার এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। দোনিয়ার মত এমন উদার হৃদয়ের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। এবার দোনিয়াকে বলল, ইনি মারিয়া। আমাদের দেশের রাজকুমারী। আমার স্ত্রী। দোনিয়া হেসে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। বলল - রাজকুমারী। আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি আপনি অনেকদিন জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় এমন কোন রাজকুমারী দেখি নি যিনি রাজপ্রাসাদের বিলাসবাহুল্যের সুখের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে এভাবে জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মারিয়া একটু হেসে বলল- এই জাহাজের জীবন শুধু দুঃখকষ্টেরই নয়। কত নাম না-জানা দেশের কতরকম মানুষের সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ তা যেমন আনন্দের তেমনি রোমাঞ্চকরও। ফ্রান্সিস এই জীবন ভালোবাসে। তাই আমিও এই জীবন ভালোবাসি। দোনিয়া খুশির হাসি হেসে মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস মারিয়া আর দোনিয়াকে নিয়ে নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে তখনই হ্যারি ছুটে এল। বলল - ফ্রান্সিস, আমাদের কী হয়েছিল মোটামুটি বন্ধুদের বলেছি। কিন্তু ওরা বারবারই জানতে চাইছে জাহাজ এখন দেশের দিকে চালানো হবে কিনা। ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল, এই আনন্দের মুহূর্তে কিছু বলবো না। তুমি সবাইকে রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ডেক-এ আসতে বলো। ফ্রান্সিস মারিয়া আর দোনিয়াকে নিয়ে কেবিনঘরের দিকে চলল। ওদিকে বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। প্রায় সবারই এক কথা - আর নয়। এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাতে হবে। আমরা অনেকদিন দেশছাড়া। শুধু বিস্কো শাঙ্কো কোন কথা বলল না। ওদের এক চিন্তা - ফ্রান্সিস এখন কী করবে? দেশে ফেরার জন্যে পাগল এই বন্ধুদের কি ফ্রান্সিস শান্ত করতে পারবে?

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। পরস্পর ওরা মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে তখনই মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুদের কথাবার্তা থেমে গেল। নিস্তব্ধ চারদিক। শুধু সমুদ্রের হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ। ঢেউ জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়ার মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

আজকে চাঁদের আলো অনেকটা উজ্জ্বল। আলো পড়েছে সমুদ্রে জাহাজে ভাইকিংদের মাথায় গায়ে। ফ্রান্সিস তাকিয়ে দেখল এসব। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, - ভাইসব। - আমি ভালো করেই জানি মাতৃভূমির টান নাড়ির টান। তবু বলবো মাতৃভূমির নিশ্চিন্ত সুখী অলসের জীবন আমাকে কোনদিন টানে নি। ঐ জীবনকে আমি বেঁচে থাকা ব'লে মানি না। ফ্রান্সিস থামল। তারপর আস্তে আস্তে সব ঘটনা বলল। সার্দিনিয়ার অতীত ইতিহাস, দোনিয়া, রাজা এনজিও, স্পিনোলা, সাত মূল্যবান সৈন্যমূর্তি আর সেসব উদ্ধারের সঙ্কল্প সবই বলল। তারপর বলল - কাজেই আমাদের এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। ফ্রান্সিস থামল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল, - ফ্রান্সিস। - আমাদের এখানে কতদিন থাকতে হবে? ফ্রান্সিস বলল - তা তো এখনই বলতে পারবো না। সব দেখেশুনে যদি মনে করি খাঁড়ির জলে তলিয়ে যাওয়া মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবো তাহ'লেই

আমরা এখানে থাকবো। আমাদের দিন পাঁচ সাতেক সময় দাও। এর মধ্যে যদি বুঝি মূর্তি উদ্ধার করা অসম্ভব তাহ'লে সেইদিনই জাহাজ দেশের দিকে চালাবো। ফ্রান্সিস থামতেই ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে বলল - মূর্তি উদ্ধার হোক বা না হোক আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস অল্প হেসে বলল, মারিয়া -ঠিক এই কথাটাই আমি এতদিন তোমার কাছ থেকে আশা করেছি। তখনও ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে। হঠাৎ হ্যারি গলা চড়িয়ে ব'লে উঠল - ভাইসব। আস্তে আস্তে গুঞ্জন থামল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিসের সঙ্কল্পের কথা তোমরা শুনেছো। যদি এর পরেও তোমরা দেশে ফিরে যেতে চাও - যেতে পারো। আমি ফ্রান্সিস আর মারিয়া এখুনি নৌকোয় চড়ে সাসারিতে চলে যাবো। বলো, তোমরা থাকবে কি চলে যাবে? শাঙ্কো আর বিস্কো একসঙ্গে বলে উঠল - আমরা ফ্রান্সিসের সঙ্গে থাকবো। একটুক্ষণের নীরবতা। পরক্ষণেই চিৎকার ক'রে কয়েকজন বন্ধু ব'লে উঠল - আমরা ফ্রান্সিসকে ফেলে যাবো না। এবার সবাই একসঙ্গে বলে উঠল - ও-হো-হো-হো। মারিয়া বুঝতে পারল - ফ্রান্সিসকে ওর বন্ধুরা কত ভালোবাসে। ও হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিসও ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বন্ধুদের সংকল্পের ধ্বনি স্তিমিত হ'লে ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল - আমরা কাল সকালে সাসারিতে যাবো। থাকবো ঐ নুরাঘিটায়। দিনের বেলা খাঁড়ির জলে খোঁজ করবো জলের তলায় ডুবে যাওয়া নৌকোটা আর মূর্তিগুলো। কয়েকদিন ধ'রে খাঁড়ির দু'ধারেও খোঁজ চালাবো। তার মধ্যে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেতেও পারি যার সাহায্যে নিখোঁজ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবো। কাজেই কয়েকদিন না কাটলে আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না। দিন কয়েক পরে আমি জাহাজে আসবো। জানাবো - মূর্তিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব কিনা। যদি বুঝি সম্ভব নয় - আমরা দেশের দিকে জাহাজ চালাবো। ফ্রান্সিস থামলো। বন্ধুরা আবার ধ্বনি তুললো -ও-হো-হো-হো। সভা ভেঙে গেল। বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে অনেকেই নেমে গেল নিজের নিজের কেবিন ঘরে যাওয়ার জন্যে। অন্য বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ ব'সে রইল। ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের কেবিন ঘরে চলে এল।

পরদিন সকালের খাবার যাচ্ছে ফ্রান্সিস কেবিনঘরে বসে। মারিয়ার খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যারিও খাওয়া সেরে এল। বলল, - ফ্রান্সিস, - তোমার সঙ্গে কে কে যাবে? ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল, - মারিয়া তুমি আর বিস্কো। হ্যারি বলল শাঙ্কো আমাকে বারবার বলল ওকে যেন তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। হ্যারির কথা শেষ হ'তেই দোনিয়াকে নিয়ে শাঙ্কো ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, - শাঙ্কো, - তুমি তীর ছুঁড়তে ওস্তাদ। নিখুঁত তোমার নিশানা। কিন্তু আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। কাজেই তোমার বদলে এবার বিস্কোকে নিয়ে যাবো। জাহাজ পাহারার দায়িত্বে থাকবে তুমি। শাঙ্কো একটুক্ষণ মাথা গোঁজ করে থেকে বলল - ফ্রান্সিস - তোমার মত তো মানতেই হবে। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার। - না শাঙ্কো। - আমি সবদিক ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি দুঃখ করো না। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো আর কোন কথা বলল না।

খাওয়া শেষ ক'রে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। ও আর মারিয়া আগে থেকেই পোশাকটোশাক পরে তৈরি হ'য়ে ছিল। সবাই এবার সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। বিস্কোও তৈরি হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। ওর কোমরে তরোয়াল গোঁজা দেখে ফ্রান্সিস বলল, - বিস্কো, তরোয়াল রেখে যাও। আমরা তো এখন লড়াই করতে যাচ্ছি না। বিস্কো কোমর থেকে তরোয়াল খুলে একজন বন্ধুর হাতে দিল।

হালের কাছ থেকে দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হ'ল। ফ্রান্সিসরা একে একে নেমে এল। দোনিয়ার নৌকোয় ফ্রান্সিস আর দোনিয়া বসল। রাজার নৌকাটায় বসল হ্যারি মারিয়া আর বিস্কো। নৌকোর বাঁধন খুলে ফ্রান্সিসরা নৌকো বেয়ে চলল খাঁড়ির দিকে।

সমুদ্র আজ খুব শান্ত নয়। এলোমেলো জোর হাওয়া ছুটেছে। ঢেউ উঠছে। ঢেউয়ের দোলায় দোল খেতে খেতে নৌকো দু'টো চলল খাঁড়ির দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার জাহাজের কাছে এল ওরা। মারিয়া ব'লে উঠলো, দেখেছো - কী সুন্দর জাহাজ! হ্যারি বলল, - রাজকুমারী - ওটা সার্দিনিয়ার রাজা এনজিওর জাহাজ। জাহাজের রেলিং এর কাছে তখন সৈন্যরা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে ফ্রান্সিসদের। বিশেষ ক'রে মারিয়াকে। ওরা বুঝে উঠতে পারল না এরকম পোশাক পরা লোকগুলো আর মেয়েটি কোন্ দেশের?

রাজার জাহাজ ছাড়িয়ে নৌকো দু'টো খাঁড়িতে ঢুকল। ফ্রান্সিস ডাকল, - দোনিয়া? দোনিয়া নৌকোর মাঝখানে চুপ ক'রে বসেছিল। দাঁড় বাইছিল ফ্রান্সিস। দোনিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল - আপনি কীভাবে এই অদ্ভুত বঁড়শিগুলো দিয়ে মূর্তিগুলো খুঁজতেন? দোনিয়া নৌকোর মাঝখানে গোল ক'রে রাখা দড়ির মুখটা বের করল। বড় বড় বঁড়শীগুলো ঐ মুখে বাঁধা। দোনিয়া বঁড়শিটা জলে নামাল। দড়ি ছাড়তে লাগল। একটু পরেই দড়ি ছাড়া বন্ধ করল। তার মানে বঁড়শিগুলো মাটি ছুঁয়েছে। ফ্রান্সিস দড়ি ছাড়ার সময় হিসেব করে বুঝল - খাঁড়িটার জল খুব গভীর নয়। ফ্রান্সিস নৌকো বেয়ে চলল। দোনিয়াও বঁড়শির দড়ি টেনে নিয়ে চলল। তার মানে জলের নিচের মাটির ওপর দিয়ে বঁড়শিগুলো চলেছে। ফ্রান্সিস বুঝল ব্যাপারটা। ও বলল - দোনিয়া - আপনি দাঁড়ে বসুন। আমি বঁড়শি টানছি। ওরা জায়গা বদল করল। ফ্রান্সিস বঁড়শি টেনে টেনে চলল। হঠাৎ কী সে লেগে বঁড়শিটা আটকে গেল। ফ্রান্সিস দড়িতে জোর ঝুঁকুনি দিল তিন চার বার। বঁড়শি আটকে রইল। ফ্রান্সিস দড়িটা ধ'রে টানতে লাগল। বঁড়শিতে আটকে কী যেন উঠে আসছে। টেনে টেনে ফ্রান্সিস বঁড়শিগুলো জলের ওপরে তুলল। দেখল একটা বঁড়শিতে লম্বা জাহাজবাঁধা কাছি আটকে আছে। কালো কাদায় কাছিটা মাখামাখি হ'য়ে আছে। ফ্রান্সিস একটু হেসে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই জলেপচা কাছিটা ছিঁড়ে গিয়ে জলে ডুবে গেল। ফ্রান্সিস বঁড়শিগুলো জলে ফেলে আবার টেনে নিয়ে চলল। কিছুটা আসতেই আবার বঁড়শিগুলো কীসে আটকাল। আবার ফ্রান্সিস দড়ি টেনে তুলতে লাগল। জলের ওপরে উঠলে দেখা গেল বঁড়শিতে সমুদ্রের শ্যাওলা জড়ানো ঝুঁপড়ি ছোট গাছমত। আশ্চর্য! তা'তে কয়েকটা লাল হলুদ ফুল। রঙটা অবশ্য মরা মরা। তবু সমুদ্রের নিচে এরকম ক্ষুদে ফুলের গাছ! আশ্চর্য বৈকি! দোনিয়া হেসে বলল - সমুদ্রের নিচে মাটিতে কাদায় নাকি এরকম ফুল-ফোটানো ক্ষুদে গুল্ম আছে। মনে হয় কে যেন ফুলের বাগান ক'রে রেখেছে।

-- আপনি দেখেছেন? ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একইভাবে হেসে মাথা নেড়ে বলল, - না। আমার সব গ্রন্থ পাঠ ক'রে পাওয়া বিদ্যে।

নৌকো দু'টো নুরাঘির কাছে এল। ফ্রান্সিস আরো কয়েকবার বঁড়শি ফেলল। কিন্তু কোনকিছুতে আটকালো না। ফ্রান্সিস বলল, দোনিয়া। এই বঁড়শিগুলো দিয়ে কি মূর্তিগুলোর হদিশ করা যাবে? এত বড় খাঁড়ির জলে?

-- এছাড়া আর কোন উপায় তো এখনও ভাবতে পারিনি। তবে একটা ব্যাপার কি জানেন - সাত সাতটা মূর্তি। নিশ্চয়ই একসঙ্গে জড়িয়ে নিচের মাটিতে পড়ে নেই। বরং নৌকাডুবির সময় ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তত একটা মূর্তিরও হদিশ পাই যদি বাকি ক'টাও

কাছাকাছিই পাবো। ফ্রান্সিস একটু ভেবে বললেন - আপনার কথাটায় যুক্তি আছে। তবে এভাবে দীর্ঘদিন ধ'রে তল্লাসি চালাতে হবে। সেটা কি শরীরে সইবে? দোনিয়া কোন কথা না বলে মাথা ওঠা নামা করল।

খাঁড়ি পার হ'য়ে নৌকো দু'টো নুরাঘির সামনের ঘাটে এসে লাগল। ফ্রান্সিসরা নামল সবাই। ঘাটে নৌকো বেঁধে সবাই নুরাঘিটায় ঢুকল। মারিয়া তো আগে এখানে আসে নি। ও অবাক হ'য়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওপরে উঠল। নিজেদের ঘরটায় ঢুকল। মারিয়া জানালা দিয়ে বাইরের খাঁড়ি সমুদ্র দেখতে লাগল। বিস্কো বসল না। ও মারিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরেটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। হ্যারি দোনিয়া বসে রইল। ফ্রান্সিস দু'হাতে মাথা রেখে শুয়ে রইল। অনেক চিন্তা। কীভাবে মূর্তি উদ্ধারের কাজ শুরু করবে তাও ভাবতে লাগল।

দুপুরে খাবারদাবার নিয়ে সাধারণ পোশাক পরা দু'জন সৈন্য ঘরে ঢুকল। চিনে মাটির থালায় গোল ক'রে কাটা রুটি মাংসের ঝোল তরিতরকারির স্যুপ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। খেতে খেতে ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হ'ল - সৈন্যমূর্তিগুলো দেখতে কেমন তা তো জানা হয়নি। ভাবল, দুশো বছর আগেকার কথা। কাজেই নিজের চোখে দেখেছে এমন লোক পাওয়া অসম্ভব। তবু খেতে খেতে দোনিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, - আচ্ছা দোনিয়া। আপনি কি জানেন ঐ সৈন্যমূর্তিগুলো দেখতে কেমন ছিল?

-- ওপরের ঘরটা হচ্ছে গির্জা। রাজা ফ্রেডারিক ঐ গির্জাটা তৈরি করিয়েছিলেন। ওখানে গেলে একটা ছোট্ট সৈন্যমূর্তি দেখতে পাবেন। ব্রোঞ্জে তৈরি। ওটা ফ্রেডারিক নিজেই তৈরি করেছিলেন। তারপর পিসার এক কর্মকারকে নমুনা হিসেবে ওটা দিয়েছিলেন। ঐ মূর্তিটার মতই সোনার সাতটি মূর্তি সেই কর্মকার গড়িয়ে দিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক মূর্তিগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে সাতটা সুরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই কর্মকার কাজ করেছিল। মূর্তি তৈরি শেষ হ'লে গির্জায় এনে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ওপরে গির্জায় গেলে ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি আর সবই দেখতে পাবেন। দোনিয়া বলল। ততক্ষণে ফ্রান্সিসের খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি কাঠের পাত্র থেকে জল খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, - চলুন। আর সবাই অবাক। তখনো কারও খাওয়া হয় নি। মারিয়া বলল, - আরে বাবা - আগে খেয়ে নাও তো। ফ্রান্সিস সে কথায় কান দিল না। বলল, - দোনিয়া চলুন। দোনিয়া খেতে খেতে হেসে বলল, - ঠিক আছে। আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান। গির্জাটা দেখতে থাকুন। আমরা যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা না বলে দ্রুতপায়ে ঘরের বাইরে এল। দেখল এখানেও একটা বড় গোল ঘর। পাথরের মেঝের এখানে ওখানে শুকনো ঘাসপাতা বিছানা। প্রায় পনেরো কুড়িজন সৈন্য সাধারণ পোশাকে শুয়ে বসে আছে। এই ঘরেই বোধহয় সুলতান মুজাহিদের রাজসভা বসতো। ডানহাতে দেখল ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। এই সিঁড়ির পাথরের ধাপগুলো অনেক মসৃণ। ওপরের ঘরে উঠে দেখল ঘরটা গোল। কিন্তু খুব বড় নয়। গরাদ বসানো কয়েকটা জানালা দিয়ে আলো আসছে। সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখল সামনে একটা কাঠের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কাঠের মূর্তি। চেস্টনাট কাঠ কুঁদে কুঁদে তৈরি। বড় সুন্দর মূর্তিটি। বেদীতে সার দিয়ে মোমবাতি বসানো। কোনটাই জ্বলছে না। সমুদ্রের হাওয়ায় নিভে গেছে বোধহয়। শুধু একটা হলুদ রঙের মোটা বেশ বড় মোমবাতি জ্বলছে। বেদীটা থেকে কয়েক হাত সামনে দু'টো গোল কাঠের খুঁটিমত পোঁতা। খুঁটিতে একটা রুপোর তার টানা দিয়ে বাঁধা। তাতে

কয়েকটা রুপোর ছোট ছোট শেকল ঝুলছে। ফ্রান্সিস গুনে দেখল সাতটা শেকল। মাঝখানের শেকলটা বড় আর মোটা। ফ্রান্সিস এটার কারণ বুঝল না। গির্জাঘরের চারদিক বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

— কী? দেখলেন সব? পেছনে দোনিয়ার কথা শুনে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, - মারিয়া হ্যারি বিস্কোও এসেছে। ফ্রান্সিস সেই ঝোলা শেকলগুলো দেখিয়ে বলল, - দোনিয়া, এখানে নিশ্চয়ই কিছু ঝোলানো থাকতো?

— ঠিক ধরেছেন। নিখোঁজ সৈন্যমূর্তিগুলো ঝোলানো থাকতো। দোনিয়া বলল। তারপর বাঁদিকে পাথরের একটা তাকের দিকে যেতে যেতে বলল - এখানে আসুন। সবাই পাথরের তাকটার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকের ওপর একটা ইঞ্চি ছয়েক মূর্তি রাখা। ব্রোঞ্জের মূর্তি। কালচে রঙ এখন। দোনিয়া মূর্তিটা দেখিয়ে বলল - রাজা ফ্রেডারিক এই মূর্তিটা ব্রোঞ্জে ঢালাই ক'রে নিজে গড়েছিলেন। বলা হয় - জমিতে চাষ করার সময় পাদ্রিয়া নামে জায়গায় একজন কৃষক প্রাচীন একটা সৈন্যমূর্তি পেয়েছিল। তবে সেটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক নাকি সেই মূর্তিটার আদলে এই মূর্তিটা গড়েছিলেন। তারপরের কথা তো বলেছি। ফ্রান্সিস খুব আগ্রহের সঙ্গে মূর্তিটা দেখতে লাগল। সৈন্যমূর্তিটা দেখতে এরকম মারিয়াই প্রথম বলল - সৈন্যটার মাথায় বাঁকামত কী ওটা? — শিরস্ত্রাণ। - সিং এর মত দেখতে। হয়তো সে সময় যোদ্ধারা এরকম শিংএর মত শিরস্ত্রাণ পরতো। দোনিয়া বলল। হ্যারি বলল - এর আদলে যে সব সোনার মূর্তিগড়া হয়েছিল সেগুলো কি এর চেয়ে বড় ছিল?

— হ্যাঁ। প্রায় এক ফুট। পঞ্চম মূর্তিটা ছিল উচ্চতায় চার ফুট। সবচেয়ে বড়। দোনিয়া বলল। তারপর পাথরের তাকটার বাঁপাশ থেকে দু'টো রুপোর হাতামত বের করল। বলল - এই দুটো দিয়ে ঘা দিয়ে দিয়ে বাদ্যকর সুরধ্বনি তুলতেন। হাতামত জিনিশটা রেখে দিয়ে বলল - ফ্রান্সিস মূর্তিটার সিং দুটো লক্ষ্য করুন। দেখুন সিং দুটো পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে আছে। যে রুপোর শেকলগুলো ঝুলছে দেখে এলেন সেগুলোর নিচের কড়ার সঙ্গে ঐ সিংএর জোড়া জায়গাটা আটকে দেওয়া ছিল। একটু থেমে দোনিয়া বলল - এবার চলুন ঝুলন্ত শেকলগুলো দেখতে।

সেই খুঁটিতে ঝোলানো শেকলগুলোর কাছে এসে দোনিয়া বলল - দেখুন সাতটা শেকলে সাতটা যোদ্ধামূর্তি ঝুলতো। লক্ষ্য করুন - পঞ্চম শেকলটা মোটা আর বড়। ওটাতেই ঝুলতো সবচেয়ে বড় মূর্তিটা। ফ্রান্সিসরা বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখতে লাগল ঐ খুঁটি দুটো, ঝুলন্ত শেকলগুলো। মারিয়া ছোট থেকেই রাজপ্রাসাদের নৃত্য-গীতিশালায় নানা ঐক্যবাদনের অনুষ্ঠান শুনেছে। ও সহজেই কল্পনা ক'রে নিতে পারল দুশ বছর আগেকার সেই পরিবেশ - ঐ শেকলগুলোয় ঝুলছে সাতটি যোদ্ধামূর্তি। ভোরের নরম আলো ছড়িয়ে

পড়েছে বাইরের ছোট ছোট পাহাড়ে উপত্যকায় সমতলে মাটিতে ঘাসে আর এখানে এক অন্ধ বাদ্যকর মূর্তিগুলোতে ঘা দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলছে সপ্তসুরের এক স্বর্গীয় পরিবেশ। ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে চলল। মারিয়া তখনও দাঁড়িয়ে। আত্মমগ্ন। ফ্রান্সিস আস্তে ডাকল- মারিয়া - এসো। মারিয়া একটু চমকে ফিরে তাকাল ফ্রান্সিসদের দিকে। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মত যেন এল নামবার সিঁড়ির কাছে। সবাই নেমে এল।

পরদিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিসরা কাজে নেমে পড়ল। দোনিয়ার সঙ্গে বসল ফ্রান্সিস। রাজার নৌকোটায় বসল হ্যারি মারিয়া আর বিস্কো।

দোনিয়া ওর বঁড়শি টেনে টেনে চলল। দোনিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে ফ্রান্সিস বঁড়শি টেনে চলল। দুপুরে নুরাঘিতে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়া। বঁড়শি টানা। কিন্তু যোদ্ধামূর্তিগুলোর কোন হদিশই পাওয়া গেলনা। বিকেলে বিস্কো রাজার নৌকোয় মারিয়াকে নিয়ে জাহাজে রেখে আসে। সকালে আবার গিয়ে মারিয়াকে নিয়ে আসে।

দুদিন কাটল। কিন্তু একটা যোদ্ধামূর্তিও উদ্ধার করা গেলনা। দোনিয়ার তৈরি বঁড়শিতে উঠল জাহাজের কাদা ল্যাপটানো ভাঙা-নোঙর, জলেপচা হাতল জংধরা ঢাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল একটা জেলে নৌকো হঠাৎ হঠাৎ ঝুঁকেপড়া পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আড়ালে ঘুরছে। নৌকোটায় একজন জেলে। ফ্রান্সিস বুঝল স্পিনোলার ব্যবস্থা এটা। ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

সেদিন দুপুরবেলা। খাওয়া দাওয়া সেরে নৌকোয় এল ওরা। চলল বঁড়শি টেনে টেনে খোঁজা। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এত বিস্তৃত খাঁড়ি। গভীরতা কম হলেও এভাবে খুঁজে বের করা কি সম্ভব? হঠাৎই ফ্রান্সিস দেখল উত্তর দিকের ধ্বসেপড়া নুরাঘিটার নিচে অনেকটা চৌকোনো একটা গহ্বরমত। ফ্রান্সিস দোনিয়াকে ঐ জায়গাটা দেখিয়ে বলল - ওটা কী? দোনিয়া বলল - ওটা বোধহয় নুরাঘিটায় ওঠার কোনো গোপন পথ ছিল। এখন তো নুরাঘিটার এপাশ ধ্বসে পড়েছে। পথটাও পাথরে আটকে গেছে বোধহয়। ঐ গহ্বরমত জায়গাটায় আমরা আমাদের নৌকোটা ভোর হবার আগেই লুকিয়ে রাখতাম। ফ্রান্সিস বলল--চলুন না ঐ গোপনপথটার অবস্থা দেখে আসি।
— জায়গাটা অন্ধকার আর ভীষণ পেছল পাথরের ধাপগুলো। দোনিয়া বলল।

— ঠিক আছে। দেখা যাক একবার। ফ্রান্সিস বলল। তারপর নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বিস্কোকে ডাকল। - বিস্কো। বিস্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস আঙুল তুলে ঐ গহ্বরমত জায়গাটা দেখিয়ে বলল- ঐ খানে যাবো আমরা। তোমরা আমাদের পেছনে পেছনে এসো।

গহ্বরমত জায়গাটায় পৌঁছল ওরা। ওটার ছাতমত ওপরটা বেশ উচুঁতে। নৌকোদুটো ঢুকে গেল। বেশ অন্ধকার ভেতরটা। অন্ধকারটা একটু সয়ে আসতে ফ্রান্সিস দেখল জলের ধারেই পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। ফ্রান্সিস প্রায় অন্ধকারে নৌকো থেকে পাথরের সিঁড়িতে পা রাখল। শরীরে একটু ঝাঁকুনি। সাবধানে সিড়িঁতে উঠে দাঁড়াল। সত্যি - কাদা ল্যাপটানো সিঁড়িটা ভীষণ পেছল। পেছনে নৌকো থেকে মারিয়া অস্ফুটস্বরে বলল- সাবধান। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। শুধু ডানহাতটা তুলে নাড়ল। তারপর পা টিপে টিপে একটা একটা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কয়েকটা সিঁড়ি উঠতেই বুঝল জলকাদা আর নেই। কিন্তু ভেজাভেজা সিঁড়িগুলো। বুঝল জোয়ারের সময় এর বেশি সমুদ্রের জল ওঠে না।

আরো কটা সিঁড়ি উঠল। আর ওঠা যাবে না। চৌকোনো পাথর গড়িয়ে পড়ে সিঁড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল বাঁদিকে ভেঙেপড়া পাথরের দেয়ালের বড় ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো পড়েছে। ওখানে অন্ধকার নেই। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে এই চৌকোনো পাথরের স্তূপ পার হতে হবে। নিচে থেকে হ্যারির ডাক শোনা গেল- ফ্রান্সিস? গহ্বরমত জায়গাটায় পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ডাকটা জোরালো শোনালো। ফ্রান্সিসও চেঁচিয়ে বলল- ভয় নেই। আমি নিরাপদ। তারপর ফ্রান্সিস গড়িয়ে পড়া চৌকোনো পাথরগুলো ভালো করে দেখে হিসেব করতে লাগল। পাঁচছ'টা পাথর সরাতে পারলেই সিঁড়ি দিয়ে উঠা যাবে।

এবার ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। পেছল সিঁড়ি পর্যন্ত নামল না। ওখান থেকেই বলল - হ্যারি, - বিস্কোকে উঠে আসতে বলো। তোমরা নেমো না। প্রথম তিন চারটে সিঁড়ি ভীষণ পেছল।

একটু পরেই বিস্কো উঠে এল। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার?

— এসো আমার সঙ্গে। ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কয়েকটা সিঁড়ি উঠে ফ্রান্সিস পাথরের স্তূপ দেখাল। বলল - ঐ পাথরগুলো সরাতে হবে। বেশি না, পাঁচ ছ'টা সরাতে পরলেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যাবে। এবার দুজনে মিলে প্রথম চৌকোনা পাথরটা ধরে ঠেলতে লাগল। নুরাঘির ভাঙা দেয়ালের পাথর। খুব ভারি নয়। আস্তে আস্তে ধরে ধরে পাথরগুলো সরিয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পেতে দিল। ফ্রান্সিস পা ফেলে ফেলে দেখল সমান পাথরগুলো নড়ছে না। শুকনো পাথর। উঠতে সুবিধেই হলো। ফ্রান্সিস ডাকল, - বিস্কো উঠে এসো। বিস্কো উঠে এলো। আবার দেখল এখানে বাঁ পাশের দেয়াল ভেঙে বিরাট হাঁ হয়ে গেছে। রোদ পড়ে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওখানে পৌঁছে ফ্রান্সিস দেখল ওপরের দিকেও সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। তারপর পাথরের স্তূপ। ঐ জায়গাটা ধ্বস নেমে সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। আর ওঠা সম্ভব নয়।

ফ্রান্সিস বাঁ দিকের ভাঙা খোঁদলটা দিয়ে দেখল সম্পূর্ণ খাঁড়িটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে অটুট নুরাঘিটা। খাঁড়ির মুখে রাজার জাহাজ। দূরে দূরে জেলেদের নৌকো। আরো দূরে ওদের জাহাজটা। সমুদ্র আজ অনেক শান্ত। সাদারঙের সামুদ্রিক পাখিগুলো মাথার ওপর পাক খেয়ে উড়ছে। পাখির তীক্ষ্ণ ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। বিস্কো এসে ওর পাশে দাঁড়াল। বিস্কোও বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল— কী করবে এখন?

— নেমে যাবো। চলো। দোনিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে আবার নামতে লাগল। শুকনো আর ভেজা সিঁড়ির ধাপ দিয়ে নামতে অসুবিধে হল না। কিন্তু একেবারে নিচের ভীষণ পেছল সিঁড়িগুলো দিয়ে দু'জনকে সাবধানে নামতে হ'ল।

দু'জনে নৌকোয় উঠল। হ্যারি জিজ্ঞেস করল — কী দেখলে ওপরে?

— ধ্বস নেমে ভেঙেপড়া নুরাঘিটা দেখলাম। ভাঙা পাথরটাথর সিঁড়ি এসব। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ অন্ধকার সুড়ঙ্গটা থেকে ওরা নৌকো চালিয়ে বেরিয়ে এল। নৌকোর দাঁড় টানতে টানতে ফ্রান্সিস বলল-

— দোনিয়া, আমার কেমন মনে হচ্ছে - মুবারক এখানে পরে এসেছিল আর একাই চেষ্টা করেছিল যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করতে।

— একা কেন ? কয়েকজন সঙ্গী নিয়েও তো আসতে পারতো। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলল - না। আপনার মত মুবারককেও একাই এই খাঁড়ির নিচে খুঁজতে হয়েছে। কীভাবে মুবারক খুঁজেছিল বলতে পারবো না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস নৌকোটা কোথায় ডুবে গিয়েছিল মুবারক সেটা জানতো।

— কিন্তু সেই চিঠিটায় কিন্তু সেই ইঙ্গিতটা নেই। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল - আচ্ছা। যেখানে নৌকো থেকে মুবারক জলে ঝাঁপ দিচ্ছে সেই জায়গাটা একবার বলুন তো। আপনার তো মুখস্থ। দোনিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল - "জাহাজের সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে ঝড়ের প্রবল ধাক্কায় আমাদের নৌকা কাত হইয়া ডুবিতে লাগিল। নৌকায় আমার একমাত্র সঙ্গীটিকে বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলাম না। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া অন্ধকারে ঝড়বিক্ষুব্ধ খাঁড়ির জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

আজ আর জানি না কীভাবে আমি তীরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলাম।" দোনিয়া থামল। ফ্রান্সিস বলল - দেখুন আমার কেমন বিশ্বাস জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় মুবারক নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিল।

— কিন্তু ঐ ঝড়জলের মধ্যে ঐ অন্ধকারে মুবারক কি কিছু দেখতে পেয়েছিল? দোনিয়া বলল।

— মনে রাখবেন, ঝড় এলে মেঘে বিদ্যুৎ চমকাবেই। ঝড় থেমে যাবার পর কিন্তু কিছুক্ষণ হলেও বিদ্যুৎ চমকায়। আমার জাহাজী জীবনের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে। ফ্রান্সিস বলল।

দোনিয়া বলল - হ্যাঁ ? জাহাজে জাহাজে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান আপনারা। কাজেই আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবু বলি - মুবারক কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর কথা কোথাও লেখে নি।

— এটাই আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগছে। মুবারক ঝড়ের বর্ণনা করেছে সুন্দর। সব ঘটনার বর্ণনাই বাস্তব। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানো আর বাজ পড়ার কথাটা বাদ দিয়েছে কেন বুঝলাম না। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একটু ভেবে নিয়ে মাথা উঠানামা করে বলল - কথাটা ভাববার মত।

— আচ্ছা। - আরবিতে লেখা ঐ চিঠিটা কি আপনার কাছে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

— হ্যাঁ আছে। দোনিয়া বলল।

— কোথায় আছে? পিসায়? ফ্রান্সিস সাগ্রহে বলল।

— না। - এখানেই আছে। দোনিয়া বলল।

— আমাকে একটু দেখাবেন? অবশ্য আমি আরবি ভাষার আ-ও জানি না। ওটা আপনিই আমার সামনে ভালো করে পড়বেন। লক্ষ্য রাখবেন শুধু ঝড়ের বর্ণনার জায়গাটা এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার বর্ণনাটা। ফ্রান্সিস বলল।

— ঐ চিঠিটা এতবার পড়েছি। - নাঃ আমি হুবহু চিঠিটাই আপনাকে বলেছি। দোরিয়া বলল।

— তবু একবার চিঠিটা আমাকে দেখতে দিন - আমার অনুরোধ। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া মাথা নিচু করে ভাবলো একটুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বলল, - বেশ চলুন। দেখুন চেষ্টা করে চিঠিটা থেকে কোন সূত্র পান কিনা।

— তাহলে কোথায় নামতে হবে আমাদের? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। দোনিয়া খাঁড়ির ডানদিকের একটা ঢালু পার আঙুল তুলে দেখাল। বলল - ওখানে নেমে আমাদের যেতে

হবে।

ফ্রান্সিস দাঁড় বাওয়া থামিয়ে পেছনের নৌকায় হ্যারিদের দিকে গলা চড়িয়ে বলল, হ্যারি -- নৌকো নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে এসো।

ঘাটের মত ঢালু জায়গাটায় ফ্রান্সিসদের নৌকো দুটো লাগল। এখানে ঢালু পারটায় পাথর বেশি নেই। সবাই নামল নৌকা থেকে। ঢালু পার দিয়ে উঠছে ওরা তখন দেখল দু'টো জেলেদের নৌকো উপুড় করে রাখা। বোধ হয় মেরামতি রঙ করার জন্যে।

পার ছাড়াতেই একটু দূরে কয়েকটা চেস্টনাট গাছের নিচে জেলেদের পাথর সাজিয়ে তৈরি বাড়ি দেখা গেল। ওপরের ছাউনি শুকনো ঘাসের।

সবাই বাড়িগুলোর সামনে এল। বাড়িগুলো থেকে জেলেবৌ বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ওদের দেখতে লাগল। সমর্থ পুরুষরা তো মাছ ধরতে চলে গেছে। দুটো ঘরের সামনে এসে দোনিয়া দাঁড়াল। বাঁদিকের ঘরটা থেকে একজন বুড়ি বেরিয়ে এল। চোখ কুঁচকে দোনিয়াকে দেখে দাঁত ফোক্‌লা মুখে হাসল। দোনিয়াও হাসল। কী বলল যেন। তারপর পাশের চ্যালাকাঠের দরজাবসানো ঘরটা খুলে ঢুকল। ফ্রান্সিস ঢুকল শুধু। ছোটঘর। হ্যারিরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দেখল একটা ঘাসের বিছানামত পাতা। বিছানায় কম্বলের মত মোটা কাপড় পাতা। ঘাস পাকিয়ে একটা বালিশমতও করা হয়েছে। বিছানার ওপাশে একটা ওক কাঠের লম্বা বাক্স। তাতে লতাপাতা আঁকা রুপোর গিল্টি। বাক্সটার দিকে যেতে যেতে দোনিয়া বলল--এটাই আমার আস্তানা।

বাক্সের ডালা খুলে দোনিয়া কিছু শৌখিন পোশাকপত্র আরো কীসব সরিয়ে কয়েকটা পার্চমেন্ট কাগজ তুলে নিল। সেগুলো দেখে নিয়ে একটা কাগজ হাতে নিল। বাকিগুলো রেখে দিল। বাক্স বন্ধ করে বলল--এখানে আলো কম। পড়া যাবে না। বাইরে চলুন।

বাইরে একটা চেস্টনাট গাছের নিচে একটা লম্বাটে পাথরে এসে বসল দোনিয়া। মারিয়া হ্যারি বসল। বিস্কো দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি আস্তে বলল, ফ্রান্সিস ঐ কাগজটা কী? ফ্রান্সিস বলল,- মুবারকের সেই চিঠি।

— বলো কি? হ্যারি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাগজটার দিকে। মারিয়া আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলোনা। গলা নামিয়ে হ্যারিকে বলল- কী ব্যাপার বলো তো? হ্যারি বিস্কোকেও ইঙ্গিতে কাছে ডাকল। তারপর নিচুস্বরে সমস্ত ঘটনা বলতে লাগল।

দোনিয়া কাগজটা ফ্রান্সিসকে তুলে দেখিয়ে বলল - এটাই সেই মুবারকের সেই চিঠি। ফ্রান্সিস ভালো করে দেখল কাগজটা। হরফ দেখে বুঝল আরবি ভাষা। এত পুরোনো কাগজ। হলদে হয়ে গেছে। অক্ষরগুলোও এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ভালো করে বোঝাই যায় না।

এবার আপনি চিঠিটা ভালো করে পড়ুন তো। দেখুন তো কোন কথা বা পংক্তি কি আপনি বাদ দিয়ে বলেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া চিঠিটা মনে মনে

পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে মাথা নাড়ল। বলল - নাঃ চিঠিটা হুবহু বলেছি আমি। ফ্রান্সিস ভাবল কিছুক্ষণ। কিছু বলল না।

হ্যারির ততক্ষণে নিখোঁজ যোদ্ধামূর্তির গল্পটা বলা শেষ হয়ে গেছে। হ্যারি বলল ফ্রান্সিস কী ভাবছো?

— জানো হ্যারি, - আমার কেমন মনে হচ্ছে চিঠিটায় নিশ্চয়ই কিছু লেখা বাদ গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস দোনিয়াকে বলল--দোনিয়া-আপনি এই চিঠিটা ছাড়া আর কিছু কি ঐ গ্রন্থটাতে পান নি?

--দোনিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল--না--জ্যোতিষ বিদ্যার মোটা গ্রন্থ। তখন তো গ্রন্থটা পড়ার দিকেই সমস্ত মনপ্রাণ। হঠাৎই এই চিঠিটা পেয়েছিলাম। তখন আর গ্রন্থপড়ার দিকে মন থাকে নি। চিঠিটা বেশ কষ্ট করে পড়েই বুঝতে পারলাম সোনার যোদ্ধামূর্তিগুলো মুজাহিদ দেশে নিয়ে যেতে পারে নি। মূর্তিগুলো আছে আসারির এই ক্যালে মানে খাঁড়ির জলের নিচে। একটু থেমে দোনিয়া বলল--

--বেশ কিছুদিন এই চিন্তাটাই আমাকে পেয়ে বসল। পরে আর ঐ অভিজাত ভদ্রলোকের বাড়ি যাই নি। গ্রন্থটাও আর পড়া হয় নি। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল--আমার মনে হয় ঐ গ্রন্থে আরো কিছু সূত্র পাওয়া যাবে।

--এটা তখন ভাবি নি। ধরেই নিয়েছিলাম এই চিঠির ভিত্তিতেই নিখোঁজ মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে পারবো। কিন্তু এখন বুঝছি--এতবড় খাঁড়িতে ওসব আদৌ খুঁজে পাবো কিনা। দোনিয়া বলল।

--আমি তো সে কথা আপনাকে আগেই বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

--আচ্ছা--হ্যারি বলল--আপনি তো চিঠিটা পিসা নগরের একজন অভিজাত ভদ্রলোকের বাড়িতে পেয়েছিলেন?

--হ্যাঁ। দোনিয়া মাথা ওঠানামা করে বলল।

--ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস বলল-আমিও তাই বলছিলাম। ওখানে খোঁজাখুঁজি করতে পারলে হয়তো অন্য আরও সূত্রও পেতে পারি।

--এটা আপনাদের অনুমান--তাই কিনা। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল--তা ঠিক। তবে এখন পর্যন্ত আমরা মুবারকের চিঠি থেকে শুধু এইটুকু জানলাম যে সোনার মূর্তিগুলো এই খাঁড়ির জলের নিচেই কোথাও আছে। এই একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন প্রশ্ন--এতবড় খাঁড়ির কোথায় সেই নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল। খাঁড়িটার জলের গভীরতা বেশি নয়। আপনার ঐ বড়শীগুলো ফেলে ফেলে টেনেটেনে খোঁজা যায় ঠিকই কিন্তু সেটা কতটা সম্ভব? দিনের পর দিন এত কষ্ট করে খুঁজেও যে নিখোঁজ মূর্তিগুলো পাবো সেটা অনিশ্চিত। কাজেই মুবারকের চিঠিটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে একটু খোঁজুখুঁজি করতেই হবে। যদি কিছু পাওয়া যায় বা হদিশ করা যায়। দোনিয়া একটু ভাবল। তারপর বলল--বেশ। তবে তো আপনাদের পিসায় যেতে হবে।

--তা তো যেতেই হবে। হ্যারি বলল।

--ঠিক আছে। আপনারা কবে কীভাবে যাবেন ভেবে দেখুন। দোনিয়া বলল।

সেটা আমরা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবো। ফ্রান্সিস বলল।

নৌকোয় উঠে ফ্রান্সিস বলল--মারিয়া--আমরা আমাদের জাহাজে যাবো। মারিয়া একটু আশ্চর্য হয়েই বলল

--আজকে খোঁজাখুঁজি করবে না? ফ্রান্সিস বলল--না--আমাদের একবার পিসা যেতে হবে।

--সে তো মূল ভূখন্ডে। মারিয়া বলল।

--হ্যাঁ সেখানেই যেতে হবে। হ্যারি বলল।

--কিন্তু তা'তে তো আরো সময় নষ্ট হবে। বিস্কো বলল।

--না হয়তো এই সময়টা খুবই কাজে লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

--সেটা তাহ'লে বন্ধুদের বুঝিয়ে বলো। বিস্কো বলল।

--সেইজন্যেই আমাদের জাহাজে যাচ্ছি। দেখি সব বলে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিসদের নিয়ে নৌকোগুলো চলল ওদের জাহাজের দিকে। নৌকোর দাঁড় টানতে টানতে বিস্কো বলল--রাজকুমারী--এসব জায়গায় দেখছি গরম খুব বেশি না। মারিয়া বলল--এটা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল--ঠান্ডা গরম কোনটাই বেশি নয়।

জাহাজে উঠে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল-সবাইকে ডেকএ আসতে বলো। ভাইকিং বন্ধুদের সবাইকে খবর দিল হ্যারি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের ডেক-এ এসে জড়ো হল। ওরা ভেবে পাচ্ছিল না ফ্রান্সিস হঠাৎ এভাবে ওদের ডাকলো কেন।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল--ভাইসব--আমরা নিখোঁজ মূর্তিগুলো উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছি। এখন একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের পিসায় যেতে হবে। যে কাজে যাচ্ছি তা হোক বা নাহোক কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ফিরে আসবো। আমাদের সঙ্গে বন্ধু দোনিয়াও থাকবেন। ফ্রান্সিস থামলো। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ওরা অনেকেই ভেবেছিল ফ্রান্সিস দেশের দিকে যাত্রার কথা বলবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আরো কয়েকদিন দেরি হবে। শুধু তাই নয়। ফ্রান্সিস তো এখনও যোদ্ধামূর্তিগুলোর হদিশই করতে পারে নি।

ফ্রান্সিস আবার বলতে শুরু করল--ভাইসব--তোমরা অধৈর্য হয়ো না। পিসা থেকে ফিরে এসে যা বলার আমি বলবো। ফ্রান্সিস থামলো। সভা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল। পেছনে মারিয়া হ্যারি দোনিয়াও চলল।

কেবিনঘরে এসে ফ্রান্সিসরা বসল। ফ্রান্সিস বলল--পিসা যেতে হলে আমাদের আজকেই জাহাজ ছাড়তে হবে। দেরি করা চলবে না। তার আগে রাজা এনজিওকে খবর পাঠাতে হবে। ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল--আপনি রাজা এনজিওকে খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করুন। জানাবেন দিন কয়েকের জন্যে আমরা পিসায় যাচ্ছি। রাজা প্রথম ফ্রেডারিকের সময়কার কিছু খবরাখবর জোগাড় করতে। ব্যস্ আর কিছু নয়। ফিরে এসে আমরা আবার সন্ধানকার্য চালাবো। দোনিয়া বলল--বেশ--আমি যাচ্ছি।

--তাহলে ফ্রান্সিস-দোনিয়া ফিরে এলেই আমরা জাহাজ ছাড়বো? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিসের মাথা ওঠানামা করল। মারিয়া আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বলল--আচ্ছা দোনিয়া--পিসা খুব সুন্দর নগর তাই না? দোনিয়া হেসে বলল--হ্যাঁ রাজকুমারী। এখন তো নানা চিন্তা মাথায়। পরে আপনাকে পিসা জেনিয়া এসব জায়গা সম্বন্ধে বলবো। আপনার শুনতে ভালো লাগবে।

দোনিয়া কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরেই নৌকোয় উঠে দাঁড় টানতে টানতে দূরের নুরাঘিটার দিকে চলল।

দোনিয়া চলে যেতেই মারিয়া জাহাজের ডেকএ উঠে এল। রেলিঙ ধরে তাকিয়ে রইল দূরের নুরাঘিটার দিকে। --কখন দোনিয়া ফিরে আসবে। পিসা নগরের কথা ও

শুনেছে। না জানি কত বড় নগর কত লোকজন-কেমন তাদের জীবনযাত্রা পোশাক পরিচ্ছদ।

বিকেল হল। কিছু পরেই পশ্চিমের আকাশ লালচে হ'য়ে উঠল। কিছুটা নিস্তেজ লাল সূর্য সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় নেমে এল। তারপর ডুবে গেল। আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল।

ঐ স্বল্প অন্ধকারে মারিয়া দেখল দোনিয়া নৌকো চালিয়ে আসছে। মারিয়া খবরটা দিতে নিজের কেবিনঘরের দিকে ছুটল।

কেবিনঘরে ঢুকে দেখল--ফ্রান্সিস আধশোয়া হ'য়ে আছে। গভীরভাবে কিছু ভাবছে। হ্যারি নিশ্চুপ বসে আছে। মারিয়া ব'লে উঠল--দোনিয়া আসছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পরে দোনিয়া ঢুকল। বলল--রাজা এনজিওকে বললাম। রাজা আপত্তি কিছু করল না। তবে বারবার বলল যে সে মাসারিতে বেশিদিন থাকতে পারবে না। পিসা থেকে ফিরেই আমরা যেন জোর তল্লাশী চালাই।

--ঠিক আছে--ফ্রান্সিস বলল। তরপর দোনিয়াকে বলল--

--বলুন তো--পিসা কীভাবে যাবো?

--আপনাদের জাহাজে চড়েই যেতে পারবেন। দোনিয়া বলল।

--কিন্তু আমি ভাবছি--ফ্রান্সিস বলল--এতজন বন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা তো লড়াই করতে যাচ্ছি না। আমরা চারজন গেলেই হবে। —মারিয়া হ্যারি আপনি আর আমি।

--কিন্তু নৌকোয় চড়ে কি যাওয়া যাবে? হ্যারি বলল।

--দোনিয়া কী বলেন? ফ্রান্সিস দোনিয়ার দিকে তাকাল।

--তিনটে নৌকো তো আছে। নৌকোগুলোয় চড়ে যাওয়া অসম্ভব মনে করি না। তবে আপনাদের রাজকুমারীও তো যাবেন। ঝড়বৃষ্টি রোদ--এসব সহ্য করতে পারবেন না। সমুদ্রপথ তো কম দূর নয়। তা ছাড়া কিছু এলাকা আছে যেখানে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ওৎ পেতে থাকে। সেক্ষেত্রে দল বেঁধে জাহাজে চড়ে যাওয়াই নিরাপদ। ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই ভাবলো দোনিয়ার কথাগুলো। হ্যারিই বলল--

--জাহাজেই চলো ফ্রান্সিস--সময়ও কম লাগবে।

--বেশ--তুমি সবাইকে বলো তৈরি হতে--যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রা শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি চলে গেল সবাইকে খবর দিতে--জাহাজ ছাড়ার জন্যে তৈরি হতে।

একটু রাত হতেই ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে নোঙর তোলা হল। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। বাতাসও বেগবান। সব পাল খুলে দেওয়া হল। সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউয়ের গায়ে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল।

ফ্রান্সিস দোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ডেকএ উঠে এল। জাহাজ চালক ফ্লাইজারের কাছে এল দু'জনে। জাহাজ চালক ফ্লাইজারকে ফ্রান্সিস বলল--দোনিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজ চালাও। উনি এই অঞ্চলের মানুষ। এসব এলাকা উনি ভালোভাবেই চেনেন। দোনিয়া এগিয়ে এসে ফ্লাইজারকে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর বলল--ভাই তোমার কোন অসুবিধে হলে আমাকে ব'লো। ফ্লাইজার হেসে মাথা ঝাঁকাল।

কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ মূলভূখণ্ডের কাছে এল। সমুদ্রপথে ঝড়বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার পাল্লায় পড়তে হল না।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পিসা নগরের বন্দর দূর থেকে দেখা গেল। অনেক জাহাজ

ঘাটে নোঙর করা। কত দেশের পতাকা উড়ছে জাহাজগুলোর মাথায়। জাহাজী মানুষ মোটবাহকদের ভীড়। নগরবাসী দু'চারজন শৌখিন লোকও দেখা গেল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ বন্দরে ভিড়ল। কাঠের পাটাতন ফেলা হল। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের আর তর সইছিল না। ছোট ছোট দল বেঁধে দু'দল নেমে গেল পিসা নগর ঘুরে বেড়িয়ে দেখার জন্যে। ফ্রান্সিস আগেই বন্ধুদের বলে দিয়েছিল--ইচ্ছে করলে ওরা নগরে ঘুরে আসতে পারে। কতদিন পরে এরকম একটা চোখ ধাঁধানো নগরে এল ওরা।

কিছু পরে দোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়া নেমে এল। বন্দর এলাকায় লোকজনের বেশ ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা বড় রাস্তায় এল। বেশ চওড়া পাথর বাঁধানো রাস্তা। সুবেশ পুরুষ মহিলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাথর লোহা কাঠ দিয়ে তৈরি সুন্দর বাড়িঘরদোর। কয়েকটা অট্টালিকা বড় ছোট দোকানপাট। ক্রেতাসাধারণের ভীড়। ঘোড়ায় টানা সুদৃশ্য গাড়ি রাস্তায় চলছে। তাতে অভিজাতশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ বসে। স্ত্রীলোকদের পোশাক জমকালো।

দোনিয়া একটা গাড়িভাড়া করল। দু'মুখো আসনে ফ্রান্সিসরা মুখোমুখি বসল। গাড়ি চলল। পাথর বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল--টক্-টক্-টকাস্--

কতদিন পরে এতবড় নগর দেখে সুন্দর পোশাক পরা পুরুষ মহিলাদের দেখে মারিয়ার খুব ভালো লাগল। আবার মনটা খারাপও হল নিজের দামি পোশাকটার ছেঁড়াখোরা সেলাই করা চেহারা দেখে। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখল ফ্রান্সিস নগরের লোকজন বাড়িঘর কিছুই দেখছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। নিজের বাড়িঘর কিছুই দেখছে না। সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। নিজের চিন্তায় বিভোর। ফ্রান্সিস হ্যারির গায়ের পোশাকের অবস্থাও বেশ খারাপ। তালিও দেখা যাচ্ছে। মারিয়ার কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। কথাটা ও ফ্রান্সিসকে বলতে সাহস পেল না।

গাড়ি চলল। একসময় একটা সাদারঙের গীর্জার পাশ দিয়ে একটা ছোট রাস্তায় ঢুকল। কিছুটা যেতে দোনিয়ার নির্দেশে একটা বাড়ির পাথরের দেউড়ির সামনে থামল। ফ্রান্সিসরা নামল। দেউড়ির দরজা দামি কাঠের। কতরকম বিচিত্র রঙীন নক্‌শা দরজায়।

আধ ভেজানো দরজা ঠেলে দোনিয়া প্রথম ঢুকল। পেছনে ফ্রান্সিসরা ছোট ছোট রঙীন বাধানো পথটা একটা দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। দু'পাশে বেশ সযত্নে তৈরি বাগান। নানা গাছে বাগানে নানারঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলের গন্ধ আসছে বাগান থেকে।

দোনিয়া এগিয়ে গিয়ে দরজায় মৃদু টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন কাফ্রি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। দোনিয়াকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। দোনিয়া বলল--নোবাইল আছেন কি না? কাফ্রি যুবকটি মাথা একটু কাত করে আসতে ইঙ্গিত করল। কাফ্রি যুবকটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। মারিয়া বেশ অবাক হয়েই চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চলল। মারিয়া তো রাজপ্রাসাদেই মানুষ। কিন্তু এ বাড়ির দেয়ালচিত্র, মেঝেয় বিচিত্র রঙের নক্‌শা করা গালিচা পাতা কারুকাজ করা দরজা জানালা দেখে বুঝল এত রঙ এত সাজসজ্জা ওদের প্রাসাদেও নেই।

ডানদিকের একটা খোলা দরজার সামনে যুবকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। দোনিয়া ফ্রান্সিসদের ঢুকতে ইঙ্গিত করে নিজেও ঢুকল।

ফ্রান্সিসরা একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকল। একটা লম্বাটে কাঠের আসনে একজন সাদা দাড়ি গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক বসেছিলেন। আসনে পাখির পালকে তৈরি ঝালরওয়ালা গদীমত। হাতে ধরা একটা লম্বাটে কাগজ পড়ছিলেন। ফ্রান্সিসরা ঢুকতেই ভদ্রলোক

কাগজটা পাকিয়ে রেখে একটু দ্রুতই এগিয়ে এলেন দোনিয়ার দিকে। হেসে দোনিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন। দোনিয়া ফ্রান্সিসকে বলল--ইনি নোবাইল--শুধু ধনী বা অভিজাত নন-বিদ্বানও। ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল--এঁরা আমার পরম বন্ধু। জাতিতে ভাইকিং। নোবাইল হেসে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলেন। মারিয়াকে দেখিয়ে দোনিয়া বলল--ইনি ওঁদের দেশের রাজকুমারী। নোবাইল সঙ্গে সঙ্গে মাথা বেশ কিছুটা নামিয়ে ডান হাত বাড়ালেন। মারিয়া অভিজাত রীতি অনুযায়ী তাঁর হাতে হাত রাখল। নোবাইল মারিয়ার হাতে আলতো চুমু খেলেন। স্পেনীয় ভাষায় বললেন--আপনাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী আমরা শুনেছি। তবে এই প্রথম পরিচিত হবার সৌভাগ্য হল।

--কী যে বলেন--মারিয়া হেসে বলল--আপনারা সম্পদে জ্ঞানে গরিমায় আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে। নোবাইল একটু মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল। কোন কথা বলল না। দোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন--দোনিয়া--আপনি তো জেলে চাষীদের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। আমাদের এড়িয়ে চলেন। হঠাৎ আমাদের কথা মনে পড়ল।

--কারণ আছে। আপনার গ্রন্থাগারে একটু পড়াশুনো করবো।

--বেশ তো--চলুন। নোবাইল ঘর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে চললেন। ফ্রান্সিসরাও পেছনে পেছনে চলল। কাফ্রি যুবকটি তখন আসছিল। নোবাইল মৃদুস্বরে তাকে কী বললেন। তারপর দোনিয়ার দিকে ফিরে বললেন—ও দরজা খুলে দিচ্ছে। আপনারা যান। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন--আপনি অন্দরে আমার স্ত্রীর কাছে চলুন। মারিয়া একবার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। অস্বস্তিবোধ করল। কিন্তু ভদ্রলোক যেভাবে বলছেন--না যাওয়াটা অভিজাতমহলের রীতিতে ভালো দেখায় না। মারিয়া নোবাইলের সঙ্গে অন্দরমহলের দিকে চলল।

দোনিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা গ্রন্থাগারে ঢুকল। দেখল--মোটা কাঠের পাটাতনের ওপর চামড়া বাঁধানো বেশ কিছু বড় বড় গ্রন্থ। একপাশে কাঠের আসনের সামনের চৌকোনো কাঠের ওপর রুপোর দোয়াতদানি। পালকের কলম। কিছু পাচমেনট কাগজও রাখা আছে।

দোনিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা তাকের কাছে গেল। একটা মোটা গ্রন্থ তুলে নিল। গ্রন্থটির মলাটে হাতে আঁকা গ্রহনক্ষত্রের ছবি। মলাট উল্টে পাতা বের করল। কালির লেখা শুকিয়ে বেশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। দেখল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় হাতে লেখা। গ্রন্থটির ভারি পাতা পেছন থেকে আস্তে আস্তে ওল্টাতে ওল্টাতে একটা পাতার কাছে এসে দোনিয়া বলল--মুবারকের চিঠিটা এখানেই গোঁজা ছিল। জানিনা কী করে সেই চিঠিটা এখানে এল। হ্যারি ফ্রান্সিস দু'জনেই পাতাটা দেখতে লাগল। সবই আরবী ভাষায় লেখা। হ্যারি বলল--দোনিয়া--দেখুন তো এই পাতাগুলোয় কী বিষয়ে লেখা আছে। দোনিয়া পাতাটা উল্টেপাল্টে বলল--জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়েই লেখা। অন্য কিছু নয়। ফ্রান্সিস চুপ করে ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর দোনিয়ার কাছে এসে বলল--আচ্ছা এখানকার সব গ্রন্থই কি আপনি পড়েছেন?

--না-না। --ইচ্ছে ছিল-পড়বার। কারণ গ্রীক আর আরবী ভাষায় হাতে লেখা গ্রন্থগুলি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আগ্রহ ছিল। কিন্তু ঐ চিঠিটা পাওয়ার পর আমি মূর্তি উদ্ধারের কথাটাই ভাবলাম। নিজের জন্যে নয়। গরিব জেলে চাষীদের ভালোর জন্যই ঐ মূর্তিগুলোর বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ করবো বলে। আসলে এই চিন্তাটাই এত পেয়ে বসল যে আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। দোনিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিস বলল--সন্দেহ নেই-আপনার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। অবশ্য সিপনোলার মত মানুষেরা সেটা বুঝবে না। একটু

থেমে ফ্রান্সিস--আমার কিন্তু কেমন মনে হচ্ছে--চিঠিটা অসম্পূর্ণ। একটা কিছু বর্ণনা এর মধ্যে বাদ গেছে।

--তাহলে কি বলতে চাও যে চিঠিটার অন্য একটা নকল আছে? হ্যারি বলল।

--হ্যাঁ--মুবারক নিশ্চয়ই কোন খসড়া মত করেছিল। সেখান থেকে দেখে দেখে ভালোভাবে লিখতে গিয়ে কোন অংশ বাদ পড়ে গেছে। মুবারক আর মিলিয়ে দেখে নি। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল--প্রায় দু'শো বছর আগের কথা। এখন কি ওসবের কোন হদিশ করা যাবে? ফ্রান্সিস চিন্তা করতে লাগল। বলল--তা ঠিক। তবে--হঠাৎ থেমে ফ্রান্সিস বলে উঠল--আচ্ছা আপনি কি সমস্ত গ্রন্থটাই পড়েছিলেন? দোনিয়া মাথা নেড়ে বলল--না--। চিঠিটা পাওয়ার পর আর পড়তে পারি নি। ফ্রান্সিস বলল—

--তাহ'লে এবার পড়ুন তো। খুব সময় লাগবে কি?

--না-না। আরবী আমি আমার মাতৃভাষার মতই পড়তে পারি। দোনিয়া বলল।

তখনই নোবাইল ঘরে ঢুকলেন। বললেন--আপনাদের অসুবিধে ঘটালাম না তো? দোনিয়া হেসে বলল--না-না-।

--ঠিক আছে। আপনারা কিন্তু আমার অতিথি। দুপুরের খাওয়াটা এখানেই খেয়ে যাবেন। নোবাইল বললেন। ফ্রান্সিস হ্যারি এখানকার রীতি অনুযায়ী একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল--এতো আমরা সম্মানিত বোধ করবো। নোবাইল হাসলেন। বললেন--আপনাদের রাজকুমারী আবার লো ল্যাতিন জানেন না। আমাকে গিয়ে তাঁকে আবার সাহায্য করতে হবে। নইলে অন্দরমহলের মহিলাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হ'য়ে যাবে। আমি যাচ্ছি। নোবাইল চলে গেলেন।

দোনিয়া আসনে বসে গ্রন্থটি পড়তে লাগলেন। হ্যারি পাশে বসল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতে লাগল। আবার দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। দোনিয়া ডান থেকে বাঁদিকে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ দোনিয়া বলে উঠল--এটা কী? ঝুঁকে পড়ল গ্রন্থটির ওপর। পাশে বসা হ্যারিও ঝুঁকল। একটা মোটা পাতা দেখিয়ে দোনিয়া বলল--এটাতে এত কাটাকুটি--জড়ানো লেখা গায়ে গায়ে লেখা--মানে খুব দ্রুত কিছু লেখা। সেইজন্যেই এত কাটাকুটি।

--জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়ে কিছু লেখা?

--উঁহু--অন্য হাতের লেখা। ভালো করে পড়তেই পারছি না। দোনিয়া বলল।

-কষ্ট করে হলেও পড়তে থাকুন। হ্যারি বলল। দোনিয়া একটুক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে বলল--ফ্রান্সিস--মুবারকের লেখা সেই চিঠির দু'একটা পংক্তি পড়তে পারছি। কোন সম্বোধন নেই--নিচে লেখকের নামও নেই।

--তার মানে আপনার কাছে মুবারকের যে চিঠিটা আছে এটা তারই খসড়া। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল।

--বোঝা যাচ্ছে--ভুলেই হোক বা যেভাবেই হোক--খস-ড়া গ্রন্থটার সঙ্গে সেলাই করে বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস মাথার চুলে আঙ্গুল চালাল। বেশ উত্তেজিত গলায় বলল---এবার খসড়াটা সম্পূর্ণ ভালো করে পড়ুন। দোনিয়া বলল--উঁহু--পড়তে হবে না। শব্দগুলো ধ'রে ধ'রে যে জায়গাগুলো পড়া যাচ্ছে না সেগুলো বুঝে নিয়ে--লিখতে হবে। দোনিয়া গ্রন্থটি নিয়ে বসার জায়গায় গেল। সাজিয়ে রাখা একটা পার্চমেন্ট কাগজ টেনে নিল। রুপোর দোয়াতে কলম চুবিয়ে নিয়ে খসড়াটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে দেখে থেমে থেমে লিখতে লাগল।

ফ্রান্সিস অনড় দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারিও আর বসে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়াল।

এসময় মারিয়া ঘরে ঢুকল। পেছনে সেই কাফ্রি যুবকটি। মারিয়া হেসে বলল--এই যে পড়ুয়ারা--গৃহকর্ত্রী তোমাদের খেতে ডাকছেন। ফ্রান্সিস অনড় দাঁড়িয়ে। কোন কথা বলল না। হ্যারি বলল--একটু পরে যাচ্ছি।

দোনিয়া মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল--অনেক সময় লাগবে। চলুন--খেয়ে আসা যাক।

দোনিয়া দরজার দিকে চলল। অগত্যা হ্যারি আর ফ্রান্সিসকেও এগোতে হল। মারিয়াও চলল। ফ্রান্সিসের গম্ভীর মুখ দেখে এতক্ষনে বুঝল ফ্রান্সিসরা সেই চিঠির ব্যাপারে নিশ্চয়ই নতুন কোন সূত্র পেয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। ও জানে ফ্রান্সিস সময়মত সব বলবে।

সবাই খাবার ঘরে ঢুকল। লম্বাটে ঘর। পাথরের দেয়ালে এখানে ওখানে নানা রঙের ছবি আঁকা। কোথাও নানারঙের নক্শা আঁকা। মারিয়া দোনিয়া আগে দেখেছে। কিন্তু হ্যারি ফ্রান্সিস দেখে নি। হ্যারি বেশ বোকার মতই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ছবিগুলো যীশুর জীবনের কয়েকটা ঘটনা নিয়ে আঁকা। ফ্রান্সিস কিন্তু কোনদিকে তাকিয়ে দেখল না ও সোজা খাবার টেবিলের দিকে চলল।

নোবাইল তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে খাবার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। ফ্রান্সিসরা এলে তাঁরা বসলেন ওক কাঠের গদীওয়ালা চেয়ারে। ফ্রান্সিসরাও বসল। একটুক্ষণ পরস্পরকে পরিচিত করাবার নিয়ম মানা হল। টেবিলে ছাড়া ছাড়া রঙীন ফুলতোলা সাদা ধপ্‌ধপে ঢাকনা। খাওয়ার বাসনপত্র ছুরি কাঁটাচামচ রুপোর। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। রাঁধুনি বুড়ি খাবার নিয়ে ঢুকল। পেছনে একটি অল্পবয়সী মেয়ে। নোবাইল নিজের মেয়ে ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

রুপোর থালায় খাবার পরিবেশন করল রাঁধুনি বুড়ি। তদারক করল নোবাইলের মেয়ে। খেতে খেতে কথাবার্তা চলল। নোবাইল দোনিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের পড়াশুনো কতদূর এগোল?

--মনে হচ্ছে বিকেল নাগাদ প্রয়োজনীয় তথ্যটা পেয়ে যাবো। দোনিয়া বলল।

--আজকে থাকবেন তো? নোবাইলের স্ত্রী বললেন।

--উঁহু--এই ভাইকিং বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি। ওঁদের সঙ্গেই থাকতে হবে। ওঁদের জাহাজেই থাকবো। দোনিয়া বলল।

ফ্রান্সিস চুপচাপ খেয়ে নিল। একটু তাড়াতাড়িই খেল। মাথায় চিন্তা তো রয়েইছে। তার ওপর এই জাঁকজমক--এই দামি ঝক্‌ঝকে বাসনপত্র টেবিল ঢাকনা আর ধনী পরিবারের সামনে--এসব ভালো লাগছিল না। খাওয়া হয়ে গেছে অথচ অভিজাতমহলের ভদ্রতা। উঠে যেতেও পারছে না। একটু ভেবে ফ্রান্সিস নোবাইল ও তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেই ফেলল--যদি অনুমতি করেন--তাহলে আমি উঠি। নোবাইলের স্ত্রী কথাটা না বুঝেও অনুমান করলেন। বললেন--আপনি তো প্রায় কিছুই খেলেন না। লো ল্যাতিন ভাষা। হ্যারি বুঝিয়ে দিলে ফ্রান্সিস হেসে বলল--মানে--খুব একটা খিদে নেই। আমাকে মাফ করবেন। নোবাইল কোন কথা না ব'লে মাথা কাত ক'রে সম্মতি জানাল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠল। চলল গ্রন্থাগারের দিকে। গ্রন্থাগারে ঢুকে ও লেখার আসনের কাছে এল। দোনিয়া যতটুকু লিখেছে দেখল। বুঝল না কিছুই। মোটা কাঠের তাকে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

কিছু পরে দোনিয়ার সঙ্গে হ্যারি আর মারিয়া এল। দোনিয়া নিজের কাজে মন দিল।

ফ্রান্সিস একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারি দোনিয়ার পাশে বসল। মারিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে মারিয়ার দিকে ফ্রান্সিসের চোখ পড়ল। ফ্রান্সিস কাছে এসে বলল--মারিয়া--আমার কেমন মনে হয়েছিল মুবারকের চিঠিটা অসম্পূর্ণ। এবার মুবারকের চিঠির একটা খসড়া পাওয়া গেছে। দোনিয়া সেই কাটাকুটি করা খসড়াটা পরিষ্কার করে লিখছে। এখন দেখা যাক খসড়াটায় কী ছিল।

--সবটাই তো তোমার অনুমান, মারিয়া বলল।

--তা' ঠিক। তবে খসড়াটা পাওয়া গেছে আর সেটা এখানেই পাওয়া গেছে--কাজেই আমার অনুমান কিছুটা মিলেছে। এখন বাকিটুকু। ফ্রান্সিস কথাটা ব'লে আবার কাঠের তাকে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

গ্রন্থাগার নিস্তব্ধ। কেউ কোন কথা বলছে না। দোনিয়া নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে। সময় বয়ে চলেছে!

হঠাৎ দোনিয়া আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লেখা কাগজটা তুলে নিল। লেখাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল--ফ্রান্সিস--আপনার অনুমান সত্যি! ফ্রান্সিস প্রায় লাফ দিয়ে দোনিয়ার কাছে এল। বলল--কী ব্যাপার বলুন তো। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল। মারিয়া দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। চিঠিটাই তো আমার মুখস্থ। সেই চিঠিতে এই ক'টা পংক্তি ছুট পড়েছে অর্থাৎ বাদ গেছে।

--সেই পংক্তিটা বলুন। অধীর আগ্রহে ফ্রান্সিস বলে উঠল। কাগজটা দেখে দেখে দোনিয়া পড়ল--"জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া এক ঝলক ঝাপ্‌সা দেখিলাম হাত তিরিশেক দূরে কালো পাথরের বৃষ্টিভেজা দেয়াল মত।"

পড়া শেষ হতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। বলল--দেখুন--বলেছিলাম কিনা।

--কিন্তু দেয়াল বলতে কোন দেয়াল বোঝাচ্ছে? দোনিয়া বলল।

--কেন? ঐ ভাঙা নুরাঘিটার দেয়ালটা। ফ্রান্সিস বলল।

--কিন্তু--ওটার দক্ষিণ দিকটা মানে খাঁড়ির দিকটা তো প্রায় ধ্বংসস্তূপ। দোনিয়া বলল।

--ভুলে যাবেন না--ঘটনাটা দু'শো বছর আগেকার। আর ঐ নুরাঘিটা নিশ্চয়ই অটুট অভগ্ন ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

--তাহলে......দোনিয়াকে কথাটা বলতে দিল না ফ্রান্সিস। নিজেই বলে উঠল--ঐ ভাঙা নুরাঘিটার হাত তিরিশেক দূরে মূর্তিশুদ্ধ নৌকোটা ডুবে গিয়েছিল। এখন আর অতবড় খাঁড়িটার তলায় খুঁজতে হবে না। অল্প জায়গাটা তো পেয়ে গেলাম। এবার আমাদের চেষ্টা পরিশ্রম। এবার হ্যারি বলল--তাহ'লে ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

--যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সার্দিনিয়া ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর দোনিয়াকে বলল--আপনি নোবাইলকে বলুন--আমরা এখন জাহাজে ফিরে যাবো। দোনিয়া চলে গেল। আসন থেকে ফ্রান্সিস লেখা কাগজটা তুলে মারিয়াকে দিল। বলল--এটা যত্ন করে কেবিনঘরে রেখে দিও। মারিয়া চিঠির কাগজটা নিল।

বিদায় নেবার সময় হল। ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে এল। পেছনে নোবাইল, তাঁর স্ত্রীও এলেন। নোবাইল বারবারই বললেন--অতদূর দেশ থেকে আপনারা এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে ভালো ক'রে কথাই হল না। অনুরোধ রইল--দেশে ফেরার আগে একবার এখানে আসবেন। ফ্রান্সিস হেসে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে বলল--আপনার আপ্যায়ন আমরা ভুলবো না। কয়েকদিন থাকতে পারলে আমাদের বিশেষ করে রাজকুমারী

মারিয়ার খুবই ভালো লাগতো। কিন্তু বিশেষ একটা প্রয়োজন আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে।

--না-না--আপনাদের দেরি করিয়ে দেওয়াটা উচিত হবে না। নোবাইল বলল।

ফ্রান্সিস চলতে পথটা ধরে দেউড়ির কাছে এল। দেখল--দরজা খুলে দিয়ে সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস যুবকটির পিঠে হাত রেখে মাথা কাত করে বোঝাল ওরা যাচ্ছে। কাফ্রি যুবকটি এতক্ষণে হাসল। ঝকঝকে দাঁত ওর। মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল।

ফ্রান্সিসরা বড় রাস্তায় এল। দোনিয়াই এদিক ওদিক ঘুরে একটা ভাড়াগাড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল জাহাজঘাটার দিকে।

পিসা নগরের বড় বড় রাস্তা বড় বড় অট্টালিকা সুবেশ নারীপুরুষদের দেখতে দেখতে মারিয়া যেন আপনমনেই বলল--ক'টা দিন থাকা যেত না? পাশে-বসা ফ্রান্সিস হেসে বলল--মারিয়া--তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু মূর্তি উদ্ধার ছাড়া আমি এখন আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটায় এল। ভাইকিং বন্ধুরা সবাই তখনও ফেরে নি। ফ্রান্সিসের চিন্তা হল। ও চাইছিল তাড়াতাড়ি সার্দিনিয়া ফিরে যেতে। অনেক কাজ বাকি। এত চিন্তাভাবনা করে সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে দেখা যাক পরীক্ষা করে। কিন্তু বন্ধুরা কতদিন পরে পিসার মত একটা জমকালো নগর দেখছে। ওদের তো সাধ হবেই ঘুরে বেড়াতে। একটু আনন্দ ফূর্তি তো করবেই।

অগত্যা কেবিনঘরে ফিরে ফ্রান্সিস কাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

মারিয়া জাহাজের রেলিং ধ'রে পিসার জাহাজঘাটায় লোকজন দেখতে লাগল।

সন্ধ্যের সময় বন্ধুরা দু'জন চারজন দল মিলে ফিরে আসতে লাগল।

হ্যারি এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল--সবাই তো আরো দু'একদিন এখানে থাকতে চাইছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল--অসম্ভব। সবাই ফিরলেই জাহাজ ছাড়তে হবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার আগেই সব ভাইকিং বন্ধুরা ফিরে এল। ফ্রান্সিসের কথা শুনল সবাই। উপায় নেই। ফ্রান্সিস বলেছে। কাজেই খুব ইচ্ছে থাকলেও এই নগরে আর থাকা যাবে না।

রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। বাতাসের তেমন জোর নেই। পাল খাটানো হল। সব পালগুলো। কিন্তু জাহাজ ধীরে চলল। ফ্রান্সিস তখন ডেকএ উঠে এসেছে। বুঝল--জাহাজের গতি বাড়াতে হবে। ও বিস্কোকে ডেকে বলল--দাঁড় বাইতে বলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সার্দিনিয়া পৌঁছাতে হবে।

জাহাজ চলল। সারারাত জাহাজ চলল। কিন্তু বাতাসের জোর বাড়ল না। দাঁড় টেনে যতটা জোরে চলার চলল। মাস্তুলের মাথায় নজরদার পেড্রো চারদিকে নজর রাখতে লাগল। বলা যায় না--জলদস্যুদের পাল্লায় পড়তে হতে পারে। আগে থেকে বুঝতে পারলে সাবধান হওয়া যাবে। তাছাড়া দোনিয়া বলেছে এই অঞ্চলে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের আস্তানা আছে। কাজেই চারদিকে নজর রাখা--আগে থেকে সাবধান থাকা।

পূর্ব আকাশে রঙ ফিরতে লাগল। লাল হয়ে উঠল। একটু পরেই সূর্য উঠল। সকালের নরম আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর ছড়ালো। ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগল। কিন্তু হাওয়ার জোর বাড়ল না।

হঠাৎ পেড্রোর নজরে পড়ল পূবদিকে বেশ দূরে একটা নৌকো ভাসছে। পেড্রো

ভালোভাবে চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল। নৌকোটার একটা ধার ভাঙা। সেদিকে দু'পা ছড়িয়ে একটা মানুষ নৌকোর গলুইয়ে মাথা রেখে শুয়ে আছে। মা মেরিও জানে না মরে গেছে না বেঁচে আছে।

পেড্রো মাস্তুল থেকে নেমে এল। ডেকএ শুয়ে থাকা কয়েকজন ভাইকিংদের মধ্যে দু'একজন মাত্র উঠে বসেছে। পেড্রো তাদের ভাঙা নৌকো আর মানুষটার কথা বলল। ওরা রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘুম ভেঙে আরো কয়েকজন এসে ভীড় করে দাঁড়াল। পেড্রো চলল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

সব শুনে ফ্রান্সিস ডেকএ উঠে এল। ততক্ষণে হ্যারি বিস্কোরাও খবর পেল। ওরাও ডেকএ উঠে এল।

সবাই তাকিয়ে রইল আধভাঙা নৌকোটার দিকে। একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্লাইজারের কাছে এল। ফ্লাইজারকে দূরের আধাভাঙা নৌকোটার দিকে জাহাজ চালাতে বলল। নৌকোটায় একজন মানুষ আছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

ফ্লাইজার জাহাজের মুখ ঘোরাল। জাহাজ চলল ঐ আধভাঙা নৌকোটার দিকে। কাছাকাছি এল ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে দেখল যে নৌকোর একটা ধার ওপরের দিকে হাত দুয়েক ভেঙে গেছে। তবে নৌকোয় জল ওঠে নি। তাই ডুবে যায় নি। ঢোলা হাতা সবুজে রঙের জোব্বামত গায়ে একটা লোক গলুইয়ে অসাড় পড়ে আছে। সর্বাঙ্গ জলে ভেজা।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—কী ব্যাপার দেখতে। বিস্কো দড়ির মইটা জাহাজ থেকে নৌকোটার কাছে ফেলল। মই বেয়ে বেয়ে নৌকোটার ওপর নেমে এল। ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে নৌকোটা। ঐ দুলুনির মধ্যেই বিস্কো লোকটার নাকের সামনে হাত রাখল। ক্ষীন শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। বসে পরে বুকে কান ঠেকাল। মৃদু ধক্ ধক্ শব্দ। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসদের হাতের ইঙ্গিতে বোঝাল—লোকটা বেঁচে আছে। দড়ির জালমত ফেলতে বলল।

জাহাজ থেকে সেটা নামিয়ে দেওয়া হল। বিস্কো বেশ কসরৎ করে লোকটাকে তুলে জালে বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ভাইকিংরা ওটা ধরে টেনে টেনে তুলতে লাগল। বিস্কো দড়ির মই বেয়ে উঠে এল।

লোকটাকে প্রথমে ডেকএর ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। তখনও লোকটা চোখ বুঁজে রয়েছে। তারপর কয়েকজন মিলে ওকে কেবিনঘরে নিয়ে গেল। ভেজা পোশাক ছাড়িয়ে শুক্‌নো পোশাক পরানো হল। বৈদ্যি ভেন লোকটার কপালে গলায় নীলমত মলম মাখিয়ে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে টিপতে লাগল।

একটু পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা চোখ মেলে তাকাল। ভেন মুখ নিচু করে স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল— তুমি কে? কী হয়েছিল তোমার? লোকটা তাকিয়েই রইল। তার মানে ভাষা বোঝে নি। এবার হ্যারি থেমে থেমে লো ল্যাতিন ভাষায় একই কথা জিজ্ঞেস করল। এবার লো ল্যাতিন ভাষায় [illegible] বলল জাহাজডুবি। ফ্রান্সিস ভেনকে বলল—দেখো তো—অসুখটা কেমন? মারাত্মক কিছু না। অনাহার জল তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল ওর খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। পরে শুনবো সব।

ভেনএর ওষুধ খেয়ে দুপুরে খেয়ে দেয়েই ইগনোতি সন্ধ্যের আগেই অনেকটা সুস্থ হল। হ্যারি ইগনোতির সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারল রাতের ঘন কুয়াশার মধ্যে ওদের জাহাজ একটা ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গিয়েছিল। ও নিজে একটা

ধাক্কা খেয়ে আধভাঙা নৌকোয় চড়ে কোনরকমে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিল। কতদিন নৌকোয় ছিল সেটা ইগনোতির মনে নেই।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়েছে। বিকেল থেকেই বাতাসের জোর বেড়েছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না।

যে কেবিনঘরে ইগনোতিকে রাখা হয়েছিল সেই কেবিনঘরে চারজন ভাইকিংও ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎই কেবিনঘরের দরজায় ঠক্ করে শব্দ হতে একজন ভাইকিং এর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল অন্ধকারে ইগনোতি দরজা বন্ধ করছে। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। একবার ভাইকিংটি ভাবল ইগনোতিকে জিজ্ঞেস করে ও বাইরে গিয়েছিল কিনা। কিন্তু ইগনোতি তো ওর ভাষা বুঝবে না। কাজেই ভাইকিংটি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হল। সকালের খাওয়াদাওয়া চলছে তখনই রাঁধুনি ভাইকিংটি খাবার জলের পিপের ঢাকনা খুলে দেখল জল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। পরপর সাজানো চারটে পিপের একটিতে কম জল ছিল। ও বুঝে উঠতে পারল না জল এত কমে গেল কী করে। রান্নার জায়গার পাশে যেখানে জলের পিপেগুলো রাখা হয় সেখানে দেখা গেল জায়গাটা জলময় হয়ে গেছে। এত জল নষ্ট হল কী ক'রে? রাঁধুনি ভাইকিং ওর সাহায্যকারী ভাইকিং বন্ধুকে বলল সে কথা। দু'জনেই অবশিষ্ট জলের পরিমান দেখে চিন্তায় পড়ে গেল। দু'জনে পিপেগুলো তুলে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল--পিপেগুলোয় ফুটো হয় নি। অথচ এত জল পড়ে গেল কী করে? ওরা ভেবে পেল না কী করে হল এটা।

রাঁধুনি ছুটল ফ্রান্সিসের কাছে। সকালের খাওয়ার পর সবাই তখন জল খেতে চাইছে। রাঁধুনির সাহায্যকারী একটা পিপে থেকে সবাইকে জল দিল। পিপেটা প্রায় খালি হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে রান্নাঘরে এল। পিপের ঢাকনা খুলে জলের পরিমান দেখল। চিন্তায় পড়ল ফ্রান্সিস। এখন খাবার জলে টান পড়লে তো বিপদে পড়তে হবে। এতজনের প্রয়োজনীয় জল এখন কোথায় পাওয়া যাবে? ফ্রান্সিস রাঁধুনিকে বলল--পিপের ফাটা জায়গা দিয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে যায় নি তো। রাঁধুনি বলল--না।? কোথাও ফাটা চোখে পড়েনি। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দোনিয়ার কাছে এল। খাবার জলের সঙ্কটের কথা বলল। সব শুনে দোনিয়া বলল--এই অঞ্চলটা আমার ঠিক পরিচিত নয়। তবে আমরা বোধহয় কর্সিকা দ্বীপের কাছে এসেছি।

--কর্সিকা দ্বীপ কোনদিকে পড়বে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

--বাঁ দিকে। দোনিয়া বলল--উত্তর কর্সিকায় থামতে পারলে হয়তো খাবার জল পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজের ডেকএ উঠে এল। জাহাজচালক ফ্লাইজারকে এসে বলল--বা দিক মানে পূবদিকে জাহাজ চালাও। কালকের মধ্যে যে করে হোক কর্সিকার উত্তরে কোথাও পৌঁছাতে হবে।

--যা জল আছে তা'তে আর ক'টা দিন যাবে না? ফ্লাইজার বলল।

--জলের তেষ্টা নিয়ে ক'দিন কাটানো যায় বলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল জোগাড় করতে হবে। হ্যারি বলল।

--ঠিক আছে। ফ্লাইজার বলল। তারপর দু'তিনজন ভাইকিং বন্ধুকে ডেকে বলল--পাল ঘোরাও--জাহাজ বাঁদিকে ঘুরবে। বন্ধুরা মাস্তুল বেয়ে পাল খাটানোর কাঠের টানায়

ঘোরাতে লাগল। আস্তে আস্তে জাহাজের মুখ পূবমুখো হল। জাহাজ চলল।

ফ্রান্সিস দড়িদড়া ধরে পা রেখে রেখে মাস্তুলের কিছুটা ওপরে উঠল। চেঁচিয়ে ডাকল—পেড্রো। পেড্রো নিচের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—ডাঙা দেখলেই বলবে। পেড্রো চেঁচিয়ে বলল--ঠিক আছে।

ফ্রান্সিস মাস্তুল বেয়ে নেমে এল। হ্যারি বলল--দাঁড় টানতে হবে। এখন গতি বাড়াতে হবে।

--তা' ঠিক। কিন্তু হ্যারি--বন্ধুরা যারা দাঁড় টানবে তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়বে। বারবার জল খেতে চাইবে। বেশি জলের চাহিদা মেটাতে এই জলটুকুও ফুরিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বলল--সত্যি এটা আমি ভাবিনি।

--কাজেই গতি বাড়াবার প্রশ্ন নেই। এখন বাতাসই একমাত্র ভরসা। ফ্রান্সিস বলল।

এবার হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে হল--আচ্ছা--ইগনোতিকে জিজ্ঞেস করে এলাকার কোথায় জল পাওয়া যাবে তার হদিশ করা যায় কিনা।

ফ্রান্সিস বলল--হ্যারি চলো তো-ইগনোতিকে জিজ্ঞেস করা যাক-- ও কোনভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে কিনা।

দু'জনে ইগনোতিকে যে কেবিনঘরে রাখা হয়েছে সেই ঘরে এল। দেখল--ইগনোতি অনেক সুস্থ এখন। তবে কথাবার্তা বলছে না। কার সঙ্গেই বা কথা বলবে। ওর কথা তো কেউ বুঝবে না।

হ্যারি ইগনোতিকে জিজ্ঞেস করল--আচ্ছা ইগনোতি--আমরা কি কর্সিকা দ্বীপের কাছাকাছি এসেছি?

--তা তো ঠিক বলতে পারবো না তবে কর্সিকা দ্বীপের উত্তর দিকটা আমি মোটামুটি চিনি। এখানে আমি অনেকবার ব্যবসার ব্যাপারে এসেছি।

--তবে তো এখানে কোথায় জল পাওয়া যাবে তাও তুমি জানো? হ্যারি বলল।

--হ্যাঁ জানি। ইগনোতি বলল। হ্যারি কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—তা'হলে এখন আমাদের কর্সিকা দ্বীপের উত্তরে পৌঁছুতে হবে।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। জলের পরিমান আরো কমে গেল।

ফ্রান্সিসের চিন্তা বাড়ল। ওদিকে কোনরকমে খাওয়াদাওয়া সেরেই পেড্রো মাস্তুলের ওপরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়েছে। নজর রাখছে চারদিকে যদি ডাঙার দেখা পাওয়া যায়।

সন্ধ্যে হয়ে এল। অন্ধকার তেমন ঘন নয়। একটু পরেই পূর্ব দিগন্তের দিকে অনুজ্জ্বল চাঁদটা উজ্জ্বল হতে লাগল। চাদের আলো ছড়ালো সমুদ্রের বুকে।

জাহাজ চলেছে। তখনও ডাঙার দেখা নেই।

রাতের খাওয়াদাওয়ার সময় হল। এবার জলের পরিমান কমে যাওয়ার কথা ফ্রান্সিস সবাইকে জানাবে ভাবল। হ্যারিকে বলল সে কথা। হ্যারি বলল--তাহলে কি সবাইকে ডেকএ আসতে বলবো? ফ্রান্সিস বলল-বেশ—সবাইকেই তো সমস্যাটার কথাটা জানাতে হবে। হ্যারি সবাইকে খবর দিল।

আস্তে আস্তে ভাইকিং বন্ধুরা এসে ডেকএ জড়ো হল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে উঠে এল ডেকএ। বন্ধুরা তখনও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি আসতেই চুপ করলো সবাই। ফ্রান্সিস বলতে লাগল--ভাইসব--তোমরা এরমধ্যেই নিশ্চয়ই জেনেছো যে জাহাজে জলাভাব দেখা দিয়েছে। কীভাবে জল এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল আমরা জানি না। যাহোক--সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি--জল যতটা সম্ভব কম খাবে। যেটুকু জল

আছে তা'তে যে কটা দিন সম্ভব চালাতে হবে। এই কষ্টটুকু সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে। ফ্রান্সিস থামল। বন্ধুদের মধ্যে একজন বলল--কিন্তু জল না খেয়ে আমাদের কতদিন আর চলবে। ফ্রান্সিস বলল--আমরা জেনেছি যে কর্সিকা দ্বীপ কাছেই। ওখানে পৌঁছাতে পারলে আমরা জল সংগ্রহ করতে পারবো। ততক্ষণ পর্যন্ত বুক দিয়ে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হবে। জলতৃষ্ণা সহ্য করতে হবে। বন্ধুরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল--ও-হো-হো। সভা ভেঙ্গে গেল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সব ভাইকিং বন্ধুরাই অল্প করে জল খেল। কেউ কেউ খেলও না।

রাত বাড়তে লাগল। সব ভাইকিং বন্ধুরাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও কেবিনঘরের বিছানায় এইশুয়ে পড়ছে পরক্ষণেই উঠে পড়ছে। ডেকএ উঠে আসছে। পূবদিকে তাকিয়ে থাকছে। মারিয়া লক্ষ্য করল সেটা। ডেক থেকে ফ্রান্সিস ফিরে আসতে মারিয়া জিজ্ঞেস করল--বারবার উঠে পড়ছো কেন। ফ্রান্সিস বলল--জানো তো জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে আসছে। ডাঙায় পৌঁছোতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

তখনই পেড্রো চেঁচিয়ে বলে উঠল--ডাঙা--ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডেকএ শুয়ে থাকা--কয়েকজন ভাইকিংএর কানে গেল কথাটা। ওরা রেলিঙের ধারে এল। দেখল--চাঁদের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট উঁচুনিচু ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

একজন ভাইকিং ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। খবর পেয়েই ফ্রান্সিস হ্যারিকে গিয়ে ডেকে তুলল। চিন্তায় হ্যারির ও ঠিক ঘুম আসছিল না। দু'জনেই ডেকএ উঠে এল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখল উঁচুনিচু ডাঙা। কিন্তু জাহাজ কোথায় ভেড়ানো হবে। জলের হদিশ কোথায় পাওয়া যাবে? ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল সে কথা। হ্যারি বলল--এখন ইগনোতির সাহায্য নিতে হবে। ওকে ডেকে আনছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারি ইগনোতিকে ডেকে নিয়ে এল। হ্যারি বলল--ইগনোতি--ঠিক কোন জায়গাটায় নামলে আমরা খাবার জলের হদিশ পাবো? তুমি চিনে নিয়ে ঠিক জায়গাটা বের করতে পারবে? ইগনোতি তীরভূমির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল--আরো কাছে যেতে হবে। জাহাজটা আস্তে আস্তে তীরভূমির অনেকটা কাছে চলে এল। ইগনোতি তীরভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল--ঐ যে টিলার মাথায়--ঝাকড়া গাছের জঙ্গল--ওখানটায় নামতে হবে। ওখান থেকে কিছুটা গেলেই ছোট পাহাড়ি ঢাল। ওখানে একটা ঝর্ণা আছে। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল।

জাহাজটা ততক্ষণে টিলার কাছাকাছি এসেছে। জাহাজ আর যেতে পারবে না। জাহাজচালক ফ্লাইজার ততক্ষণে জাহাজ থামিয়েছে। ফ্লাইজারের কাছে এল ফ্রান্সিস। বলল--জাহাজ কি তীরে ভেড়ানো যাবে না? ফ্লাইজার বলল--এখানে জলের গভীরতা নেই। মাটিতে জাহাজ আটকে গেলেই বিপদে পড়তে হবে।

ফ্রান্সিস এসে হ্যারিকে বলল--জাহাজ আর যাবে না। নৌকোর পিপে নিয়ে জল আনতে যেতে হবে। তুমি ইগনোতিকে সেকথা বলো। হ্যারিই ইগনোতিকে কথাটা বলল। তারপর বলল--আমরা নৌকোয় চড়ে জল আনতে যাবো। তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে? ইগনোতি মাথা কাত করে জানাল পারবে। তারপর জাহাজটা যখন টিলার কাছে এল তখন ইগনোতি হাত দিয়ে একটা জংলা গাছের মাথা দেখাল।

এবার তিনটে পিপে একটা নৌকোয় তোলা হল। অন্য পিপেটায় এখনও সামান্য জল রয়েছে। কষ্ট ক'রে হলেও দু'একটা দিন তো যাবে। ওটা আর ওরা নেবে না ঠিক করল।

যখন ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর হ্যারি ওদের নৌকোয় নামতে যাবে তখনই দোনিয়া এল।

দোনিয়া ইগনোতির আশ্রয় নেবার ব্যাপারটা জানতো না। তাই ইগনোতিকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গী হতে দেখে দোনিয়া ফ্রান্সিসকে ইগনোতির কথা জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস ইগনোতির জাহাজডুবি হয়ে এসে ওদের জাহাজে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলল। দোনিয়া এবার ইগনোতির দিকে তাকাল। দেখল--এখানকার চাষিদের মতই ওর পোশাক। দোনিয়া ইগনোতির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। একটু আঞ্চলিক ভাষার মিশেল থাকায় হ্যারি ঠিক বুঝল না। দোনিয়া কথা শেষ করে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল--লোকটার কথাবার্তা শুনলাম। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে--লোকটা ঠিক কথা বলছে না। আপনাদের বিপদ হতে পারে।

--উপায় নেই দোনিয়া। জাহাজের এতগুলো মানুষের তো খাবার জল চাই। এই অচেনা অজানা জায়গায় কোথায় খুঁজে পাবো জল। একমাত্র ইগনোতিই পারে ঠিক জলের সন্ধান দিতে। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া শুধু বলল--সাবধানে থাকবেন।

পিপে বসানো নৌকোটায় শাঙ্কো উঠল। অন্য নৌকোটায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি। দাঁড় টেনে চলল ওরা। তখন চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলো চিক্‌চিক্ করছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

তীরের কাছাকাছি একটা জায়গা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে ইগনোতি বলল--ঐ জায়গায় নামতে হবে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সেকথা। ফ্রান্সিস সেই ঢালু জায়গাটায় নৌকো লাগাল। নামল তিনজনে। বেশ ভেজা ভেজা কাদামাটি। জোয়ারের সময় বোধহয় ডুবে যায়। কাদার ওপর দিয়ে চলল তিনজনে। ফ্রান্সিস ঠিকই করেছিল আগে জলের জায়গাটার হদিশ করবে। তারপর ফিরে এসে পিপেগুলো নিয়ে যাবে।

কাদায় পা ডুবে যেতে লাগল। একটু এগোতেই আর কাদা নেই। শক্ত জমি। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল ওখান থেকে একটা সরু পায়ে চলা পথের মত। তার মানে এই পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত আছে।

একটু এগিয়েই গাছপালার জঙ্গল। অবশ্য পথটা দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। চলল ওরা। উৎরাই পড়ল। ফ্রান্সিস ভাবল--তার মানে এখানে পাহাড় টাহাড় মত আছে। পাহাড়ি এলাকায় ঝর্ণার জল পাওয়া যাবে।

উৎরাই শেষ হতেই দেখা গেল একটা পাথরের লম্বাটে ঘর। ঘরের গরাদ দেওয়া জানালায় আলো আভাস নেই। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল না জায়গাটা বসতি এলাকা কিনা। একটাই মাত্র ঘর। ওরা ঘরের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ ঐ ঘরটা থেকে দ্রুতপায়ে কারা ছুটে আসতে লাগল। ফ্রান্সিসরা নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছিল। জল খুঁজতে সঙ্গে তরোয়াল আনা প্রয়োজন মনে করে নি। শাঙ্কো বিপদ আঁচ করে সঙ্গে সঙ্গে জামার ঢোলা গলার মধ্যে দিয়ে বড় ছোরাটা কোমর থেকে খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

লোকগুলো তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। চাঁদের আলোয় ওদের হাতের খোলা তরোয়াল যেন ঝলসে উঠছে। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল দোনিয়ার কথা। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। ফ্রান্সিস চাপাগলায় বলল--কেউ বাধা দিওনা।

লোকগুলো মূরজাতীয়। কাফ্রিও আছে। বিশাল বলিষ্ঠ শরীর। হ্যারি চিৎকার করে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল--আমরা লড়াই চাই না। আমরা নিরস্ত্র। ওদিকে ইগনোতিকে দেখা গেল নিশ্চিন্তে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। যোদ্ধার দল তখন ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইগনোতি ওদের কী বলল। যোদ্ধার দল তরোয়াল নামাল। তারপর ফ্রান্সিসদের পেছনে এসে ঘিরে দাঁড়াল। একজন যোদ্ধা তরোয়াল উঁচিয়ে ওদের সেই পাথরের বাড়ির দিকে যেতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসদের ঘিরে নিয়ে চলল সবাই। এবার ইগনোতির দিকে ফ্রান্সিসের নজর পড়ল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—ইগনোতিকে বলো তো--ও এই অমানবিক কাজটা করল কেন। হ্যারি কথাটা ইগনোতিকে বলল। ইগনোতি কথাটার খুব একটা গুরুত্ব দিল না। আসলে ওর মতলব তো হাসিল হয়েছে। ওর কাজই হল ওদের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে লোকজন ধরে আনা। তারজন্যে ও মূল্য পায়। সেইজন্যেই এভাবে ও মানুষ ধরার জাল ফাঁদে।

ফ্রান্সিসদের সেই ঘরে ঢোকানো হল। দেখা গেল অনেক যোদ্ধা ঘরটায় শুয়ে বসে আছে। এককোনে কাপড় ঢাকা গদিমত। একজন বেশ বলিষ্ঠ লোক শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের দেখেই লোকটা উঠে বসল। যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল--ভালো শিকার ধরেছিস। চড়া দামে বিকোবে। বলল--তোর পাওনা নিয়ে যাস। ইগনোতি দাঁত বের করে হাসল।

তরোয়ালের ডগা দিয়ে একরকম ঠেলেঠুলে রক্ষীর দল ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল ঘরটার বাইরে। ঘরটার বাইরে আসতেই দেখা গেল কাঠের মোটা মোটা খুঁটি পুঁতে পুঁতে মোটা লোহার জাল মত। তার মধ্যে দিয়ে হাত গলে যাবে মাথা গলবে না।

অন্ধকারে পশুর খাঁচার মত লাগছে দেখতে। একজন রক্ষী গিয়ে দুদিকের দুটো তালা খুলে ফেলল? ফ্রান্সিসদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আর একটি রক্ষী এসে মোটা দড়ি দিয়ে লোহার সঙ্গে ফ্রান্সিসদের হাত বেঁধে দিল। দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিস ভেতরটা দেখল। অন্তত জনা দশ পনেরো লোক ওদের মতই বন্দী অবস্থায় বসে আছে নয়তো লোহার খুঁটির ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। তাদের গায়ে শতছিন্ন পোশাক। তবে অধিকাংশই সুস্থদেহী। কারণটা ফ্রান্সিস অনুমান করল। ঐ বলিষ্ঠ লোকটা দাস ব্যবসায়ী। সুস্থ দাস ভালো দামে বিক্রি হবে। কাজেই সুস্থ রাখা চাই। কিছু বন্দী আবার রোগাক্রান্ত। বোঝাই যাচ্ছে—ভয়ানক অসুস্থ। অন্ধকারে এক নরকের মত দৃশ্য। পায়ের নিচে মাটি লালচে। বন্দীদের পায়ের চাপে ধূলোটে।

ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল। বন্দীরা কাছাকাছি দেশগুলোর লোক। কাফ্রিও আছে। সংখ্যায় তারাই বেশি। ফ্রান্সিস অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝল পাহারাদারের সংখ্যা অন্তত ছ'সাতজন। বোধহয় আগে কিছু বন্দী পালিয়েছিল। তাই এত কড়াকড়ি।

ওদিকে আর এক চিন্তা। জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। ওরা তো পিপে ভরে জল নিয়ে যেতে পারলো না। কালকে থেকেই হয়তো নির্জলা কাটাতে হবে ওদের। এতগুলো মানুষ জন্তুজানোয়ারের মত শুয়ে বসে আছে। কেউ কথা বলছে না--মৃতদেহের স্তূপ যেন। নিস্তব্ধ চারদিক।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল--ফ্রান্সিস--ছোরা লুকিয়ে রেখেছি। কী করবে?--দাঁড়াও--কালকের দিনটা দেখি। কত লোকজন এদের সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। এখানে আমরা সবাই তো নিরস্ত্র। ওদেরত সংখ্যাটা কত, অস্ত্রশস্ত্র কেমন সেটা আগে আঁচ করে নি। তারপর পালাবার ছক কষবো। ফ্রান্সিস বলল।

ভোর হল। একটা ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। অনেক বন্দীই তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। কেউ কেউ লোহার খুঁটিতে কাঁধ রেখে মুখ ঝুঁকিয়ে ঘুমিয়ে আছে তখনও।

সকালের আলো পড়ল বন্দীশালায়। এবার স্পষ্ট দেখা গেল বন্দীশালার নারকীয় পরিবেশ। কারো কারো গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া জামা, অনেকেরই খালি গা--শুধুমাত্র কৌপিনের মত কোমরে পরা কাপড়ের টুকরো।

শাঙ্কোর পাশেই শুয়েছিল একটা বিশাল চেহারার কাফ্রি। সে ঘুম ভেঙে উঠে বসল। বিরাট এক হাই তুলল। তারপর শাঙ্কোকে নতুন মানুষ দেখে জিজ্ঞেস করল--জালে ধরা

পড়লে কী ক'রে? কথাটা বুঝল না শাঙ্কো। আঙুল দিয়ে হ্যারিকে দেখাল। লোকটা হাসল। এবার হ্যারিকে লো ল্যাতিন ভাষায় জিজ্ঞেস করল--কোথাকার লোক তোমরা? এই নরককুণ্ডে এসে জুটলে কী ক'রে? কথাটা আঞ্চলিক ভাষা মেশানো। তবে হ্যারি মোটামুটি বুঝল--বলল যে ওরা ভাইকিং জাহাজে জলাভাব--ইগনোতি জলের হদিশ দিতে ওদের নিয়ে এসেছিল। ইগনোতি নামটা শুনে লোকটার মুখ কঠিন হল। কপালের শিরা ফুটে উঠল। বলল--ইগনোতি একটা নরকের কীট। সুযোগ পেলে ওটাকে আমি হাতের কাছে যা পাবো তাই দিয়ে হত্যা করবো।

--ইগনোতিরই তাহ'লে এই জঘন্য কাজ? হ্যারি বলল।

--হ্যাঁ। এই দরিয়া দিয়ে যে সব জাহাজ যাতায়াত করে ও মাঝে মাঝেই জাহাজডুবির গল্প ফেঁদে সেইসব জাহাজে আশ্রয় নেয়। অসহায় মুমূর্ষু মানুষকে দেখে লোকের তো করুণা হবেই। ওরা ওকে জাহাজে তুলে নেয়। এটাই হল ইগনোতির আসল কাজ। গোপনে ও জাহাজের মজুত জলভান্ডার থেকে জল ফেলে দেয়। তখন জাহাজটিতে জলের হাহাকার পড়ে যায়। তখন ও পরামর্শ দেয় কাছেই জল পাওয়া যাবে। সেই জলের হদিশ ও জানে। ওকে বিশ্বাস করে ওর দেখানো পথ দিয়ে নাবিকেরা আসে আর এই ক্রীতদাস ব্যবসায়ী সেসব লোককে এখানে বন্দী করে রাখে আর ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। ততদিন পর্যন্ত এই বন্দীদের দেখাশুনো করে--যাতে মরে না যায় তার ব্যবস্থা করে। মরে গেলেই তো ক্ষতি। আমাদেরও সেভাবেই আনা হয়েছে এখানে। হ্যারি কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিসের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক ইগনোতি লোকটা। ক্রুদ্ধস্বরে বলল--ওটাকে কায়দায় পেলে আমি নিকেশ করবো।

একটু পরেই সকালের খাবার আনা হল। একজন পাহারাদার ঠং-ঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলে দিল। বন্দীরা উঠে বসল। অনেকে আগে থেকে বসেও ছিল।

একজন রক্ষী একরকমের লম্বা পাতা ধুলোভরা মেঝেয় পেতে দিয়ে গেল। অন্যজন গোল গোল করে কাটা রুটি পাতায় দিল। অন্যজন দিয়ে গেল আলু আনাজপাতা মেশানো ঝোলমত। দু'হাত বাঁধা অবস্থাতেই বন্দীরা দু'হাতের মুঠো দিয়ে রুটি খেতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বুঝল বন্দীরা এভাবে খেতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ফ্রান্সিসের এটা সহ্য হল না। ও দু'পায়ে পাতাসুদ্ধু খাবার ছিটকে ফেলল। একজন রক্ষী তেড়ে এল। ফ্রান্সিস লোহার খুঁটিতে বাঁধা হাত নিয়েও উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল--আমরা কি জানোয়ার? জানোয়ারের মত খাবার খাবো? রক্ষীটি ফ্রান্সিসের কথা বুঝল না কিন্তু ওর এই উগ্রমূর্তি দেখে একটু থমকাল। বুঝে উঠতে পারলো না কী করবে। ফ্রান্সিস রুখে দাঁড়াতে হ্যারি আর শাঙ্কোও উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল--ও--হো-হো। দেখাদেখি অন্য বন্দীরাও চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করল। রক্ষীরা বেশ ভয় পেয়ে গেল।

দাসব্যবসায়ী বোধহয় ফ্রান্সিসের চ্যাঁচামেচি শুনেই সেই বলিষ্ঠদেহী লোহার জালঘেরা জায়গাটায় এল। বলল--কী হয়েছে? রক্ষীরা ফ্রান্সিসদের বিরুদ্ধতার কথা বলল। লোকটা একটু ভাবল। বলল--ঠিক আছে--একজন একজন ক'রে হাত খুলে দিয়ে খেতে দিবি। আর অন্য রক্ষীরা তরোয়াল হাতে পাহারায় থাকবি। কথাটা বলে লোকটা চলে গেল।

এবার এক একজন বন্দীকে হাতের দড়ি খুলে খুলে খেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস এবার খেল। এই খাওয়ার ব্যবস্থায় বেশ দেরি হল। সবার খাওয়া হলে এককোনের একটা বড় পিপে থেকে কাঠের পাত্রে জল ভরে এনে জল খাওয়ানো হল। অন্য রক্ষীটি প্রত্যেকের হাত খাওয়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বেঁধে দিতে লাগল।

দরজার দু'টো তালা বন্ধ করে দিয়ে রক্ষীরা চলে গেল।

সময় কাটতে লাগল। ফ্রান্সিসের মাথায় চিন্তা। যখন জল খাচ্ছিল তখনই মনে পড়ছিল--মারিয়া আর বন্ধুদের তৃষ্ণার্ত মুখের কথা। তৃষ্ণার্ত হওয়া সত্ত্বেও ও সামান্য জল খেল।

পাশে আধশোয়া হ্যারি বলল--কী করবে ফ্রান্সিস?

--রাত নামার জন্যে অপেক্ষা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

--রাতে তো পাহারাদার সৈন্যদের সংখ্যা বাড়ে। হ্যারি বলল।

--দেখি সন্ধ্যের পরে ক'জন থাকে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরে সকালের খাওয়ার মতই ফ্রান্সিসরা একে একে খোলা হাতে খেল। বড় আকারের রুটি আর আলু আর কীসব সবজি মেশানো পাখির মাংস। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্যই হল--সুস্বাদু রুটি। কেক এর মত স্বাদ। ঝোলও তাই। মাংসর পরিমানও বেশি। খেতে খেতে ফ্রান্সিস মৃদু হাসল--ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে বিক্রি করতে গেলে সুস্থ আর বলশালী মানুষদের দাম বেশি পাওয়া যাবে। তাই এত সুখাদ্যের আয়োজন।

সন্ধ্যের আগেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। সূর্যাস্তের আগেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কেমন একটা ঠান্ডা হাওয়া সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে এল। ফ্রান্সিস লোহার খুঁটিটায় শরীরের ভর রেখে কীভাবে অক্ষত অবস্থায় পালানো যায় তাই চোখ বুঁজে ভাবছিল। সমুদ্রের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগতেই ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ঝলসানো আলোয় ও চমকে উঠল। আকাশের দিকে তাকাল। দেখল পশ্চিম আকাশ থেকে মেঘ উঠে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যে চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তারপরই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। পরক্ষণেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। ফ্রান্সিস খুশিতে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল--হ্যারি--এই বৃষ্টি যীশুর আশীর্বাদ। হ্যারি ঠিক বুঝল না। বলল--একথা বলছো কেন?

--ভেবে দেখো--এই বৃষ্টি আমাদের জাহাজের ওপরও পড়ছে। সমুদ্রে বৃষ্টির জল ধ'রে রাখাটা নতুন কিছু নয়। বিস্কো ওরা নিশ্চয়ই এই জল ধরে রাখবে। তা'তে সকলের সবটা জলের তেষ্টা মিটবে না। কিন্তু অন্তত কালকের দিনটা তো চালাতে পারবে। হ্যারি বলল--সত্যি একথাটা আমি ভাবিনি তো।

--এবার পালানো। ফ্রান্সিস বলল।

অন্ধকার আকাশে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে বাজপড়ার প্রচন্ড শব্দ। লোহার জালঘেরা সেই বন্দীশালার ওপর তো কোন ছাউনি নেই। ফ্রান্সিসরা ও অন্য বন্দীরা প্রবল বৃষ্টিধারায় ভিজতে লাগল। বৃষ্টিতে এরকম জানোয়ারের মত ভিজতে ভিজতেও কিন্তু ফ্রান্সিসের মন আনন্দে ভরে উঠল। একেবারে স্নান করার মত ভিজে গেছে। ভিজতে ভিজতে এখন শীত শীত করতে লাগল। তবু মনে আনন্দ--মারিয়া আর বন্ধুদের জল খাওয়ার সমস্যা তো আপাতত মিটলো।

বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি চলল। তারপর আস্তে আস্তে থেমে গেল। পায়ে লালচে মাটি কাদার তাল হয়ে গেল। সেই কাদার মধ্যেই অনেকে গা এলিয়ে দিয়েছে। বাকিরা বসে আছে। মুখে লালচে কাদার ছিটে। গায়ে পায়ে কাদা লেপ্টে আছে। জন্তু জানোয়ারের মত দশা মানুষগুলোর, জল কাদায় ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে কেউ কেউ এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। পরিচিতদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছে।

এই দৃশ্যের নির্মমতায় ফ্রান্সিস নিজেকে সংযত করতে পারল। গভীর দুঃখে বেদনায় আবার ভীষণ রাগে ওর দু'চোখ ভিজে উঠল। ও মনে মনে স্থির করে ফেলল এই নির্মমতার শোধ ও নেবে। প্রয়োজনে এদের হত্যা করবে। হাতের কাছে পেলে কাউকে রেহাই দেবে না।

রাত হচ্ছে। রাতের খাবার দেবার সময়ই পালাতে হবে--ফ্রান্সিস ভাবল। আস্তে ডাকল--শাঙ্কো। শাঙ্কো ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—এগিয়ে এসো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাঁধের ওপর মাথা রাখল। ফ্রান্সিস বাঁধা দু'হাত শাঙ্কোর পোশাকের ঢোলা গলা দিয়ে ঢোকাল। ছোরাটা তুলে আনল। তারপর দু'থাবায় ছোরাটা ধরে শাঙ্কোর হাত বাঁধা দড়িতে ঘষে ঘষে দড়িটা কেটে ফেলল।

ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল রাতের খাবার দেবার সময়ের জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের খাবার দিতে তিনজন পাহারাদার এল। ঢং ঢঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিস নজর রাখল পেছনের দিকে। না, কোন সশস্ত্র রক্ষী নেই। লক্ষ্য করল--মাঝের পাহারাদারটা বেশ লম্বাচওড়া। বলশালী। বাকি দুটোর সাধারণ শরীর। চাপা গলায় ফ্রান্সিস বলল--আমি মাঝেরটা শাঙ্কো বাঁ দিকেরটা হ্যারি ডানদিকেরটা--একসঙ্গে। গলা চেপে--টুঁ--শব্দটি যেন না করতে পারে। পাহারাদারদের একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। সে ওটা দরজার একটা লোহার আংটায় বসিয়ে দিল।

ফ্রান্সিসরা তিনটে লোহার দন্ড ধরে রাখার ভান করে রইল। তিন পাহারাদারের মধ্যেরটির হাতে ছিল কাঠের বড় থালাটা। তাতে খাবার। সে উবু হয়ে থালাটা রাখতে যাবে তখনই ফ্রান্সিস বিদ্যুৎবেগে লোকটার থুতনিতে প্রচন্ড জোরে লাথি চালাল। জল কাদা ছিটকোল। লোকটা লাথির জোর মারে চিত হ'য়ে জলকাদার মধ্যে ছিটকে পড়ল যেন। ততক্ষণে শাঙ্কো আর হ্যারিও বাকি দু'জনের গলা চেপে ধরেছে যাতে টুঁ শব্দটিও না করতে পারে। পাহারাদার দু'জনেই ঝট্‌কাচ্ছে গলার চাপ মুক্ত করতে। শাঙ্কো ঠিক চেপে ধরে আছে। কিন্তু হ্যারি তো বরাবরই দুর্বল শরীরের। কোনরকমে চেপে ধরে আছে। বন্দীশালার লোহার দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল ফ্রান্সিস সেই বলশালী লোকটাকে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে গলা চেপে ধরে আছে। লোকটা দু'হাতে ফ্রান্সিসের দুহাত চেপে গলার চাপ কমাবার চেষ্টা করছে। জলে কাদায় সবারই শরীরে তখন লালচে কাদামাটির আস্তরণ।

ঠিক তখনই তিনজন সশস্ত্র রক্ষী বন্দীশালার কাছে এল। হয়তো রাতে পাহারা দেবে বলে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসদের ঝটাপটি দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপরই কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল। ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রথমে ছুটে আসা রক্ষীটার দিকে প্রচন্ড বেগে ছুটে গিয়ে রক্ষীটা কিছু বোঝবার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুঁক করে মুখে শব্দ তুলে ছিট্‌কে গিয়ে জলকাদায় মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর হাত থেকে তরোয়ালটা ছিট্‌কে গেল। ফ্রান্সিস এক ঝট্‌কায় জলকাদা থেকে তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপরই ঘুরে দাঁড়াল থমকে দাঁড়িয়ে পড়া দু'টির দিকে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিসের জলকাদা মাখা রুদ্রমূর্তি দেখে রক্ষী দু'জন ভয় পেল ঠিকই কিন্তু ওরাও তো এরকম তরোয়ালের লড়াই অনেক লড়েছে। দু'জনই একসঙ্গে ফ্রান্সিসের দিকে লাফিয়ে এল। একজন তরোয়াল চালাল ফ্রান্সিসের গলা লক্ষ্য করে। ফ্রান্সিস দ্রুত মাথা নামিয়েই ঐ রক্ষীটার বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল। অন্যটা এগিয়ে আসতেই ফ্রান্সিস প্রচন্ড জোরে ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়ালের ঘা মারলো। রক্ষীটির হাত থেকে তরোয়াল ছিট্‌কে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ে

তরোয়ালের বাঁট দিয়ে ঘা মারল। লোকটা জলকাদার মধ্যে ঝপ শব্দ তুলে পড়ে গেল। জল কাদা ছিটকালো। কাদায় চোখ ঢেকে গেল রক্ষীটির। ওদিকে শাঙ্কো যেটাকে গলা চেপে ধরেছিল সেটার মুখ দিয়ে কোন শব্দই বেরোচ্ছিল না। কিন্তু হ্যারি যেটাকে চেপে ধরেছিল সেটার মুখ দিয়ে তখনও গো গোঁ শব্দ বেরোচ্ছিল। উপায় নেই ফ্রান্সিস ভাবল। এটাকে নিকেশ করতেই হবে। তরোয়াল চালিয়ে করলোও তাই। ফ্রান্সিস দু'তিনপা দ্রুত এগিয়ে শাঙ্কোকে বলল--ছেড়ে দাও। শাঙ্কো রক্ষীটার গলা ছেড়ে দিল। রক্ষীটা তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ওর গলায় তরোয়ালের ফলাটা ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস বলল--হ্যারি--ওকে বলো তো--টুঁ শব্দটি করলে ওকে মেরে ফেলব। হ্যারি তখন হাঁপাচ্ছে। মুখ নিচু ক'রে লোকটার কানের কাছে হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলল--একেবারে শব্দ করবে না। শব্দ করলেই তোমাকে মেরে ফেলা হবে। রক্ষীটি হ্যারির কথা বুঝল। ফ্রান্সিস তরোয়াল নাচিয়ে ওকে উঠে বসতে বলল। রক্ষীটি উঠে বসল। ফ্রান্সিস আবার তরোয়াল নাচিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলল। রক্ষীটি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। ওর পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে ফ্রান্সিস বলল--শাঙ্কো--সব বন্দীদের দড়ি কেটে দাও। তাড়াতাড়ি। ফ্রান্সিস তরোয়ালের বাঁট দিয়ে রক্ষীটার মাথায় আঘাত করতে রক্ষীটা অজ্ঞান হয়ে গেল।

ওদিকে অন্য বন্দীরা সবাই লোহার ডান্ডায় ভর রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের কান্ড দেখছিল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে একে একে বন্দীদের হাত বাঁধা দড়ি কেটে দিতে লাগল। বন্দীরা ছাড়া পেয়ে জলকাদা ভেঙে খোলা লোহার দরজা দিয়ে মুহূর্তে উধাও।

ফ্রান্সিসরাও ছুটে বাইরের অন্ধকারে এসে পড়ল। এবার চিন্তা কোথায় পিপেসুদ্ধু নৌকো তিনটি বেঁধে রেখে এসেছিল। আকাশে তখনও বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল ওরা পাথরের লম্বাটে ঘরটার কোনার দিকে এসেছো আর তখনই বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল ওরা পাথরের লম্বাটে ঘরটার কোনের দিকে এসেছে। আর তখনই দেখল লম্বাটে ঘরটা থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা দ্রুত গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল। লোকটা কাছাকাছি এসেছে তখন। ইগনোতি। বন্দীশালার দিকেই যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল শাঙ্কো। শাঙ্কো মাটিতে উবু হয়ে বসল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে হাত দিয়ে ইগনোতির মুখ চেপে ধরে ওর পিঠে ছোরাটা আমূল ঢুকিয়ে দিল। ইগনোতির মুখে শব্দ উঠল--ঘর্‌। শাঙ্কো ইগনোতিকে একটুক্ষণ ধরে রইল। তারপর ছেড়ে দিল। ইগনোতি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু'একবার নড়ল ওর শরীরটা তারপর স্থির হ'য়ে গেল।

ফ্রান্সিস আগে আগে ছুটল। পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কো। ফ্রান্সিসের লক্ষ্য সমুদ্রের ধারে যাওয়া। নৌকো থেকে নেমে ওরা বেশিদূর আসে নি। কাজেই বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। অন্ধকারে যতটা দেখে দেখে সম্ভব ওরা দু'টো চড়াই পার হল। তখনই ফ্রান্সিসের গায়ে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া লাগল। ফ্রান্সিসরা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নাড়ির যোগ। ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগতেই বুঝল--সমুদ্র কাছেই। বিদ্যুৎ চমকাল। দেখা গেল গাছগাছালি পাতলা হ'য়ে এসেছে। আর একটা উৎরাইতে উঠতেই কানে এল সমুদ্রের মৃদু গর্জন। ফ্রান্সিস ব'লে উঠল--এসে গেছি।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছল ওরা। অন্ধকারে চারদিকে নজর চালাল। তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। দেখা গেল ডানদিকে হাত পঞ্চাশেক দূরে ওদের নৌকো তিনটে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। হঠাৎ তীরভূমির দিকে শোনা গেল রক্ষীদের চিৎকার ক'রে ডাকাডাকি হৈহল্লা ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ, ওরা এতক্ষনে জানতে পেরেছে বন্দীরা পালিয়ে গেছে।

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে ফ্রান্সিসরা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নৌকোগুলোর

দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি প্রায় লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল। গাছের গোড়ার সঙ্গে বাধা দড়ি তিনটে শাঙ্কো দ্রুত ছোরা দিয়ে কেটে ফেলল। সেই দড়ি তিনটে নৌকোর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলল এবং লাফিয়ে নৌকোয় উঠল। অন্ধকারে দূরে ওদের জাহাজটা আবছা ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। দাঁড় তুলে নিল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। নৌকো চালাল ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে। ততক্ষণে সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেছে রক্ষীর দল। হৈহল্লা করছে। কিন্তু ওখানে ওদের কোন নৌকো বাঁধা নেই।

অন্ধকার সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌকোগুলো চলল জাহাজের দিকে। আকাশে এখনও থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

অন্ধকার সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌকোগুলো চলল জাহাজের দিকে। আকাশে এখনও থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

জাহাজের ডেকএ মারিয়া ঠায় দাঁড়িয়েছিল। বিস্কোরাও কয়েকজন ছিল। ফ্রান্সিসদের নৌকোগুলো অস্পষ্ট দেখল ওরা। চিৎকার ক'রে উঠল--ও--হো--হো।

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসদের নৌকোগুলো এসে জাহাজের গায়ে লাগল। দড়ির সিঁড়ি ফেলা হল। ওরা একে একে জাহাজের ডেকএ উঠে এল। মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। বলল--জল এনেছো? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। ফ্রান্সিসদের জলকাদামাখা চেহারা দেখেই মারিয়া বিস্কোরা বুঝেছিল--কিছু একটা হয়েছে। ফ্রান্সিস এবার বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল--বিস্কো বৃষ্টির জল কিছু জমাতে পেরেছো? বিস্কো বলল--সে আর বলতে। সবাই মিলে প্রায় আধ পিপে জমিয়েছি। জাহাজ ছাড়ো। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা যাবে না।--তাহ'লে আর দেরি না। --এই জলটুকু থাকতে থাকতে জলসংগ্রহ করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। কয়েকজন ভাইকিং ছুটে গেল নোঙর তুলতে জাহাজে পাল খাটাতে। ওদিকে হ্যারি তখন বন্ধুদের সব ঘটনা বলছে। দোনিয়া তখনই ডেকএ উঠে এল। হ্যারির কথাবার্তা শুনেই বুঝল--ওরা জল পায় নি। ফ্রান্সিস এবার দোনিয়াকে জিজ্ঞেস করল--আপনি তো এই এলাকা মোটামুটি চেনেন। জল কোথায় পাবো বলতে পারেন?--দেখুন--কাছাকাছি একটা ছোট্ট বন্দরমত আছে। ওখানে একটা কূপ আছে। অনেক জাহাজই ওখানে থেমে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু সেটা এখনও কতদূর আমি সঠিক বলতে পারবো না। তবে সমুদ্রের তীরের ধারে ধারে জাহাজ দক্ষিণমুখে চালালে ছোট্ট বন্দরটা পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্লাইজারের কাছে গেল। দোনিয়ার কথাবার্তা বলল। ফ্লাইজার মাথা ওঠানামা করল। তার মানে ও নির্দেশটা বুঝল। তীরভূমির যতটা সম্ভব কাছাকাছি দূরত্ব রেখে জাহাজ চালাতে লাগল।

ফিরে এসে দোনিয়াকে বলল--ঐ ছোট্ট বন্দরটার কোন নিশানা দিতে পারেন।

--হ্যাঁ।--সমুদ্র থেকেই একটা ডাঙা নুরাঘির মাথা দেখা যায়। ওটার রঙ কালো। দোনিয়া ও ফ্রান্সিসের পাশেই দাঁড়িয়েছিল নজরদার পেড্রো। কথাটা শুনে পেড্রো দড়িদড়া ধ'রে ধ'রে মাস্তুল বেয়ে নিজের জায়গায় উঠে গেল।

হ্যারি শাঙ্কো ততক্ষনে স্নান করে গায়ের মুখের শুকিয়ে আসা কাদা ধুতে গেল। ফ্রান্সিসও চলে গেল স্নান করে গায়ের কাদা ধুতে।

জাহাজ চলল। তখন আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরেই পূব আকাশে লাল আলো ছড়িয়ে সূর্য উঠল।

সূর্য তখন মাথার ওপর উঠে এসেছে। তখনও ডাঙা নুরাঘিটা নজরদার পেড্রোর চোখে পড়ল না।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই দেখা গেল ধরে রাখা বৃষ্টির জল প্রায় শেষ। ফ্রান্সিসের নির্দেশে দুপুরের খাওয়ার সময় জল খুব হিসেব করে খেল সবাই। অনেক অনুমান করা সত্ত্বেও মারিয়া কিন্তু এক ফোঁটা জলও খেল না। ফ্রান্সিস শুনল সেটা। কিন্তু কিছু বলল না।

জাহাজ চলেছে। পেড্রো নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডাঙা নুরাঘির মাথার দেখা নেই।

সারারাত জাহাজ চলল। ফ্রান্সিস প্রায় সারারাত না ঘুমিয়ে কাটাল। মারিয়ারও এক অবস্থা। কেউ কোন কথা বলল না। ভাইকিং বন্ধুরা জলতৃষ্ণা নিয়েও কেউ ঘুমোল কেউ ঘুমোল না।

ভোর হল। বৃষ্টির ধরে রাখা জল কতটা আছে তা দেখবার জন্যে ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে তখনই হ্যারি ঢুকল। বলল--ফ্রান্সিস কী করবে?

--জল শেষ—এই তো। ফ্রান্সিস বলল—

--খুব সামান্য তলানি আছে। হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবল। মাথা তুলে বলল--বন্ধুদের মধ্যে যারা একটু দুর্বল--যারা জলতৃষ্ণা সহ্য করতে পারবে না একমাত্র তারাই অল্প জল খেতে পাবে। আর কেউ জল খাবে না। সবাইকে বলে দাও।

--কিন্তু—ক'ার জলের খুবই প্রয়োজন—মানে অসুখে মৃতপ্রায় হলে যেমন হয়—সেটা বুঝবে কী করে? হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল--বৈদ্যি ভেনকে ডাকো তো।

হ্যারি কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মারিয়া বলে উঠল--জল সংগ্রহ করা না পর্যন্ত আমি একফোঁটা জলও খাবো না।

--ধরো দিন সাতেকের আগে জল পাওয়া গেল না। সেই সাতদিন পারবে জল না খেয়ে থাকতে? ফ্রান্সিস বলল।

--নিশ্চয়ই পারবো। মারিয়া গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল।

তখনই ভেন কেবিনঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল--ভেন--তুমি তো সব শুনেছো। ভেনই ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে বয়স্ক। চুলে দাড়িতে পাক ধরেছে। সে মাথা ওঠানামা করল। অর্থাৎ সবই জানে সে।

--ভেন--ফ্রান্সিস বলল-শুধু তুমিই যাকে জল খাওয়াতে বলবে তাকেই এই সামান্য জল থেকে জল খেতে দেওয়া হবে। কারন তুমিই ঠিক বুঝবে কা'কে জল খাওয়ানো প্রয়োজন।

ভেন কোন কথা বলল না। শুধু আবার মাথা ওঠানামা করল। বুঝল--বড় কঠিন দায়িত্ব চাপলো ওর ওপর।

সকালের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। কমবেশি তৃষ্ণার্ত সকলেই। তবু কেউ জল খেল না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার সময় বোঝা গেল জল না খেয়ে থাকার প্রতিক্রিয়া কী? বেশ কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই অঞ্চলে রোদের তাপ প্রখর নয়। তবু দিনের গরম তো। জলের তৃষ্ণা তো হবেই আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা তো বাড়বেই। কিন্তু সহ্য করার ক্ষমতা তো সবার সমান নয়। ভেন অসুস্থদের চোখ জিভ পরীক্ষা করছে। তখনই ফ্রান্সিস এল। বলল--ভেন--অন্য কোনভাবে জলতেষ্টা সামান্য হলেও মেটানো সম্ভব? ভেন মাথা নাড়ল। তারপর বিস্কোর দিকে তাকাল। বিস্কোর হাতে কাঠের লম্বা চোঙমত। তা'তেই বৃষ্টির শেষ জলটুকু রাখা হয়েছে। ভেন এর নির্দেশে কয়েকজনকে

অল্প জল খাওয়ানো হল।

বিকেল থেকেই আরো অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কেবিনঘরে ডেকএর এখানে ওখানে তারা শুয়ে পড়ে রইল। মারিয়া হ্যারি শাঙ্কোও শুয়ে পড়ে রইল। শুধু ফ্রান্সিস ডেকএর ওপর চুপ করে বসে রইল। মাঝে মাঝেই তাকাতে লাগল আকাশের দিকে-যদি মেঘের দেখা পাওয়া যায়। বিস্কো ভেনএর নির্দেশমত অসুস্থদের এক ফোঁটা দুফোঁটা করে জল খাইয়ে দিতে লাগল।

নজরদার পেড্রোকে ডাকবার জন্যে ভেন বিস্কোকে বলল। বিস্কো মাস্তুলের মাথার দিকে তাকিয়ে ডাকল—পেড্রো নেমে এসো। গলা চড়িয়েই ডাকতে গেল কিন্তু বিস্কোর গলা দিয়ে জোরে শব্দ বেরুলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিস্কো হাতে ধরা জলের চোঙটা ভেনএর হাতে দিয়ে বেশ কষ্ট করে দড়ির মই বেয়ে বেয়ে বেশ কিছুটা আস্তে আস্তে উঠল। বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে পরিশ্রম হবে। জলের তেষ্টা বেড়ে যাবে। ওখান থেকেই ভাঙা গলায় ডাকল—পেড্রো। পেড্রো শুনল ডাকটা। নিচের দিকে তাকাল। দেখল ডেকএর ওপর অনেক বন্ধু চুপচাপ শুয়ে আছে। ভাগ্যি ভালো রোদের তেজ কম—বাতাসও জোরে বইছে। তাই জলতৃষ্ণা কাতর ভাইকিংরা ডেকএ শুয়ে একটু স্বস্তি পাচ্ছে।

পেড্রো এবার উঠল। আস্তে আস্তে দড়ির মই দড়ি ধরে নামতে লাগল। বিস্কো ও নেমে এল। পেড্রো ডেকএ এসে দাঁড়াল। ভেন ওকে মুখ হাঁ করতে ইঙ্গিত করল। পেড্রো মুখ হাঁ করল। ভেন কিছুটা বেশিই জল ওর মুখে ঢেলে দিল। পেড্রো জল খেয়ে আবার চলল নিজের জায়গায়। মাস্তুলের মাথায়।

সূর্য অস্ত গেল। হালকা অন্ধকার নেমে এল। একটু পরেই পূব দিগন্তে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো ছড়ালো সমুদ্রের জলে। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল না হলেও সমুদ্রের তীরের গাছপালা টিলা এসব দেখা যাচ্ছিল।

পেড্রো সমানে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। যেন চোখে পলক পড়ছে না। দোনিয়া বলেছিল—একটা কালো, রঙের ভাঙা নুরাঘির মাথা দেখা যাবে। ওখানেই ছোট্ট বন্দরমত। কূয়োর জল পাওয়া যাবে ওখানে।

হঠাৎই পেড্রো চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখল—কয়েকটা গাছের মাথা ছাড়িয়ে কালো উঁচু গোল দেয়ালমত। পেড্রো তখনও দমবন্ধ করে তাকিয়ে আছে। জাহাজ আরো এগিয়ে যেতেই পেড্রো দেখল ভাঙা নুরাঘিটা। ও চিৎকার করে উঠল—ভাঙা নুরাঘি—ভাঙা নুরাঘি—। গলায় সেই জোর নেই। তবু কথা তো বেরিয়ে এল গলা থেকে। অস্পষ্ট হলেও ফ্রান্সিসের কানে গেল কথাটা। ও বেশ দুর্বল শরীর নিয়েও দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বোধহয় একা ফ্রান্সিসই বারবার মেঘ দেখার আশায় আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল আর কান খাড়া রাখছিল যদি পেড্রো কিছু বলে।

ফ্রান্সিস যতটা সম্ভব দ্রুত রেলিঙের দিকে ছুটল। রেলিঙে ভর দিয়ে তীরভূমির দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখল নুরাঘির ভাঙা মাথা। পেড্রো তখনও একনাগাড়ে ভাঙা গলায় ব'লে চলেছে—নুরাঘি—ভাঙা নুরাঘি। ডেকএ শুয়ে থাকা ভাইকিংরা ততক্ষণে অনেকেই উঠে পড়েছে। তারাও রেলিঙের ধারে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে দেখে বলল—শিগগির দোনিয়াকে ডাকো। জলদি।

একটু পরেই শাঙ্কো দোনিয়াকে নিয়ে ডেকএ উঠে এল। দোনিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস আঙ্গুল তুলে ভাঙা নুরাঘিটা দেখাল। দোনিয়া একটুক্ষণ টেনে নিয়ে—হ্যাঁ--ওটার সামনেই একটা ছোট্ট জাহাজঘাটা মত আছে।

জাহাজ চলল। ভাঙা নুরাঘিটার কাছাকাছি আসতেই এবার চাঁদের আলোয় অনেকটা

স্পষ্ট দেখা গেল--ঘাটে একটা মালবাহী জাহাজ নোঙর করা আছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা আস্তে আস্তে জাহাজঘাটায় ভিড়ল। একটা সুবিধে হল যে নৌকোয় চড়ে গিয়ে পিপেয় ভরে জল আনতে হবে না।

জাহাজঘাটার খুব কাছেই আনা গেল ফ্রান্সিসদের জাহাজটাকে। কাঠের পাটাতন ফেলা হল। জলের জায়গায় আসা গেছে এই কথাটা এর মধ্যেই সব ভাইকিংদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। মারিয়াও পেল খবরটা। বেশ দুর্বল শরীর নিয়েও মারিয়া ডেকএ উঠে এল।

এবার কারা জল আনতে যাবে, তাই নিয়ে ফ্রান্সিসকে ভাবতে হল। হ্যারিকে নেওয়া যাবে না। হ্যারি তো বরাবরই দুর্বল। তারপরও জল নিতে না পেরে আরো কাহিল হয়ে পড়েছে। বিস্কোর দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল-- তুমি শাঙ্কো আরও কয়েকজন সুস্থ সঙ্গী নাও আর জলের চারটে পিপেই নিয়ে এসো। যতটা সম্ভব জল নেব। আমি দোনিয়াকে নিয়ে জলের খোঁজে যাচ্ছি। তোমরা পেছনে পেছনে এসো।

পাটাতনে হেঁটে গিয়ে কিছুটা জলকাদা পার হয়ে দু'জনে উঁচু পারে উঠল। দু'ধারে এদিক ওদিক কিছু পাথরের বাড়িঘর। চাঁদের আলোয় পাথর ছড়িয়ে থাকা ধুলোটে পথ দিয়ে দু'জনে চলল। একটু এগোতেই কিছু গাছগাছালির পরেই একটা টিলার মত। তার নিচেই ছড়ানো বড় পাথর। দোনিয়াই এতক্ষণ আগে আগে যাচ্ছিল। দোনিয়া সেই কাঠের লম্বা চোঙটা নিয়ে এসেছিল। কারণ ও জানতো জল তোলার জন্যে এটা লাগবে।

দোনিয়া দু'টো চ্যাপ্টা পাথর খণ্ডের ওপর দু'পা রেখে নিচু হল। ফ্রান্সিস দেখল পাথর খণ্ড দু'টোতে মাঝখানটায় গর্ত। চাঁদের আলোয় বোঝা গেল না কতটা গভীর। দোনিয়া কাঠের চোঙটা নামাল। ছলাৎ-- জলের শব্দ উঠল। দোনিয়া কাঠের চোঙ ভরে জল তুলল। ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে ধরে বলল-- খান। গত প্রায় দিন তিনেকের মধ্যে ফ্রান্সিস খুব সামান্য জলই খেয়েছে। সেই তৃষ্ণার জল সামনে। তবু ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল-- না। আপনি খান। দোনিয়াও তৃষ্ণাকাতর মুখে ম্লান হাসল। বলল-- যে কারণে আপনি জল খেতে চাইছেন না একই কারণে আমিও খাবো না। তবে জল দিয়ে চোখ মুখটা ধুয়ে নিন। এটা করা খুবই প্রয়োজন। ফ্রান্সিস আপত্তি করল না। দু'জনেই ঐ জলে হাতমুখ চোখে জলের ঝাপ্টা দিল। আঃ কী ঠাণ্ডা জল। কী শান্তি।

তখনই পিপে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে শাঙ্কোরা এল। ওরা একটু দূর থেকে ফ্রান্সিস আর দোনিয়ার মুখ ধোয়া দেখল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল-- ও-- হো-- হো কিন্তু সকলের গলাই তো শুকিয়ে কাঠ। তেমন জোরালো শব্দ গলা দিয়ে বেরুলো না।

ওরা এবার প্রায় ছুটে এল পিপেগুলো নিয়ে। একজন ভাইকিং বন্ধু দোনিয়ার হাত থেকে কাঠের চোঙটা প্রায় টেনে নিল। ফ্রান্সিস বাধা দিতে গিয়েও দিল না। ওখান থেকে সরে দাঁড়াল। শাঙ্কো দেখল সেটা। ভাবল ফ্রান্সিস যখন মানা করছে না তখন জল না খেয়ে উপায় কি। ওদিকে বন্ধুরা সব জল তুলে তুলে খেতে শুরু করছে। তখন ওদের আনন্দ দেখে কে। জল খাওয়া মাথায় গায়ে ঢালা হৈ চৈ চলল। শাঙ্কোও প্রায় এক চোঙ জল খেয়ে ফেলল চোঁ চোঁ করে।

এতক্ষণে ফ্রান্সিস বলল- এবার পিপেগুলো ভরে ফেল। জাহাজে যে তৃষ্ণার্ত বন্ধুরা রয়েছে তাদের ভুলে যেও না। ভাইকিংদের হৈ হল্লা এবার বন্ধ হ'ল। পিপে এনে এনে জল ভরতে লাগল। যখন সবগুলো পিপেয় জল ভরা শেষ হল তখন সবাই হাত লাগাল। ধরাধরি করে চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে চলল জাহাজের দিকে। সবার পেছনে ফ্রান্সিস আর দোনিয়া।

পাতা পাটাতন দিয়ে পিপেগুলো ধরে ধরে নিয়ে সবাই জাহাজের ডেক-এ উঠল। শাঙ্কো এতক্ষণে একটু গলা চড়িয়ে বলতে পারল-- সবাই এসো-- জল এনেছি। তৃষ্ণায় কাতর বন্ধুরা ছুটে এল। কাঠের চোঙে জল ভরে শাঙ্কো সবাইকে জল খাওয়াতে লাগল। আনন্দের হৈ হল্লা শুরু হল। সেই শব্দ কেবিন ঘরে গিয়েও পৌঁছল। মারিয়া আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে চলল ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির দিকে। হ্যারি তার আগেই উঠে এসেছে।

ফ্রান্সিস আর দোনিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যারি আর বিস্কো এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। মারিয়া তখনই এল।

ভাইকিং বন্ধুরা কাঠের চোঙ্টায় জল ভরে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়া ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হেসে বলল-- আমরাও খাচ্ছি তুমি খাও। মারিয়া চোঙটা থেকে আস্তে আস্তে খেতে লাগল। শুকনো গলা দিয়ে জল যেন নামতে চায় না। খুব বেশি জল মারিয়া প্রথমেই খেতে পারল না। এবার ফ্রান্সিস দোনিয়া আর বিস্কো জল খেল। মারিয়া আবার জল খেল। অল্প জল হাতে নিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিল। ততক্ষণে ভাইকিংদের আনন্দে হৈ হল্লা থেমে গেছে।

এবার জলের পিপেগুলো বেশ কয়েকজন ধ'রে ধ'রে নিয়ে চলল রান্না ঘরের পাশে রেখে দেওয়ার জন্যে।

রাতের খাওয়া শেষ হতেই ঘর্ ঘর্ শব্দে নোঙর তোলা হল। পাটাতন তুলে ফেলা হ'ল। নোঙরের দড়ি আলগা হতেই জাহাজ তীরভূমি থেকে সরে আসতে লাগল। দোনিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্লাইজারের কাছে এল। দোনিয়ার নির্দেশমত ফ্লাইজার জাহাজ চালাতে লাগল সরাসরি বন্দরের উদ্দেশ্যে।

জোর বাতাসে জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠল। সমুদ্রে উঁচু ঢেউ উঠছে না। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলো চিক্ চিক্ করছে। ভাইকিং বন্ধুরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেল। দাঁড় টানার আর দরকার নেই। তৃষ্ণার জল পেয়ে এখন সবাই মোটামুটি সুস্থ। তার ওপর দাঁড় টানার পরিশ্রম থেকেও মুক্তি পেয়েছে।

জাহাজ চলল। পথে ঝড়বৃষ্টির পাল্লায় পড়তে হয় নি। শুধু এক সকালে ঘন কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রম হবার উপক্রম হয়েছিল। দোনিয়া দিক ঠিক করে জাহাজ চালক ফ্লাইজারকে জাহাজ চালাবার নির্দেশ দিয়েছিল।

দু'দিন পরেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ সার্দিনিয়া দ্বীপের কাছে এল। সমুদ্রতীরের কাছ দিয়ে জাহাজ চলতে লাগল।

পরদিন বিকেলের দিকে দূর থেকে সাসারি বন্দর দেখা গেল। দু'টো মালবাহী জাহাজ নোঙর করা ছিল। রাজা এনজিওর শৌখিন জাহাজটার কাছে ফ্রান্সিসদের জাহাজ ভিড়ল। নোঙর করা হল।

ফ্রান্সিস আর দেরি করতে চাইছিল না। অনেক কষ্টে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গেছে। এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেই সোনার যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করতে হবে।

ফ্রন্সিস হ্যারিকে বলল— দোনিয়া আর শাঙ্কোকে খবর দাও। আমরা এখুনি নুরাঘির ঘরটায় যাবো। রাতে থাকবো। কাল সকাল থেকেই অনুসন্ধান চালাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'টো নৌকোয় চড়ে ফ্রান্সিসরা নুরাঘিটায় এল। ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস নিজেদের ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথার পেছনে দু'হাত রেখে চোখ বুঁজে রইল। হ্যারি দক্ষিণের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অস্তগামী সূর্যের আলো

পড়েছে খাঁড়ির জলে। ছোট ছোট ঢেউ-তোলা জল কেমন লালচে হ'য়ে উঠেছে। এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলে নি। দোনিয়া চুপ ক'রে বসেছিল। ভাবছিল - ফ্রান্সিস একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছে। কিন্তু ঐ সূত্রের ওপর নির্ভর ক'রে কি যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করা যাবে? দোনিয়ার মনের কথা যেন ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। বলল - দোনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ ভাঙা নুরাঘিটার হাত তিরিশেক দূরে নৌকোটা ডুবেছিল। কাজেই ঐ জায়গাটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের তল্লাসি চালাতে হবে।

-- কিন্তু সেই এলাকাটাও নেহাৎ ছোট নয়। দোরিয়া বলল।

-- ঠিক। আস্তে আস্তে ঠিক জায়গাটার হদিশ পাবো। ফ্রান্সিস বলল। ওদের কথাবার্তা শুনে হ্যারি এসে বিছানায় বসল। বলল - আচ্ছা দোনিয়া - ঐ নুরাঘিটায় ধ্বস নেমেছিল কবে?

-- সঠিক সময়টা আমি কোথাও পাইনি। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য থেকে হিসেব করে একটা আন্দাজ করা যায়। দোনিয়া বলল।

আন্দাজ ক'রেই বলুন না। ফ্রান্সিস বলল।

-- মানে-ঐ নুরাঘির ধ্বস নামার ব্যাপারটা নৌকোডুবিটার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে এটা আমি কোনদিন ভাবি নি। দোনিয়া বলল।

— এবার তো ভাবতেই হবে। হ্যারি বলল।

দোনিয়া আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বোধহয় হিসেবটা করতে লাগল। ফ্রান্সিস হ্যারিও চুপ ক'রে রইল।

সন্ধ্যে হল। ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে গেল। একজন সৈন্য এসে দেয়ালের পাথরের খাঁজে বসানো মশালটা জ্বেলে দিয়ে গেল।

একসময় দোনিয়া বলল - যতদূর হিসেবে পাচ্ছি তা'তে ঐ নুরাঘির ধ্বস নেমেছিল মুজাহিদ যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাবার পরে।

-- কতদিন পরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

-- তা'তো সঠিক বলতে পারবো না। দোনিয়া মাথা নেড়ে বলল। হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস তোমার কি মনে হয় মুবারক যোদ্ধামূর্তি উদ্ধার করতে এসেছিল? ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল - নিশ্চয়ই এসেছিল। তারপর বলল - আমার মনে হয় মুবারক বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। মুবারক একাই এসেছিল আর দিনে নয় রাতে সন্ধান চালিয়েছিল।

-- রাতে কেন। দোনিয়া বলল।

-- দিনে সন্ধানের কাজ চালাতে গেলে সহজেই এখানকার লোকেদের চোখে বিশেষ ক'রে সমুদ্রে যারা মাছ ধরে সেই জেলেদের নজরে পড়ে যেত। তাছাড়া ভুলে যাবেন না - মুবারক বিদেশী ছিল। আরবি ছিল ওর মাতৃভাষা। হ্যারি বলল।

-- হুঁ - কথাটা ঠিক। দোনিয়া যেন আপনমনে বলল। কেউ আর কোন কথা বলল না।

রাতের খাওয়াদাওয়ার তখনও কিছু দেরি আছে। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকল। দোনিয়াকে বলল - মহামান্য রাজা আপনাদের কাল সকালে দেখা করতে বলেছেন। দোনিয়া মাথা কাত ক'রে বলল, - বেশ। - যাবো। এবার চলে যেতে গিয়েও সেনাপতি ঘুরে দাঁড়াল। বলল - আর একটা কথা। শুনলাম, আপনারা আজকে ঐ ধ্বসে পড়া নুরাঘিটায় নাকি উঠেছিলেন।

-- হ্যাঁ। - খোঁজ করতে উঠেছিলাম। হ্যারি বলল। -- ভালো করেন নি, --

সেনাপতি বলল। - মহামান্য রাজার জাহাজ থেকে আমাদের সৈন্যরা দেখেছে এখানকার জেলেরাও দেখেছে। এখনও ঐ নুরাঘির মাথা থেকে ধ্বস নামে। আপনারা বিপদে পড়তে পারেন। হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাটা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল - বলো যে আমরা এখন থেকে সাবধান হবো। তবে নুরাঘিটায় আর তার ধারে কাছে খোঁজ করতেই হবে। হ্যারি বলল সে কথা। - সে'আপনাদের দায়িত্ব! আমার সাবধান করার ক'রে গেলাম। কথাটা ব'লে সেনাপতি চলে গেল।

পরদিন ফ্রান্সিসদের সকালের খাওয়া শেষ হতে সেনাপতি এল। ওরা সেনাপতির সঙ্গে সাসারির রাজপ্রাসাদের দিকে চলল।

রাজা এনজিও সিংহাসনে বসে আছে। বাঁপাশের আসনে স্পিনোলা বসে আছেন। রাজা এনজিও দোনিয়াকে বললেন - যোদ্ধামূর্তিগুলোর কোন হদিশ পেলেন? দোনিয়া বলল - যা বলার ফ্রান্সিস বলবেন। ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে বলল - মান্যবর রাজা - আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছি। তার ওপর নির্ভর করেই আমরা সন্ধানকার্য চালাবো। -সেই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা কী? স্পিনোলা কুটিলদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। ফ্রান্সিস সাবধান হ'ল। বলল - সেটা যথাসময় বলবো। তবে সবটাই এখনও অনুমানের পর্যায়ে আছে। কয়েকটা দিন সন্ধান চালিয়ে তবেই সূত্রটার গুরুত্ব যাচাই করতে পারবো। - কতদিন লাগবে? আমাকে তো রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। রাজা এনজিও বলল। - কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক কবে উদ্ধার করতে পারবো সেটা বলতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

- ঠিক আছে। চেষ্টা চালিয়ে যান। তবে মহামান্য রাজাকে আমি বলেছি - আপনারা মিছিমিছি খাটাখাটুনি করেছেন। সেই মূল্যবান মূর্তিগুলো মুজাহিদ তার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে। স্পিনোলা বলল। - হয়তো আপনার অনুমান সত্য। তবে আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস মূর্তিগুলো এই খাঁড়ির জলের নিচেই আছে। ফ্রান্সিস বলল।

- হুঁ। স্পিনোলা আর কোন কথা বলল না।

- আপনারা এবার যেতে পারেন। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করুন। রাজা এনজিও বলল।

- আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। দোনিয়া বলল। সবাই মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে এল।

বিস্কো সকালেই মারিয়াকে আনতে চলে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসরা নুরাঘির ঘাটে এসে দেখল - রাজার নৌকোয় বিস্কো মারিয়া বসে আছে। হ্যারি সেই নৌকোয় উঠল। দোনিয়ার নৌকোয় উঠল ফ্রান্সিস আর মারিয়া। নৌকো চলল। সামনে ফ্রান্সিসদের নৌকো। নৌকো চলল ভাঙা নুরাঘিটার দিকে।

কাছাকাছি যখন নৌকো পৌঁছল তখন অনেকটা চৌকোনো আকারের সেই সুড়ঙ্গটা আঙুল তুলে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল - দোনিয়া - এই গোপন পথটা মুবারক যেভাবেই হোক খুঁজে বের করেছিল। এখানেই মুবারক নৌকোর সঙ্গে নিজেকেও লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন এটার মুখে পাথুরে দেয়াল ছিল নিশ্চয়ই। গোপন পথটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্যে। ধ্বস নামার সময় সেই দেয়ালটা ভেঙে পড়েছিল। লক্ষ্য করুন - সুড়ঙ্গের মত মুখটার চারপাশের পাথরগুলো ভাঙা ভাঙা।

-- বুঝলাম। - কিন্তু নুরাঘিটায় ধস নেমেছিল মুবারক এখানে আসার আগে না পরে? দোনিয়া বলল।

-- আমার মনে হয় তার আগে। ফ্রান্সিস বলল।

দু'টো নৌকোই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকল। এখানে অন্ধকার। সুড়ঙ্গপথে যেটুকু সামান্য

আলো আসছে। অন্ধকারটা চোখে স'য়ে আসতে ফ্রান্সিস নৌকো থেকে সেই প্যাচপেচে পেছল কাদাভরা পাথরের সিঁড়িতে পা রাখল। বলল - বিস্কো তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো। - কিন্তু সাবধান। ভীষণ পেছল। পা টিপেটিপে এসো। বিস্কোও নামছে তখনই মারিয়া বলল - বিস্কো বলেছে - সেনাপতি নাকি এই নুরাঘিতে উঠতে মানা করেছে। অন্ধকার সিঁড়ি থেকে ফ্রান্সিস বলল - উপায় নেই। তবে ভয় নেই। আমরা সাবধান থাকবো। অন্ধকার সুড়ঙ্গে ফ্রান্সিসের কথাগুলো বেশ জোরালো শোনালো।

অন্ধকারে ফ্রান্সিস পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তখনই ভাবল — ভুল হয়েছে। এরপর একটা মশাল আনতে হবে।

পাঁচসাতটা সিঁড়ির পরেই আর জলা কাদা নেই। শুকনো পাথর সিঁড়িতে আগেই পেতেছিল। নিশ্চিন্তে উঠতে লাগল।

চত্বরমত জায়গাটায় আসতেই বা দিকের বিরাট খোঁদল দিয়ে আলো আসছে দেখল। এখানটায় বেশি অন্ধকার নেই।

ফ্রান্সিস সারাক্ষণ কান খাড়া রাখছিল। যদি কোন পাথর পড়ার শব্দ শোনে সাবধান হতে পারবে। চত্বরটার পরে সিঁড়িটায় উঠতে যাবে তখনই ফ্রান্সিসের কানে এল খুব মৃদু পাথর ঘষটানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ও পাশের পাথুরে দেয়ালে শরীরটা লেপ্টে দাঁড়াল আর গলা চড়িয়ে বলল -- বিস্কো, — ধ্বস -- সাবধান। বিস্কোও দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সত্যিই ওপরথেকে বেশ কয়েকটা পাথর ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ধ্বসে পড়ল ছোট চত্বরটার ওপর। ফ্রান্সিসের গা ঘেঁষেই পাথরের বড় বড় চৌকোনো টুকরোগুলো গড়িয়ে পড়ল। একটা পাথর বিস্কোর পায়ের পাতায় প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল। বিস্কো দ্রুত পা সরিয়ে নিল। ধুলোবালি উড়ল।

ধ্বস থামতে ফ্রান্সিস দু'টো পাথর ডিঙিয়ে ছোট চত্বরটায় নামতে যাবে তখনই ঐ অল্প আলোয় দেখল দু'টো পাথরে মধ্যে চৌকোনো মত কী যেন আটকে আছে। ফ্রান্সিস নিচু হ'য়ে দেখেও বুঝল না জিনিসটা কী? ও হাত বাড়িয়ে দু'টো পাথরের জোড় থেকে জিনিসটা টেনে টেনে খুলে আনল। সামান্য আলোয় দেখল চৌকোনো মত কী যেন। তামা বা পেতলের পাতের মত। জিনিসটার ওপর থেকে ধুলোবালি ময়লা হাত দিয়ে মুছে ফেলতেই বুঝল -- পেতল তামা নয় -- সোনা আর তাতে গোল গোল কাজ করা।

ওদিকে নিচে নৌকো থেকে হ্যারি মারিয়া ধ্বস নামার শব্দ শুনেছিল। ওরা তখন ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডাকাডাকি শুরু করেছে। বিস্কো চেঁচিয়ে বলল — ভয় নেই, আমরা নিরাপদ।

সোনার জিনিসটায় কিছু কাজ করা আছে। ফ্রান্সিস দ্রুত ভাবতে লাগল -- সোনার এই জিনিসটা কী হতে পারে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল গির্জায় দেখা সেই ব্রোঞ্জের ছোট যোদ্ধামূর্তিটার কথা। মূর্তিটার বাঁ হাতে ঠিক এমনি একটা ঢাল ছিল। তাহলে কি নিখোঁজ একটি যোদ্ধামূর্তির ঢাল এটা? ফ্রান্সিস চম্‌কে উঠল। তাহলে মুবারক কি একটা মূর্তি উদ্ধার করতে পেরেছিল? ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। ঢালটা কোমরে গুঁজে রাখল। দ্রুত সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলল -- বিস্কো -- নামবো চলো। দু'জনেই নামতে লাগল। পেছল সিঁড়িগুলো সাবধানে পার হ'য়ে নৌকোয় উঠল দু'জনে।

নৌকো ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সিস বলল -- দোনিয়া — যোদ্ধামূর্তির একটা ভাঙা ঢাল আমি পেয়েছি। দোনিয়া ভীষণ চমকে উঠে বলল -- সত্যি?

ততক্ষণে নৌকো সুড়ঙ্গটার বাইরে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস কোমরে গুঁজে রাখা ভাঙা ঢালটা বের করল। উজ্জ্বল রোদে দেখল -- ওটা ঢালই। দোনিয়া হাত বাড়িয়ে ঢালটা

নিলো। দেখতে দেখতে বলল -- আপনার অনুমান ঠিক। এটা একটা সৈন্যে মূর্তির ভাঙা ঢাল।

-- তার মানে আস্ত মূর্তিটা তাহ'লে যেখানে ঢালটা পেয়েছি সেখানেই কোথাও পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল। দোনিয়া একটু ভেবে বলল — তার মানে অন্তত একটা মূর্তি মুবারক উদ্ধার করতে পেরেছিল। কিন্তু কোন কারণে সেটা ফেলে যেতে হয়েছে আর ঐ মূর্তিটা ওখানেই পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস দোনিয়ার হাত থেকে ঢালটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবল -- ঢালটা উঁচুতে তুলে মারিয়া হ্যারি আর বিস্কোকে দেখাবে। দোনিয়া দ্রুত চারদিকে তাকাল। দেখল -- খাঁড়ির পুবপারে একটা নৌকো ভাসছে। নৌকোর দু'জন জেলে ফ্রান্সিসের দিকেই তাকিয়ে আছে। দোনিয়া চাপাস্বরে ব'লে উঠল — ফ্রান্সিস ঢালটা লুকোও। নজরদারি চলছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হ'ল। আলগোছে ঢালটা হাত থেকে ছেড়ে দিল। নৌকোর গলুইয়ে পড়ল ওটা। হ্যারি ওদের নৌকো থেকে গলা চড়িয়ে বলল -- কী বলছিলে ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে গলা চড়িয়ে বলল -- কিছু না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দাঁড় টানতে লাগল। নৌকো দু'টো চলল নুরাঘির ঘাটের দিকে।

সারা নৌকাপথে ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। ঘাটে নৌকো দুটো এসে লাগল। তার আগেই ফ্রান্সিস সোনার ঢালটা নৌকোর গলুই থেকে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছিল।

নুরাঘিতে ঢোকার মুখে সদর দেউড়িতে সেনাপতির সঙ্গে দেখা। সেনাপতি দোনিয়াকে বলল -- হদিশ পেলেন কিছু? -- তল্লাসি চালাচ্ছি-- দেখা যাক। দোনিয়া বলল।

একেবারে ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল -- হ্যারি -- একটা যোদ্ধামূর্তির ভাঙা ঢাল পেয়েছি। সোনার ঢাল। হ্যারি চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো বলো কী?

তখনই দু'জন সৈন্য ওদের দুপুরের খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস চোখের ইশারায় হ্যারি আর মারিয়াকে চুপ ক'রে থাকতে বলল।

সবাই বিছানায় ব'সে খেতে লাগল। সবাই চুপ।

খাওয়া শেষ হ'ল। সৈন্য দুজন এঁটো থালা চিনেমাটির বাটি নিয়ে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস কোমর থেকে ভাঙা ঢালটা নিয়ে মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া খুশিতে আত্মহারা তখন। হ্যারি আর বিস্কো ঝুঁকে পড়ে সোনার ঢালটা দেখতে লাগল।

ফ্রান্সিস এসময় যা করে তাই করল। দু'হাতের তালু মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়ল। দোনিয়াও ওর পাশে আধশোয়া হ'ল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখন অনেক চিন্তা। সেই চিন্তার কথাই বলবার জন্যে ডাকল -- দোনিয়া।

-- বলুন। দোনিয়া ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল।

-- দেখুন, -- আমার মনে হয় মুবারক একাই মূর্তিগুলো জলের তলা থেকে উদ্ধার করতে এসেছিল। ফ্রান্সিস বলল। -- আমারও তাই মনে হয়—দোনিয়া বলল -- কিন্তু ক'টা মূর্তি মুবারক উদ্ধার করতে পেরেছিল সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বলল -- আজ থাক। বিকেল হয়ে গেলে খোঁজা যাবে না। কালকে সকালে গিয়েই যে জায়গায় ঢালটা পেয়েছি সেখানে ভালো ক'রে খুঁজতে হবে। মারিয়া হ্যারি নৌকোয় থাকবে। আমরা তিনজন উঠে পাথর সরিয়ে খুঁজবো। -- হুঁ -- সাবধানে খুঁজতে হবে। আজকেও তো ধ্বস নেমেছিল। আমরা নিচে থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনেছি। দোনিয়া বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

মারিয়া ঢালটা হ্যারির হাতে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে গির্জাঘরের দিকে চলল। গির্জায় ঢুকে যে কুলুঙ্গিতে ব্রোঞ্জের যে ছোট্ট মূর্তিটা ছিল সেটার কাছে গেল। মূর্তির ঢালটার কারুকাজের সঙ্গে সোনার ঢালটার কারুকাজ মনে মনে মেলাল। বুঝল — হুবহু এক। শুধু সোনার ঢালটা আকারে বড়।

ঘরে ঢুকে বলল, -- ফ্রান্সিস -- ব্রোঞ্জের মূর্তির ঢালের সঙ্গে মিলে গেছে। হুবহু এক। একইরকম কাজ। ফ্রান্সিস চোখ না খুলেই মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই নৌকায় চড়ে ফ্রান্সিসরা ভাঙা নুরাঘির দিকে চলল। অন্ধকারমত সুড়ঙ্গটায় ঢুকল। নৌকো ভেড়াল পাথরের সিঁড়ির ধারে।

ফ্রান্সিস বিস্কো আর দোনিয়া পেছল সিঁড়িতে নামল। ফ্রান্সিসের নির্দেশমত বিস্কো আগেই একটা মশাল এনে নৌকোয় রেখেছিল। কোমরে গুঁজে এনেছিল লোহার টুকরো আর চকমকি পাথর। বিস্কো মশালটা তুলে ফ্রান্সিসকে দিল। তারপর চকমকি ঠুকে মশালটায় আগুন ধরাল। এবার মশালটা হাতে নিয়ে ভীষণ পেছল সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে উঠতে লাগল। মশালের আলোয় সিঁড়ির ধাপগুলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। তিনজনে সাবধানে উঠতে লাগল সেই কাদা ল্যাপটানো সিঁড়িগুলো দিয়ে।

পেছল সিঁড়ি শেষ। এবার ওঠাটা সহজ হ'ল। ফ্রান্সিস উঠতে উঠতে বলল — বিস্কো দোনিয়া কান খাড়া রাখুন। পাথরের সামান্য নড়াচড়ার শব্দ হ'লেই দাঁড়িয়ে পড়বেন দেয়াল ঘেঁষে।

আস্তে আস্তে তিনজনেই সেই বাঁ দিকের বিরাট খোঁদলের পাশে ছোট্ট চত্বরটায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস যে পাথর দু'টোর মাঝখানে আটকে--থাকা সোনার ভাঙা ঢালটা দেখেছিল সেখানটা ভালো ক'রে দেখতে লাগল। ওখানটায় পাথরের স্তূপ যেন। কিছুক্ষণ দেখেটেখে ফ্রান্সিস বলল — বিস্কো -- মশালটা একটু ওপরে পাথরের খাঁজে বসিয়ে দাও। বিস্কো কয়েকটা ধ্বসে-পড়া পাথর ডিঙিয়ে একটা পাথরের খাঁজ বের করল। জ্বলন্ত মশালটা বসিয়ে দিল। জায়গাটা বেশ স্পষ্টই দেখা যেতে লাগল।

একটু পরে ফ্রান্সিস বলল, — বিস্কো -- পাথরের চৌকোনো খণ্ডগুলো আস্তে আস্তে সরাতে হবে। দোনিয়া আপনিও হাত লাগান। তিনজনে মিলে আস্তে আস্তে সাবধানে পাথরগুলো সরিয়ে চত্বরের একপাশে রাখতে লাগল। পাথরগুলো ভারি। তিনজনেরই যথেষ্ট পরিশ্রম হ'তে লাগল। হাঁপাতে লাগল তিনজনেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। কিন্তু কোন যোদ্ধামূর্তির হদিশ পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস বলল -- বসে জিরিয়ে নেওয়া যাক।

তিনজনেই সিঁড়িগুলোয় বসল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর ফ্রান্সিসই প্রথম

উঠল। ওপরের সিঁড়ি যতটা পরিষ্কার হয়েছে ততটা পর্যন্ত উঠল। তারপর কয়েকটা পাথর ডিঙিয়ে ওপরে একটা কাত হয়ে থাকা পাথরে পা রাখতেই ওখানে পাথরগুলো নাড়া খেল। আশেপাশের কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গেল। ফ্রান্সিস ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। গড়ানো পাথর ডিঙিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ দেখল পাথরের জটলার নিচে সিঁড়িতে কী যেন পড়ে রয়েছে। জায়গাটা অন্ধকার। মশালের আলো পৌঁছোয় নি। ওদিকে পায়ের নিচে পাথর গড়িয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস পা রাখতে পারছে না। ও দ্রুত একটা গড়ানো পাথরে পায়ের ভর রেখে লাফ দিয়ে নিচের দু'টো সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পরিষ্কার সিঁড়িতে নেমে এল। তখনও হাঁপাচ্ছে ফ্রান্সিস।

একটু দম নিয়ে ফ্রান্সিস আঙুল দিয়ে ওপর দিকটা দেখিয়ে বলল -- বিস্কো -- ওখানে একটা সিঁড়িতে কিছু নজরে পড়ল। ঐ পর্যন্ত পাথরগুলো সরাতে হবে। হাত লাগাও।

তিনজনে আবার পাথর নামিয়ে আনতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়ির সেই ধাপটা দেখা গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে উঠে এলো। এবার ভালোভাবেই দেখল -- ধুলো পাথরের কুচির নিচে কী যেন কিছুটা বেরিয়ে আছে। ফ্রান্সিস নুয়ে পড়ে ধুলো পাথরকুচি সরিয়ে ওটা টান দিতেই দেখল -- সিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ। সবটা বের করতেই দেখল সোনার যোদ্ধামূর্তি। ব্রোঞ্জের মূর্তিটার তিনগুণ। মূর্তির সোনার গাটায় কেমন কালচে ছোপ ছোপ। অনেকদিনের বৃষ্টি ধুলোবালিতে সোনালি রংটা যেন ঢাকা পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস মূর্তিটা হাত দিয়ে তুলতে গিয়ে দেখল -- ঠিক শিংএর জোড়াটায় দড়ি- বাঁধা। মূর্তি কিছুটা তুলতে বাঁধা দড়িটাও উঠল কয়েকহাত। তবে বৃষ্টির জলে পচে কালো হয়ে যাওয়া দড়িটা একটানেই ছিঁড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল -- মুবারক দড়ি বেঁধেই মূর্তিটা জলের তলা থেকে তুলেছিল। ও শ্যেন দৃষ্টিতে কাছাকাছি পাথরের নিচে তাকাতে লাগল। নাঃ -- আর কোন মূর্তি নেই।

নিচে থেকে বিস্কো চেঁচিয়ে বলল -- কী হ'ল ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে মূর্তিটা উঁচু করে ধরল। বিস্কো আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল -- ও -- হো -- হো -- হো। দোনিয়াও হাসল। নিচে নৌকোয়-বসা মারিয়া আর হ্যারির কানে ভাইকিংদের এই উল্লাসধ্বনির শব্দ গিয়ে পৌঁছল। হ্যারি হেসে বলল -- রাজকুমারী -- ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই মূর্তিগুলোর হদিশ পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে বিস্কো মশাল হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিস আর দোনিয়া। ওদের ভাগ্য ভাল আজ আর ধ্বস নামেনি।

ফ্রান্সিস নৌকোয় ওঠার আগে হাত বাড়িয়ে মূর্তিটা মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া মূর্তিটা হাতে নিয়ে খুশিতে হেসে উঠল। তখনই লক্ষ্য করল মূর্তিটার হাতের ঢালটা নেই। তার মানে আস্ত মূর্তি একটাই। মারিয়া গায়ের পোশাকের কাপড় দিয়ে মূর্তিটার গায়ে ঘষে ঘষে দিল। মশালের আলোয় সোনালি রং একটু ঝিকিয়ে উঠল। হ্যারি বলল -- রাজকুমারী, সুড়ঙ্গের বাইরে যাবার আগে মূর্তিটা পোশাকের নিচে লুকিয়ে রাখুন। মারিয়া তাই করল। মশাল জলে চুবিয়ে নিভিয়ে বিস্কো এসে নৌকোয় উঠল। দু'টো নৌকোই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে খাঁড়ির জলে এল। চলল নুরাঘির দিকে।

নুরাঘির সদর দেউড়িতে আজও সেনাপতি দাঁড়িয়ে ছিল। দোনিয়াকে বলল -- কতদূর এগোলেন? -- আর কয়েকটা দিন যাক--দোনিয়া বলল।

ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস যথারীতি মাথার পেছনে দু'হাতের তালু রেখে শুয়ে পড়ল। সবাই মূর্তিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। দোনিয়াও দেখল। তারপর হাঁটুর ওপর দু'হাত আড়াআড়ি রেখে মাথা গুঁজে রইল। খাওয়ার সময় হয়েছে বুঝে মারিয়া মূর্তিটা বিছানার

কোণে নিচে ঢুকিয়ে রাখল। ঢালটাও ওখানেই রেখেছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস আর শুয়ে পড়ল না। দোনিয়া বিছানায় আধশোওয়া হ'ল। হ্যারি বলল -- ফ্রান্সিস -- এবার কী করবে? ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল -- দেখ -- আমার মনে হয় মুবারক ঐ একটা মূর্তিই দড়ি বেঁধে তুলতে পেরেছিল। আরগুলো তুলতে পারেনি। দোনিয়া বলল -- কী ক'রে বুঝলেন যে বাকিগুলো তুলতে পারেনি? -- আমার এটা অনুমান। ব্যাপারটা এই রকম ঘটেছিল — মুবারক একাই এখানে এসেছিল। তখন নুরাঘিটায় ধ্বস নামেনি। মুবারক গোপন পথটা দিয়ে নুরাঘির ওপরের দিকে ছোট চত্বরটায় আশ্রয় নিয়েছিল। মুবারক নৌকোর সাহায্য নেয় নি। কারণ ও ঠিক জায়গাটা বুঝতে পেরেছিল। ও পাথুরে দেয়ালের কথা যে চিঠিতে লিখে কেটে দিয়েছিল সেটা ছিল সুড়ঙ্গের সামনের দেয়ালটা। ফ্রান্সিস থামল। তারপর ভেবে নিয়ে বলতে লাগল — মুবারক দিনের বেলা সুড়ঙ্গটা দিয়ে জলে সাঁতরে খাঁড়ির জলে আসতো। তারপর চারদিকে কোন জেলেদের নৌকো বা জাহাজ যখন দেখতো না তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে দেয়াল থেকে দূরত্ব আন্দাজ ক'রে জলে ডুব দিতো। জলের নিচে মাটিতে কাদায় ডুবে যাওয়া নৌকোটা খুঁজতো। এইভাবে দিনের পর দিন খুঁজে মুবারক একটা মূর্তি পেয়েছিল। সেটাতে দড়ি বেঁধে সুড়ঙ্গে চলে এসেছিল। সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে দড়ি টেনে মূর্তিটা নিয়ে এসেছিল।

-- অন্য মূর্তিগুলো দেখেছিল কী? দোনিয়া বলল।

-- হয়তো দেখেছিল। কিন্তু জলে ডুব দিয়ে মূর্তিতে দড়ি বাঁধতে যেটুকু দমের দরকার তাতে একটা মূর্তিতেই দড়ি বাঁধা সম্ভব। যা হোক -- এ কারণেই হোক বা কোন জেলেনৌকো বা জাহাজ এসে পড়েছিল বলেই হোক মুবারক আর জলে নামে নি। ফ্রান্সিস থামল।

-- তারপর মুবারক কি আর মূর্তি তুলতে পারে নি? হ্যারি বলল। — না পারে নি ফ্রান্সিস বলল--কারণ মূর্তিটা মুবারক নুরাঘির ওপরে ঐ ছোট চত্বরটার কাছে রেখেছিল এবং সেই রাতেই নুরাঘিতে ধ্বস নেমেছিল। মুবারক নিজেকে বাঁচাবার মত সময় পায়নি। ধ্বসের পাথর ধুলোবালির সঙ্গে সে ছিটকে পড়েছিল খাঁড়ির জলে। মুবারক মারা গিয়েছিল এবং হঠাৎই। শুধু মূর্তিটাই থেকে গেল। তবে অটুট নয়। ধসের পাথরের ধাক্কায় মূর্তির হাতের ঢাল ভেঙে গড়িয়ে পড়েছিল। ওটাই আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম। ফ্রান্সিস থামল। সকলেই চুপ করে রইল। একসময় দোনিয়া বলল — তাহ'লে বাকি মূর্তিগুলো এবং সবচেয়ে বড় মূর্তিটা সবই এখানে জলের নিচেই আছে?

-- হ্যাঁ। আমার এটাই অনুমান। ফ্রান্সিস বলল -- তবে আজকে নয় — কালকে একটু বেলায় কড়া রোদের সময় সুড়ঙ্গ থেকে জলে নামবো। তারপর জলের নিচে যতটা সম্ভব দেখে বুঝতে পারবো। চড়া রোদে জলের নিচে অনেকটা দেখা যাবে।

পরের দিন একটু বেলায় ফ্রান্সিসরা নৌকো নিয়ে ভাঙা নুরাঘির সুড়ঙ্গমত মুখটার কাছে এল। ফ্রান্সিস জলে নামল। অনেকটা নিঃশ্বাস নিয়ে জলে ডুব দিল। নিচে হাত দশেক নামতেই দেখল ভাঙা নুরাঘিটার পাথর ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস দিক ঠিক রেখে খাঁড়ির মাঝখানের দিকে চলল। হিসেব করে হাত কুড়ি আসার আগেই ওর দম ফুরিয়ে এল। হাতেপায়ে জল ঠেলে ও জলের ওপরে উঠল। দোনিয়া আশ্চর্য হয়ে বলল -- ফ্রান্সিস এতক্ষণ জলে ডুবে থাকতে পারে? হ্যারি হেসে বলল -- ফ্রান্সিস মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে থেকে জলের নিচে অনেকক্ষণ ডুবে থাকার কায়দাকানুন শিখেছে।

ফ্রান্সিস আবার ডুব দিল। জল এখানে ততটা ঘোলা নয়। রোদেরও তেজ আছে।

দেখল -- নুরাঘির ভাঙা পাথরগুলো এতদূর পর্যন্ত আসেনি। ফ্রান্সিস জায়গাটায় একবা চক্কর দিয়ে জলের ওপরে উঠল। এবার সুড়ঙ্গটার দিকে তাকাল। সুড়ঙ্গটার সমান্তরালে স'রে এল। তারপর হিসেব করে হাত দশেক স'রে স'রে একটা দূরত্ব আন্দাজ ক'রে ডু দিল।

দ্রুত জল দু'হাত পায়ে ঠেলে নেমে এলো তলে মাটি, পাথরকুচি কাদার কাছে বাইরের উজ্জ্বল রোদ এখানে অল্পই পৌঁছেছে। একটা চক্কর দিতেই কেমন ঝাপসা দেখল কাদামাটিতে একটা বড় নৌকোর লোহার খাঁচা অনেকটা গেঁথে আছে। লোহার খাঁচাটা হলদে কালো জং ধরা। নৌকোর কাঠ পচে গলে কাদার সঙ্গে মিশে গেছে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট নজরে পড়ল লোহার খাঁচার পাশে, কাদায় কী যেন উঁচু হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ওটা ধরে টানতেই উঠে এল। আর একটা সোনার যোদ্ধামূর্তি। দম শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস বুঝল ভারি মূর্তিটা এক হাতে নিয়ে জল ঠেলে ওঠা যাবে না। ও মূর্তিটা

রেখে হাতে পায়ে জল ঠেলে দ্রুত ওপরে উঠে এল। ভুস্ ক'রে উঠে দেখল হাত কুড়ি দূরে দোনিয়ার নৌকো ভাসছে। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল -- দোরিয়া। দোনিয়া ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হাত নেড়ে ডেকে বলল—এখানে আসুন। দোনিয়া দাঁড় টেনে নৌকোটা ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাচ্ছে তখনও। বলল -- ঠিক এখানে নৌকোটা রাখুন। আপনার দড়ি বাঁধা বঁড়শিটা দিন। দোনিয়া নৌকোর গলুই থেকে বড়শি তুলে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। বড়শি ঝুলিয়ে রেখে ফ্রান্সিস কিছুটা দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর বলল -- দড়ি ধরে দুটো হ্যাঁচকা টান দিলেই আপনি দড়ি টানতে শুরু করবেন। কথাটা ব'লে বেশ দম নিয়ে ফ্রান্সিস ডুব দিল। যখন হাতে পায়ে জল ঠেলে নামছে তখন ও ভাবল -- ঐ মূর্তিটা মুবারক হয়তো মাটি কাদা থেকে তুলে রেখে এসেছিল পরে রাতে দড়ি বেঁধে তুলবে বলে। দুর্ভাগ্য মুবারকের। তার সুযোগ আর ওর জীবনে এল না।

ফ্রান্সিস মূর্তিটার কাছে পৌঁছল। কোমর থেকে দড়ি খুলল। মাথার সিং এর মতো শিরস্ত্রাণের মাঝখানে বঁড়শিটা আটকে ও দড়িতে দুটো হ্যাঁচকা টান দিল। দোনিয়া দড়ি টানতে লাগল। মূর্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস জলের ওপর দিকে উঠতে লাগল। জল থেকে যখন মাথা তুলল তখন দেখল বঁড়শিতে ঝোলা অবস্থায় মূর্তিটার দিকে দোনিয়া অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছে। হ্যারি মারিয়া দেখল সেটা। ওরা ওদের নৌকো চালিয়ে দোনিয়ার নৌকোর কাছে এল। ওরাও দেখতে লাগল মূর্তিটা। মারিয়া হাত বাড়িয়ে বঁড়শি থেকে মূর্তিটা খুলে নিয়ে নৌকোর মধ্যে রাখল। ফ্রান্সিস রাজার নৌকোটাতে উঠল। পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ল। হাঁ ক'রে শ্বাস নিতে লাগল। অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর নাড়াতে পারছে না। মারিয়া হ্যারি দুজনেই ফ্রান্সিসের কাছে স'রে এল। মারিয়া নিজের

ঢোলা ঘেরের পোশাক পায়ের কাছে বেশ কিছুটা ছিঁড়ে ফেলল। ফ্রান্সিসের চোখ মুখ হাত পা ঐ টুকরো কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগল।

আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'ল। ফ্রান্সিস বলল -- জানো হ্যারি -- নুরাঘির পাথর ভেঙে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ভাগ্যি ভালো তারপরে কাদার মধ্যে মুবারকের নৌকোটা গেঁথে আছে। অন্য মূর্তিগুলো ওখানেই ছড়িয়ে আছে। যদি ওগুলো নুরাঘির ভাঙা পাথরে নিচে চাপা পড়তো তাহ'লে ওগুলো আর উদ্ধার করা যেতো কি না সন্দেহ।

-- তুমি অন্য মূর্তিগুলো দেখেছো? হ্যারি বলল।

-- না। তবে ওখানেই ছড়িয়ে আছে। বেশ খোঁজাখুঁজি করতে হবে আর কি। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল -- আজকে আর তুমি নেবো না। বিস্কো নামুক। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। দোরিয়ার নৌকোয় লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসের মত বঁড়শিবাঁধা দড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর জলে ঝাঁপ দিল।

বিস্কো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতে পায়ে জল ঠেলে নিচে নেমে এল। এখানে আলো বেশ কম। সেটুকু আলোতেই বিস্কো পাথরকুচি মেশা কাদামাটির ওপর দাঁড়াল। ভাঙা নৌকোর লোহার জংধরা খাঁচাটার ধারে ধারে নিচু হয়ে কাদামাটি সরাতে লাগল। হঠাৎই কী একটা হাতে ঠেকল। জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই একটা কাদামাখা পেতলের সুন্দর কারুকাজ করা ভাঙা বর্শা উঠে এল। বিস্কো ওটা ফেলে দিল। আবার কাদামাটি সরাতে লাগল। কিন্তু দম ফুরিয়ে আসছে। বিস্কো কাদামাটিতে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে জল ঠেলে উঠতে লাগল। যখন জলের মধ্যে পরিষ্কার আলোর আভাস পেল তখন ওর দম প্রায় শেষ। জলে জোরে পা চালিয়ে ও এক ধাক্কায় জলের ওপর উঠে এল। ভুস্ করে উঠেই ও হাঁ ক'রে শ্বাস নিতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বুঝল আর একটু দেরি হ'লে বিস্কোর প্রাণসংশয় হ'ত। ও চেঁচিয়ে বলল -- বিস্কো -- উঠে এসো। একটু বিশ্রাম নিয়ে আমি নামছি। বিস্কোরা তো জাতিতে ভাইকিং। যেমন দুঃসাহসী তেমনি একরোখা। বিস্কো নৌকোয় উঠে এল না। হাত দিয়ে জল ঠেলে একটুক্ষণ দম নিল। তারপর আবার ডুব দিল। বিস্কোর কপাল ভালো. দু'হাত দিয়ে তিন চারবার কাদা সরাতেই হাতে ঠেকল একটা যোদ্ধামূর্তি। কাদামাখা যোদ্ধামূর্তিটা টেনে তুলেই বঁড়শিতে আটকাল। তারপর জলের ওপরে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল -- দোনিয়া -- দড়ি টানুন। দোনিয়া তৈরিই ছিল। দড়ি টানতে লাগল। লেপ্টে থাকা কাদা নিয়ে মূর্তিটা উঠে এল। দোনিয়া মূর্তিটা বঁড়শি থেকে খুলে নিয়ে নৌকোয় রাখ্‌ল। দেখল হুবহু আগের মূর্তিগুলোর মতই এই মূর্তিটা। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলল -- বিস্কো -- আজ থাক। আবার কালকে নামা যাবে। একদিনে সব মূর্তি তোলা যাবে না। নৌকোয় উঠে এসো। বিস্কো রাজার নৌকোয় উঠে এল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে নৌকোদুটো চলল নুরাঘির ঘাটের দিকে। দুটো নৌকোই পাশাপাশি চলল। দোনিয়া ডাকল -- ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল -- বলুন।

--ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। নজরদাররা ঠিক বুঝেছে আর আমরা যে সোনার মূর্তি উদ্ধার করেছি সেটা সবাই জেনে গেছে। দোনিয়া বলল। সত্যিই তাই। দূর থেকেই ফ্রান্সিসরা দেখতে পেল ঘাটে অনেক লোক জমে গেছে।

আস্তে আস্তে নৌকো দু'টি ঘাটে লাগল। দেখা গেল সৈন্যরা তো আছেই আশেপাশের বসতি থেকেও অনেক লোক এসেছে। বৌমেয়েরা বুড়োবুড়ি আর বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল। এখানে সকলেই জানে মুজাহিদ যোদ্ধামূর্তিগুলো চুরি ক'রে পালিয়ে

গিয়েছিল। সেগুলো যে এই খাঁড়ির জলের নিচেই পড়ে ছিল এটা কেউ ভাবতেও পারে নি।

ফ্রান্সিস নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে বিস্কোকে বলল -- বিস্কো মূর্তিদুটো উঁচু ক'রে তুলে সবাইকে দেখাও। বিস্কো মূর্তিদুটো দু'হাতে তুলে সবাইকে দেখাতে লাগল। ঘাটে অত লোক। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলেই অবাক হয়ে সেই মূর্তিদুটো দেখতে লাগল। উজ্জ্বল রোদ পড়েছে মূর্তিদুটোয়। কাদামাটিতে ময়লা মূর্তির গায়ে এখানে ওখানে সোনালি রঙটা দেখা গেল। বিস্ময়ভাব কেটে গেলে জমায়েত লোকেদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হ'ল। তারপর আনন্দোল্লাস শুরু হ'ল। নৌকো থেকে নামল সবাই।

সেনাপতি দোনিয়ার কাছে এল। বলল -- মহামান্য রাজা আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। হ্যারি বলল -- আমাদের এখনও খাওয়া হয় নি। দুই বন্ধুর গায়ের পোশাক ভেজা। -- ওসব জানি না। মহামান্য রাজা আপনাদের এক্ষুণি যেতে বলেছেন। সেনাপতি গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে বলল -- দু'টো মূর্তিই নিয়ে চলো।

মূর্তিহাতে বিস্কো আগে আগে চলল। সেনাপতি দু'একবার মূর্তিদুটোর দিকে বেশ লোভার্ত দৃষ্টিতে তাকাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সেটা। বলল -- বিস্কো, মূর্তিদুটো সেনাপতির হাতে দাও। বিস্কো তাই করল। গোমড়ামুখো সেনাপতি মূর্তিদুটো হাতে নিয়ে খুশিতে আটখানা। সবক'টা দাঁত বের করে হাসতে লাগল যেন সে-ই জলের তলা থেকে মূর্তিদুটো উদ্ধার করেছে। সেনাপতি মূর্তিদুটো দু'হাতে উঁচু ক'রে তুলে হাঁটতে লাগল। পেছনে পেছনে লোকের জটলাও চলল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ভাঙা মূর্তিটা ওদের ঘরে রয়েছে। বিস্কোকে বলল -- বিস্কো, আমাদের আস্তানা থেকে ভাঙা মূর্তিটা নিয়ে এসো। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া -- ফিস ফিস ক'রে বলল -- ওটা থাক না। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। তারপর বলল -- মারিয়া, মূর্তিটা রাজা এনজিওর সম্পত্তি। ওটার ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই।

-- কী সুন্দর মূর্তিটা! মারিয়া যেন আপন মনে বলল।

-- উপায় নেই। ফিরিয়ে দিতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া কয়েক পা দ্রুত হেঁটে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল -- মারিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। ও মৃদু হেসে হাঁটতে লাগল।

রাজা এনজিও সিংহাসনেই বসে ছিল। মাথায় মুকুট গায়ে রাজকীয় পোশাক নেই। হালকা হলুদ রঙের একটা জোব্বামত গায়ে। জোব্বায় সোনালি রুপোলি সুতোর কাজ করা। বাঁ দিকের ডানদিকের দুটো আসনে স্পিনোলা আর স্পিনোলারই সঙ্গী একজন অমাত্য বসে আছেন।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়েই মূর্তিদুটো দু'হাতে তুলে ধরল। তারপর সিংহাসনের কাছে গিয়ে একটি মূর্তি রাজাকে অন্যটি স্পিনোলাকে দিল। তখন বিস্কো এসে দাঁড়িয়েছে। সেনাপতি বিস্কোর হাত থেকে ভাঙা মূর্তিটা নিয়ে অন্য অমাত্যকে দিল।

তিনজনই পস্পরের মুখের দিকে তাকাল। এত সহজে মূর্তিগুলো উদ্ধার করা হবে আর তাঁদের হাতে আসবে এটা বোধহয় তাঁরা কল্পনাও করেন নি। রাজা এনজিও আনন্দে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তিটা দু'হাতে উঁচু করে তুললো। মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রাজা হাসতে লাগল। রাজা এনজিও সিংহাসনে আবার বসতে স্পিনোলা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন -- কিন্তু সবচেয়ে বড় পঞ্চম মূর্তিটা কোথায়? ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল -- ওটা এখনও জলের নিচেই আছে।

-- ঠিক আছে। স্পিনোলা এবার রাজাকে বললেন -- মহামান্য রাজা। বাকি মূর্তিগুলো

আমাদের নৌসেনা বাহিনীর বাছাই করা কয়েকজন সৈন্য তুলবে। আপনি কী বলেন?

-- বেশ তো। তবে আমার তাড়াতাড়ি চাই। রাজা বলল। ফ্রান্সিস বুঝল স্পিনোলার মতলব ভালো নয়। নিজেরা বাকি মূর্তিগুলো তুলে দোনিয়ার সমমূল্যের চারভাগের এক ভাগ অর্থ পাওয়ার দাবিটা নস্যাৎ করে দেবেন স্পিনোলা। ফ্রান্সিস রাজার দিকে তাকিয়ে বলল -- মান্যবর রাজা -- দোনিয়ার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। -- কী শর্ত বলুন তো? রাজা একটু আশ্চর্য হয়ে বলল। মূর্তিগুলো উদ্ধার করা হ'লে সেসবের সমমূল্যের অর্থের চারভাগের একভাগ দোনিয়ার প্রাপ্য হবে--ফ্রান্সিস বলল।

-- কই আমি তো মনে করতে পারছি না। রাজা বলল। ফ্রান্সিস স্পিনোলার দিকে তাকাল। বলল -- স্পিনোলা সেদিন আপনারা এই শর্তে দোনিয়াকে এবং আমাদের দিনের বেলা অনুসন্ধানের কাজ চালাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। বোধহয় আপনার মনে আছে? স্পিনোলা মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লে উঠলো -- ঠিক আছে -- ঠিক আছে -- ওসব পরে ভাবা যাবে। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল --না -- ঐ শর্তের ফয়েসলা এখনই করতে হবে। স্পিনোলা ফ্রান্সিসের দৃপ্তভঙ্গী লক্ষ্য করল। তিনি যথেষ্ট কুবুদ্ধি ধরেন। বুঝলেন ফ্রান্সিসদের সাহায্য ছাড়া বাকি মূর্তিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কারণ ফ্রান্সিসরাই সঠিক জানে বাকি মূর্তিগুলো কোথায়। এখনই শর্ত অস্বীকার করলে এই বিদেশীরা ওদের জাহাজে দোনিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। ওদের এক্ষুনি বন্দী করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলে উদ্ধারের কাজ পিছিয়ে যাবে। স্পিনোলা একটু গম্ভীর স্বরে বললেন -- রাজা এনজিও শর্ত রক্ষা করবেন। কিন্তু উদ্ধারকার্যে আপনাদের সাহায্য করতে হবে।

-- বেশ। আমরা রাজি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা অমাত্য দু'জন উঠে দাঁড়াল। স্পিনোলা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল - কাল সকালে উদ্ধারের কাজ শুরু করবে আমাদের সৈন্যরা। আপনাদেরও সঙ্গে থাকতে হবে। রাজা স্পিনোলা ও অমাত্যকে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলল।

ফ্রান্সিসরাও রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। ওরা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। তখনও ওদের স্নান খাওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস বিস্কোর অবশ্য পোশাক পরেই স্নান হয়ে গেছে।

পরের দিন রাজা এনজিওর জাহাজে বাঁধা নৌকোটা চড়ে তিনজন সৈন্য এল। ফ্রান্সিসরা রাজার অন্য নৌকোটা আর দোনিয়ার নৌকোটায় চড়ে এল সেই নির্দিষ্ট জায়গাটায়। তিনটে নৌকো সেই জায়গায় একত্র হল। একজন সৈন্য নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দোনিয়া -- কোথায় ডুব দিতে হবে? দোনিয়া আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল। সৈন্যটি অতি উৎসাহে তখনই জলে ঝাঁপ দিল।

সময় কাটতে লাগল। সবাই নৌকো থেকে ঐ জায়গার জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সৈন্যটির ওঠার নাম নেই। ফ্রান্সিস বলল -- হ্যারি -- এতক্ষণ আমিই জলের নিচে থাকতে পারিনা। সৈন্যটি অনভ্যস্ত নিশ্চয়ই। একটা ভুল সৈন্যটি করেছেই। মূর্তি খুঁজে পেয়ে নিশ্চয়ই এক হাতে নিয়ে উঠে আসছিল। বোকামি আর কাকে বলে। শুধু এক খোলা হাতে জল ঠেলে দ্রুত ওপরে ওঠা যায় না। নৌবাহিনীর সৈন্য। সমুদ্রের ভারি জল সম্বন্ধে এটুকু অভিজ্ঞতা-তো থাকা উচিত। দোনিয়া বলল, -- সোনার মূর্তি উদ্ধার করছে -- এই উত্তেজনায় সৈন্যটি সাবধানতার কথা গুলিয়ে ফেলেছে।

বাকি দু'জন সৈন্য পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। একজন ডুবে যাওয়া সৈন্যটার নাম ধরে ডাকল। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে চুপ করে গেল।

বেশ সময় কাটল। বোঝা গেল যে কারণেই হোক সৈন্যটি আর বেঁচে নেই।

তখনই দেখা গেল রাজার জাহাজটা আস্তে আস্তে এদিকে আসছে। কাছে এলে দেখা গেল সেনাপতি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সৈন্যদের একজন গলা চড়িয়ে সেনাপতিকে একজন সৈন্য কিভাবে মারা গেছে সেটা জানাল।

সেনাপতি সব শুনে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা বলেছিলেন এ খোঁজ চালাবার জন্যে আপনারা সৈন্যদের সাহায্য করবেন। ফ্রান্সিস বলল, সৈন্যটিতো আমাদের কোন সাহায্য চায়নি। ও জানতে চেয়েছিল কোথায় ডুব দেবে। আমরা তা দেখিয়ে দিয়েছি।

-- যাক গে। সেনাপতি বলল, এবার সাহায্য করুন।

ফ্রান্সিস নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। সৈন্য দু'জনের দিকে তাকাল। হ্যারিকে বলল, হ্যারি -- আমি তো ওদের ভাষা জানি না। তুমি বুঝিয়ে বলো আমি যেভাবে নামছি সেভাবে ওদের নামতে হবে। মূর্তি ফেলে সেটা এই বঁড়শির একটাতে আটকে দিয়ে কোমরের দড়ি খুলে ওপরে উঠে আসতে হবে। হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় সৈন্য দুজনকে সব বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার দড়িবাঁধা বঁড়শিগুলো ঝুলিয়ে নিয়ে কিছুটা দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে নিল। তারপর জলে ঝাঁপ দিল।

জলের নিচে ভাঙা নৌকোর লোহার খাঁচাটার পাশে কাদামাটিতে একটা বঁড়শি দিয়ে খুচিয়ে দ্রুত কাদামাটি সরাতেই দুটো মূর্তি পাশাপাশি পেল। জলে কয়েক পাক খেয়ে কোমরে পাক দেওয়া দড়ি খুলল। মূর্তি দু'টোয় দুটো বড়শি আটকে দড়িতে দু'টো হ্যাঁচকা টান দিল। দোনিয়া নৌকো থেকে দড়ি টানতে লাগল। মূর্তিদুটো জলের উপরে উঠে এল। ফ্রান্সিসও ভুস্ ক'রে ভেসে উঠল। সেনাপতি একজন সৈন্যকে বলল -- মূর্তিদুটো তোমাদের নৌকোয় রাখ। সৈন্যটি হাত-বাড়িয়ে বঁড়শি থেকে মূর্তিদুটো খুলে নিজেদের নৌকোয় রাখল।

অন্য সৈন্যটি এবার দোনিয়ার হাত থেকে বঁড়শি বাঁধা দড়িটা কোমরে জড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিল যেমন ফ্রান্সিস দেখিয়ে দিয়েছিল।

সবাই জলের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই দোনিয়া হাতে ধরা দড়িতে দু'টো হ্যাঁচকা টান বুঝল। দোনিয়া দড়ি টানতে লাগল। একটা মূর্তি উঠে এল। সৈন্যটিও জলে ভেসে উঠল। খুশিতে ও হাসছে তখন। মূর্তিটা রাজার নৌকোয় রাখা হল আগের মতই।

ছ'টা মূর্তি উদ্ধার হ'ল। এবার সবচেয়ে বড়ো আর সবচেয়ে মূল্যবান মূর্তিটি উদ্ধার করতে হবে। সেনাপতিকে দেখা গেল খুব উৎসাহী। অন্য সৈনটিকে হাত পা নেড়ে কী সব ব'লে উৎসাহিত করল। সৈন্যটি দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিল।

সকলেই জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সকলেই ভাবছে বড় মূর্তিটা কি সৈন্যটি উদ্ধার করতে পারবে? জলে কয়েকটা বুদ্বুদ উঠে ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস সেদিকে তাকাল। ও নিশ্চিত জানে সৈন্যটি পারবে না। অন্য মূর্তিগুলো ভাঙা নৌকোর লোহার খাঁচাটার আশেপাশে ছিটকে পড়েছে। তাই পাওয়া গেল। বড় মূর্তিটা নিশ্চয়ই ওগুলোর তুলনায় ভারি ছিল। ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা কম। তবু জায়গাটা ভালো ক'রে না দেখে এখনই কিছু বলা যাবে না। তবে সৈন্যটি যে এত অল্প সময়ে খুঁজে বের করতে পারবে না এটা ঠিক।

কিছু পরেই সৈন্যটি ভুস্ ক'রে জলের ওপর মাথা তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে দু'হাত নাড়িয়ে জানাল বড় মূর্তিটার হদিশ ও পায়নি।

সেনাপতির উৎসাহে তবু ভাঁটা পড়ল না। সেনাপতি দোনিয়ার হাত থেকে দড়িটা নিজে নিল। অন্য সৈন্যটিকে নামতে ইঙ্গিত করল। বেচারার তখনও হাঁপভাবটা যায়নি।

কিন্তু সেনাপতির হুকুম। সৈন্যটি দড়ি কোমরে পেঁচিয়ে ঝাঁপ দিল।

আবার সবার আগ্রহ উৎকণ্ঠা। কী হয়? কী হয়? কিছুক্ষণ সময় কাটল। সৈন্যটি আস্তে আস্তে জল থেকে মাথা তুলল। ও তখন সমস্ত শরীর ছেড়ে দিয়েছে অসহ্য ক্লান্তিতে। নৌকোর সৈন্যটি বেশ কসরৎ ক'র হাত বাড়িয়ে ওকে নৌকোয় তুলে নিল।

সেনাপতির এখন আর সেই উৎসাহ নেই। ওর খুব আশা ছিল বড় মূর্তিটা তোলাবার গৌরব ও একাই নেবে। সেটা হ'ল না। সেনাপতি এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল -- আমার সৈন্যদের একটু বিশ্রাম দরকার। আপনারা এবার নামলে ভালো হয়। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। মারিয়া ভীতস্বরে বলল -- এক্ষুণি আবার নামছো? ফ্রান্সিস হেসে বলল -- কী করি। আমি ছাড়া কেউ পারবে না। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহলে বেশিক্ষণ লাগবে না। ফ্রান্সিস জলে ঝাঁপ দিল।

জলের নিচে দ্রুত নেমে এল। ঠিক জংধরা নৌকোর খাঁচাটার মাঝখানে নামল। বঁড়শি দিয়ে দ্রুত নৌকোর মাঝখানটা খুঁড়তে লাগল। পচা কাঠ কাদা তুলে সরাতে লাগল। কিন্তু মূর্তির হদিশ নেই। পচা কাঠের টুকরো আর কাদায় কাদায় ও জায়গার জলটা কালো হয়ে গেল। দম ফুরিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না দ্রুত জলের ওপরে উঠে এল। সবাই হতাশ হ'ল। হ্যারি বুঝল ফ্রান্সিস যখন বিফল হ'ল তখন বড় মূর্তিটা উদ্ধার করা সহজ হবে না।

ফ্রান্সিস জল থেকে উঠল না। জলের ওপর মুখ তুলে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে বলল -- বিস্কো -- তুমিও নামো। একা হবে না। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল -- আমি আঙুল দিয়ে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেবো, সেই জায়গাটাই খুঁড়বে। ফ্রান্সিস ঠিক করল একটা বঁড়শি খুলে বিস্কোকে দেবে কাদামাটি খোঁড়ার জন্যে কিন্তু বড়শিগুলো এত শক্ত ক'রে বাঁধা যে দড়ি না কেটে খোলা যাবে না। শাঙ্কোর কোমরে সবসময় ছোরো থাকে। বিস্কোর তো ছোরা নেই। ফ্রান্সিস বঁড়শিগুলো জলের ওপর তুলে সেনাপতির নৌকোয় রাখল। বলল -- আপনার তরোয়াল দিয়ে একটা বঁড়শি দড়ি কেটে খুলে দিন। সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে রুপোর ওপর মীনে করা তরোয়ালের বাঁট ধ'রে এক টানে তরোয়াল বের করল। ধারালো তরোয়ালের দুটো পোঁচেই দড়ি কেটে গেল। একটা বঁড়শি খুলে এল। বিস্কো নিল ওটা।

এবার দু'জনেই ডুব দিল। নৌকোর খাঁচাটার মাঝখানটা দাঁড়াল দু'জন। ফ্রান্সিস ঠিক নৌকোর মাঝখানটা আঙুল টেনে দেখাল। দু'জনেই মাঝখানটা দ্রুতহাতে খুঁড়তে লাগল। পচা কাঠ কাদাটে জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা চৌকোনো মত কাঠের পাটাতনের কোণায় হঠাৎ বিস্কোর বঁড়শিটা আটকে গেল। বিস্কো জোরে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই পচা কাঠ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কাদাজলের মধ্য দিয়ে বিস্কো দেখল বড় মূর্তিটা কাত হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ঠিক পেছনেই দ্রুতহাতে খুঁড়ছে। বিস্কো ফ্রান্সিসের গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। ফ্রান্সিস মুখ তুলে তাকাল। বিস্কো আঙুল দিয়ে মূর্তিটা দেখাল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে জলের ওপর দিকে আঙুল তুলে বিস্কোকে উঠে যেতে বলল। বিস্কো বুঝতে পারছিল দম ফুরিয়ে আসছে। ও হাতের বড়ঁশিটা ফেলে দিয়ে দ্রুত হাতে পায়ে জল ঠেলে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসের দম বেশি। একটা বঁড়শি মূর্তিটার শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণের মাঝখানে আটকে দাঁড়িয়ে দু'টো হ্যাঁচকা টান দিল। দড়িটা একজন সৈন্য ধরে ছিল। টান লাগতে ও সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল সে কথা। নিয়ম না জানলেও সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে দড়িটা ধরে টান দিল। দেখল বেশ ভারি। সেনাপতি হেসে উঠল। সৈন্য দু'জনকে দড়ি ধরে টানতে বলল। তিনজনে দড়ি ধরে একসঙ্গে টানল। নৌকোর

একপাশেই তিনজন দাঁড়িয়ে তখন। নিচু হয়ে জোর দিয়ে আবার টানতেই ভারসাম্য হারিয়ে নৌকো উল্টে গেল। তিনজনেই জলে পড়ে গেল। সেনাপতির হাত থেকে দড়িও ছিটকে গেল।

ফ্রান্সিস তখনই জল থেকে ভুস করে মুখ তুলল। উল্টোনো নৌকো আর সেনাপতি ও সৈন্য দু'জনকে জলে ভেসে থাকতে দেখে বুঝল কী হয়েছে। প্রবল উত্তেজনায় উৎসাহে ভারসাম্যের কথা ভাবতেও পারে নি সেনাপতি। তাই যা হবার তাই হয়েছে। নৌকো উল্টে গেছে। ফ্রান্সিস হাত ঘুড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করল। ওদিকে দু'জন সৈন্য মিলে ঠেলে ঠেলে নৌকোটা সোজা করেছে। নিজেরা নৌকোয় উঠে ভুঁড়িওয়ালা সেনাপতিকে কোনরকমে টেনে নৌকোয় তুলল। সেনাপতি নৌকোর পাটাতনে শুয়ে চিৎ হয়ে হাঁপাতে লাগল। ওর মধ্যেই একবার কাত হয়ে দোরিয়াকে বলল- জিজ্ঞেস করুন বড় মূর্তিটা পেয়েছে কিনা। দোরিয়া ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল কথাটা। ফ্রান্সিস বলল - হ্যাঁ। মূর্তির শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণে বঁড়শিটা ভালো করেই এ[illegible]গায়ে এসেছি। এবার সেনাপতিমশাইকে বলুন জলের নিচে থেকে ছিটকে-পড়া দড়িটা নিয়ে আসতে। দোনিয়া সেনাপতিকে ডেকে বলল সে কথা। সেনাপতি কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তার সৈন্য দু'জনকে জলে ডুবে দড়ির মাথাটা ধরে নিয়ে আসতে বলল। ভীষণ ক্লান্ত সৈন্য দুজন বোধহয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাইল। সেনাপতি তড়াক করে উঠে বসল। কোমরে তরোয়ালের বাঁটে হাত রাখল। সৈন্য দু'জন আর কোন কথা না বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দোনিয়ার নৌকোয় উঠে এল।

কিছু পরেই সৈন্য দুজন দড়িটার মাথাটা ধরে উঠে এল। সেনাপতির নৌকোয় উঠলো ওরা।

ফ্রান্সিস দোনিয়াকে বলল - হ্যারিদের নৌকোয় চলুন। দোনিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারিদের নৌকোয় উঠল। সেনাপতিকে ইঙ্গিতে তাদের নৌকোটা কাছে আনতে বলল। দু'টো নৌকো কাছাকাছি এল। এবার ফ্রান্সিসের নির্দেশে মারিয়া হ্যারি আর দোনিয়া নৌকোটার একপাশে বসল। ওপাশে নৌকো বেশ কাত হল। অন্যপাশে দাঁড়াল বিস্কো। ফ্রান্সিস সেনাপতির নৌকোয় উঠল। সেনাপতি ও সৈন্য দু'জনকে ইঙ্গিতে নৌকোয় একধারে বসাল। নৌকো ওদিকে কাত হ'ল। আর একপাশে ফ্রান্সিস নিজে দাঁড়াল। সেনাপতির হাত থেকে দড়ির মুখটা নিল। এবার দু'নৌকোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো দড়ি ধরে একসঙ্গে টানতে লাগল। নৌকো দু'টো আর একপাশে কাত হ'য়ে রইল না। দুলতে থাকলেও সোজা রইল নৌকোদুটো ভারসাম্য থাকার জন্যে।

একসময় বঁড়শিতে গাঁথা বড় মূর্তিটা উঠে এল। মূর্তিটার গায়ে খুব কাদামাটি ময়লা লেগে নেই। তাই সোনার রঙটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে

রইল বঁড়শিতে গাঁথা মূর্তিটার দিকে। উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে রোদ পড়েছে মূর্তিটায়। সামান্য ঝিকিয়ে উঠছে মূর্তিটার এখানে ওখানে। এই দেখে সেনাপতির আর সবুর সইল না। সে লাফিয়ে উঠতে গেল। নৌকো টাল গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে আঙুল দেখিয়ে সেনাপতিকে বসতে বলল। সেনাপতি বাধ্য ছেলের মত বসে পড়ল। মূর্তিটা সেনাপতির নৌকোয় রেখে ফ্রান্সিস দড়িটা খুলে নিল। সৈন্য দুজন নৌকোয় দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল। সেনাপতি মূর্তিটার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল--হা--হা--।

তিনটে নৌকো ফিরে চলল নুরাঘির ঘাটের দিকে। কালকের চেয়েও আজকে ভীড় আরো বেশী। দূর দূরান্ত থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে চাষিরাও এসেছে। জেলে পরিবারের লোকেরা তো আছেই। সৈন্যরাও ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।

নৌকোগুলো ঘাটে ভিড়ল। বড় মূর্তিটা সৈন্য দু'জন ধরে নিয়ে নৌকো থেকে নামল। এগিয়ে চলল রাজবাড়ির দিকে। ঠিক পেছনেই চলল সেনাপতি। দুহাতে দুটো মূর্তি ঝুলিয়ে।

ফ্রান্সিসরা চলল নুরাঘির সদর দেউড়ির দিকে। দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই একজন সৈন্য ছুটতে ছুটতে দোনিয়ার সামনে এল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মহামান্য রাজা আপনাকে ডেকেছেন। দোনিয়া একবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। তারপর সৈন্যটির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেল।

নিজেদের ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বিস্কো নিজেদের ভেজা পোশাক ছেড়ে মারিয়া ওদের জন্যে যে পোশাক নিয়ে এসেছিল সেই শুকনো পোশাক পরল।

কিছু পরেই দুজন সৈন্য ওদের জন্যে খাবার নিয়ে এল। ওরা খেতে বসল। কেউ কোন কথা বলল না।

খাওয়া শেষ হলে এতক্ষণে হ্যারি বলল - ফ্রান্সিস, এখন তো আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। চলো জাহাজে ফিরে যাই। ফ্রান্সিস একটু আধশোয়া হয়ে ছিল। উঠে দাঁড়াল। দেয়ালে লেখা সেই অস্পষ্ট স্বরলিপির দিকে তাকাল একবার। ততক্ষণে হ্যারিরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস ঘরের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল - চলো।

নুরাঘির বাইরে ঘাটের কাছে এল ওরা। মারিয়া বলল - রাজা এনজিওর সঙ্গে একবার দেখা করবে না?

- কী দরকার । রাজার স্বার্থোদ্ধার হয়ে গেছে। এখন আমাদের হয়তো চিনতেই পারবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা ওদের নৌকোয় উঠতে যাবে, দেখল দোনিয়া ছুটে আসছে। কাছে এসে দোনিয়া বলল - আপনারা চলে যাচ্ছেন?

হ্যারি হেসে বলল - হ্যাঁ। জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।

-- মূর্তিগুলো হাতে পেয়ে রাজা এনজিও স্পিনোলা অমাত্যরা খুব খুশি তাই না? মারিয়া হেসে বলল। দোনিয়া হেসে বলল - খুশি বলে খুশি! নাচানাচি করাটা শুধু বাকি। একটু হেসে দোনিয়া বলল, স্পিনোলা বার বার রাজা এনজিওকে বলছিল মূর্তিগুলো রাজধানী কাগলিয়ারিতে নিয়ে যেতে। কিন্তু আশ্চর্য! রাজা এনজিও সম্মত হল না। বলল - আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা ফ্রেডারিক যে গির্জায় যে ভাবে এই মূর্তিগুলো যে কারণে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন সেখানেই মূর্তিগুলো থাকবে। স্পিনোলা যুক্তি দেখাল মূর্তিগুলো এখানে বাজাবার মত কোন বাদ্যকর নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম - সেই দুশো বছর আগের মত প্রতিদিন ভোরবেলা মূর্তিগুলো বাজিয়ে সুর তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিলাম। এবার হ্যারি বলল- সত্যিই আপনাকে প্রশংসা করতেই হয়। দোনিয়া ফ্রান্সিসের

দিকে তাকিয়ে বলল - ফ্রান্সিসের চেয়ে বেশি প্রশংসা পাবার যোগ্য আমি নই। কথাটা বলে দোনিয়া ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। আবেগে ওর শরীর কাঁপতে লাগল। দুচোখ জলে ভিজে উঠল। ফ্রান্সিস একটু হেসে নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল।

নৌকোয় গিয়ে উঠল সবাই। বিস্কো দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল ওদের জাহাজের দিকে।

জাহাজে উঠতেই সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিসদের ঘিরে হৈ হৈ করতে লাগল। ওর মধ্যেই বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল, ভাই সব - ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে আমরা জলের তলা থেকে নিখোঁজ সব যোদ্ধামূর্তিগুলো উদ্ধার করেছি। সব বন্ধুরা একসঙ্গে ধ্বনি তুলল - ও হো হো হো।

খুব ভোরে ফ্রান্সিসের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলো সুন্দর সুরধ্বনি। দূর থেকে আসছে সেই সুরধ্বনি। মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মারিয়াও কান পেতে শুনছিল ঐ সুরলহরী। ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল - মারিয়া চলো নুরাঘির ঐ গির্জাটায়। দোনিয়াই ঐ বাজনা বাজাচ্ছে।

দুজনে জাহাজে বাঁধা নৌকোটা খুলল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। তখনই পুর্ব আকাশে লাল রঙের ছোপ লাগল। একটু পরেই সূর্য উঠল। ভোরের ঠান্ডা হাওয়া। খাঁড়ির জলে নুরাঘিদুটোয় ছড়িয়ে পড়া ভোরের নরম আলো। সমুদ্রের পাখির ডাক - সমস্ত পরিবেশটা যেন মায়াময় হয়ে উঠল।

ওরা যখন নুরাঘির গির্জাটায় ঢুকল তখন দেখল গির্জাটায় কিছু জেলে চাষি জড়ো হয়েছে। দোনিয়া রুপোর হাতাটা মূর্তিগুলোর গায়ে ঠুকে ঠুকে সুরমূর্ছনা তুলছে। ফ্রান্সিস মারিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই সুরমূর্ছনা শুনতে লাগল।

একসময় বাজনা থামিয়ে দোনিয়া পিছু ফিরে তাকাল। দেখল ফ্রান্সিস আর মারিয়াকে। ছুটে এসে ফ্রান্সিসের ডানহাতটা দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া বলল - আপনি একদিনেই বেশ সুন্দর বাজাচ্ছেন। দোরিয়া হেসে বলল - ছেলেবেলা আমার এক কাকা আমাকে গ্রীসীয় বীণা বাজাতে শিখিয়েছিলেন। আমিও খুব মন দিয়ে শিখেছিলাম। সেই সুরজ্ঞানটাই আজ কাজে লেগে গেল। মারিয়া হেসে বলল, কিছু মনে না করলে বলি—

— নিশ্চয়ই—বলুন। দোনিয়া বলল।

— তৃতীয় সুরধ্বনিটা কিন্তু একটু বেসুরো লাগছে। মারিয়া হেসে বলল। দোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে মারিয়াকে সম্মান জানিয়ে বলল - রাজকুমারী - আপনার সুরজ্ঞানের প্রশংসা করছি। তৃতীয় মূর্তিটা হচ্ছে সেই ঢাল-ভাঙা মূর্তিটা। তাই বেসুরো ধ্বনি তুলছে। স্বর্ণকারকে দিয়ে ঢালটা লাগিয়ে নিলেই শুদ্ধ সুর বেরোবে।

— রাজা এনজিও কি আপনাকে অর্থমূল্য দেবেন বলেছেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

— এখনো আমি চাই নি। ভেবেছি - আর চাইব না। এখানেই আমি বাদ্যকর হয়ে সারা জীবন থাকবো। প্রতিভোরে এই বাজনা বাজাবো। সেই অন্ধ বাদ্যকরের স্বরলিপি থেকে সুর উদ্ধার করবো। দুশো বছর আগে যেমন দূর দূর দেশ থেকে মানুষ ছুটে আসতো এই বাজনা শোনার জন্যে আমিও এমন বাজানো শিখবো যে তেমনি মানুষজন ছুটে আসবে আমার বাজনা শুনতে। বদলে কিছু অর্থদান করতে আবেদন জানাবো। সেই অর্থ আমি ব্যয় করবো সার্দিনিয়ার দরিদ্র চাষি জেলেদের কল্যাণে। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল - দোনিয়া—আপনার মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলেই বোঝা যায় - পৃথিবী কত সুন্দর, মানুষ কত ভালো আর জীবন কত আনন্দের।

ফ্রান্সিস মারিয়া ঘাটে এসে নৌকোয় উঠল। নৌকো চালাতে চালাতে চারদিকে উজ্জ্বল রোদে হেসে-ওঠা প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস হেসে ডাকল--মারিয়া? মারিয়া ওর দিকে তাকাল। - আমার হাত এবারও শূন্য। মূল্যবান কিছুই নেই। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া আবেগআপ্লুতস্বরে বলে উঠল - আজ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। মারিয়ার কথা শুনে ফ্রান্সিস খুব খুশি হল। হাসল।

কোন কথা না বলে ওদের জাহাজের দিকে নৌকো চালাতে লাগল। এই আনন্দের অনুভূতি ফ্রান্সিস ওর সমস্ত দেহমন দিয়ে অনুভব করতে লাগল। নৌকো চলল ওদের জাহাজের দিকে।

শেষ

ফ্রান্সিসের নতুন দুঃসাহসিক অভিযান

রাণীর রত্ন ভাণ্ডার

অনিল ভৌমিক

উৎসর্গ

শ্রী দীপেন ভৌমিক

শ্রীমতী মনীষা ভৌমিক

ফ্রান্সিদের জাহজ চলেছে ওদের দেশের দিকে। ভূমধ্যসাগরের জল শান্ত। ঢেউয়ের মাতামাতি নেই। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। কতদিন পরে দেশের দিকে চলেছে ওরা। মারিয়া অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেনি। তবে ফ্রান্সিস বেশ বুঝতে পারছিল মারিয়াও দেশে ফেরার আনন্দে অধীর। মারিয়ার দোষ নেই। ফ্রান্সিসদের মতো দেশে দেশে বিদেশ-বিভুঁইয়ের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবার অভ্যেস তো মারিয়ার নেই। কাজেই ওর আনন্দ হবে এ তো স্বাভাবিক।

জোর বাতাসে জাহাজের পাল ফুলে উঠেছে। বেশ দ্রুতগতিতে জাহাজ চলেছে। ভাইকিংদের দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ডেক-এর এখানে ওখানে কেউ কেউ শুয়ে বসে আছে। কোথাও কয়েকজন জড়ো হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। বেশ অবসরের মেজাজ সকলের।

সেদিন দুপুর থেকে কিন্তু হাওয়া পড়ে গেল। হাওয়ায় আর সেই জোর নেই। পালগুলো নেতিয়ে পড়ল। বিকেল নাগাদ জাহাজের গতি আরও কমে গেল। সমুদ্রের চারদিকে একটা গভীর স্তব্ধতা। যেন একফোঁটা হাওয়া নেই। সমুদ্রের সোঁ সোঁ ডাকও কেমন নিস্তেজ। ভাইকিংরা ঝড়ের আশঙ্কা করল। জাহাজ-চালক ফ্লাইজারের কাছে এল বিস্কো। সঙ্গে দু'জন ভাইকিং বন্ধু। বিস্কো জাহাজ-চালককে বলল, কী ব্যাপার বলো তো? হাওয়া বন্ধ। চারদিক থমথমে।

জাহাজ-চালকের কপালে তখন চিন্তার ভাঁজ। ও শুধু বলল, ফ্রান্সিসকে ডাকো একবার।

বিস্কো বলল, তা ডাকছি। কিন্তু তোমার কি আশঙ্কা প্রচণ্ড ঝড় আসবে?

জাহাজ-চালক ফ্লাইজার শুধু বলল, ফ্রান্সিসকে খবর দাও।

বিস্কো আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বিপদ আশঙ্কা করে ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

ফ্লাইজারের কাছে এসে বলল, কী হয়েছে? ঝড় আসবে?

জাহাজ-চালক একবার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, সমুদ্রে চোরা স্রোত থাকে। আমরা সেই চোরা স্রোতে পড়েছি। আমার দিকজ্ঞান লোপ পেয়েছে। চোরা স্রোতের টান কাটাতে পারছি না। জাহাজ কোথায় চলেছে আমি জানি না।

সর্বনাশ! বলো কি? ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল।

হ্যারি জাহাজ-চালককে বলল, যদি সব দাঁড় টানা যায়?

জাহাজ-চালক ফ্লাইজার মাথা এপাশ-ওপাশ করল। বলল, তাহলেও এই চোরা স্রোতের প্রচণ্ড টান থেকে জাহাজকে মুক্ত করা যাবে না। জাহাজ ডুবে যাবার ভয় নেই। কিন্তু জাহাজের গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করা এখন অসম্ভব।

তবে তো আমাদের এখন কিছু করার নেই। হ্যারি বলল।

হ্যাঁ, যতক্ষণ না এই চোরা টান নিস্তেজ হবে ততক্ষণ জাহাজ যেদিকে যাবে যাক। ফ্লাইজার বলল।

এই চোরা টান কতক্ষণ চলবে? ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজ-চালক মাথা নাড়ল। বলল, জানি না। সমুদ্রের অনেক জায়গায় এরকম চোরা টান থাকে। জাহাজকে যেন টেনে নিয়ে যায়।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল—জাহাজ ডুবে যাবে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাহাজ কোথায় কোনদিকে যাবে কে জানে। ফ্রান্সিস মুখ তুলে বলল, হ্যারি জানো, সার্দিনিয়ার ধারেকাছে কোনো দ্বীপ আছে বা মূল ভূখণ্ড কতদূর?

হ্যারি বলল, রাজকুমারী মারিয়ার ভূগোল জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি। রাজকুমারী হয়তো বলতে পারবেন।

হুঁ, চলো, মারিয়াকে জিজ্ঞেস করি। কথাটা বলে ফ্রান্সিস নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল।

দু'জনে ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরে এল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া চুপ করে শুয়ে আছে। এসময় মারিয়া কখনো শুয়ে থাকে না। ডেক-এ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমুদ্র আকাশ দেখে। সূর্যাস্তের রঙীন খেলা দেখে, সূর্য অস্ত গেলে কেবিনে ফিরে আসে। আজকে মারিয়া শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল, শুয়ে আছো কেন?

মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে বসল। হেসে বলল, এক্ষুণি ডেক-এ যাবো ভেবেছিলাম। যাক গে, বিস্কো তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কী হয়েছে?

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে জাহাজ-চালকের কথা, সমস্যার কথা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মারিয়া, সার্দিনিয়ার কাছাকাছি কোনো দ্বীপ বা মূল ভূখণ্ড আছে?

মারিয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, সার্দিনিয়ার উত্তরে আছে কর্সিকা দ্বীপ। কিন্তু সেটা কতদূরে তা আমি জানি না।

আর মূল ভূখণ্ড? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

সেটা আরো উত্তরে—দূরে। মারিয়া বলল, এটুকুই বলতে পারি।

হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল, ডেক-এ চলো। মারিয়া হেসে বলল, এতক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে বোধহয়। আজ থাক।

বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ-চালকের কাছে চলল।

আসলে সকাল থেকেই মারিয়ার শরীর ভালো নেই। ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত মুখে একটা তেতো বিস্বাদ ভাব। সকালের খাবার তো খেতেই পারেনি। ও খাবার ঘরেই খাচ্ছিল। বিস্কো পাশে বসে খাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিস্কো বলল, রাজকুমারী, আপনি যে কিছুই খেলেন না।

মারিয়া হেসে বলল, খিদে পায়নি তেমন। রাতে বেশি করে খাবো। মারিয়া বিস্কোকেও বুঝতে দিল না যে ওর শরীর খারাপ।

দুপুরের দিকে মারিয়া বুঝতে পারল জ্বর এসেছে। গা হাত-পায়ের ব্যথাটা বেড়ে চলেছে। মাথায় টনটনানি শুরু হলো। মুখ বুঁজে মারিয়া সব সহ্য করতে লাগল। ফ্রান্সিস যতক্ষণ ঘরে রইল ততক্ষণ মারিয়া ফ্রান্সিসের ছেঁড়া পোশাক সেলাই করছিল। ফ্রান্সিস কিছু বুঝতে পারেনি। দু'একটা কথাটথা যা বলেছে স্বাভাবিকভাবেই

বলেছে। মাথার টনটনে ব্যথায় মারিয়া ছুঁচ চোখেই দেখতে পারছিল না। উল্টে মাথা নিচু করে সেলাই করতে গিয়ে মাথার ব্যথা বেড়ে যাচ্ছিল। তবু মারিয়া নিজের শরীরের কষ্ট ফ্রান্সিসকে বুঝতে দেয়নি। বিস্কো যখন ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে গেল তখন আর পারল না। শুয়ে পড়ল। তখনও অল্প অল্প কাশি হচ্ছিল। বুকে একটা হাঁপ-ধরা ভাব। মারিয়া বুঝল—বুকে কফ জমেছে। গত রাতে ডেক-এ একটু রাত পর্যন্ত ছিল। ভালো হয়নি সেটা। ঠাণ্ডা লেগেছে।

সন্ধ্যের পর থেকেই জ্বর বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে কাশিও বাড়ল। বুকের হাঁপ-ধরা ভাবটাও বেড়ে চলল। মারিয়া একটা মোটা গায়ের কাপড় জড়িয়ে শুয়ে রইল। সারা শরীরে ব্যথা আর শীত শীত ভাব। কাঁপুনি। মারিয়া দাঁত চেপে সব সহ্য করতে লাগল।

বেশ রাতে ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে এল। দেখল মারিয়া কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে। মারিয়া ঘুমিয়ে আছে ভেবে ফ্রান্সিস আর ডাকল না। রাঁধুনি বন্ধু মারিয়াকে রাতের খাবার খেতে ডাকতে এসেছিল। মারিয়া বলে দিয়েছিল, খিদে নেই।

হঠাৎ বুকের হাঁপ-ধরা ভাবটা বাড়তেই মারিয়া কাশতে লাগল। ও উঠে বসল। কাশতে কাশতে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। ফ্রান্সিস দ্রুত দু'হাতে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যেন। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। মারিয়া কাশছে তখনও। ফ্রান্সিস কিছু বলল না। কাশিটা কমল। মারিয়া হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। দুশ্চিন্তায় ফ্রান্সিস তখনও গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না। শুধু একটু অভিমানের সুরে বলল, মারিয়া, তুমি এত অসুস্থ অথচ আমাকে একবার বললেও না।

মারিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে বলল, সর্দিজ্বর এসব—ভেবো না, সেরে যাবে। কতবার হয়েছে সেরে গেছে ভেন এর ওযুধ খেয়ে।

ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে নামল। বলল, বিছানা থেকে নেমো না। আমি এক্ষুণি আসছি।

ফ্রান্সিস ছুটে হ্যারির কেবিন ঘরে এল। ডাকল, হ্যারি—ওঠ শীগগির।

হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসের উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে হ্যারি এক লাফে বিছানা থেকে নামল। বলল, জাহাজের কিছু হয়েছে?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, না। মারিয়ার ভীষণ জ্বর এসেছে। তুমি বৈদ্য ভেনকে ডাকো। আমি যাচ্ছি। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে চলে গেল। ততক্ষণে বিস্কোও উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিসের কথাও শুনেছে। হ্যারির পেছনে পেছনে বিস্কোও ছুটল বৈদ্য বন্ধুর কাছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়ার কেবিন ঘরে বেশ হন্তদন্ত হয়েই ভেন ঢুকল। হাতে পুঁটলি আর চিনেমাটির বোয়াম। ভেন মারিয়ার কপালে হাত দিল। দু'চোখে আঙুল চেপে খুলে দেখল। হাতের নাড়ি টিপে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, রাজকুমারী, পিঠটা দেখব একটু। মারিয়া একটু কষ্ট করেই উবু হয়ে শুল। মারিয়ার পিঠে বাঁ হাত পেতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ভেন ঠুকতে লাগল। পরীক্ষা শেষ হলো। ঘরে আর ঘরের বাইরে অল্প জায়গায় তখন ভাইকিং বন্ধুরা জড়ো হয়েছে।

ফ্রান্সিস বৈদ্যকে বলল, কী বুঝলে?

বুকে ভীষণ কফ জমেছে। কষ্টের অসুখ। ওষুধ দিচ্ছি। বৈদ্য ভেন আস্তে আস্তে বলল।

খুব কাশি হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল।

হবেই। ওষুধ পড়ুক দেখি। ভেন বোয়াম থেকে কালো আঠার মতো ওষুধ বের করতে করতে বলল। আঙুলে-তোলা ওষুধ হাতের তেলোয় ঘষে ঘষে বড়ি মতো করল। ফ্রান্সিসকে বলল, একটা বড়ি খাইয়ে দাও। জ্বর নামবে।

বিস্কো কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মাথার পেছনে হাত দিয়ে বলল, মারিয়া ওষুধটা খেয়ে নাও। মাথাটা তুলে ধরতে মারিয়া জলের সঙ্গে বড়িটা খেয়ে নিল। মারিয়া এতক্ষণে বুঝতে পারল—শরীর আর ওর বশে নেই। একদিনেই শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে। গায়ে হাতে পায়ে অসহ্য ব্যথা। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মাথাটা ব্যথায় টনটন করছে। ছিঁড়ে পড়ছে যেন। বুকে আবার চাপ ভাবটা বাড়তেই শুরু হলো বেদম কাশি। কাশতে কাশতে মারিয়ার শরীরটা বেঁকে যেতে লাগল। কাশি থামাতে মারিয়া বালিশে মুখ গুঁজল। কিন্তু কষ্টকর কাশিটা কমল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে মারিয়ার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। মারিয়া হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল।

মারিয়ার কষ্ট দেখে ফ্রান্সিসের মতো শক্ত মনের মানুষও অস্থির হয়ে পড়ল। ভেনকে বলল, যেভাবে পারো মারিয়ার কষ্টটা কমাও।

ভেন তখন ওর কাপড়ের ঝোলা থেকে পাথরের ছোট্ট শিলনোড়া বের করেছে। বলল, দেখি। ঝোলা থেকে চারটে কালো কী ফল বের করল। দু'আঙুলে টিপে খোসাটা ভাঙল। ভেতরের সবুজ রঙের ফলগুলো বার করল। শিলনোড়া দিয়ে গুঁড়ো করল। গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে বড় গোল করল। ওটা থেকে সবজে ওষুধগুলো টেনে খুলে হাতে পাকিয়ে চারটে বড়ি মতো করল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে ভেন বলল, ঐ কালো বড়ি খাওয়াবার এক ঘন্টা পরে পরে এই সবুজ বড়িগুলো খাওয়াবে। হ্যারি সব বড়িগুলো নিয়ে মারিয়ার শিয়রের কাছে রাখা একটা চিনেমাটির পাত্রে রাখল।

সময় কাটতে লাগল। এক ঘন্টা সময় গেল। হ্যারি মারিয়াকে সবুজ বড়িটা খাইয়ে দিল। আবার সকলের প্রতীক্ষা। ভেনও মাথা নিচু করে বসে রইল চোখ বুঁজে। কোনো কথা বলল না।

ভোর হলো। বাইরে সাগরপাখির ডাক শোনা গেল। ভেন ফ্রান্সিস হ্যারি বিস্কোরা তো সারারাত চোখের পাতা এক করেনি। ভাইকিং বন্ধুরাও কেউ একটানা সারারাত ঘুমোয়নি। মাঝে মাঝেই এসে মারিয়ার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে বারবার খোঁজ নিয়ে গেছে।

দুপুর নাগাদ মারিয়ার শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হলো। প্রায় অজ্ঞানের মতো মারিয়া বিছানায় অসাড় হয়ে শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস বারবার ভেনকে বলল, মারিয়া কি সুস্থ হবে না?

ভেন কোনো কথা বলল না। আবার নতুন ওষুধ তৈরি করল। ফ্রান্সিসই মারিয়ার মাথা তুলে ধরল। হ্যারি অনেক কষ্টে ওষুধটা খাওয়াল।

বিকেল হলো। ভেন মারিয়াকে পরীক্ষা করল। আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে বলল, জ্বর একটু কমেছে। তবে বিপদ এখনও কাটেনি। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতো সবরকম চেষ্টা করছি। কিন্তু কোনো ভালো বদ্যিকে আজ রাতের মধ্যেই দেখাতে হবে। নইলে—ভেন চুপ করল।

ফ্রান্সিস আর বসে থাকতে পারল না। ছুটে ডেক-এ উঠে এল। দেখল—পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ও জাহাজ-চালকের কাছে ছুটে এল। বলল, ফ্লাইজার যে করে হোক কোনো ডাঙায় আমাদের পৌঁছতেই হবে। তুমি জাহাজ আরো জোরে চালাও।

জাহাজ-চালক ফ্লাইজার একটুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিসকে এরকম অস্থির হয়ে পড়তে ও কোনোদিন দেখেনি। বুঝল—সত্যি কথাটা এখন বলা উচিত হবে না। ও বলল, ফ্রান্সিস অস্থির হয়ো না। স্থির হও। আমরা আজ রাতের মধ্যেই কোনো না কোনো দ্বীপে বা দেশে পৌঁছবো।তুমি রাজকুমারীর কাছে যাও। তাঁকে সাহস দাও। তুমি পাশে থাকলে রাজকুমারী মনে অনেক জোর পাবেন। তুমি যাও। আমরা যা করার করছি। ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলতে পারল না। নিজের কেবিনে ফিরে এল।

নজরদার পেড্রো গতকাল থেকেই একনাগাড়ে জাহাজের মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গায় বসে আছে। শুধু খাওয়ার সময় গোগ্রাসে খেয়েই আবার নিজের জায়গায় চলে গেছে। সারারাত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে চারদিকে যদি ডাঙা চোখে পড়ে। পরের দিনও ও নজর রাখতে লাগল।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুদের কারো মন ভালো নেই। ওরা শুকনো মুখে ডেক-এর এখানে ওখানে কেবিন ঘরে শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। কিছুতো করার নেই শুধু মারিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া। শুধু শাঙ্কো রেলিঙের ধারে সারারাত দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে নজর রাখতে লাগল—কোনোদিকে ডাঙা দেখা যায় কিনা। কিন্তু কোথায় ডাঙা? চারদিকে শুধু জল আর জল।

সন্ধ্যের পর চাঁদ উঠল। পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়। তাই জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। এতে চারদিকে নজর রাখার সুবিধে হলো।

জাহাজ চলেছে। জাহাজ-চালক ফ্লাইজার হুইলে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। চোরা স্রোতের টানের জোর কমেছে। কিন্তু ফ্লাইজার ভেবে পাচ্ছে না কোনদিকে জাহাজের মুখ ঘোরাবে। জাহাজ কোথায় এল তাও বুঝতে পারছে না। অগত্যা জাহাজ যেদিকে যায় যাক। ম্লান মুখে অসহায়ভাবে ও দাঁড়িয়ে রইল।

একটু রাতে হঠাৎ পেড্রোর চোখে পড়ল ডানদিকে দূরে সাদাটে কুয়াশার পাতলা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে আগুনের ক্ষীণ আভা। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল—ডাঙা—ডাঙার কাছে এসেছি আমরা। অনেক ভাইকিং বন্ধু ছুটে এল রেলিঙের ধারে। বিস্কো ছুটল ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে খবর

দিতে। জাহাজ-চালক ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ছুটে এল রেলিঙের ধারে। ওরা আলো দেখল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না ওটা সমুদ্রের বুকের আলোকস্তম্ভ কিনা। একটু পরেই বুঝল—ওটা ডাঙায় আছে। ওটা নিশ্চয়ই কোনো দ্বীপ বা দেশ।

ফ্রান্সিস ফ্লাইজারের কাছে এল। বলল, যত দ্রুত সম্ভব ঐ আলো লক্ষ্য করে জাহাজ চালাও। ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, একদল দাঁড়ঘরে নেমে যাও। দাঁড় টানো। আর একদল পালের দড়িদড়া খুলে বেঁধে পাল ঠিক রাখো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ আলোর কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। ভাইকিং বন্ধুরা সমস্বরে হাঁক দিল—ও-হো-হো-হো। তারপর ছুটল নিজেদের কাজের জায়গায়। জাহাজের গতি বাড়ল। জাহাজ ছুটল ঐ আলো লক্ষ্য করে।

ফ্রান্সিস কেবিন ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, একটু খোঁজখবর না নিয়ে এই বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো কি উচিত হবে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, হ্যারি উপায় নেই। মারিয়ার শরীরের যা অবস্থা তাতে যত দ্রুত সম্ভব ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারলে মারিয়াকে—আর বলতে পারল না ফ্রান্সিস। ওর গলা বুঁজে এল।

জাহাজঘাটের কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা বন্দর এলাকা। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। নানা দেশের পতাকা উড়ছে জাহাজগুলোর মাথায়। যে আলো ফ্রান্সিসরা দূর থেকে দেখেছিল সেই আলো জ্বলছে একটা বেশ উঁচু মিনারের মাথায়। যেন অনেকগুলো মশাল একসঙ্গে জ্বলছে। বোঝাই যাচ্ছে সমুদ্রে নজরদারির জন্যেই এরকম পাথর গেঁথে মিনার তৈরি করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজের রেলিঙ ধরে। তাকিয়ে ছিল জাহাজঘাটার দিকে। তখন দেখল একটা জাহাজ দ্রুত ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে আসছে। ফ্রান্সিস জাহাজটা দেখেই বুঝল ওটা যুদ্ধজাহাজ।

ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলে উঠল, ভাইসব, আমরা লড়াই করবো না। কেউ তরোয়াল হাতে নেবে না। আস্তে আস্তে সব ভাইকিংরা ডেক-এ এসে দাঁড়াল। কারো মুখে কথা নেই। শুধু বিস্কো আর বৈদ্যবন্ধু ভেন রইল মারিয়ার কাছে। মারিয়া তখনও চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। জ্বর কমলেও মারিয়ার শরীরে কোনো সাড় নেই। যখন কাশি উঠছে তখনই মারিয়ার কষ্ট হচ্ছে বেশি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। বিছানায় এপাশে ওপাশে ছটফট করে। কাশি কমলে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে থাকে।

যুদ্ধজাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা জোর ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল। যুদ্ধজাহাজ থেকে জনা দশেক সৈন্য তরোয়াল হাতে লাফ দিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেকে উঠে এল। সর্বপ্রথমে যে উঠে এল সে ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। বোঝা গেল সেই দলনেতা। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মুখে দাড়ি গোঁফ। লম্বা টান টান শরীর। সৈন্যদের গায়ে হাঁটুঝুল মোটা কাপড়ের পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম নেই। কোমরে চামড়ার ফেট্টি।

তাতে তরোয়ালের খাপ গোঁজা।

দলনেতা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, তোমরা তো এই অঞ্চলের লোক নও। তোমরা এখানে এসেছ কেন।

হ্যারি এগিয়ে এল। ভাঙা ভাঙা লো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বলল, আপনার অনুমান ঠিক। আমরা বিদেশী, জাতিতে ভাইকিং আমরা। আমাদের মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যে আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা শান্তি চাই—যুদ্ধ চাই না।

দলনেতা একটু ভাবল। তারপর বলল, শুধু তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস নেই। আমরা জাহাজ তল্লাশী করবো। তোমরা দস্যু লুটেরার দল হতে পারো।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে মৃদুস্বরে সব কথা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল, ওরা যা করতে চায় করুক। বাধা দিও না।

হ্যারি বলল, আপনি জাহাজ তল্লাশী করুন—আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে জেনে রাখুন আমরা জলদস্যু নই। আমরা ভাইকিং—বীরের জাতি।

দলনেতা এসব কথায় বিশেষ কান দিল না। সঙ্গের সৈন্যদের ইঙ্গিত করল জাহাজ তল্লাশীর জন্যে। চারজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। দুজন সৈন্য ডেক-এ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

হ্যারি বলল, এটা কি কোনো দ্বীপ না দেশ?

এটা কর্সিকা দ্বীপ। এই বন্দরের নাম বোনিফেসিও—কর্সিকার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বন্দর। এখানকার সামন্ত রাজা সিনার্কা। দলনেতা বলল।

হ্যারি সব কথা ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। তারপর দলপতিকে বলল, তল্লাশী শেষ হলেই বুঝবেন আমরা জলদস্যু বা লুটেরার দল নই। আমাদের দেশের রাজকুমারী এই জাহাজে সাংঘাতিক অসুখে মৃতপ্রায়। আমাদের বিনীত অনুরোধ—আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হলেই যত শীগগির সম্ভব রাজকুমারীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন।

সে সব মাননীয় সিনার্কাকে বলবেন কাল সকালে। দলনেতা বলল।

হ্যারি বলল, না কাল সকালে নয়। আজ রাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

দলপতি বেশ কড়া চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। বলল, একটু পরেই সবাইকে কয়েদ ঘরে ঢুকতে হবে। তার জন্যে তৈরি হোন।

হ্যারি চিৎকার করে বলে উঠল, আমাদের নরকে নিয়ে যান—কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু রাজকুমারীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আজ রাতেই করতে হবে। হ্যারিকে ক্রুদ্ধস্বরে এভাবে চিৎকার করে কথা বলতে ভাইকিং বন্ধুরা কখনও দেখেনি। ওরা বেশ আশ্চর্য হলো। হ্যারি ও দলপতির কথা ওরা না বুঝলেও হ্যারিকে সমর্থন জানাতে ওরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো-হো।

ভাইকিংদের এভাবে উত্তেজিত হতে দেখে দলপতি বেশ ঘাবড়ে গেল। তবু গম্ভীরভাব বজায় রেখে বলল, মাননীয় সিনার্কা উত্তরে সারিনে গিয়েছেন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে। উনি কাল সকালে ফিরবেন। তখন উনিই যা করবার করবেন।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল, হ্যারি, এখন উত্তেজিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কাজ করতে হবে।

—কিন্তু ফ্রান্সিস, বৈদ্য বলেছে আজ রাতের মধ্যেই সুচিকিৎসা চাই—নতুন ওষুধ চাই। হ্যারি বলল।

জানি জানি। দেখা যাক দলপতি কী করে। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রের মৃদু গর্জন আর শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ। যারা তল্লাশী চালাচ্ছিল তারা দলপতির কাছে এল। ওরা বলল, জাহাজে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু একজন অসুস্থ মহিলার ঘরে কিছু গয়নাগাঁটি পাওয়া গেছে। তেমন মূল্যবান কিছু জাহাজে লুকানো নেই।

দলপতি একবার মাথা ঝাঁকাল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—এই জাহাজটা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বন্দরে চলো। তারপর যা করার করবো।

দলপতি নিজেদের যুদ্ধজাহাজে চলে গেল। তার সৈন্যরা কয়েকজন মিলে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ওদের যুদ্ধজাহাজের পেছনের হালের সঙ্গে শক্ত কাছি দিয়ে বাঁধল। তারপর টেনে নিয়ে চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজটা।

শাঙ্কো, ফ্রান্সিস আর বৈদ্য ভেন-এর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পেরেছিল আজ রাতের মধ্যেই মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারলে মারিয়ার বাঁচার আশা কম। তাই শাঙ্কো জাহাজ থেকে পালাবার উপায় ভাবতে লাগল। তখনই সৈন্যরা জাহাজের তল্লাশী সেরে দলপতিকে সব জানাচ্ছিল। শাঙ্কো দেখল—এই সুযোগ। সৈন্যরা সব দলপতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে নজর নেই। ও আস্তে আস্তে নিজেদের দল থেকে সরে এল। গলা নামিয়ে হ্যারিকে বলল, হ্যারি আমি পালাচ্ছি। তারপর ডেক-এর ওপর নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে চলে এল তারপরই সিঁড়িঘর। সিঁড়িঘরের আড়ালে গড়িয়ে চলে এল পেছনে হালের কাছে। ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নেমে এল জলের ওপর। আস্তে জলে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। দম বন্ধ করে ডুব সাঁতার দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা ভাসাল। দেখল, সেই সৈন্যরা কয়েকজন ওদের জাহাজের হালের সঙ্গে কাছি বাঁধছে। শাঙ্কো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—যাক সময়মতোই পালানো গেছে। আর একটু দেরি হলে ও ধরা পড়ে যেত। শাঙ্কো জলে শব্দ না তুলে আস্তে আস্তে ওদের জাহাজের পেছনে পেছনে সাঁতরে চলল।

বোনিফেসিও বন্দরের ঘাটে এসে ফ্রান্সিসদের জাহাজ লাগল। দলপতির নির্দেশে সৈন্যরা কাঠের পাটাতন ফেলল। ফ্রান্সিসরা তখনও বুঝতে পারছে না দলপতি ওদের নিয়ে কি করবে।

এবার দলপতি ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। পাটাতনের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, সবাইকে নামতে হবে। তুমি সবাইকে নেমে আসতে বলো।

হ্যারি বলল, আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের রাজকুমারী অত্যন্ত অসুস্থ

হয়ে পড়েছেন। তাঁকে অন্তত এই জাহাজে থাকতে দিন। পাহারা দিয়েই রাখুন।

দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, না না—সবাইকে দুর্গে যেতে হবে। ওসব অসুখ-ফসুখ বুঝি না। হ্যারি, ফ্রান্সিসকে সব কথা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, এখন ওর কথা শুনে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ও যা বলছে তাই করতে হবে।

কিন্তু সাংঘাতিক অসুস্থ রাজকুমারীকে—

ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমিই মারিয়াকে নিয়ে যাবো। দলপতির আদেশ মেনে চললে হয়তো মারিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঐ দলপতিই করে দেবে। দলপতি চিৎকার করে বলল, কী হলো? নামো সবাই।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, সবাইকে নামতে বলো। আমি মারিয়াকে নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরের দিকে চলল।

হ্যারি এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, সবাই জাহাজ থেকে নেমে এসো। আমি জানি—এভাবে আমরা কখনো বিনা লড়াইয়ে বিনা প্রতিবাদে হার স্বীকার করি না। কিন্তু আজকের অবস্থা অন্যরকম। ফ্রান্সিস বলেছে দলপতি যা বলে তাই মেনে নিতে।

ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। দলপতি হ্যারির দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, এক্ষুণি সবাইকে নামতো বলো। নইলে সব ক'জনকে আমরা মেরে ফলবো।

হ্যারি কথাটা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল। ভাইকিংদের গুঞ্জন থামল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস অনেক ভেবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। ফ্রান্সিসের কথার অবাধ্য হয়ো না। এতক্ষণে ভাইকিংরা আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে জাহাজঘাটায় নামতে লাগল। ওরা বুঝল রাজকুমারী অসুস্থ। তার চিকিৎসার দরকার সবার আগে।

ওদিকে ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে ঢুকে দেখল—বৈদ্য ভেন মাথা নিচু করে মারিয়ার মাথার কাছে বসে আছে। ফ্রান্সিস বৈদ্যকে ডাকল। তারপর আস্তে আস্তে সব কথা বলল।

বৈদ্য ভেন মারিয়ার কপালে হাত দিল। গলায় হাত দিল। বলল, জ্বর বেশি নেই। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। এ অবস্থায় রাজকুমারীকে নিয়ে যাওয়া খুব ঝুঁকি।

ফ্রান্সিস বলল, উপায় নেই। এই ঝুঁকি নিতেই হবে। মাথা নিচু করে মারিয়ার মুখের কাছে মুখ এনে ফ্রান্সিস ডাকল, মারিয়া। মারিয়া কোনো সাড়া দিল না। ফ্রান্সিস আবার ডাকল, মারিয়া।

মারিয়া আস্তে আস্তে চোখ খুলল। একটু হাসার চেষ্টা করল। কোনো কথা বলতে পারল না। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া তোমাকে সব পরে বলবো। এখন আমাদের সবাইকে তীরে নামতে হবে। তোমাকে আমি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবো। যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয় তার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। শুধু তুমি একটু কষ্ট হলে সহ্য কোরো। পারবে তো? মারিয়া খুব আস্তে আস্তে মাথা কাত করলো। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

মারিয়ার কাঁধের পেছনে হাত দিয়ে মাথাটা তুলল। হাঁটুর নিচে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে বিছানা থেকে তুলল। তারপর বেশ আস্তে আস্তে দরজার দিকে চলল। পেছন না ফিরে বলল, ভেন তোমার দরকারি ওষুধগুলো আনতে ভুলো না।

মারিয়াকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ ওঠার সময় বেশ অসুবিধে হলো ফ্রান্সিসের। অনেক আস্তে অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও ঝাঁকুনি লাগল। মারিয়ার মুখে কষ্টের শব্দ হলো—উঃ উঃ। মারিয়া কপাল কোঁচকাল। চোখ বন্ধই রইল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার সাবধানে উঠতে লাগল।

কাঠের পাটাতনের সামনে এসে দেখল—বন্ধুরা আস্তে আস্তে সোজা রাস্তাটা দিয়ে চলেছে। সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা পাহারা দিয়ে চলেছে। এসময় মারিয়ার হঠাৎ কাশি উঠল। ফ্রান্সিস বেশ ঘাবড়ে গেল। কাশি হলেই মারিয়ার কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। কাশতে কাশতে মারিয়ার শরীরটা যেন বেঁকে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস বহুকষ্টে মারিয়াকে ধরে থাকল। মুখ ঘুরিয়ে বৈদ্যকে ডাকল, ভেন—শীগগির এসো। বৈদ্য ভেন ছুটে এল। মারিয়ার পিঠে দুহাতের তালু চেপে ধরল। কাশি কমল। ফ্রান্সিস তবু নড়ল না। কাশি থেমে গেল। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ওর চোখমুখ কুঁচকে গেল। মারিয়ার রোগার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, মারিয়ার কষ্ট দেখে ফ্রান্সিসের মনটা হাহাকার করে উঠল। এত কষ্টের জীবন মারিয়ার সহ্য হবে না—এটা ওর আগে ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু এখন ওসব ভাবলে মন দুর্বল হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পাটাতন দিয়ে নামতে লাগল। ওর চোখেমুখে তখন সংকল্পের দৃঢ়তা। আলোর মিনার ছাড়িয়ে দলপতির পেছনে পেছনে সৈন্যদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলল। দুপাশে ছাড়া ছাড়া পাথরের বাড়িঘর নিস্তব্ধ। এত রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সবাই একটা দুর্গের সামনে এল। দুর্গের সদর দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে। পাহারাদার সৈন্যরা দলপতিকে দেখে মাথা একটু নোয়ালো। পাহারাদারের সঙ্গে কী কথা হলো। ঘড় ঘড় শব্দে বিরাট কাঠের দরজা খোলা হলো। সবাই দুর্গের মধ্যে ঢুকল। একটা পাথর বাঁধানো ছোট চত্বরের পরে একটা দরজার সামনে এসে সবাই দাঁড়াল। লোহার গরাদের দরজার মাথায় মশাল জ্বলছে। দুজন পাহারাদার সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। দলপতির নির্দেশে একজন এগিয়ে গিয়ে দরজার তালা খুলল। ঠং ঠাং শব্দে দরজা খোলা হলো। দলপতি হ্যারিকে বলল, সবাইকে ভেতরে ঢুকতে বলো।

হ্যারি বলল, কিন্তু আমাদের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ। তাঁকে অন্তত রেহাই দিন।

দলপতি মাথা নেড়ে বলল, সেসব কাল সকালে সিনার্কাকে বলবেন।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সে কথা। ফ্রান্সিস বলল, আর কোনো অনুরোধ করো না। দেখা যাক কী হয়।

ঘরটা বেশ বড়। পাথুরে দেয়ালের আংটায় মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল ঘর জুড়ে দড়িবাঁধা শুকনো ঘাসের বিছানামতো। তার ওপর মোটা কাপড় পাতা। প্রায় দশ বারো জন লোক শুয়ে আছে তাতে। ফ্রান্সিস বুঝল—ওরা বন্দী। এটা কয়েদঘর। ও মারিয়াকে নিয়ে ডানদিকের দেয়ালের কাছে এসে বিছানায় আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। মারিয়ার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বৈদ্য ভেন মারিয়ার একপাশে বসল। হাতের পুঁটুলি রাখল পাশে। হ্যারি এসে বসল ফ্রান্সিসের কাছে। আস্তে আস্তে বলল, ফ্রান্সিস শাঙ্কো জলে নেমে পালিয়েছে।

ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো কি জানে আমাদের এখানে বন্দী করা হয়েছে?

আমি জাহাজ থেকে নামার সময় গলা চড়িয়ে দুবার বলেছি—শাঙ্কো আমাদের অনুসরণ করো। হ্যারি বলল।

যাক, একজন তো বাইরে রইলো। ফ্রান্সিস ক্লান্তস্বরে বলল।

হ্যারি ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ভাইকিং বন্ধুরা প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। কয়েকজন হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। অবশ্য কথা বলার মতো মনের অবস্থা এখন ওদের নেই। একদিকে রাজকুমারীর এই অবস্থা অন্যদিকে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ—ওরা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হ্যারিরা আসার আগে যে বন্দীরা ছিল তাদের দেখা গেল সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাদের পরনে এই অঞ্চলের চাষীদের জোব্বামতো পোশাক। শুধু একজন পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মশালের আলো **ওখানে** অল্পই পৌঁছেছে। হ্যারি আবছা দেখল লোকটির পরনের পোশাক একইরকম তবে রঙটা ঘন নীল। একটু দামী ভালো কাপড়ের পোশাক। লোকটির মাথার এলোমেলো বড় বড় চুল কপালে নেমে এসেছে। মুখে পাতলা দাড়ি গোঁফ। কতদিন এখানে বন্দী হয়ে আছে কে জানে। হ্যারি ওপরের দিকে তাকাল। পাথরের ছাদ। ডানদিকে ছাদের একটু নিচে মনে হলো একটা ফোকরমতো। আগে বোধহয় লোহার গরাদ বসানো জানালা ছিল। তাতে গরাদ নেই। ফোকরের জায়গাটা পাথর ভেঙে বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এত উঁচুতে যে দেয়াল বেয়ে পৌঁছনো অসম্ভব।

হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, ভেন দ্যাখো তো। মনে হচ্ছে মারিয়ার জ্বরটা বেড়েছে।

ভেন এগিয়ে এল। মারিয়ার কপালে গলায় হাত চাপল। বলল, একটা ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, একপাত্র জলের ব্যবস্থা কর। হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বন্ধুদের কাউকে ডাকল না। কিন্তু জল কোথায়? হ্যারি চারদিকে তাকাল। বোধহয় হ্যারিকে চারিদিকে তাকাতে দেখেই প্রায় অন্ধকার থেকে লোকটি স্পেনীয় ভাষায় বলল, আপনি কি কিছু খুঁজছেন? বেশ ভারি গলা লোকটির।

হ্যারি একটু দ্রুতই শায়িতদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লোকটির কাছে এল। বলল, একজন অসুস্থকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। জল কোথায় রাখা আছে?

লোকটি আঙুল তুলে বাঁ দিকের কোণটা দেখাল। বলল, ওখানে একটা বাড়তি

কাঠের পাত্রও আছে। হ্যারি চলল সেই দিকে। একটু পরেই কাঠের পাত্রে জল নিয়ে ফিরে এল। ভেন ততক্ষণে ওর ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে বড়ি বানিয়েছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়ার মাথার নিচে হাত দিল। মৃদুস্বরে বলল, মারিয়া একটা ওষুধ খেয়ে নাও। তারপর হাত দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করল। ভেন বড়িটা হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি জল আর বড়িটা আস্তে আস্তে মারিয়াকে খাইয়ে দিল। মাথা নামিয়ে দিতেই মারিয়া গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল। কপালে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। আস্তে আস্তে মারিয়ার গোঙানি বন্ধ হলো।

হ্যারি চুপ করে বসেছিল। শরীর ক্লান্ত। ঘুমে চোখ বুঁজে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সিস আর মারিয়ার দিকে চোখ পড়তে হ্যারি আর ঘুমের কথা ভাবতেই পারছিল না। হঠাৎ হ্যারি শুনল, আপনাদের মধ্যে অসুস্থ কে? হ্যারি মুখ ফিরিয়ে দেখল সেই লোকটি ওদের কাছে চলে এসেছে। হ্যারি হাত তুলে মারিয়াকে দেখাল। লোকটি বেশ আশ্চর্য হলো মারিয়াকে দেখে। বলল, ইনি তো মহিলা। তার ওপর অসুস্থ। সিনার্কার সৈন্যরা এঁকেও বন্দী করল?

হ্যারি বলল, ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

আপনারা বিদেশী। লোকটি বলল।

হ্যাঁ, আমরা ভাইকিং। হ্যারি বলল।

আমার নাম রোক্কা। লোকটি বলল।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে হ্যারি বলল, ও ফ্রান্সিস—রাজকুমারীর স্বামী। আমি হ্যারি। রোক্কা একটু মাথা নুইয়ে নিয়ে এ অঞ্চলের ভদ্রতা দেখাল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। হ্যারি ভাবল রোক্কার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো যাবে। জেগেও থাকা যাবে।

—রোক্কা, আপনাদের এই বন্দীদশার কারণ কী?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি—সিনার্কা জেনো। জেনোয়ার অধিবাসীদের আমরা জেনো বলি। কর্সিকার এই দক্ষিণ অঞ্চলে সিনার্কা তার রাজত্ব কায়েম করেছে। দরিদ্র চাষী আর জেলেদের ওপর তার অত্যাচার নিপীড়নের শেষ নেই। আমরা তাই সিনার্কার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রাহ করেছি। আমাদের শক্ত ঘাঁটি হলো কিছু উত্তরে সারিন-এ। এখানে সব চাষী জেলেদের বিদ্রোহী করে তুলতে আমরা এসেছিলাম। সামান্য ভুলের জন্য ধরা পড়ি। মাস ছয়েক আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে সিনার্কা ও তাঁর তাঁবেদার ভূস্বামীদের কর্সিকা থেকে তাড়াবো। রোক্কা থামল। তারপর মারিয়ার চিকিৎসা কী হচ্ছে, ওরা কী করে এখানে এলো, এসব নিয়ে হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

শাঙ্কো সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে কখনো আস্তে আস্তে সাঁতরে সমুদ্রতীরে এল। জল থেকে উঠে শাঙ্কো বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে রাস্তার ধারে এল। পাথুরে

দেয়ালের আড়াল থেকে দেখল—ফ্রান্সিসরা দুর্গে ঢুকল। বুঝল, এখানে নিশ্চয়ই কোনো কয়েদঘর আছে। ফ্রান্সিসদের সেখানেই বন্দী করা হলো।

শাঙ্কো কিছুদূরের একটা চেস্টনাট গাছের আড়াল থেকে চাঁদের আলোয় দুর্গটা দেখতে লাগল। কালো পাথরের দেয়ালে দেয়ালে কোথাও কোথাও ফাটল ধরা। সবুজে শ্যাওলার ছোপ। দেখে বুঝল দুর্গটা পুরনো। তবে এদিকটা সারাই করে দেউড়িতে কাঠের বিরাট দরজা বসানো হয়েছে। শাঙ্কো বুঝল এখান দিয়ে দুর্গে ঢোকা যাবে না। শাঙ্কো চলল দুর্গটার পেছন দিকে।

দুর্গটা ঘুরে শাঙ্কো দুর্গটার পেছনদিকে এল। দেখল—পেছন দিকে পাথুরে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। দুর্গের এই ভাঙা অংশটার নিচেই একটা খাদমতো। খুব গভীর খাদ নয়। খাদটায় গাছপালার জঙ্গল। এদিকটায় দুর্গের ভাঙা পাথরের স্তূপ। সেই ভাঙা স্তূপ জমে জমে দুর্গটার প্রায় মাথার কাছে উঠে গেছে। চাঁদের আলোয় ঐ দিকে ভালো করে নজর দিয়েও কোনো প্রহরীকে দেখল না। বুঝল—এদিক দিয়ে কেউ দুর্গে ঢুকতে পারবে না বলেই এদিকটা অরক্ষিত হয়ে আছে।

এবার শাঙ্কো খাদের বড় বড় গাছগুলোর মাথা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখতে পেল তাতে বুঝতে পারল ঐ বড় বড় গাছগাছালি বেয়ে উঠে পাথরের স্তূপের কাছে যাওয়া যাবে। তারপর ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে দুর্গের অনেকটা ওপরে ওঠা যাবে।

শাঙ্কো দ্রুত কাজে নামলো। খাদটার গায়ে গায়ে পাথরের এবড়োখেবড়ো চাঁইয়ের ওপর পা রেখে রেখে একটা বেশ উঁচুতে ডালপালা ছড়ানো ওক গাছের নিচে এল। তারপর উঁচুতে ঝুঁকেপড়া ডাল দেখে হিসেব করল। গাছটায় উঠতে লাগল। ডালপালার ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো আসছে সেই আলোই শাঙ্কোর ভরসা। একসময় ওক গাছটার মগডালে উঠে এল। ডালটা ধরে অন্য একটা মোটা ডালে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। দুর্গের ভাঙা পাথরের স্তূপের কাছে এল। শাঙ্কো তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। গাছটার কাণ্ড বেয়ে বেয়েও ওকে উঠতে হয়েছে অনেকটা। একটু অপেক্ষা করে দম নিল। তারপর ঐ ডালটা ছেড়ে দিয়ে পাথরের স্তূপের ওপর নেমে এল। এখানে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। ও সাবধানে ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে দুর্গের ওপর উঠতে লাগল। তখনই দেখল বাঁ দিকের পাথরের ভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ফ্রান্সিসদের কোন ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে শাঙ্কো তো জানে না তা। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে কিছুটা নামতেই দেখল ডানহাতি একটা জানালার মতো ফোকর। তবে ভাঙা। শাঙ্কো দেখল ভাঙা সিঁড়িগুলো থেকে ফোকরটা হাত পনেরো দূরে। এই ফাঁকটা পার হবার উপায় নেই। শাঙ্কো ওখান থেকে দু'হাতের চেটো মুখের কাছে গোল করে ফোকরের দিকে মুখ এগিয়ে ডাকল, ফ্রান্সিস—হ্যারি। ফোকরের নিচের কয়েদঘরে তখন হ্যারি আর রোক্সা মৃদুস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। ওরা সেই ডাক শুনতে পেল না। কিন্তু ফ্রান্সিস ডাকটা অস্পষ্ট শুনল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কান পাতল। হ্যারি আর রোক্সা কথা থামিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার একটু স্পষ্ট ডাক

শোনা গেল, ফ্রান্সিস—হ্যারি। হ্যারি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল, নিশ্চয়ই শাঙ্কো।

কিন্তু কোথা থেকে ডাকছে শাঙ্কো? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল। হ্যারি আঙুল দিয়ে ছাদের কাছে ভাঙা জানালাটা দেখিয়ে বলল—ঐখান থেকে শাঙ্কো ডাকছে।

ফ্রান্সিসও দুহাতের চেটো গোল করে বলল—শাঙ্কো—আমরা এই ঘরে।

ভাঙা জানালার নিচে শাঙ্কোর কথা শোনা গেল, অপেক্ষা করো। আমি দড়ি নিয়ে আসছি। ফ্রান্সিস হ্যারি রোক্কা তিনজনেই কথাটা শুনল।

রোক্কা বলল, কে কথা বলছে?

আমাদের এক বন্ধু—শাঙ্কো। ও যদি ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে দড়ি নামিয়ে দিতে পারে তাহলে আমরা দড়ি বেয়ে উঠে ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে পালাতে পারবো। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হলো—যাক ফ্রান্সিসদের পাওয়া গেছে ভাঙা জানালার নিচের ঘরটাতে। শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নামতে লাগল। ওক গাছটার কাছে এসে লাফিয়ে উঠে মগডালটা ধরল। তারপর গাছ থেকে কখনও ডাল ধরে কখনও কাণ্ড বেয়ে বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল। ছুটল জাহাজঘাটের দিকে। জাহাজ থেকে মোটা কাছি আনতে হবে।

রাস্তা দিয়ে নয়—শাঙ্কো বাড়িঘরদোরের আড়ালে আড়ালে গাছ ঝোপ পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে বেশ দ্রুত ছুটে এল জাহাজঘাটে। চাঁদের আলোয় দেখল—নোঙরকরা ওদের জাহাজটাকে মাঝখানে রেখে দুটো যুদ্ধজাহাজ দাঁড়িয়ে আছে—এখানে যুদ্ধজাহাজকে বলে ফেল্লুকা। সৈন্যদের হাঁটুঝুল কাপড়ের পোশাককে বলে কাপট। শাঙ্কো ঠিক করল ওদের জাহাজ থেকেই লম্বা কাছি আর দড়ির মই নেবে। তার আগে ফেল্লুকা দুটোর নোঙরের দড়ি কেটে দিতে হবে যাতে ফেল্লুকা দুটো বাতাসের ধাক্কায় আস্তে আস্তে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যায়। বাতাস সমুদ্রের দিকেই বইছে। আস্তে আস্তে ফেল্লুকা দুটো ভেসে গেলে ভেতরের সৈন্যরা বুঝতেই পারবে না।

শাঙ্কো দেখল জাহাজঘাটের এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে নজরদার মিনারের ওপারের আগুনও স্তিমিত। একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে শাঙ্কো সেখান দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে সমুদ্রের জলে নামল। জলে কোনো শব্দ না তুলে চলল বাঁদিকের ফেল্লুকার দিকে। ফেল্লুকার কাছে এসে চাঁদের আলোয় দেখল—মাত্র একজন কাপটপরা সৈন্য ডেক-এ ঘোরাফেরা করছে। শাঙ্কো জলে ডুব দিয়ে ফেল্লুকার নোঙরবাঁধা কাছিটার কাছে আস্তে জল থেকে মাথা তুলল। তারপর কোমর থেকে ছোরাটা খুলল। ধারালো ছোরার কয়েকটা পোঁচেই নোঙরের কাছি কেটে গেল। ফেল্লুকাটা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল গভীর সমুদ্রের দিকে।

শাঙ্কো কোমরে ছোরা গুঁজে এ পাশের ফেল্লুকার দিকে নিঃশব্দে জল ঠেলে চলল। নোঙরের কাছির কাছে এল। কাছিটা দেখে ওর মনে হলো এই কাছিটাই

নিয়ে গেলে ভালো হয়। ও এই কথা ভেবে জলে ডুব দিল। কাছিটার গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে বেশ নিচে নেমে এল। তারপর ছোরা বের করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাছিটা কাটল। কোমরে ছোরা গুঁজে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। তখনই নজরে পড়ল ফেল্লুকার পেছনে হালের কাছে মইটা ঝুলছে। কাঠের ছোট ছোট ধাপবাঁধা দড়ির মইটা বেশ শক্তপোক্ত। ওদের দড়ির মইয়ের চেয়ে অনেক ভালো আর লম্বাও।

শাঙ্কো ফেল্লুকার পেছনে হালের কাছে নিঃশব্দে এল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পায়ের ভর রেখে রেখে পেছনের ডেক-এ উঠে এল। ছোরা বের করল। দ্রুত হাতে মইটা যে লম্বা দড়ির সঙ্গে বাঁধা সেটা কেটে ফেলল। নোঙরের বাঁধা কাছিটা কেটে ছোরাটা কোমরে গুঁজল। কাটা কাছির মুখটা কোমরে জড়ালো। তারপর দড়ির মইয়ের মুখের দড়িটা হাতে নিয়ে হালের মইয়ের প্রথম ফাঁকটায় বাঁ হাত গলিয়ে কাঁধে আটকে নিল। কাছির মুখটাও বাঁ হাতে ধরল। ডান হাতটা দিয়ে জল টেনে টেনে আস্তে আস্তে সাঁতরে চলল তীরের দিকে। মই আর লম্বা কাছি টেনে আনতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তবে দূরত্ব কম বলে কিছু পরেই সব নিয়ে তীরে উঠল। কাছির সবটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। শাঙ্কোর শরীর দেখাল পিপের মতো। মইটা দ্রুত হাতে ভাঁজ করে করে গুটিয়ে কাঁদে ফেলে শাঙ্কো চলল সেই দুর্গের পেছন দিকে। এতক্ষণে সমুদ্রের জোর হাওয়ায় শাঙ্কোর জলে ভেজা শরীর শীত শীত করে উঠল। একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। সমুদ্রের ওপর পাতলা সাদাটে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল ফেল্লুকা দুটো অনেক দূরে ভেসে যাচ্ছে।

দুর্গের পেছনে যখন এল তখন আকাশের দিকে তাকাল—রাত শেষ হতে কত দেরি? দেখল—চাঁদ আর তারাগুলোর আলো ম্লান হয়ে এসেছে। বুঝল—রাত বেশি নেই। শাঙ্কোরা তো জাহাজে জাহাজেই ঘুরে বেড়ায়। দিন রাতের আকাশ দেখে ওরা মোটামুটি সময় হিসেব করতে পারে।

কাছি আর মই নিয়ে বেশ কসরৎ করে শাঙ্কো ওক গাছটার ডাল থেকে পাথরের স্তূপের ওপর নামল। সাবধানে পা ফেলে ফেলে ভাঙা সিঁড়িগুলোর কাছে এল। তারপর আগের মতই হাতের তেলো গোল করে ডাকল, ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিস তখন ভাবছে—শাঙ্কো কি ওদের পালাবার উপায় বের করতে পারবে?

শাঙ্কোর ডাক শুনেই ফ্রান্সিস আগের মতোই বলল, শাঙ্কো? শাঙ্কো তখন চাঁদের ম্লান আলোয় চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল দুটো বড় বড় পাথরের পাটাতন সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। শাঙ্কো মইয়ের একমুখের টানা দড়িটা দিয়ে পাথর দুটোয় পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর মইয়ের অন্য মুখটা দুহাতে ছুঁড়ে দিল ভাঙা জানালার ফোকরের দিকে। কিন্তু ফোকর দিয়ে গলে গেল না মইয়ের মাথাটা। পাথরে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে নিচে গড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো সাবধান হলো। কোনোরকম শব্দ হওয়া

চলবে না। মইয়ের মুখটা টেনে তুলল। বার কয়েক মইয়ের মাথাটা শূন্যে ঘুরিয়ে জোরে ছুঁড়ে দিল ভাঙা ফোকরটার দিকে। এবার মুখটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে গলে গেল। শাঙ্কো মইটা ছাড়াতে লাগল। মইয়ের মাথাটা নিচে নামতে নামতে মেঝের কাছে চলে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারি রোক্কা তিনজনই ছুটে এল মইয়ের কাছে। ফ্রান্সিস মইয়ের মাথাটা কয়েকবার জোরে টানল। দেখল মইটা যথেষ্ট শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। এবার ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে মারিয়ার কাছে এল। মারিয়ার কানের কাছে মুখ এনে ডাকল মারিয়া—মারিয়া। মারিয়া চোখ খুলল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমরা পালাব। তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু দাঁত চেপে তোমাকে কষ্ট সহ্য করতে হবে। কোনোরকম শব্দ করবে না।

মারিয়া ঠোঁট একটু ফাঁক করে দুর্বলস্বরে বলল—আচ্ছা।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে পিঠ আর হাঁটুর কাছে ধরে ধরে ঘাসের বিছানা থেকে তুলল। তারপর মারিয়াকে বাঁ কাঁধে শুইয়ে নিল। এই ঝাঁকুনিটা যত কমই হোক আর ফ্রান্সিস সাবধান থাকা সত্ত্বেও মারিয়ার কাশি এল। শুরু হলো মারিয়ার দমবন্ধ-করা কাশি। ভেন তাড়াতাড়ি মারিয়ার পিঠে হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস এক পাও নড়ল না। মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে মারিয়া কাশলে ভয়ের কিছু নেই। মারিয়া এর আগেও কেশেছে—পাহারাদার সৈন্যরা শুনতেও পেয়েছে। কিন্তু ঐ ভাঙা জানালার কাছে উঠে কাশলেই বিপদ হবে। সেই কাশির শব্দ পাহারাদারদের কানে গেলে ওদের সন্দেহ হবেই। সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। এই কয়েদঘর থেকে মুক্তির আর কোনো আশাই থাকবে না। মারিয়ার কাশি কমল। তবু ফ্রান্সিস নড়ল না। মশালের আলোয় হ্যারি দেখল—দুচোখ বন্ধ করে ফ্রান্সিস স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঘামে-ভেজা মুখ মশালের আলোয় চক্‌চক্‌ করছে। একদিকে মারিয়ার জন্যে দুশ্চিন্তা অন্যদিকে পালাবার এই সুবর্ণ সুযোগ এবং শেষ সুযোগ—ফ্রান্সিসের মনে কী ঝড়ের তোলপাড় চলছে হ্যারি সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারল। মারিয়ার কাশি বন্ধ হলো। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে মইয়ের দিকে এগোল। মইয়ের কাঠে পা রেখে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। ততক্ষণে ভাইকিংরা রোক্কার বিদ্রোহী বন্ধুরা সবাই দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল ফ্রান্সিস কী অসীম ধৈর্য আর মনের জোরে সব কষ্ট সহ্য করে এক-পা এক-পা করে মই দিয়ে উঠছে। ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজনের চোখে জল এল। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল—ফ্রান্সিস যেন সফল হয়।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়াকে নিয়ে উঠতে লাগল। একসময় ভাঙা জানালার ফোকরের নিচের পাথরে পা রাখল। পাথরগুলো জোড়ের জায়গায় ভেঙে গিয়ে বেশ আলগা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস ডান পা'টা রেখেই বুঝল সেটা। পা'টা নামিয়ে আনল। হিসেব করে পায়ের চাপ দিতে হবে। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় ও ডানদিকের জোড়া পাথরটায় ডান পা'টা রেখে পায়ের চাপ আস্তে আস্তে বাড়াতে লাগল। সাবধানে। বেশি নড়ে গেলে ভারসাম্য রাখতে পারবে না। কাঁধে প্রায় অজ্ঞান

মারিয়ার শরীরের চাপও রয়েছে। পাথরটা বেশি সরে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে দুজনকেই ছিটকে পড়তে হবে সামনের হাতপনেরো অন্ধকার ফাঁকটার মধ্যে। তারপর অন্ধকারে নিচে কোথায় আছড়ে পড়বে। দুজনেরই মৃত্যু অবধারিত। ফ্রান্সিস মৃত্যুর চিন্তাটাকে অগ্রাহ্য করল মনে মনে। ওসব চিন্তা মনটাকে দুর্বল করে দেবে। শরীরটাকেও। এখন সবচেয়ে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। এই অন্ধকারে ফাঁকটায় পেতে রাখা দড়ির মই দিয়ে পার হতেই হবে।

দু একবার জোরে ডান পায়ের চাপ দিল পাথরটায়। পাথরটা নড়ে উঠলেও খুলে বেরিয়ে আসার মত আলগা হয়ে যায়নি। ডান পায়ে চাপ দিয়ে ভর রেখে বাঁ দিকের পাথরটায় বাঁ পা রাখল। আস্তে। চাপ দিয়ে দেখল ওটার জোড়টা বেশ শক্ত। পাথরটা নড়লোই না। নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্রান্সিস ওটায় বাঁ পা রেখে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে দাঁড়াল। ওর নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তখন। কাঁধে প্রায় অচেতন মারিয়ার শরীরের ভার। আবার হাতে সময় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে।

ফ্রান্সিস সামনের দিকে তাকাল। হাত পনেরো অন্ধকার গহ্বরমত জায়গাটার ওপর শাঙ্কো টান টান দড়ির মইটা পেতে রেখেছে। সিঁড়ির মত কাঠের ফালি বাঁধা দুটো শক্ত দড়িতে। ঐ কাঠের ফালিগুলোতে পা রেখে রেখে অন্ধকার গহ্বরমত জায়গাটা পার হলেই পাথরের সিঁড়ি। ওপরের দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িতে শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির ওপরটায় পাথরের দরজা। দরজার পাল্লা নেই। ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই। ওপরে বোধহয় দুর্গের খোলা ছাদ। কারণ ওখান দিয়ে সামনের সিঁড়িতে পাথুরে দেয়ালে চাঁদের আলো কোনাকুনি পড়েছে। অতি দ্রুত ফ্রান্সিস এসব ভেবে নিল।

ফ্রান্সিস একটু দম নিল। তাকাল ঐ একফালি চাঁদের আলোটার দিকে। তাকিয়ে ওর হঠাৎ মনে হল কে যেন সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। এরকম সুতোর কাজ করা পোশাক পরেও অনেকদিন যাকে গীর্জার উৎসবে যেতে দেখেছে। ফ্রান্সিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। চোখ বুঁজে অস্ফুটস্বরে ডাকল—মা। ওর মনের জোর অনেক বেড়ে গেল। ও চোখ খুলে নিচু হল। প্রায় হামা দিয়ে কাঠের ধাপগুলোয় কখনও পা রেখে কখনও হাঁটু চেপে চেপে ও অন্ধকার গহ্বরমত জায়গাটা পার হতে লাগল। পিঠে মারিয়ার নাক মুখ দিয়ে গরম শ্বাস পড়ছে। মারিয়ার শরীরও গরম। বেশ জ্বর। মারিয়া দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু জ্বরের ঘোরে হাত আলগা হয়ে যেতে পারে। গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। শরীরে একটা আল্‌তো ঝাঁকুনি দিয়ে দু'তিনটে ধাপ দ্রুত পার হয়েই শেষ ধাপটাও পার হল। তখনই শাঙ্কো দুহাতে ওর বাহু ধরল। পাথরের সিঁড়ির দিকে টেনে আনল। ফ্রান্সিস পাথরের সিঁড়িতে দু পা রাখল। শাঙ্কো নিচু হয়ে বসল। ফ্রান্সিস ওর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে শাঙ্কোর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন জোরে জোরে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুটস্বরে ডাকল—মারিয়া। কোন উত্তর নেই। আবার ডাকল—মারিয়া।

—উঁ। মারিয়া মুখে গোঙানির মত শব্দ করল।

ফ্রান্সিস বলল—তোমার কষ্ট হয় নি তো? মারিয়া কোন কথা বলল না। এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল ওর পিঠে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মারিয়া নিঃশব্দে কাঁদছে। পিঠের ওখানটার পোশাক ভিজে গেছে যেন।

ফ্রান্সিস আর দাঁড়াল না। মারিয়ার কাশি উঠলে ভয়ানক বিপদ হবে। পাহারাদাররা শুনতে পারে।

শাঙ্কো তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ফ্রান্সিসও মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে উঠতে লাগল। দুর্গের ছাদে উঠে শাঙ্কো এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিসও পিছু পিছু চলল। এখানে ওখানে ভাঙা পাথরের পাটাতন ছড়িয়ে আছে। সেইগুলোর ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলল। অসাবধান হলে পায়ের চাপে পাথর নড়ে যেতে পারে পাও পিছলে যেতে পারে।

শাঙ্কো তো জায়গাটা চেনে। ও ফ্রান্সিসের আগেই খাদের ধারে চলে এল। এখানেই ও কাছিটা কোমর থেকে খুলে রেখেছিল। কাছির একটা মুখ টেনে বাঁধলো একটা পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে তারপর কাছিটা খাদে ঝুলিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে ততক্ষণে এসে পড়েছে।

শাঙ্কো বলল, ফ্রান্সিস, আমিই না হয় রাজকুমারীকে কাঁধে নিয়ে নামি।

ফ্রান্সিস শুধু বলল, আমি পারবো। তারপর মারিয়াকে কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরল। বলল, মারিয়া এবার কষ্ট হলেও আমাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরো। মারিয়া দুর্বল শরীরের আর কতটা জোর পাবে। তবু জোরে আঁকড়ে ধরল ফ্রান্সিসকে। ফ্রান্সিস বলল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আরো জোরে ধরো। একটুক্ষণ। আমরা মুক্তির দোরগোড়ায়। মারিয়া আরো জোরে আঁকড়ে ধরল। ফ্রান্সিস খাদের ওঁখানে পাথরে পা রেখে রেখে কাছি বেয়ে বেয়ে বেশ দ্রুতই নেমে এল। বুঝল—মারিয়া এত জোরে বেশিক্ষণ ধরে থাকতে পারবে না। এখানটায় পাথর কম। ম্লান চাঁদের আলোয় একটা ঘাস-ঝোপে-ঢাকা জায়গায় মারিয়াকে শুইয়ে দিল। তারপর পাশে নিজে শুয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল।

হাপাচ্ছে তখন কয়েদঘরে সবাই এতক্ষণ মই বেয়ে পালিয়ে যাওয়া দেখছিল। হ্যারি যখন বুঝল মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিস পালাতে পেরেছে তখন রোক্কার দিকে তাকাল। বলল, রোক্কা, ফ্রান্সিস নিরাপদে পালাতে পেরেছে। এখন আপনাকে সবার আগে পালাতে হবে। পালিয়ে গিয়ে প্রথম আপনাকে রাজকুমারীর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এখন রাজকুমারীকে সুস্থ করে তোলার আগে পর্যন্ত আমরা কিছু ভাবতে পারছি না। আমাদের কারো মনে এখন শান্তি নেই। রোক্কা একটু ভাবল। বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন।

ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই অসুস্থ রাজকুমারীকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। কারণ, ফ্রান্সিস এখানকার কিছুই চেনে না। হ্যারি বলল।

খুবই স্বাভাবিক। রোক্কা বলল। একটু ভেবে নিয়ে রোক্কা বলল, কিন্তু আর দেরি করা যাবে না। রোক্কা এবার দুহাত ওপরে তুলে নিঃশব্দে হাতের ইঙ্গিতে

সবাইকে কাছে আসতে বলল। সবাই এসে রোক্কাকে ঘিরে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াল। রোক্কা লো ল্যাতিন ভাষায় নিজের দলের লোকেদের বলল, বন্ধুরা—এরা ভাইকিং —বিদেশী। এই কর্সিকা দ্বীপের কিছু ওঁরা চেনেন না। তোমরা ওঁদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করবে এই আমার নির্দেশ। কারণ—এঁদের যেটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে নির্দ্বিধায় বলতে পার এঁরা শুধু সৎ ও বিবেকবান নন—বীর ও দুঃসাহসী। একটু থামল রোক্কা। তারপর বলল, আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না। তোমরা এই ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে বার্গ পাহাড়ে আমাদের আস্তানায় চলে যাবে। আমি পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। রোক্কা থামল। তারপর হ্যারিকে বলল, আপনি আপনার বন্ধুদের আবার কথাগুলো বুঝিয়ে বলে দেবেন। এবার সবাই পালাবার জন্যে তৈরি হও। বলেই রোক্কা মইটার কাছে গেল। মই বেয়ে দ্রুত উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলল, কোনো গোলমাল যেন না হয়। হ্যারি বন্ধুদের রোক্কার নির্দেশ বুঝিয়ে বলল। রোক্কা মই বেয়ে উঠে ফাঁকের জায়গাটা পার হয়ে ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর এল। শাঙ্কো একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আত্মগোপন করে চারদিকে নজর রাখছিল। এবার এগিয়ে এসে ঝোলানো কাছিটা আঙুল দিয়ে দেখাল। রোক্কা দ্রুত কাছি বেয়ে খাদে নামল। ফ্রান্সিস রোক্কাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। রোক্কা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, রাজকুমারীকে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলো। মারিয়াকে আস্তে আস্তে দুহাতে তুলে পাঁজাকোলা করে রোক্কার পেছনে পেছনে চলল। তখনই দেখল, পুব আকশে লাল রং ধরেছে। সূর্য উঠতে দেরী নেই। চিন্তা হলো বন্ধুরা সূর্য ওঠার আগেই পালাতে পারবে কিনা। কিন্তু এখন আর ফিরে বন্ধুদের সাহায্য করার কথা ভাবতে পারল না। মারিয়ার জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। রোক্কা বসতি এলাকা এড়িয়ে ঝোপঝাড় পাথুরে এলাকা দিয়ে চলল। পেছনে মারিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সিসও যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল।

প্রায় আধঘন্টা পরে রোক্কা একটা কাঠ আর পাথরে তৈরি বাড়ির পেছনে এল। পেছনে পাথরের দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের দরজা। রোক্কা দরজাটা বার কয়েক ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। সাধারণ পোশাকপরা একটি যুবক মুখ বাড়িয়ে রোক্কাকে দেখে হাসল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। রোক্কা ফ্রান্সিসকে ইশারা করে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসও ঢুকল। রোক্কা দুপাশের ঘর ছাড়িয়ে টানা বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরটায় এল। কয়েকটা কাঠের তক্তা পেতে বিছানা করা। বালিশও আছে। রোক্কা ফ্রান্সিসকে হাতের ইঙ্গিতে মারিয়াকে শুইয়ে দিতে বলল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। রোক্কা যুবকটিকে বলল, শীগগির বৈদ্যমশাইকে আসতে বলো। যুবকটি ছুটে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তক্তাপাতা বিছানায় বসল। হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। মারিয়া চোখ খুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো দারুণ লাল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ও বুঝে উঠতে পারল না কী করবে এখন? মারিয়া চোখ বুঁজল। অসাড় হয়ে শুয়ে রইল।

রোক্কার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক ঢুকলেন। তাঁর গায়ে রোক্কার মতোই দামী

পোশাক। তিনি বেশ দ্রুতই বিছানায় বসলেন। মারিয়ার কপালে হাত দিলেন। চোখ টিপে ধরে চোখের নিচটা দেখলেন। গোড়ালির কাছে হাত দিয়ে টিপে ধরলেন। রোক্কাকে বললেন, রোগীকে একটু পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দাও। লো ল্যাতিন ভাষা। ফ্রান্সিস বুঝল না। রোক্কা স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসকে বলল কথাটা। ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে আস্তে আস্তে বলল, বৈদ্যমশাই তোমাকে পরীক্ষা করবেন। একটু পাশ ফিরে শোও। মারিয়া পাশ ফিরতে গেলে ফ্রান্সিস সাহায্য করল। বৈদ্যমশাই মারিয়ার পিঠে আঙুল পেতে অন্য আঙুলে বেশ কয়েকবার ঠুকলেন। ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে সোজা করে শোয়াতে বললেন। কয়েকটা নির্দেশ দিলেন। তারপর চুপ করে বসে রইলেন। কেউ কোনো কথা বলল না। একটু পরে যুবকটি একটা ছোট চিনেমাটির বাটিতে সবজে রঙের জল নিয়ে এল। তখনই মারিয়ার কাশি উঠল। আবার সেই কষ্ট, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে কাশতে কাশতে। মারিয়া মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। ফ্রান্সিস অসহায়ের মতো মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাশি কমল। একটু পরে কাশি বন্ধ হলো। মারিয়া মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস বৈদ্যের মুখের দিকে তাকাল। দেখল বৈদ্যমশাইয়ের কপালে চিন্তার রেখা। উনি একদৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এবার ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে ওষুধটা খাইয়ে দিতে বললেন। ফ্রান্সিস ওযুধের বাটিটা মারিয়ার মুখের কাছে এনে বলল, মারিয়া একটু কষ্ট করে এই ওযুধটা খাও। অসুখ সারবে। ফ্রান্সিস বাঁ হাতে মারিয়ার মাথাটা তুলে ধরল। মারিয়া চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ওষুধটা খেয়ে নিল। মুখ বিকৃত করল। বোঝা গেল ওষুধটা বিস্বাদ। মাথাটা বালিশে নামাল ফ্রান্সিস। বৈদ্যমশাই একটুক্ষণ বসে থেকে উঠলেন। মৃদুস্বরে ডাকলেন—কামেরাত যুবকটি এগিয়ে এলো। কামেরাতকে কী নির্দেশ দিলেন। এবার রোক্কা জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলেন? বৈদ্যমশাই লো ল্যাতিন ভাষায় বললেন, নিশ্চয়ই আগে কিছু ওষুধ পড়েছিল। নইলে উনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতেন। বৈদ্যমশাই চলে গেলেন।

উৎকণ্ঠিত ফ্রান্সিস বলল—রোক্কা, বৈদ্যমশাই কী বললেন?

রোক্কা আসল কথা না বলে একটু হেসে বলল, বললেন অসুখ সেরে যাবে। তবে কয়েকদিন ওষুধ পড়তে হবে। ফ্রান্সিস একটু আশ্বস্ত হলো। মারিয়া চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস বুঝল না মারিয়া কথাটা শুনেছে কি না।

কামেরাত একটি মোটা কাপড় নিয়ে এল। মারিয়ার গায়ে ঢাকা দিল গলা পর্যন্ত। তারপর চলে গেল। রোক্কা বলল, আমি একটু আসছি। রোক্কা চলে গেল। একা ফ্রান্সিস মারিয়ার শিয়রে বসে রইল। ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল, বন্ধুরা কেউ তো জানতেই পারল না আমরা এখানে আছি। রোক্কাকে বলতে হবে ওদের খবর দেবার জন্যে।

ওদিকে কয়েদ ঘর থেকে রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্যরা আর ভাইকিংরা মই বেয়ে পালাতে লাগল। ভাইকিংরা দশ-পনের জন আর কয়েকজন রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্য পালিয়েছে তখন। এত জনের নড়াচড়া মই বেয়ে ওঠায় বেশ শব্দ হতে লাগল।

তখনই দেখা গেল ভাঙা জানালা থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল। পাথরটা মাঝের বিছানা ঘেঁষে পড়ল। আবার জোর শব্দ তুলে পাথরটা ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। পাহারাদার জেনো সৈন্যদের সন্দেহ হলো। ওরা লোহার দরজা খুলে দ্রুত কয়েদঘরে ঢুকল। মশালের আলোয় মই দেখেই ওরা বুঝল কিছু কয়েদী পালিয়েছে। রোক্কাও পালিয়েছে। দুজন পাহারাদার সৈন্য নিরস্ত্র ভাইকিংদের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিংরা কয়েকজন আহত হলো। অন্য সৈন্য দু'জন তরোয়াল চালিয়ে চালিয়ে মইয়ের দড়ি কেটে দিল। বাকি ভাইকিংদের আর রোক্কার বিদ্রোহী সৈন্যদের একজনের পালানো হলো না। কয়েদ ঘরে তালা লাগিয়ে পাহারাদার সৈন্যরা চলে গেল।

ভাঙা সিঁড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছিল শাঙ্কো। কয়েদঘরে গোলমাল, পাহারাদার সৈন্যদের চিৎকার চ্যাচামেচি শুনেই বুঝল—ওরা টের পেয়েছে। বোধহয় মইয়ের দড়িও কেটে দিয়েছে। আর কারো পালানোর সম্ভাবনা নেই।

শাঙ্কো ভাঙা পাথরে পা রেখে রেখে যতটা দ্রুত সম্ভব খাদে নেমে এল। মুক্ত বন্ধুরা এসে শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কো বলল, বন্ধুরা, এখনও সব বন্ধু পালাতে পারেনি। পাহারাদার সৈন্যরা টের পেয়ে মইয়ের দড়ি কেটে দিয়েছে। এক্ষুণি আমাদের জাহাজে যেতে হবে। অস্ত্র এনে লড়াই করে বাকি বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে।

হ্যারি বলল, কিন্তু জেনো সৈন্যদের যুদ্ধজাহাজ দুটো আমাদের জাহাজের দুপাশেই রয়েছে।

শাঙ্কো একটু হেসে বলল, আমি দুটো জাহাজেরই নোঙর-বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছি। দুটো জাহাজই এখন মাঝ-সমুদ্রে। এখানকার পাহারাদার আর কিছু সৈন্য হয়তো এখন আছে। ওদের লড়াই করে হারাতে অসুবিধে হবে না। এই সুযোগ। আর দেরি নয়। সব জাহাজঘাটায় চলো।

ওরা দল বেঁধে ছুটল জাহাজঘাটার দিকে। শাঙ্কো যে পাথুরে মাটি ঝোপঝাড়ের এলাকা দিয়ে জাহাজঘাটায় এসেছিল সেই জায়গা দিয়েই বন্ধুদের নিয়ে চলল। বসতি এলাকা থেকে দূরে।

জাহাজঘাটায় এসে চাঁদের আলোয় দেখল সত্যি শুধু ওদের জাহাজটাই ভাসছে। জেনোদের যুদ্ধজাহাজ দুটো নেই। বোঝা গেল—ঐ দুই জাহাজের সৈন্যরা এখনও বোধহয় বুঝতে পারেনি যে ওদের জাহাজ জাহাজঘাটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।

শাঙ্কো হ্যারিরা দ্রুত কাঠের পাটাতন দিয়ে ওদের জাহাজে উঠল। দ্রুত ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে।

অস্ত্রঘর থেকে তরোয়াল নিয়ে ওরা ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কো নিয়ে এল ওর তীর ধনুক।

জাহাজ থেকে নামতেই দেখল তিনচারজন জেনো সৈন্য জাহাজঘাটার দিকে ছুটে আসছে। ওরা বোধহয় ওদের ফেলুকা মানে যুদ্ধজাহাজ দেখতে না পেয়েই ছুটে আসছিল।

সামনেই অস্ত্র হাতে শাঙ্কোরা। শুরু হলো লড়াই। তখন চাঁদ আর তারার আলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। ভোর হতে দেরি নেই। লড়াই চলল। বিস্কোর নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে জেনো সৈন্যরা বুঝল এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনজন জেনো সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গোঙাতে লাগল। শেষেরটির হাতের তরোয়াল বিস্কোর একটা জোরালো মার ঠেকাতে গিয়ে তখন ছিটকে গেছে। সেই সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দুর্গের দিকে।

দুর্গের সামনে যখন ওরা এলো তখন সকালের রোদ পড়েছে দুর্গের কাল্‌চে পাথুরে গায়ে। কাছে এসে দেখল সদর দেউড়ির সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জেনো সৈন্যরা আট-দশ জন দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে সেই দলপতি। হ্যারি চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বলল, শাঙ্কো, পায়ে তীর ছুঁড়ে কয়েকটাকে ঘায়েল কর। বুকে মেরো না। বন্ধুদের উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য—অকারণ নরহত্যা আমরা চাই না।

শাঙ্কো পাথুরে রাস্তায় বাঁ হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর নিশানা স্থির করে তীর ছুঁড়ল দলপতির দিকে। দলপতি তরোয়াল ফেলে দু'হাতে হাঁটু চেপে বসে পড়ল। শাঙ্কো আর একটা তীর ছুঁড়ল। ওটা দুর্গের কাঠের দরজায় গিয়ে বিঁধে গেল। আবার দ্রুতহাতে তীর ছুঁড়ল শাঙ্কো। আর একজন সৈন্যের ডান হাতে লাগল তীরটি। সে তরোয়াল ফেলে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরল। এবার জেনো সৈন্যদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেল। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে পালাতে লাগল দুর্গের ডানপাশে। একটু পরেই ওদের আর দেখা গেল না। গাছগাছালির আড়াল দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল ওরা।

হ্যারি সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে দুর্গের সদর দেউড়িতে এল। দেখল বিরাট কাঠের দরজাটা একটু খোলা। তার মানে ভেতরের কয়েদ ঘরের পাহারাদার সৈন্যরাও এসেছিল বাধা দিতে। শাঙ্কোর তীরে আহত একজন পাহারাদার সৈন্যের কোমরে ঝোলানো আংটায় কয়েদঘরের চাবি পাওয়া গেল। হ্যারি চাবি নিয়ে দরজা পার হয়ে কয়েদঘরের দিকে ছুটল। পেছনে বন্ধুরা।

কয়েদঘরের তালা খুলল হ্যারি। তারপর জোরে ধাক্কা দিয়ে লোহার দরজা খুলেই চিৎকার করে বলল-বন্ধুরা পালিয়ে এসো। বন্দী ভাইকিংরা ছুটে এল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। সবাই ছুটে দুর্গের বাইরে এল। এবার কোথায় যাবে ওরা? হ্যারি দেখল রোক্কার একজন বিদ্রোহী সৈন্য মাত্র মুক্ত বন্ধুদের দলে আছে। হ্যারি ছুটতে ছুটতে সেই সৈন্যটিকে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, রোক্কা আমাদের যেতে বলেছে তোমাদের বার্গ পাহাড়ের আস্তানায়। আমাদের সেখানে নিয়ে চলো।

সৈন্যটি বলল, রোক্কার নির্দেশ মানার জন্যেই আমি আগে পালাইনি। চলুন। কিন্তু সদর রাস্তা দিয়ে নয়। অন্যদিক দিয়ে যেতে হবে। সেই সৈন্যটি সবার সামনে এসে ছুটতে লাগল।

পাথর ছড়ানো অসমতল জায়গা দিয়ে, পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে গাছ-গাছালির আড়ালে আড়ালে ওরা ছুটতে লাগল বার্গ পাহাড়ের দিকে।

বেশ কিছুটা আসার পর দূর থেকে দেখল ওরা ধুলো উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে কারা যেন আসছে। সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকে বলল, সবাইকে ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়তে বলুন। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে কথাটা বলেই নিজেও একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল। সবাই এখানে-ওখানে ছোট ঝোপঝাড়ের আড়ালে শুয়ে পড়ল।

দূর থেকে প্রথমে সিনার্কার গাড়িটা দেখা গেল। তারপর অশ্বারোহী সৈন্যরা। পরে পদাতিক সৈন্যরা। স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু সৈন্যটি সিনার্কার গাড়ি দেখেই চিনল। সিনার্কার সৈন্যরা চলে যেতে বিদ্রোহী সৈন্যটি হ্যারিকে বলল, বোধহয় সারিনের লড়াইয়ে সিনার্কা আমাদের সৈন্যদের কাছে হেরে গেছে।

আবার ছোটা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরে দূরে একটা ছোট পাহাড় দেখিয়ে রোক্কার সৈন্যটি বলল, ঐ যে বার্গ পাহাড়। দেখা গেল পাহাড়টায় গাছগাছালি বিশেষ নেই। হ্যারিরা চলল ঐ বার্গ পাহাড় লক্ষ্য করে। বার্গ পাহাড়টার নিচে এসে দেখা গেল বেশ ঘন জঙ্গল। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ফিরে গাছের নুয়ে পড়া ডালপালা সরিয়ে ওরা রোক্কার বিদ্রোহী সঙ্গীটির পেছনে পেছনে একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের সামনে এল। বিদ্রোহীটি মুখ নামিয়ে কী যেন বলে উঠল। পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে দু'তিন জন যোদ্ধা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে এল। ভাইকিংদের দেখে ওরা বেশ আশ্চর্য হল। তারপরেই হ্যারিদের সশস্ত্র দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। বিদ্রোহী সঙ্গীটি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওদের কী বলল। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার হাসল। হাতের ইশারায় হ্যারিকে ডেকে ওদের পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করল। ভাইকিংরা ওদের পেছনে পেছনে চলল। পাথরের চাঁইটার নিচে দিয়ে গুড়ি মেরে সবাই একটা বেশ বড় লম্বাটে গুহায় ঢুকল। দেখল-জনা পঁচিশেক বিদ্রোহী সৈন্য শুয়ে বসে আছে। এটাই তাহলে বিদ্রোহীদের আস্তানা। হ্যারি হাঁপাতে হাঁপাতে পাথুরে মেঝেয় বসে পড়ল। অন্য ভাইকিং বন্ধুরাও হাঁপাচ্ছে তখন। ওরাও বসে পড়ল। এই সকালেও গুহাটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার।

ওদিকে রোক্কা যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল।

সেদিন সকালে কয়েকজন ভাইকিং বিদ্রোহীদের আস্তানা সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল। পাহারাদার বিদ্রোহী সৈন্যটি তখন সকালের খাবার খেতে গুহার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। কেউ ছিল না গুহা মুখে। ভাইকিং বা কয়েকজন বাইরে এসে গুহার মুখের কাছে বিরাট পাথরের চাঁইটার ওপর আস্তে ওঁচানো পাথর খোদলে পা রেখে রেখে চাঁইটার ওপর উঠল। চারদিকে ঝক্‌ঝকে রোদ সবই দেখতে পাচ্ছিল ওরা। বার্গপাহাড়ের মাথার দিকে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু নিচে গভীর জঙ্গল। ওরা দেখে আশ্চর্য হল যে বড় বড় ফার্ণ গাছের সংখ্যাই এই বনে বেশি। অনেক দূরে বোনিফেসিওর পাথরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। দুর্গটাতো ভালোভাবেই

দেখা যাচ্ছে। তবে জাহাজঘাটা দেখা যাচ্ছে না। দুর্গের আড়ালে পড়ে গেছে। তবে অস্পষ্ট হলেও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ভাইকিংরা কিছু পরেই পাথরের চাঁইটা থেকে নেমে এল। গুহায় ঢুকল। হ্যারি মেঝেয় একটা মোটা কাপড় পেতে শুয়েছিল। ওদের দেখে বলল—কোথায় গিয়েছিলে। ভাইকিং বন্ধুদের একজন বলল—এই গুহার দম-বন্ধ-করা অন্ধকার ভালো লাগছিল না। তাই বাইরে গিয়েছিলাম।

—বাইরের বনটা সত্যিই সুন্দর। আর একজন ভাইকিং কি বলল।

তখনই গুহার পাহারাদার ছুটে হ্যারির কাছে এল। পাহারাদার জানে যে একমাত্র হ্যারিই লো ল্যাতিন ভাষা বোঝে। পাহারাদার এসে হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—আপনার বন্ধুরা বাইরে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

পাহারাদার বলল—আপনার বন্ধুরা এটা ভালো করেনি।

—কেন বলুন তো? হ্যারি জানতে চাইল।

—সারিনের লড়াইয়ে আমাদের বিদ্রোহী দলের কাছে হেরে গিয়ে সিনার্কা ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে। এই বোনিফেসিও আর ধারে কাছে সব জায়গায় সব সময়ের জন্যে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র আমরা সাবধান হয়ে গেছি। কিন্তু এসময় গুহার আস্তানা থেকে আপনার বন্ধুরা না জেনে বাইরে গেছে। যদি সিনার্কার কোন গুপ্তচরের নজরে পড়ে থাকে তবে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। তখন এই গুহার মত ভালো আস্তানা ছেড়ে পালাতে হবে। নতুন আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। আত্মরক্ষার সময় নাও পেতে পারি। আমাদের দলের ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। পাহারাদার বিদ্রোহী যোদ্ধাটি বলল।

হ্যারি কিছু বলতে পারল না। কারণ যা ঘটবার ঘটে গেছে। আসলে ভাইকিং বন্ধুরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। হ্যারি সেই কথাটাই বলল শুধু। তারপর বলল—তাহ'লে এখন তো আমাদের সব সজাগ থাকতে হবে।

—তা তো বটেই পাহারাদারটি বলল।

সারাটা দিন কিছু ঘটল না। বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। গুহার আস্তানায় গুমোট গরমে সবাই অস্থির হয়ে উঠল। সন্ধ্যে হতেই শুরু হল ঝড়। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। গুহার বাইরের বন এলাকার গাছগাছালির মাতামাতির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। তাই গুপ্তচরের কাছে খবর পেয়ে সিনার্কার আদেশে তার যোদ্ধারা বিদ্রোহীদের ঐ গুহার আস্তানা ঘিরে ফেলেছিল সন্ধ্যের আগেই। ঝড়জল শুরু হতে ওরা জঙ্গল ঝোপঝাড়ে শব্দ তুলে বিরাট পাথরের চাঁইটার কাছে এল। এখানেই গুপ্তচরটি হ্যারির বন্ধুদের দেখেছিল। ঝড়জলের মধ্যেই সিনার্কার যোদ্ধারা আস্তানাটা খুঁজতে লাগল। কিছু পরে পেয়েও গেল। গাছগাছালির আড়াল থেকে সেই দলপতি ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখল দু'জন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে গুহামুখ পাহারা দিচ্ছে। তারা ঝড়জলের শব্দের মধ্যে বুঝতেই পারে নি সিনার্কার যোদ্ধারা প্রায় গুহামুখে চলে এসেছে। ওরা পাহারা দিতে লাগল।

দলপতি চারজন যোদ্ধার কানের কাছে মুখ এনে ব'লে গেল—ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ দুই পাহারাদারকে নিকেশ করো। ঠিক তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাল। সেই আলোর ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে চারজন সিনার্কার সৈন্য পাহারাদার দুই বিদ্রোহী যোদ্ধার ওপর ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্রোহী পাহারাদার দু'জন আক্রমণ, হতেই চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তখনই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। সেই চিৎকারের শব্দ গুহার মধ্যে বিদ্রোহীরা কেউ শুনতে পেল না। পাহারাদার দু'জন সিনার্কার যোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারাল।

এবার সিনার্কার যোদ্ধারা দলবেঁধে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। গুহার মধ্যে তখন বিদ্রোহী যোদ্ধারা ভাইকিংরা শুয়ে বসে আছে। বাইরে জলঝড়ের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দই ওদের কানে যাচ্ছিল না।

হ্যারি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। হ্যারি বুঝেছিল ওর বন্ধুদের কোন না কোন গুপ্তচর নিশ্চয়ই দেখেছে আর সহজেই বুঝে নিয়েছে এমন জায়গা বিদেশীরা এলে কী করে? নিশ্চয়ই এখানে বিদেশীদের অথবা বিদ্রোহীদের আস্তানা আছে। এই আশঙ্কা থেকে হ্যারি ভাইকিং বন্ধুদের বলে রেখেছিল কেউ তরোয়াল হাতছাড়া করবে না। সবাই হাতের কাছে তরোয়াল রাখবে। এমনকি রাতে ঘুমোবার সময়ও।

সিনার্কার যোদ্ধারা গুহায় ঢোকামাত্র হ্যারি ঠিক বুঝতে পারল। হ্যারি গুহার মুখের দিকে তাকিয়েই বসেছিল। হ্যারি লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বলে—বন্ধুরা—তৈরি হও। লড়াই।

হ্যারির কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরা তরোয়াল হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় বলে উঠল—বিদ্রোহী বন্ধুরা—সিনার্কার সৈন্যরা গুহায় ঢুকছে লড়াই।

সিনার্কার যোদ্ধাদের প্রথম আক্রমণের ধাক্কাটা ভাইকিংরা সামলাল। ততক্ষণে বিদ্রোহীরাও অস্ত্র হাতে নিচ্ছে। কিন্তু সবাই অস্ত্র হাতে নেবার আগেই সিনার্কার যোদ্ধাদের হাতে মারা গেল।

গুহাটা এমন কিছু বড় নয়। কাজেই তরোয়াল চালিয়ে লড়াই করতে অসুবিধে হচ্ছিল। গুহায় ততক্ষণে জোর লড়াই চলছে। এক ফাঁকে হ্যারি ছুটে গিয়ে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে একটার পর একটা মশাল মেঝেয় ফেলে দিতে লাগল। মশালগুলো মেঝেয় পড়ে যেতেই গুহাটা অন্ধকার হয়ে গেল। এবার হ্যারি চিৎকার করে বলল বন্ধুরা—গুহার পেছন দিকে ছুটে চলো। ওখানে যে পাথরখণ্ডটা রয়েছে সেটা সরিয়ে সবাই গুহার বাইরে চলে যাও। তারপর অন্ধকারে হ্যারি চেঁচিয়ে বলল—বিদ্রোহী বন্ধুরা—আমার বন্ধুরা যা করছে আপনারাও তাই করুন।

গুহাটা তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। দু'টো মশাল মেঝেতে পড়ে গিয়েও নিবু নিবু হয়ে জ্বলছিল। ভাইকিংরা দ্রুত গুহার পেছন দিকে ছুটল। বিদ্রোহী বন্ধুরাও অন্ধকারে আন্দাজে বুঝে নিয়ে ভাইকিংদের পেছনে পেছনে ছুটল। সিনার্কার যোদ্ধারা অন্ধকারে নিজেদের মধ্যেই তরোয়াল চালাতে লাগল। বুদ্ধিমান হ্যারি ওদের দেশের ভাষায় বন্ধুদের কীভাবে পালাতে হবে বলেছে। সিনার্কার সৈন্যরা কিছুই বোঝে

নি। আবার লো ল্যাতিন ভাষায় বিদ্রোহীদের শুধু বলেছে ভাইকিং বন্ধুদের অনুসরণ করতে। এটা শুনে সিনার্কার সৈন্যরা এলোপাথারি তরোয়াল চালাচ্ছে।

সবার আগে হ্যারিই গুহার শেষ মাথায় এল। অন্ধকারে দেখল—একটা বড় পাথর গুহা মুখে বসানো। হ্যারি চিৎকার করে বলল—বন্ধুরা—পাথর সরাও। ভাইকিং বন্ধুরা কয়েকজন তরোয়াল কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে গুহার মুখের পাথরটা সরাল। এবার সবাই দ্রুত বেরিয়ে আসতে লাগল। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টির প্রচণ্ডতা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তারই আলোয় গাছ ঝোপঝাড় দেখে দেখে ভাইকিংরা আর বিদ্রোহীরা পালাতে লাগল।

বড় বড় গাছগুলো তখনও ঝড়ের বেগে মাথা নাড়ছে। বৃষ্টি কমে এসেছে। আকাশে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারদিকে তাই নানারকম শব্দ আর বিদ্যুতের ঝলক। এসবের মধ্যে দিয়ে গাছ ঝোপঝাড় লতাপাতার মধ্যে দিয়ে ভাইকিংরা আর বিদ্রোহীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটল।

হঠাৎ বনজঙ্গল শেষ। সামনেই পাথুরে প্রান্তর। হ্যারি চিৎকার করে বলল—থামো। ভাইকিংরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখে দেখে বিদ্রোহীরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি বুঝেছিল সিনার্কার সৈন্যরা জাতযোদ্ধা। বিদ্রোহীরা সুদক্ষ যোদ্ধা নয়। গুহার অপরিসর জায়গায় তরোয়ালের লড়াই লড়ে বিদ্রোহীরা সিনার্কার সৈন্যদের হারাতে পারবে না। কাজেই এই অবস্থায় পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিদ্যুতের আলোয় হ্যারি গালকাটা বিদ্রোহী সৈন্যটিকে খুঁজল। এই গালকাটা বিদ্রোহীটাই ওদের পথ দেখিয়ে এনেছিল। হ্যারি দেখল সেই বিদ্রোহী সৈন্যটির বাঁ হাতে তরোয়ালের কোপ পড়েছে। তখনও বৃষ্টিভেজা বাঁ হাতটা থেকে রক্ত পড়ছে। হ্যারি তাকে বলল—এখন আর ঐ গুহায় আস্তানায় ফিরে যাওয়া যাবে না। অন্য কোথাও আস্তানা নেওয়ার জায়গা আছে? গালে কাটা দাগ বিদ্রোহীটি বলল— এই পাথুরে প্রান্তরের শেষে একটা গ্রাম মত আছে। আপাতত ওখানেই কোন বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। এভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কী হবে।

—ঠিক—হ্যারি বলল—তাহ'লে ঐ গ্রামেই চলুন।

পাথুরে প্রান্তরটা পেরোতে পেরোতেই ভোর হয়ে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে তখন। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

গ্রামের মানুষেরা তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। মেঘ-ভাঙা রোদ পড়ল গ্রামটির পাথর-মাটির বাড়িগুলোয়। দাঁড়িয়ে পড়ল সেই গালকাটা বিদ্রোহীটি। কাঠের দরজায় কয়েকবার থেমে থেমে টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক দরজা খুলে দাঁড়াল। তার গায়ে রোক্কার মতই রঙীন জোব্বামত। গালকাটা বিদ্রোহীটিকে দেখে আর অন্য বিদ্রোহী আর ভাইকিংদের দেখে লোকটি খুবই বিব্রত হল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। গালকাটা বিদ্রোহীটি বলল—আপনার কোন ভয় নেই। শুধু দুপুর পর্যন্ত আপনার বাড়িতে আমরা থাকবো। জামা কাপড় শুকিয়ে নিয়ে কিছু খাওয়াদাওয়া করে আমরা চলে যাবো। এতে আপনার কোন

বিপদ হবে না।

—বেশ—আসুন। লোকটি সরে দাঁড়াল। সবাই বাড়িটার প্রশস্ত-উঠোনে এল। ডানদিকে একটা বেশ বড় লম্বাটে ঘর। ঘরে ঢুকে দেখা গেল একপাশে—ডাঁইকরা শস্যদানা। অন্যপাশটা ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গায় সবাই বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। সবাই ভীষণ ক্লান্ত তখন। আহত কয়েকজনের কষ্টই বেশি হচ্ছিল।

কিছু পরে চারপাঁচজন লোক খাবার নিয়ে ঢুকল। গোল রুটি আর নানা আনাজপত্রের তরকারিমত। সবাই খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল সকলের। অনেকেই আরো রুটি চেয়ে নিল।

সকাল থেকেই মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠল। বেশ চড়া রোদ। সকলে বাইরের প্রান্তরে এসে দাঁড়াল। যতটা সম্ভব পোশাক শুকিয়ে নিল।

দুপুরে পাখির মাংসের ঝোল লম্বাটে রুটি খেল সকলে। একটু বেলা হতেই সেই গালকাটা বিদ্রোহীর নির্দেশে সবাই সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যেতেই ওরা দেখল বার্গ পাহাড়ের দিক থেকে কে ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

কাছে এল সবাই দেখল ওদেরই বিদ্রোহী বন্ধু একজন। ঘোড়া থামিয়ে বন্ধুটি সেই গাল-কাটা বিদ্রোহীটির কাছে এল। বলল—আমি রোক্কার নির্দেশ তোমাদের জানাতে এসেছি। রোক্কা বলেছে তোমরা বার্গের গুহাতেই ফিরে গিয়ে আস্তানা করো। তবে এখন থেকে খুব সাবধানে সর্বক্ষণ নজরদারি চালাতে হবে যেন সিনার্কার সৈন্যদের সঙ্গে ভালো লড়াই চালানো যায়।

অগত্যা রোক্কার নির্দেশ মেনে সবাই ফিরে চলল বার্গ পাহাড়ের আস্তানার দিকে।

বেলা বাড়তে লাগল। কামারেত হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইঙ্গিতে ওষুধটা মারিয়াকে দিতে হবে জানাল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে মারিয়ার মাথার পেছনে হাত দিল। বলল, মারিয়া ওষুধটা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস মাথাটা তুলে ধরল। কামারেত মারিয়াকে একটু জল খাওয়াল। তারপর শুকনো পাতায় মোড়া দু'টো কালো রঙের বড়ি বের করল। মারিয়াকে খাইয়ে দিল। তারপর আবার জল খাওয়াল। মারিয়া পাত্রের সবটা জলই খেয়ে ফেলল। বোঝা গেল ওর যথেষ্ট জল তেষ্টা পেয়েছিল।

তখনই রোক্কা ঘরে ঢুকল। বলল, ফ্রান্সিস, আপনি ও রাজকুমারী এ বাড়িতেই থাকবেন। বেলা হলো। আপনি খেতে চলুন। ফ্রান্সিস আস্তে বলল, মারিয়া তো না খেয়ে আছে। ওকে আগে কিছু খেতে দিন। রোক্কা কামারেতকে বলল সে কথা। কামারেত কী বলে চলে গেল। রোক্কা বলল, রাজকুমারীকে এখন শক্ত খাবার খেতে দেওয়া হবে না। স্যুপ, ফলের রস এসব এই কামারেতই খেতে দেবে।

তাহলে মারিয়ার খাওয়া হোক। তারপর আমি খাবো। ফ্রান্সিস বলল। তখনই কামারেত দুটো বড় চিনেমাটির বাটি নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকল। হেসে রোক্কাকে কী বলল। রোক্কা খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল। হাসতে হাসতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে

বলল, সারিনে আমার বিদ্রোহী বন্ধুদের কাছে যুদ্ধে হেরে গেছে সিনার্কা। সিনার্কা পরাজিত সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসছে। কথাটা বলে রোক্কা ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

ফ্রান্সিসের তখন এসব ভাববার মতো মনের অবস্থা নেই। ও মারিয়াকে তখন ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বসাল। পিঠে ঘাড়ে হাত দিয়ে ধরে থাকল। ফ্রান্সিস বলল, মারিয়া, একটু খেয়ে নাও। মারিয়া বন্ধ চোখ খুলে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার চোখের সেই লালচে ভাবটা নেই। গায়ের গরম ভাবটা অনেক কম। কামারেত আস্তে আস্তে মারিয়াকে স্যুপ আর ফলের রস খাইয়ে দিল। মারিয়াকে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল। মারিয়া চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল।

তখনই রাস্তায় শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। লোকজনের কথাবার্তা। ফ্রান্সিস দরজার কাছে গেল। রোক্কার পেছনে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। একটা ছাদখোলা ঘোড়ায় টানা গাড়ি আসছে। গাড়িটা কালো রঙের। তাতে রুপোলি লতাপাতা ফুলের কাজ করা। গাড়িতে বসে আছে একজন প্রৌঢ়। মাথার কাঁচাপাকা চুল এলোমেলো। কপালে নেমে এসেছে। গায়ে বেশ দামী কাপড়ের হলুদ রঙা জোব্বামতো। বেশ ধুলো কাদা লেগে আছে পোশাকে। গম্ভীর থমথমে মুখে বসে আছে পোশাকে। রোক্কা ফিসফিস করে বলল, এখানকার সামন্তরাজা সিনার্কা। আস্তে আস্তে গাড়িটা চলে গেল। পেছনে পাঁচ ছ'টা ঘোড়ায় চড়া জেনো সৈন্য। কাপট-পরা। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মুখ-চোখ সৈন্যদের। তাদের পেছনে পদাতিক সৈন্যরা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা সব। পোশাক ছেঁড়া। ধুলো-কাদা মাখা। আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে গেল ওরা। ফ্রান্সিস দরজার কাছ থেকে সরে এল।

বিকেল নাগাদ মারিয়ার শরীরের অবস্থা অনেকটা ভালো হলো। কামারেত এসে মারিয়াকে ওযুধ খাওয়াল। মারিয়া ওযুধ খাওয়ার সময় চোখ খুলে উঠে বসে ওযুধ খেল। কামারেত মারিয়ার কপালে গলায় হাত বুলিয়ে হেসে ফ্রান্সিসকে বলল, এখন উনি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ফ্রান্সিস কথাটা বুঝল না। লো ল্যাতিন ভাষা। তবে কামারেতকে হাসতে দেখে বুঝল মারিয়া ভালো আছে। কামারেত চলে গেল। রোক্কা তখনও ফিরে আসেনি।

সন্ধ্যের সময় বৈদ্যমশাই এলেন। সঙ্গে রোক্কা আর সেই কামারেত। বৈদ্যমশাই মারিয়াকে পরীক্ষা করে রোক্কার দিকে হেসে তাকালেন। বললেন, এত তাড়াতাড়ি উনি বিপদ কাটিয়ে উঠবেন ভাবিনি। যা হোক—আর কোনো ভয় নেই। খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম। দু'তিন দিনের মধ্যেই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। রোক্কা হেসে কথাগুলো ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস আনন্দে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দ্রুত এগিয়ে এসে বৈদ্যমশাইয়ের ডানহাতটা নিজের দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে মাথা নোয়াল। অনেক কষ্টে চোখের জল আটকাল। তারপর মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখল মারিয়া খুশি চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

বৈদ্যমশাই মৃদুস্বরে কামারেতকে কী নির্দেশ দিলেন। তারপর চলে গেলেন।

কামারেতও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ফ্রান্সিস এবার রোক্কাকে বলল, কিন্তু আমার বন্ধুরা কি জানে আমরা এখানে আছি?

—সব খবর তাদের দেওয়া হয়েছে। শুধু আপনাদের রাজকুমারী অনেকটা সুস্থ হয়েছেন এই খবরটাও এখনও দেওয়া হয়নি। এই খবরটা আমি দিতে যাবো। আপনারা বিদেশী। সবাইয়ের এখানে আসাটা সিনার্কার সৈন্যদের নজরে পড়লে বিপদ হবে। সারিনের যুদ্ধে হেরে ওরা রেগে আগুন হয়ে আছে। রোক্কা বলল।

তাহলে এক কাজ করুন—শুধু হ্যারি নামের আমার বন্ধুটিকে আপনি আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসুন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। রোক্কা বলল। তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যে হলো। কামারেত একটি রুপোর মোমবাতিদানে বসানো মোটা হলুদ রঙের জ্বলন্ত মোমবাতি ঘরে রেখে গেল। ফ্রান্সিস তখনও মারিয়ার বিছানার পাশে বসে মারিয়ার ডান হাতটা ধরে আছে। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। বেশ স্বাভাবিকভাবেই মারিয়া দু'একটা কথা বলছে তখন।

একটু রাত হলে হ্যারিকে নিয়ে রোক্কা ঘরে ঢুকল। রোক্কাকে একা দেখে ফ্রান্সিস বলে উঠল—হ্যারিকে পেলেন না?

রোক্কা বলল—সে অনেক কথা। গত রাতেই সিনার্কার সৈন্যরা আমাদের বার্গ পাহাড়ের আস্তানার খবর পেয়েছিল। হয়তো সিনার্কার গুপ্তচরেরাই সন্ধান দিয়েছিল। সিনার্কার সৈন্যরা প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করেছিল। লড়াই হয়েছিল। তবে আমাদের বিদ্রোহীরা বুদ্ধিমানের মত অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গুহার অন্য মুখটা দিয়ে পালাতে পেরেছিল। হ্যারি আর আপনার ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা উত্তর দিকে পালিয়েছে। তবে বার্গ পাহাড় এলাকায় আমার দুই বন্ধুকে রেখে এসেছি। বলে এসেছি ভাইকিংদের মধ্যে হ্যারিকে দেখলে যেন তাকে সঙ্গে নিয়ে এখানেই আসে।

—লড়াই যখন হয়েছে তখন হত আহত হয়েছে কিছু, ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—তা হয়েছে। সিনার্কার সৈন্যরাও আমাদের বিদ্রোহী যোদ্ধারাও। তবে ভাইকিংরা কেউ হত আহত হয়েছে কিনা সে খবর পাইনি। রোক্কা বলল। তারপর বলল—আমার আর এক বন্ধুকে পাঠিয়েছি পলাতক বিদ্রোহীদের কাছে যেতে। আমি বলে দিয়েছি—সবাই আবার বার্গপাহাড়ের গুহার ঘাঁটিতে ফিরে আসতে। পাহারা জোরদার করতে বলেছি। যেন আবার আক্রান্ত হবার আগে যেন সবাই তৈরি থাকতে পারে। মনে হয় আমার নির্দেশ পেলে আজকে সন্ধ্যের আগে ওরা বার্গের ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারবে। রোক্কা বলল।

পরের দিন রাতে রোক্কা হ্যারিকে নিয়ে মারিয়ার ঘরে ঢুকল। হ্যারি ঘরে ঢুকে দেখল মারিয়া দুর্বলস্বরে ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলছে। হ্যারি এত খুশি হলো যে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে হ্যারির পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, হ্যারি, মারিয়ার বিপদ কেটে গেছে।

হ্যারি আনন্দে কোনো কথা বলতে পারল না।

হ্যারি আর রোক্কা মারিয়ার বিছানার পাশে বসল। রোক্কা বলল, রাজকুমারী এখন কেমন আছেন? মারিয়া অল্প হেসে বলল, অনেকটা ভালো।

—ভালো হতেই হবে। সারা কর্সিকায় এই বৈদ্যমশাইয়ের যে কী সুনাম আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। রোক্কা বলল। মারিয়া একটু হেসে বলল, এই কর্সিকা দ্বীপকে পুরনো দিনের নাবিকরা বলত 'সুগন্ধির দ্বীপ'। তাই না? রোক্কা বেশ আশ্চর্য হলো। বলল, কত দূরে আপনাদের দেশ অথচ এই ছোট্ট দ্বীপটার কথাও আপনি জানেন দেখছি। আপনি সত্যিই বিদুষী। মারিয়া হেসে বলল, না-না—তেমন কি আর। আমাদের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু প্রাচীন হাতে লেখা গ্রন্থ আছে। সে সব পড়েই জেনেছি। একটু থেমে মারিয়া বলল, তবে কর্সিকার অতীত ইতিহাসে দেখা গেছে বিভিন্ন শক্তিমান জাতি শত্রু হিসেবে এই কর্সিকাকে আক্রমণ করেছে। কেউ বন্ধু হিসেবে আসেনি।

ঠিক বলেছেন—রোক্কা মাথা ওঠানামা করে বলল। তারপর বলল, কর্সিকাবাসীদের জীবনে তাই বোধহয় বন্ধুত্ব ভালোবাসার স্থানটা কম। আমাদের জীবনে মৃত্যুটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভেনদেত্তা কথাটা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন।

হ্যাঁ—খুনোখুনির বদলা নেওয়া। মারিয়া বলল।

ঠিক। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বংশের সবাইকে হত্যা করা এখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে পেশাদার কাঁদুনেরা আছে। তাদের ভাড়া করে আনা হয়। মৃতের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে কাঁদে। কান পাতলে অনেক বাড়ি থেকে এই কান্নার শব্দ শুনতে পাবেন। আমাদের গানও তাই বোধহয় বড় বিষাদের। বড় বেদনার। সেখানে আনন্দের স্থান নেই।

সকলেই চুপ করে রইল। রোক্কার কণ্ঠস্বরে যে বেদনার সুর ছিল তা ফ্রান্সিসদের মন স্পর্শ করল। ওরা আর কথা বলতে পারল না। রোক্কা একটু পরে বলল, একজন রানীর কাহিনী আপনাদের বলি। তাঁর নাম ইসাবেলা। প্রায় একশো বছর আগের কথা। এই দক্ষিণ কর্সিকার রাজা ছিলেন তখন দ্বিতীয় জেমস। এখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের জন্যে মূল ভূখণ্ডের জেনোয়া ও পিসার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল অনেক কাল ধরে। দ্বিতীয় জেমস এই দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্যে জেনোয়াবাসী ও পিসাবাসীদের এখানকার অনেক অংশ দিয়ে দিয়েছিলেন। সিনার্কারা ছিল জেনো মানে জেনোয়ার অধিবাসী। আজকের সিনার্কাদের পূর্বপুরুষরা তখন এখানে ঘাঁটি গাড়ে। রাজা দ্বিতীয় জেমসের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়দের এক পারিবারিক বিবাদে সিনার্কারা রাজার শত্রু আত্মীয়দের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল। রাজা দ্বিতীয় জেমসের রানী ইসাবেলা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন শুধু রাজার আর তাঁর জীবন নয়, তাঁদের একমাত্র কন্যারও জীবন বিপন্ন। তাছাড়া পুরুষানুক্রমে রাজা জেমস এবং রানী ইসাবেলার ছিল অতি মূল্যবান রত্নালংকার। কেউ জানে না কতগুলো অলংকার। তবে লোক-প্রচলিত কাহিনী বলে তার সংখ্যা নাকি অনেক। সিনার্কাদের ভীষণ লোভ ছিল সেই রত্নভাণ্ডারের দিকে। সেই রত্নলংকার গুলো নাকি রাখা

ছিল দামি ওক কাঠের একটা পেটিকার মধ্যে। রোক্কা থামল।

তারপর? মারিয়া বলল। রোক্কা বলতে লাগল, রানী ইসাবেলা একদিন বোনিফেসিওর ঐ দুর্গে যার নিচের কয়েদঘরে আমরা বন্দী ছিলাম—সেই দুর্গে গেলেন। ওপরের দিকের দুটি কক্ষ দেখলেন এবং সেইদিন থেকেই তাঁর নির্দেশে ঐ দুইটির একটি কক্ষে খাদ্য, আনাজপত্র এবং দীর্ঘদিনেও নষ্ট হয় না এমন ম্যাকুয়েস-দানা, সেজ আলু, জলপাই প্রচুর রাখা হলো। সেইসঙ্গে জলের বেশ বড় কয়েকটি পিপে। খুবই গোপনে বিশ্বস্ত কিছু প্রাসাদরক্ষীরা করল এসব। তারপর একদিন গভীর রাতে রানী তাঁর ঘুমন্ত কন্যাকে নিয়ে দুর্গের সেই কক্ষ দুইটির একটিতে আশ্রয় নিলেন। কথা ছিল রাজা জেমসও রাজকোষের স্বর্ণমুদ্রা একত্র করে নিয়ে পালিয়ে সেই কক্ষে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু শেষ রাতে সিনার্কারা অর্থ দিয়ে প্রাসাদরক্ষীদের বশীভূত করে জেনো সৈন্যদের নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করল। রাজা জেমস বন্দী হলেন। হয়তো তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেন। হয়তো তাঁকে জেনোয়ায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হতো। কিন্তু ঐ যে বললাম, ভেনদেত্তা—রাজা জেমস-এর আত্মীয়রা রাজাকে হত্যা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল। রোক্কা থামল।

আর রানী ইসাবেলা ও রাজকুমারী? ফ্রান্সিস বলল।

রানী ইসাবেলা রাজা জেমসের মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দুর্গরক্ষীদের আদেশ দিলেন ঐ ঘর দুটি থেকে নামার সিঁড়িটা ভেঙে ফেলতে। রক্ষীরা অবাক হয়ে গেল। ওরা বুঝল না—রানী ইচ্ছে করে কেন এভাবে নিজেকে ও রাজকুমারীকে নিয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন নিচ্ছেন। রানী ক্রুদ্ধ হলেন। আবার জোরের সঙ্গে আদেশ দিলেন। অগত্যা দুর্গরক্ষীরা লোহার বড় বড় শাবল সংগ্রহ করে সিঁড়ির পাথরগুলোর খাঁজে খাঁজে চাড় দিয়ে সিঁড়িটা সম্পূর্ণ ভেঙে দিল। রানীও সিঁড়িতে নামার কাঠের দরজাটা চিরদিনের জন্যে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। দেখলে মনে হবে দুটি ঘরই যেন শূন্যে ঝুলছে। আপনারা পালাচ্ছিলেন, কাজেই ঘর দুটো লক্ষ্য করেননি। রোক্কা থামল।

আর সেইসব রত্নালংকারগুলো? ফ্রান্সিস বলল।

ঐ দুটো ঘরের কোথাও আছে হয়তো। রোক্কা বলল।

হয়তো বলছেন কেন? হ্যারি বলল।

একটা ঘরের একটিমাত্র গরাদ দেওয়া জানালা আছে। পশ্চিমদিকে খাড়া দুর্গের দেওয়ালের গায়ে। এত উঁচুতে যে মাটি থেকে ওখানে ওঠা অসম্ভব! কাজেই ঐ ঘর দুটোয় যাওয়া এবং খোঁজ করার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, দুর্গের ওপরটা যতটা দেখেছি তাতে বলতে পারি ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে বোধহয় ঐ জানালাটায় পৌঁছানো যায়। রোক্কা বলল, হ্যাঁ আমি শুনেছি পরে নাকি সিনার্কার নির্দেশে দু'জন দু'বার ওপর থেকে দড়ি বেয়ে নেমে জানালার লোহার গরাদ ভেঙে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দু'জনই জানালায় গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রানী ইসাবেলা ছোরা মেরে দু'জনকেই ফেলে দিয়েছে নিচের পাথরের চত্বরে। দু'জনেই শেষ।

তারপরেও কি ওভাবে চেষ্টা করা হয়নি? ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ হয়েছে—অনেক বছর পরে। সেই লোকটা জানালার কাছে এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। তখনই জানালার ওপর থেকে বড় পাথরের টুকরো খসে পড়েছিল ওর মাথায়। লোকটা তীর খাওয়া পাখির মতো খসে পড়েছিল জানালা থেকে নিচের পাথরের চত্বরে। তারপরেও হয়তো লুকিয়ে-টুকিয়ে কেউ কেউ চেষ্টা করে থাকবে। হাজার হোক অত মূল্যবান রত্নভাণ্ডার। কিন্তু কেউ গরাদ ভেঙে ঢুকতে পারেনি। গরাদসহ জানালাটা এখনও অটুট আছে। রোক্কা থামল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোনো কথা বলল না। তিন জনেই সমস্ত ঘটনাটা ভাবছে তখন। একসময় ফ্রান্সিস বলল, দুর্গটা, জানালাটা ভালো করে দেখতে হবে। কিন্তু দেখতে গেলে তো আবার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। আমরা তো বিদেশী।

পারবেন ঐ ঘর দুটোয় ঢুকতে? রোক্কা হেসে বলল।

সব দেখেটেখে ভেবে নিয়ে বলতে পারব। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে সিনার্কাকে একবার বলে দেখতে পারেন। সিনার্কা যা অর্থপিশাচ আর লোভী ও আপনাকে ঠিক খোঁজ খবরের অনুমতি দেবে। রোক্কা বলল।

হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস? চেষ্টা করবে নাকি? ফ্রান্সিস হেসে একবার মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল, হ্যারি, অনেক অভিযানেই বেরিয়েছি বাবার অনুমতি তো নয়ই—মার অনুমতিও নিইনি। আজ কিন্তু আমি হার স্বীকার করছি। মারিয়ার অনুমতি পেলে তবেই রত্নভাণ্ডারের উদ্ধারে যাব।

মারিয়া হেসে বলল, আমি জানি আমি মানা করলে তুমি মনে কী ভীষণ কষ্ট পাবে। তুমি চেষ্টা কর—আমাকে তো দু'তিন দিন বিশ্রাম নিতেই হবে। ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল—সত্যি মারিয়া, তুমি আমার মনোভাবটা খুব সহজেই বুঝতে পারো।

রোক্কা বলল, ফ্রান্সিস, আপনি চেষ্টা করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লোকে ঐ ঘর দুটোকে বলে ভূতের ঘর। অনেক অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও সিনার্কারা কাউকে ওই জানালার কাছেও পাঠাতে পারেনি। অনেকে রাতের বেলা ঐ জানালায় মোমের অস্পষ্ট আলো দেখেছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল, ওসব ভূতেটুতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমার ভয়টা একটু কমই। আসল কথা সব কিছুকেই আমি গভীরভাবে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ভাবি এবং সত্য উদ্‌ঘাটন করি। সব কথাই যাচাই করে নিতে হয়।

পরদিন সকালে মারিয়া অনেকটা সুস্থ হলো। ঘরে পায়চারি করল। ফ্রান্সিস তাই দেখে বলল, মারিয়া এবার তাহলে নিশ্চিন্তমনে সিনার্কার দরবারে যেতে পারি। মারিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখ আমি যেতে পারলাম না।"

তাতে কি! কাজে লাগলে তুমি থাকবে তখন। ফ্রান্সিস বলল।

তখন গভীর-রাত। কিছুটা সুস্থ মারিয়ার কাশি অনেক কমে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অনেক স্বাভাবিক এখন। গত কয়েকদিন ধরে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে ফ্রান্সিসের ভালো

করে ঘুমই হতো না। আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। মেঝেয় একটা মোটা কাপড় বিছিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘুমিয়ে আছে। কাঠের পাটাতনের বিছানায় মারিয়া ঘুমিয়ে আছে। মোটা মোমবাতিটা জ্বলছিল।

হঠাৎ বাড়িটার-চারদিকে কোলাহল শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও দ্রুত উঠে বসল। ছুটে গরাদ দেওয়া জানালাটার কাছে এল। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখল সিনার্কার সৈন্যরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। মশালের আলোয় দেখল—প্রত্যেকটি সৈন্যের হাতে খোলা তরোয়াল। ওরা চিৎকার হৈ হল্লা করছে।

হ্যারি আর মারিয়ারও তখন ঘুম ভেঙে গেছে। দুর্বল মারিয়া বিছানা থেকে নামল না। হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়াল। মারিয়া দুর্বলস্বরে বলল—কী হয়েছে ফ্রান্সিস?—সিনার্কার কিছু সৈন্য এই বাড়িটার কাছে জড়ো হয়েছে। কিন্তু ওরা কেন এসেছে জানিনা। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে আসতে আসতে বলল।

তখনই সৈন্যদের প্রচণ্ড ধাক্কায় সদর দরজাটা ভেঙে পড়ল। চিৎকার আরো বাড়ল। দড়াম করে ফ্রান্সিসদের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। কামেরাত এক লাফে ঘরে ঢুকে বলে উঠল — শিগগির পালিয়ে যান। ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন সৈন্য ঘরে ঢুকল। সামনের সৈন্যটি কামেরাতের মাথার ওপর তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ডান পা তুলে সৈন্যটার বুকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল। সৈন্যটা ছিট্‌কে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ল। ওর হাত থেকে তারোয়ালটা ছিট্‌কে গেল। পেছনের সৈন্যটি তরোয়াল হাতে কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। ওরা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি ওরা এভাবে আক্রান্ত হতে পারে। ছিটকে-পড়া তরোয়ালটা ফ্রান্সিস দ্রুত তুলে নিল। রুখে দাঁড়াল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসের ঐ ইস্পাত কঠিন ভঙ্গীতে দাঁড়ানো দেখে মারিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের এই চেহারা তো ও কখনও দেখেনি। হ্যারি কিন্তু আশ্চর্য হল না। ফ্রান্সিসের এই ক্রুদ্ধমূর্তি ও আগেও দেখেছে। সৈন্য দু'জন তখন হতবাক দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি বলল—তোমাদের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম ফ্রান্সিস। ওর হাতে তরোয়াল থাকলে কেউ ওর গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না। কাজেই লড়াইয়ে যেয়ো না। হ্যারির লো ল্যাতিন ভাষা ওরা বুঝল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কামেরাতও অবাক তখন।

বেশ ভীতস্বরে মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস শান্ত হও। মারিয়ার গলার স্বর কানে যেতেই ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উদ্যত তরোয়াল নামাল। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল ফ্রান্সিস। এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল—মারিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। এই অবস্থায় লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া বোকামি। আস্তে আস্তে হ্যারিকে বলল—কামেরাতকে জিজ্ঞেস করো তো—রোক্কা কোথায়? হ্যারি কামেরাত ফিসফিস করে বলল সে কথা। কামেরাতও ফিস্‌ফিস করে বলল—উদতবের ঘরে আত্মগোপন করে ছিলেন। এতক্ষণে বোধহয় ধরা পড়েছেন। ফ্রান্সিসকে হ্যারি বলল সে কথা। ফ্রান্সিস হাতের তরোয়ালটা মেঝেয় ফেলে দিল। ঝনাৎ শব্দ হল। মারিয়া দুর্বল শরীরে বিছানায় বসে থাকতে

পারল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

ততক্ষণে আরো কয়েকজন সৈন্য দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস সৈন্যদের দেখে বলল—হ্যারি, কামেরাতকে বলো—লড়াই নয়—আত্মসমর্পন। তাদের থেকে দু'জন ছুটে এসে ফ্রান্সিস হ্যারি আর কামেরাতকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। ওরা কেউ বাধা দিল না। সৈন্যরা মারিয়াকে বন্দী করবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারি মারিয়াকে দেখিয়ে বলে উঠল—উনি মারিয়া আমাদের দেশের রাজকুমারী। রাজকুমারী অসুস্থ। তাঁকে বন্দী করলে ফল ভালো হবে না। একজন সৈন্য এগিয়ে এসে হ্যারিকে বলল—তোমাদের রাজকুমারীকে এখন ছেড়ে দেওয়া হল। ও তো অসুস্থ। পালাতে পারবে না। মাননীয় সিনার্কার হুকুম হলে পরে বন্দী করা যাবে। তোমরা চলো।

—কোথায়? হ্যারি বলল।

—গেলেই দেখতে পাবে। একজন সৈন্য বলে উঠল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। ওদের কথামতই এখন চলতে হবে।

ফ্রান্সিস দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—মারিয়া—এখানেই থেকো। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হও নি, ভয় নেই—আমরা ঠিক অক্ষত শরীরে ফিরে আসবো।।

ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে হ্যারি আর কামেরাত চলল। পেছনে তরোয়াল হাতে সৈন্যরা। ফ্রান্সিসরা চলে যেতে মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এক নিজের শরীরের এই অবস্থা তার ওপর ফ্রান্সিসরাও বন্দী হল। নিজেকে মারিয়ার বড় অসহায় মনে হতে লাগল। কান্নার ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

ফ্রান্সিসদের নিয়ে সৈন্যরা বাড়িটার বাইরে এল। দেখা গেল খোলা তরোয়াল হাতে একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে এবং সৈন্যদলের মধ্যে পেছনে হাত-বাঁধা অবস্থায় রোক্কা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রোক্কার গায়ের পোশাক এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে। সেখানে গায়ের ক্ষত দেখা যাচ্ছে। কপালে গলায়—কানের পাশে তরোয়ালের ক্ষতগুলো থেকে রক্ত পড়ছে। রোক্কা তখনও ভেবে পাচ্ছে না সিনার্কার সৈন্যরা কীভাবে খবর পেল যে ও এই বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। ফ্রান্সিস দেখে নিশ্চিন্ত হল যে বৈদ্যমশাইকে বন্দী করা হয় নি। মারিয়ার চিকিৎসার কোন ব্যাঘাত হবে না। ফ্রান্সিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ফ্রান্সিসদের রোক্কার সঙ্গে দাঁড় করানো হল। চারদিক থেকে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। তাঁদেরই দলপতি বোধহয়—তরোয়াল উঁচিয়ে হাঁটতে নির্দেশ দিল। ফ্রান্সিসদের মাঝখানে রেখে সৈন্যরা হাঁটতে শুরু করল। ফ্রান্সিসরা চলল সদর রাস্তা দিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস বলল—রোক্কা—আপনি বেশ আহত। বৈদ্যমশাইকে বলে ওষুধ লাগালে পারতেন।

রোক্কা ম্লান হেসে বলল—বৈদ্যমশাই দূরের গ্রামে রোগী দেখতে গেছেন। এখানে থাকলেও সিনার্কার সৈন্যরা ওষুধ লাগাতে দিতো না। সিনার্কা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির হুকুম দেবে। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দৃঢ়স্বরে বলল—আমি বেঁচে থাকতে নয়। রোক্কা একটু আশ্চর্য হল। ফ্রান্সিস ওর স্বজন নয় স্বদেশবাসীও নয়। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একবার তাকাল। মৃদুস্বরে বলল—কিন্তু আপনি আমাকে বাঁচাবেন কেন? এবার ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বলল—কারণ আপনি মারিয়াকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। নইলে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে মারিয়াকে আমরা বাঁচাতে পারতাম না। আমি অকৃতজ্ঞ হতে শিখি নি। রোক্কা প্রশংসার চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিসরা চলল। সদর রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর নিস্তব্ধ। জনশূন্য পথে শুধু সৈন্যদের পায়ের শব্দ।

রোক্কা হঠাৎ বলে উঠল—এইবার বুঝেছি। ফ্রান্সিস রোক্কার দিকে তাকাল। রোক্কা বলল—মনে আছে আপনার—সেই দরজা একটু ফাঁক করে পরাজিত সিনার্কা আর সৈন্যদের ফিরে আসা দেখছিলাম।

—হ্যাঁ। কিন্তু দরজার অতটুকু ফাঁক দিয়ে—।

রোক্কা মাথা নেড়ে বলল—না—খুশিতে মাথার ঠিক ছিল না। হঠাৎই দরজাটা একটু বেশি ফাঁক করে ফেলেছিলাম। তখনই নিশ্চয়ই সিনার্কার সৈন্যদের কেউ আমার মুখ দেখে ফেলেছিল। আমি তখন বুঝতে পারিনি। নিজের বোকামির জন্যে আবার ধরা পড়লাম।

আপনার বিদ্রোহী বন্ধুরা কি এই সংবাদ পেয়েছে? হ্যারি বলল।

রোক্কা মাথা নেড়ে বলল—না—। একমাত্র কামেরাতকে দিয়ে এই খবর পাঠাতে পারতাম। কিন্তু সেও তো বন্দী।

—তবে এই খবর কি গোপন থাকবে—নিশ্চয়ই কালকে আপনার বন্ধুরা খবর পেয়ে যাবে। হ্যারি বলল।

রোক্কা মাথা নেড়ে বলল—উঁহু—সির্নাকা অত্যন্ত ধূর্ত—ও আমার বন্দী হওয়ার খবর কিছুতেই ফাঁস হতে দেবে না। গোপনে আমাকে মেরে ফেলবে। কথাটা শুনে ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হল। বুঝল—বিদ্রোহীদের কাছে একটা যুদ্ধে হেরে গিয়ে সিনার্কা এখন আহত বাঘের মতো ক্ষেপে আছে। অনেক ভেবে চিন্তে এগোতে হবে। কোনরকমে একটা সুযোগ পেলেই রোক্কার পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সৈন্যদের পাহারায় ফ্রান্সিসরা যখন সেই দুর্গের সামনে এসে পৌঁছল তখন পূব আকাশে লালচে ছোপ লেগেছে। দুর্গের কাছাকাছি গাছে গাছে পাখির ডাক শুরু হয়েছে।

দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথের সামনেই দেখা গেল সেই দাড়িগোঁফওয়ালা শক্তসমর্থ চেহারার দলপতি দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ পায়ের হাঁটুতে মোটা কাপড়ের পট্টি বাঁধা। শাঙ্কোর তীরের ক্ষত এখনও শুকোয় নি।

দলপতি বেশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা সব দরজার কাছে সার বেঁধে দাঁড়াও। ফ্রান্সিসদের চারপাশ থেকে সৈন্যরা দ্রুত চলে গিয়ে দুর্গের ফটকের সামনে সার বেঁধে দাঁড়াল। দুর্গরক্ষীরাও স্থির হয়ে দাঁড়াল। দলপতি বলতে লাগল—মাননীয় সিনার্কার হুকুম—বিদ্রোহী

নেতাকে যে বন্দী করা হয়েছে—এই সংবাদ একেবারে গোপন রাখতে হবে। কোন সাধারণ প্রজার কানে যেন এই সংবাদ না যায়। বুঝেছো? সৈন্যরা হাতের তরোয়াল আর বর্শা উঁচু করে ধরল।—নামাও। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল। সৈন্যরা তরোয়াল বর্শা নামাল।

কয়েকজন সৈন্য দ্রুত এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। ঘর ঘর শব্দে ফটকের বিরাট কাঠের দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। দলপতি ফ্রান্সিসদের দুর্গে ঢোকাতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা দরজার দিকে চলল।

পাথুরে চত্বর পার হবার সময় হ্যারি ফ্রান্সিসকে সিনার্কার হুকুমের কথা বলল। তারপর বলল—দলপতিকে বলবো আহত রোক্কার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

—পাগল হয়েছো—রোক্কার প্রতি সহানুভূতি চাইলে আমাদের বিপদ বেড়ে যাবে। কোন কথা বলো না। দেখা যাক কী হয়। ফ্রান্সিস বলল।

সেই কয়েদঘরের লোহার দরজা ঘটাং-ঘং শব্দে খোলা হল। ফ্রান্সিরা কয়েদঘরে ঢুকল। দেয়ালের আটকানো মশালের আলোয় দেখল তিনজন বন্দী ঘাসের দড়ি বাঁধা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। দরজা খোলার শব্দে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। একজন উঠে বসল। রোক্কাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে চম্‌কে উঠল। ছুটে এল রোক্কার কাছে। বলল—রোক্কা—আপনি বন্দী হলেন—আমরা কি হেরে গেছি?

রোক্কা বলল—না—না। আমি আমার বোকামির জন্যে ধরা পড়েছি। খুব পরিশ্রান্ত আমি। পরে কথা হবে। রোক্কা আর কোন কথা না বলে সেই ঘাসের বিছানায় বসে দড়ি বাঁধা দুহাত মাথার দিকে তুলে শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারিও বিছানায় বসল। ফ্রান্সিসও কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। কামেরাতও বসল। বন্দী দু'জন কামেরাতের পাশে বসল। ওরা নিম্নস্বরে কথা বলতে লাগল। হ্যারি চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখন নানা চিন্তা। ওদিকে মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি। বন্ধুরাও জানে না ওদের বন্দীদশার কথা। যে রোক্কার জন্যে মারিয়াকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল সেই রোক্কার নিজের জীবন আজ বিপন্ন। ফ্রান্সিসের ভাবনার শেষ নেই যেন।

তখনও ফ্রান্সিসদের কিছু খাওয়া জোটে নি।

হঠাৎই দুর্গের পাহারাদারদের মধ্যে ডাকাডাকি কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল।

একটু পরেই ঠাঠাং—ঠং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল সিনার্কা। হ্যারি আস্তে বলল—ফ্রান্সিস—সিনার্কা এসেছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল—এখন নানা রঙের ফুলপাতা তোলা গাঢ় নীল একটা ঢোলাহাতা দামি কাপড়ের পোশাক সিনার্কা পরে আছে। মাথার কাঁচাপাকা চুল পরিপাটি আঁচড়ানো। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

গম্ভীরগলায় সিনার্কা ডাকল—রোক্কা। রোক্কা চোখ খুলল। কিন্তু শুয়েই রইল। উঠে বসল না। সিনার্কা পেছনে দাঁড়ানো দলপতির দিকে তাকাল। দলপতি সঙ্গে সঙ্গে কোমরবন্ধ থেকে তরোয়াল টেনে খুলল। দু পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে রোক্কার হাতের কনুইয়ের ওপর তরোয়ালের খোঁচা মারল। কেটে গেল জায়গাটা।

রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে রোক্কা উঠে বসল। কাটা জায়গাটা হাত চেপে সিনার্কার দিকে তাকাল। সিনার্কা কেঠো হাসি হেসে বলল—এই যে বিদ্রোহী নেতা—কী ভাবে মরতে চাও বলো—ফাঁসিকাঠে না তরোয়ালের কোপে না জীবন্ত কবরে ঢুকে।

রোক্কা আস্তে আস্তে বলল—আমার কাছে সব মৃত্যুই সমান। তাছাড়া—মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য মৃত্যু তো আনন্দের গৌরবের।

—এসব বড় বড় কথা শুনিয়েই বুঝি দল বাড়িয়েছো। সিনার্কার বলল।

—দল বাড়াতে হয় নি। আপনার প্রজারা আপনার অপশাসনের জন্যে মনে মনে গর্জাচ্ছিল। তবে বিচ্ছিন্নভাবে। আমি শুধু ওদের একত্র করেছি। অর্দ্ধেক কাজ আপনিই করে রেখেছিলেন। রোক্কা শান্তভাবে বলল।

—চোপ শয়তান—সিনার্কা যেন গর্জন করে উঠল।

রোক্কা আর কোন কথা বলল না। চোখ বুঁজে চুপ করে বসে রইল।

সিনার্কার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল একজন কাঁচাপাকা চুলদাড়িওয়ালা অমাত্য। তার গায়েও দামি কাপড়ের জোব্বা মত। নিশ্চয়ই সিনার্কার পরামর্শদাতা। লোকটি এবার একটু এগিয়ে ক্রুদ্ধ সিনার্কার কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বলল—এখন মাথা গরম করবেন না। তারপর বলল—রোক্কাকে বন্দী করা হয়েছে এই খবর আপনি বেশিদিন গোপন রাখতে পারবেন না। আজ রাতেই রোক্কাকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে নিকেশ করে দিন। কেউ খোঁজই পাবে না। কথাগুলো আস্তে বললেও হ্যারি কিছু কথা শুনতে পেল। বাকিটুকু আন্দাজে বুঝে নিয়ে নিজেদের দেশের ভাষায় ফ্রান্সিসকে এই কথাগুলো ফিস্‌ফিস্ করে বলে বুঝিয়ে দিল। সিনার্কা তখন মাথাটা একটু ওঠানামা করে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। বলল—তোমরা কারা? হ্যারি বলল—আপনার দলনেতা আমাদের সব কথা জানেন। সিনার্কা দলপতির দিকে তাকাল। দলপতি দুপা খুঁড়িয়ে এসে ফ্রান্সিসদের সম্পর্কে যা জানে মৃদুস্বরে বলল। সিনার্কা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল— হুঁ—তোমরা ভাইকিং—জলদস্যুর দল—জাহাজ লুঠ করো।

—মাননীয় সিনার্কা—হ্যারি বলল—আপনার দলপতিকে জিজ্ঞেস করুন। তিনিই সব বলতে পারবেন।

তখন দলনেতা জানাল যে ভাইকিংদের জাহাজ তল্লাশী করা হয়েছিল। লুঠের জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায় নি।

সিনার্কা বলল—ঐ বাড়িটায় রোক্কা আত্মগোপন করেছিল। তোমরা ওখানে কী করছিলে?

—আমাদের রাজকুমারী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যই—হ্যারি কথাটা শেষ করতে পারলো না। সিনার্কা বলে উঠল—বাজে কথা—তোমরা রোক্কার বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিলে। তোমাদেরও রেহাই নেই।

এবার হঠাৎ ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। মাথা অনেকটা নুইয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন বিদেশীর কাছে এই সম্মান পাওয়ায় সিনার্কা বেশ খুশিই

হল। হ্যারি অবশ্য একটু অবাকই হল। ওদের দেশের রাজাকেও ফ্রান্সিস এতক্ষণ মাথা নুইয়ে সম্মান জানায় না। ফ্রান্সিস এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলল—মহামান্য রাজা—সার্দিনিয়া দ্বীপেও লোকমুখে আপনার কত প্রশংসা শুনেছি। জ্ঞানী বিচক্ষণ আর প্রজাবৎসল রাজা হিসেবে আপনার গুণগান করে এখানকার আপনার প্রজারা। আমি শুনেছি সেসব। তখন থেকেই আপনাকে একবার দর্শন করবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ছিল। আজ আপনাকে দর্শন করে আমার জীবন ধন্য হল। কথা শেষ করে ফ্রান্সিস আবার মাথা নিচু করে রইল। কিছুক্ষণ। এবার সিনার্কা খুশির হাসি হেসে বলল—ঠিক আছে—তুমি কি বলতে চাও বলো। ফ্রান্সিস মাথা তুলল। আঙ্গুল তুলে রোক্কাকে দেখিয়ে বলল—মহামান্য রাজা—এই লোকটা প্রবঞ্চক—ঠগবাজ। রোক্কা চম্‌কে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি আর কামেরাতেরও এক অবস্থা। রোক্কা কোন কথা বলল না। ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা—এই লোকটা আমাদের কয়েদ ঘর থেকে পালাবার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের রাজকুমারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবে বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজকুমারীর মূল্যবান গয়নার বাকশো চুরি করেছে। তারপর আমাদের ঐ বাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল।

রোক্কা ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে থেকে ম্লান হাসল—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসকে বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে বলে উঠল—চুপ করে থাকো। এমন একজন মহান রাজার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে মৃত্যুই তাদের একমাত্র শাস্তি। কথাটা শেষ করে ফ্রান্সিস আবার মাথা নিচু করল। সিনার্কা একজন সামন্তরাজা মাত্র। তাকে একেবারে কর্সিকা দ্বীপের মহামান্য রাজার মত সম্মান দিল ফ্রান্সিস। সিনার্কা খুশিতে আটখানা। সিনার্কা সগর্বে হেসে অমাত্য দলপতি আর সৈন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—ঠিক আছে সে ব্যবস্থা হচ্ছে। এবার তুমি কী চাও বলো। ফ্রান্সিস মাথা নিচু অবস্থাতেই বলল—যদি অভয় দেন তো বলি।

—বলো—বলো। সিনার্কা খুশি হয়ে বলল। ফ্রান্সিস মাথা তুলে বলল—মহামান্য রাজা—এখানকার আপনার প্রজাদের মুখে অতীতের একটা রহস্যময় ঘটনার কথা শুনেছি।

—কোন রহস্যময় ঘটনা? সিনার্কা কপাল কুঁচকে বলল।

—রানী ইসাবেলার রত্নালংকারের পেটিকার কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। সিনার্কা মুখে শব্দ করল।

—শুনেছি এই দুর্গের ওপরের দিকে দুটি কক্ষের কোথাও ইসাবেলার সেই রত্নালংকারের পেটিকা আজও আছে।

—হ্যাঁ—বংশানুক্রমে এটা আমরা শুনে আসছি। সিনার্কা বলল। ফ্রান্সিস আবার একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—

—মহামান্য রাজা আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দেন তবে আমরা সেই রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা করতে পারি।

—পারবে তোমরা উদ্ধার করতে? সিনার্কার কথায় বেশ আগ্রহ ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস আবার একটু মাথা নুইয়ে বলল—মহামান্য রাজা—আপনি তো আমাদের মৃত্যুদণ্ডই দেবেন। মরার আগে একবার শেষ চেষ্টা করবার সুয়োগ দিন। মরে তো যাবোই—রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে গিয়েই না হয় মরলাম।

—হুঁ—ওদুটো ভুতুড়ে ঘর। কয়েকজন লোক ঐ ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে মারা গেছে—তা জানো। সিনার্কা বলল।

—বললামই তো—মরে যেতে পারি জেনেই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ দেখো চেষ্টা করে। সিনার্কা বলল।

—তাহলে মহামান্য রাজা—আপনি সবাইকে আদেশ দিন কেউ যেন আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা না দেয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ—আদেশ দেওয়া হবে। সিনার্কা বলল।

—এবার একটা ঘটনা আপনাদের বলি—বোধহয় আপনারা জানেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—কোন ঘটনা? সিনার্কা বলল।

—ঐ ঘরদুটোর একটা নক্‌শা রানী ইসাবেলা এঁকেছিলেন একটা পার্চমেন্ট কাগজে। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি? সিনার্কা অমাত্যের দিকে তাকাল। দু'জনেই অবাক।

—হয়তো মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে রানী ইসাবেলা ঐ নক্‌শায় সঠিক নিশানা দিয়েছিলেন কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে সেই বহু মূল্যবান রত্নালংকারের পেটিকা। তারপর হয়তো নক্‌শাটা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিলেন।

—সেই নক্‌শা কোথায়? সিনার্কা সাগ্রহে বলে উঠল।

—সব বলছি। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—সেই নকশা অনেক হাত ঘুরে এই বিদ্রোহীদের হাতে এসেছে।

—তুমি কী করে জানলে? অমাত্যটি স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—ঐ বাড়িটায় মানে বিদ্রোহী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় রোক্কা এই কথা বলেছিল। আমরা আড়াল থেকে শুনেছিলাম। বিদ্রোহীদের ঐ আস্তানাতেই কোথায় লুকোনো আছে সেই নক্‌শা। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা ক্রুদ্ধদৃষ্টি রোক্কার দিকে তাকিয়ে বলল—কোথায় লুকিয়ে রেখেছো সেই নক্‌শা?

—সব মিথ্যে কথা—রোক্কা প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল—সব বানানো গপ্‌পো। ফ্রান্সিস একটু নরম গলায় বলল—মহামান্য রাজা—ঐ নকশা পেয়ে কী লাভ! আগে তো ঘর দুটোয় ঢুকতে হবে তারপরে তো নক্‌শা মেলাতে হবে! সিনার্কা এবার সমস্যাটা বুঝতে পারল। সত্যিই তো সেই ঘরদুটোয় ঢোকাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা!

—হুঁ—তা ঠিক। সিনার্কা বলল। তারপর একটু ভেবে বলল—তাহলে ঐ রত্নপেটিকা উদ্ধারের উপায় কী? ফ্রান্সিস বলল—

—প্রথমে মানে আজকেই দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা ঐ বাড়িটায় মানে বিদ্রাহীদের ঐ আস্তানায় যাবো। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে নক্‌শাটা

উদ্ধার করবো।

—পারবে? সিনার্কা একটু সংশয়ের সুরে বলল।

—নিশ্চয়ই পারবো। ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল।

—বেশ—তারপর? সিনার্কা বলল।

—এবার ঐ বন্ধ ঘরদুটোয় ঢোকার উপায় বের করতে হবে। এটাই আসল সমস্যা। ঘরদুটোয় ঢোকার উপায় বের করতে পারলে তখন—রোক্কাকে দেখিয়ে বলল—এই লোকটাকে নকশার রহস্য বুঝিয়ে দিতে বলবো।

—যদি না বলতে চায়? অমাত্যটি বলল।

উৎপীড়ন চালিয়ে কথা বার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল—

—মহামান্য রাজা—নক্‌শার রহস্যের সমাধান একমাত্র এই লোকটাই জানে। কিন্তু সেটা ওর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার আগেই যদি লোকটাকে মেরে ফেলেন তাহলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে—সিনার্কা অমাত্যটিকে বলল—কী করবেন? অমাত্যটি একটু চিন্তা করে বলল—দেখুন—এই ভাইকিং যোদ্ধাটি কি বলে।

—এই বিদ্রোহী লোকটাকে এখন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তারপর কী করতে হবে আমি মহামান্য রাজাকে সময়মত বলবো। ফ্রান্সিস বলল। অমাত্যটি এবার বলল—বেশ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলে সব মাননীয় সিনার্কার হাতে তুলে দিতে হবে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—সিনার্কা দ্রুত বলে উঠল—তোমরা বিদেশী তোমাদের বিশ্বাস কি। কিন্তু এই কথাটা ভালো করে জেনে রাখো রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করা হবে!

—বেশ—ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল। তারপর বলল—এবার তাহলে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

কামেরাতকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সিনার্কা বলল—কিন্তু এই বিদ্রোহীটাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। ফ্রান্সিস আবার মাথা একটু নুইয়ে বলল—এর নাম কামেরাত। ঐ বিদ্রোহীদের আস্তানাটার দেখাশুনো করতো। ও ঐ বাড়িটার সবকিছু চেনে। ওর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।

—হুঁ—একটু ভেবে সিনার্কা বলল—কিন্তু ও যেন পালাতে না পারে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—ওর হাতের দড়ি আরো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। সিনার্কা বলল।

সিনার্কা যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। অমাত্যটি একটু এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটুক্ষণ। তারপর ভারি গলায় বলল—ঐ অভিশপ্ত ঘরদুটোয় ঢুকতে পারবেন? ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—সব দেখে শুনে ভাবনা চিন্তা করে তবেই বলতে পারবো ঢোকা সম্ভব কি না।

—জানো—রানী ইসাবেলার প্রেতাত্মা একটা মোমবাতি হাতে সারারাত ঘরটায় ঘুরে বেড়ায়। আমাদের দুর্গরক্ষী সৈন্যরা আমাকে বলেছে ঐ ঘরদুটোয় নাকি পা

ঘষে ঘষে চলার অস্পষ্ট শব্দ শুনেছে। কাঠের দরজাটায় নাকি টোকা দেবার শব্দও শুনেছে। ঐ ঘরের কাছের ঘরগুলোয় যোদ্ধারা রাতে থাকতে সাহস পায় না। সেই ঘরগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অমাত্যটি থামল। তারপর বলল—এত সব জানার পরও তুমি ঐ ঘরদুটোয় ঢুকতে যাবে? সে সাহস আছে তোমার? ফ্রান্সিস সহজভাবে বলল—আপনারা তো আমাকে আর আমার বন্ধুকে ফাঁসিই দেবেন। ফাঁসিতে মরার আগে না হয় প্রেতাত্মার হাতেই মরবো। অমাত্যটি ফ্রান্সিসের আরো কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—তুমি যদি ঐ ঘরে ঢোকার চেষ্টা না কর তবে তোমাদের মুক্তির জন্যে সিনার্কাকে আমি রাজি করাবো। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—ঠিক আছে—আপনার এই করুণার কথাটা ভেবে দেখি। পরে যা বলার বলবো।

অমাত্যটি আর কিছু বলল না। সিনার্কার পেছনে পেছনে চলল। একটু পরে ঠং-ঠাং শব্দে কয়েদঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণের কথাবার্তায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার ঘাসের বিছানাটায় বসল। তারপর হ্যারির পাশে শুয়ে পড়ল। হ্যারি এতক্ষণ মাথা নিচু করে নির্বাক বসেছিল। যে রোক্কার জন্যে মারিয়াকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল সেই রোক্কাকে ফ্রান্সিস 'লোকটা' 'লোকটা' বলে শুধু অপমান করল না ডাহা মিথ্যে কথা বলে সিনার্কার মত একটা অত্যাচারী শাসককে নির্লজ্জের মত তোষণ করল। ফ্রান্সিসের এই অধঃপতন দেখে দুঃখে হতাশায় হ্যারির বুক ভেঙে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি ডাকটা শুনেও অনড় বসে রইল। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাতেও ঘৃণাবোধ করল।

হঠাৎ রোক্কা হো হো করে হেসে উঠল। বলল—ভাইকিংরা—বীর, দুঃসাহসী—সৎ—বিবেকবান। পরক্ষণেই শায়িত ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণাময় মুখ চোখ কুঁচকে থুতু ফেলল—থুঃ—থুঃ—।

অপমানে হ্যারির চোখ কান জ্বালা করে উঠল। দুচোখ জলে ভিজে উঠল। কিন্তু ও কাঁদতেও পারল না। ও চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

শুনল ফ্রান্সিস খুব মৃদুস্বরে ডাকল—হ্যারি—হ্যারির আর সহ্য হল না। ও মুখ তুলে চিৎকার করে বলে উঠল—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার—আমার ঘৃণা—হ্যারি আর বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আবাল্য বন্ধু ফ্রান্সিস নিজের জাত ভাইয়ের চেয়েও যে ফ্রান্সিসকে বেশি ভালোবাসে স্বপ্নেও ভাবে নি সেই ফ্রান্সিসকে এত বড় কঠিন কথা ও বলতে পারবে। হ্যারি হাঁপাতে লাগল। রোক্কা যেভাবে ফ্রান্সিসকে অপমান করল হ্যারি কখনও ফ্রান্সিসকে এরকম অপমানিত হতে দেখেনি। হঠাৎ রোক্কা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে একলাফে শায়িত ফ্রান্সিসের কাছে এল তারপর ডান পা চালাল ফ্রান্সিসের পেঠের ধারে। 'ওঁক' করে ফ্রান্সিসের মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়ে এল। লাথি খেয়ে বিছানার ওপর দুপাক ঘুরে গেল। রোক্কা চিৎকার করে বলে উঠল—অকৃতজ্ঞ —জানোয়ার। দু পা ছুটে এসে আবার পা তুলল। ফ্রান্সিস তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাঁধা দুটো হাতের মুঠি দিয়ে রোক্কার থুতনিতে এত জোরে ঘা মারল যে রোক্কা চিৎ হয়ে ছিট্‌কে পড়ল। ঘাসের

বিছানার বাইরে। পাথুরে দেয়ালে মাথাটা ঠুকে গেল। আঁ—। একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ তুলে রোক্কা অনড় পড়ে রইল। মশালের আলোয় হ্যারি দেখল—রোক্কার কপালের কাটা জায়গাটা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একে তরোয়ালের ঘায়ে রোক্কার শরীর ক্ষতবিক্ষত। তার ওপর এই মার খাওয়া। রোক্কা গোঙাতে লাগল। ক্রুদ্ধ কামেরাত এবার উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—খবরদার—চুপ করে বসে থাকো। কামেরাত কথাটার অর্থ বুঝল না। কিন্তু ফ্রান্সিসের ধমক খেয়ে ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই ঘট্ ঘটাং শব্দ তুলে লোহার দরজা খুলে গেল। রক্ষীরা কয়েকজন খাবার দাবার নিয়ে ঢুকল। রোক্কার অন্য তিন বিদ্রোহী বন্ধু কী ঘটল তা দেখল কেন রোক্কা এত ক্রুদ্ধ হল বুঝল না।

রোক্কা বাদে সবাই খেতে বসল। কামেরাত কোনরকমে রোক্কাকে উঠিয়ে বসাল। রোক্কার সামনেও খাবার দেওয়া হল। গোল কাটা রুটি। বেশ পোড়া। সঙ্গে আলু আনাজের ঝোল। একজন রক্ষী সকলের হাতের দড়ি খুলে দিল। সবাই খেতে লাগল।

ফ্রান্সিস এই সময় যা বরাবর বলে তাই বলল—হ্যারি—পেট পুরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। হ্যারির মনে পড়ে গেল অতীতের কত বন্দী জীবনের কথা। ও একটু আশ্চর্য হয়েই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। এত কাণ্ডের মধ্যেও হ্যারি দেখল—ফ্রান্সিস নির্বিকার।

সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে একজন রক্ষী ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে বলল—তোমরা দুজন মুক্ত। ফ্রান্সিস কথাটা বুঝল না। তবে দেখল রক্ষীটি অন্য সবাইয়ের দু হাত বেঁধে দিল। কিন্তু ফ্রান্সিস আর হ্যারির খোলা হাত আর বাঁধল না। এবার ফ্রান্সিস বুঝল—সিনার্কা কথা রেখেছে। ওদের মুক্তি দিয়েছে। অবশ্যই নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে—রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার যদি এরা উদ্ধার করে দিতে পারে—এই আশায়। রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারলে সিনার্কার লাভ। উদ্ধার করতে গিয়ে বিদেশিটা মরে গেলেও সিনার্কার কোন ক্ষতি নেই। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে একটু ভেবে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ডাকল—হ্যারি। হ্যারি উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—চলো যে বাড়িতে অসুস্থ মারিয়া রয়েছে সেখানে যেতে হবে।

হ্যারি রাগতস্বরে বলে উঠল—এবার তাহ'লে রাজকুমারীকে বন্দী করার কথা ভাবছো।

ফ্রান্সিস আগের মতই শান্তগলায় বলল—কথা বাড়িও না। সময় কম—চলো।

—না—আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল। ওরা দু'জন নিজেদের দেশের ভাষায় কথা বলছিল। রোক্কা আর অন্য বন্দীরা ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবে এটুকু বুঝল যে ফ্রান্সিস হ্যারিকে কোথাও যেতে বলছে—হ্যারি সেখানে যেতে চাইছে না।

ফ্রান্সিস এবার একটু দ্রুত রক্ষীটির কাছে গেল। তারপর রক্ষীটির কোমরে

ঝোলানো খাপ থেকে এক টানে তরোয়ালটা বের করল। রক্ষীটি চম্‌কে উঠে বাধা দিতে গেল। ফ্রান্সিস বাঁ হাত তুলে ওকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস স্থির তাকিয়ে আছে। হ্যারি অসহায় বোধ করল। ফ্রান্সিস ওর বুকে তরোয়াল ঠেকিয়ে হুকুম করবে হ্যারি এটা কোনদিন কল্পনাও করেনি। ও বুঝল-এখন প্রতিবাদ বৃথা। ফ্রান্সিসের মাথার ঠিক নেই এখন।

হ্যারি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—কামেরাতকে বলো আমাদের সঙ্গে যেতে। হ্যারি আর কী করে। কামেরাতকে বলল সেকথা। কামেরাত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল—না আমি যাবো না। দ্রুত সরে এসে ফ্রান্সিস কামরাতের বুকেও তরোয়াল ঠেকাল। হ্যারিকে বলল—কামেরাতকে বলে দাও—আমাদের সঙ্গে যেতে না চাইলে ওর ভালো হবে না। হ্যারি কামেরাতকে বলল সে কথা। কামেরাত বেশ ভীত চোখে ফ্রান্সিসের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা দরজার দিকে চলল। সামনে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস পেছনে হ্যারি আর কামেরাত। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ফ্রান্সিস একজন রক্ষীকে ইঙ্গিতে কামেরাতের হাতের দড়ি শক্ত করে বেঁধে দিতে বলল। রক্ষীটি একটা দড়ি নিয়ে এল। শক্ত করে কামেরাতের হাত বেঁধে দিল।

দুর্গের পাথুরে চত্বর পার হল ওরা। সদর দেউড়ির দ্বাররক্ষীরাও ওদের বাধা দিল না।

ওরা বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পূবমুখে হাঁটতে শুরু করল। বিনা প্রতিবাদে হ্যারি আর কামেরাত পেছনে পেছনে চলল। তখনই চারজন সৈন্য কোমরে তরোয়াল নিয়ে ওদের পিছু পিছু চলল। পথে দোকান পাঠ খোলা। ব্যস্ত, লোকজনের চলাফেরা। ফ্রান্সিস কোনদিকে তাকাল না। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোকজন দেখল ওদের। ওরা একটু আশ্চর্যই হল—তরোয়াল হাতে বিদেশী ফ্রান্সিসকে আর মাথা নিচু করে চলা হ্যারিকে দেখে আশেপাশের লোকজনের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হল। এই বিদেশীদের সৈন্যরা পাহারা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে একবার ওপরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিল। বেলা আন্দাজ করল। দুপুর এখনও। চারদিকে ঝক্‌ঝকে রোদ।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস হঠাৎ হাঁটার গতি কমিয়ে হ্যারির গা ঘেঁষে চলল। নিজেদের দেশীয় ভাষায় মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি—অনেক কাজ সামনে। আমি যা বলি তাই করো—সেভাবেই চলো। বিরোধিতা ক'রো না। পেছনের একজন সৈন্যের নজরে পড়ল ফ্রান্সিস। সৈন্যটি বুঝল—ওরা কোন গোপন কথা বলছে। দায়িত্ব দেবার সময় দলপতি বারবার বলে দিয়েছে এই বিদেশীরা ভীষণ চালাক। সৈন্যটি এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ওরা একটু দূরে সরে হাঁটতে লাগল। হ্যারি তখন ভাবছে ফ্রান্সিসের এসব কথার মানে কি? তবে কি ফ্রান্সিসের এইসব বিশ্রী ব্যবহার লোক দেখানো? হ্যারি ভীষণ ধন্দে পড়ে গেল।

সেই বাড়িটির সামনে এল সবাই। একজন লম্বামত সৈন্য আধভাঙা দরজায়

ধাক্কা দিল। দু'বার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল সিনার্কার একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা গেল মারিয়াকে পাহারা দেবার জন্যেই তাকে এখানে রাখা হয়েছে। বাঁদিকের শেষ ঘরটায় অসুস্থ মারিয়া আছে। ঢোকার আগে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—হ্যারি সৈন্যদের বলো যে এখন আমি তোমাকে আর কামেরাতকে নিয়ে রানী ইসাবেলার নক্‌শা খুঁজে বের করতে সারা বাড়ি তল্লাশী চালাবো। আরো বলো—সিনার্কা এ ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। বলেছেন এ সময় আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেউ বাধা দেবে না। হ্যারি একটু চুপ ক'রে থেকে লো ল্যাতিন ভাষায় সৈন্যদের কথাগুলো বলল। সৈন্যরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফ্রান্সিস বলল—ওদের বলো যে মারিয়ার ঘরের পাহারাদার সৈন্যকে ঐ ঘরেই থাকতে হবে। বাকিরা এখানে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের পাহারা দেবে। হ্যারি সে কথা সৈন্যদের বলল। সৈন্যরা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর কামেরাতকে নিয়ে চলল। মারিয়ার পাহারাদার সৈন্যটি মারিয়ার ঘরের দিকে চলে গেল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকে বলল—কামেরাতকে নিয়ে ডানদিকের বারান্দা দিয়ে চলো। তাড়াতাড়ি। হ্যারি বুঝল—ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কিছু পরিকল্পনা নিয়েছে। ও কামেরাতের হাত ধ'রে বলল—শিগগির ডান দিকের বারান্দা দিয়ে চলো। তিনজনে প্রায় ছুটে চলল। শেষ ঘরটার দরজা ঠেলে ফ্রান্সিস ঢুকে পড়ল। পেছনে হ্যারি আর কামেরাত।

ঘরটা একটু অন্ধকার অন্ধকার। ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকেই কামেরাতকে বলল—তুমি স্পেনীয় ভাষা বোঝ?

কামেরাত স্পেনীয় ভাষাতেই বলল—বুঝি—বলতে—ভালো —পারি না।

ফ্রান্সিস বলল—শিগগির আমাকে একটা কাগজ কালি কলম এনে দাও।

কামেরাত বলল—কেন?

ফ্রান্সিস একটু রেগেই বলল—প্রশ্ন করো না। যা বলছি করো।

ফ্রান্সিসের ওপর কামেরাতের রাগ তখনও পড়ে নি। মাথা নেড়ে বলল—পারবো না।

—ফ্রান্সিস দাঁত চেপে বলল—কামেরাত—সময় বেশি নেই। একটা নক্‌শা আঁকতে হবে। শিগগির।

কামেরাত আবার মাথা নাড়ল।

এবার হ্যারি বলল—কামেরাত তুমি জানো না—অমাত্যের পরামর্শমত আজ রাতেই তোমাদের জাহাজে রোক্কাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। কামেরাত অমাত্যের কথা শোনে নি। ও অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারি বলল—তাড়াতাড়ি কাগজ আনো।

ফ্রান্সিস বলল—কামেরাত-এর ওপর আমাদের তোমার রোক্কার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। তাড়াতাড়ি—সময় কম। কামেরাত এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারল। ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটা বড় পার্চমেন্ট কাগজ নিয়ে এল।

হল্‌দেটে পুরোনো কাগজ। রূপোর দোয়াত আর পাখির পালক কেটে তৈরি কলম।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা নিয়ে মেঝেয় পাতলো। আলো কম। তবু কালিতে কলম ডুবিয়ে দ্রুতহাতে একটা নক্‌শামত আঁকলো। নক্‌শাটা দেখতে এরকম—
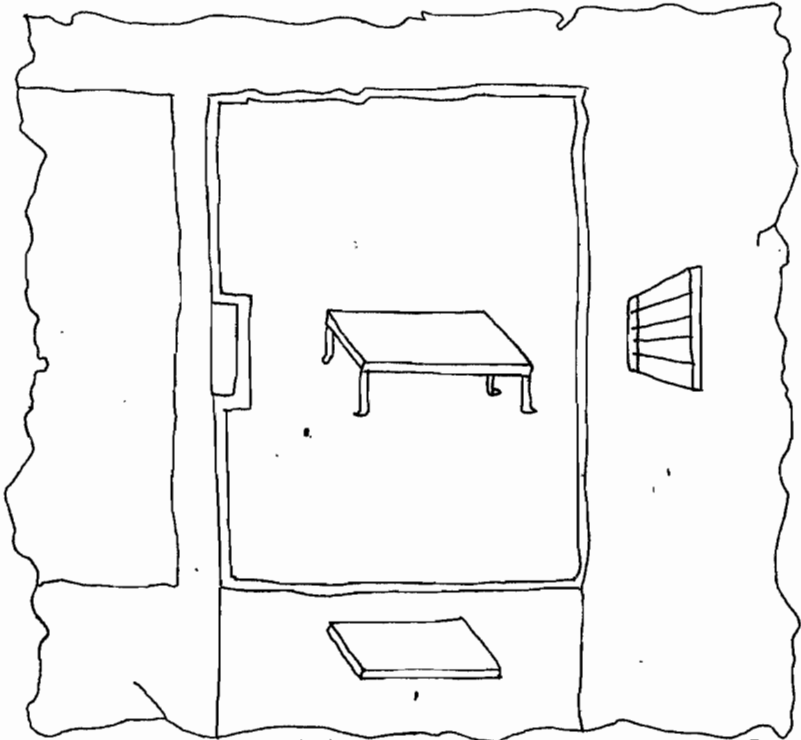
আঁকা শেষ করে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। কামেরাতকে বলল—খুব মন দিয়ে শোন। আমি মারিয়া মানে ঐ কোনার ঘরে যাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাকে আমি নিয়ে আসছি। এর মধ্যে তুমি ঐ রোগীর আর রোক্কার চিকিৎসার জন্য ওষুধগুলো একত্র করে একটা মোটা কাপড়ে পোঁটলামত বেঁধে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। যে করে হোক একটা শস্যটানা গাড়ি জোগাড় করো। এখানে সবাইকে তুমি চেন—তুমি সহজেই এটা পারবে। গাড়ি নিয়ে কোন শব্দ না ক'রে পেছনের জংলা জায়গাটায় নিয়ে এসো। এখান থেকে মারিয়াকে নিয়ে আমি পেছনের দরজার কাছে থাকবো। তুমি মারিয়াকে গাড়িতে তুলে নেবে। ওষুধগুলো বের করে মোটা কাপড়টা দিয়ে মারিয়াকে ঢেকে দেবে যাতে কেউ ওর মুখ দেখতে না পায়। তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজঘাটায় চলে যাবে। মারিয়া আমাদের জাহাজ চিনিয়ে দেবে। সেই জাহাজে মারিয়াকে নিয়ে উঠবে। ঐ জাহাজেই থাকবে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। কথাটা একটানা শেষ করে ফ্রান্সিস একটু থেমে হাঁপানো গলায় বলল—সব কথা বুঝলে। কামেরাত মাথা দুলিয়ে এতক্ষণে হেসে বলল—বুঝেছি। ফ্রান্সিসের হাতে তখনও তরোয়ালটা

ছিল। ও তরোয়ালের ফলা ঘষে ঘষে কামেরাতের হাতে বাঁধা দড়িটা কেটে দিল। কামেরাত সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস এবার খোলা তরোয়ালটা পিঠের দিকে পোশাকের নিচে ঢুকিয়ে তরোয়ালটা এক হ্যাঁচ্‌কা টানে তুলে আনল। পিঠ লম্বালম্বি কেটে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা চোখের সামনে ধরল। দেখা গেল তরোয়ালের ফলার গায়ে রক্ত লেগে রয়েছে।

হ্যারি শিউড়ে উঠে বলল—এ কী করলে?

ফ্রান্সিস বলল—আস্তে। মারিয়ার ঘরে যাবো। এখন খুব জোরে লো ল্যাতিন ভাষায় চেঁচিয়ে কাতর আর্তনাদ করে বলো—মরে গেলাম—মরে গেলাম। তাড়াতাড়ি। হ্যারি আর দেরি করলো না। শেখানো মত আর্ত চিৎকার করে বলে উঠল—উঃ—আঁ—আঁ মরে গেলাম—মরে গেলাম।

ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—চলো মারিয়ার ঘরে। ঐ ঘরের পাহারাদারকে বলবে—কামেরাতকে আমি মেরে ফেলেছি। কারণ কামেরাত কিছুতেই বলতে চাইছিল না—নক্‌শাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। চলো।

দু'জনে ছুটে এসে মারিয়ার ঘরে ঢুকল। মারিয়া বিছানায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ঢুকতে দেখে দুর্বল শরীরেও আনন্দে উত্তেজনায় উঠে বসল। হেসে দু'হাত তুলে বলল—ফ্রান্সিস।

কিন্তু এ কোন ফ্রান্সিস? হাতে তরোয়াল। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। মারিয়ার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। ও চিৎকার করে উঠতে গেল। দুর্বল শরীরে গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। পাহারাদার ফ্রান্সিসের হাতে তরোয়াল দেখে নিজেও কোমরে গোঁজা তরোয়ালের বাঁটে হাত রাখল। হ্যারি ছুটে এসে ওকে বলল—লড়াই নয়। সেই বিদ্রোহী লোকটা কিছুতেই বলছিল না রাণী ইসাবেলার নক্‌শাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই সিনার্কার হুকুমে লোকটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। পাহারাদার হ্যারির আর্ত চিৎকার শুনেছিল। তাই সন্দেহ করল না।

মারিয়া হ্যারির কথা বুঝল না। ও ফ্যাল ফ্যাল করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল। পাহারাদার হতবাক দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস ওদের দেশীয় ভাষায় বলল—হ্যারি—মারিয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। সত্য না বললে ওকেও মেরে ফেলা হবে। কথাটা শেষ করে ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজল। তারপর—এক লাফে মারিয়ার বিছানার কাছে এল। তারপর মারিয়া কিছু বোঝার আগেই মারিয়ার মাথার চুলের মুঠি ধ'রে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে মারিয়াকে মেঝের নামিয়ে আনল। চুল ধ'রে টেনে নিয়ে চলল। যন্ত্রণায় মারিয়া চোখে অন্ধকার দেখল। ওর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। দুর্বল শরীর। মারিয়া কাঁদতে লাগল। পাহারাদার সৈন্যটি বাধা দিতে গেল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে ওকে থামাল। বলল—এই মেয়ে লোকটা জানে রাণী ইসাবেলার নক্‌শা কোথায় গোপনে রাখা হয়েছে। যদি তার হদিশ না বলে তবে—সিনার্কা হুকুম দিয়েছেন—একেও মেরে ফেলা হবে। পাহারাদার সৈন্যটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বাধা দেবার চেষ্টা করল না।

বাইরের বারান্দায় পাহারাদার সৈন্যটির চোখের বাইরে আসতেই ফ্রান্সিস মারিয়ার চুলের মুঠি-ছেড়ে দিল। তারপর মারিয়াকে পাঁজা কোলা ক'রে তুলতে গেল। মারিয়া

দুর্বল শরীরে দু'হাত ছুঁড়ে যতটা সম্ভব ফ্রান্সিসকে বাধা দিতে লাগল—আর কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল—মারিয়া বাধা দিও না।—বাধা দিও না—মারিয়া—শান্ত হও। কিন্তু মারিয়া সে কথায় কান দিল না। ফ্রান্সিস আবার বলল—মারিয়া আমি সেই আগের ফ্রান্সিসই আছি—যা বলছি শোন। মারিয়া ভাঙা গলায় বলে উঠল—তুমি শয়তান—খুনী। ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়াকে এখন কিছু বলে লাভ নেই। ও আবার মারিয়ার চুলের মুঠি ধরল। মারিয়া আর্ত চিৎকার ক'রে উঠল—মা—মা—। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে জোরে চাপড় মারল। দুর্বল মারিয়া মুখে ওঁক্ ক'রে শব্দ তুলে অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেল। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। ও তাড়াতাড়ি মারিয়াকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পেছনের দরজার দিকে ছুটল।

ভেজানো দরজা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে খুলল। দেখল জংলামত জায়গাটার কিছুটা আড়ালে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জংলামত জায়গাটায় কামেরাত গুঁড়ি মেরে বসে ছিল। ফ্রান্সিসদের দেখেই ও ছুটে এল। দুহাত বাড়িয়ে মারিয়ার প্রায় অচেতন শরীরটা পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে গাড়িটার দিকে ছুটল। আস্তে আস্তে মারিয়াকে গাড়িতে শুইয়ে দিল। গাড়িতে উঠল না। ঘোড়াটার মুখের কাছে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল। গাড়ি চলার শব্দ কম হল। গাড়িটা কিছুদূর যেতেই ফ্রান্সিস ফিরে এল। ছুটে শেষের ঘরটায় ঢুকল। মেঝে থেকে নকশাটা তুলে নিল। কোমরে এটা গুঁজে রাখল। ঘরের বাইরে এসে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। তখনই দেখল তরোয়ালে কাটা ফ্রান্সিসের পিঠের দিকটার পোশাকের কাপড় রক্তে ভিজে গেছে। হ্যারি কিছু বলল না। এর মধ্যেই ফ্রান্সিস নক্‌শার কাগজটা মেঝের ধূলোয় ঘযে নিল যাতে সিনার্কা দেখে বুঝতে পারবে নক্‌শাটা পুরোনো।

দুজনে বাইরে এল। সদর দরজায় দাড়ানো সৈন্যরা কামেরাত আর মারিয়ার আর্ত চিৎকার অস্পষ্ট শুনেছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে।

হ্যারি তখন ফ্রান্সিসের হাত থেকে নক্‌শাটা নিয়ে উঁচু করে ধ'রে চেঁচিয়ে বলল—রাণী ইসাবেলার এই নক্‌শাটা উদ্ধার করা হয়েছে। শিগগির মহামান্য সিনার্কাকে সংবাদ পাঠাও। সৈন্যরা ভেতরের ব্যাপার কিছুই বুঝল না। ওরা শুনেছে এই বিদেশীরা নক্‌শা খুঁজে বের করতে এখানে আসবে। নক্‌শাটা তাহলে খুঁজে পেয়েছে ওরা। ওদিকে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের রুদ্রমূর্তি দেখে ওরা বেশ ঘাবড়েও গেল। কোন কথা না বলে ওরা দাঁড়িয়ে রইলো। হ্যারি বলল—একজন ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে মহামান্য সিনার্কাকে সংবাদটা পৌঁছে দাও। একজন ঘোড়ার খোঁজে চলে গেল। হ্যারি বলল—এবার চলো—দুর্গে যাবো আমরা।

সৈন্যদল হাঁটতে শুরু করল। তখনই মারিয়ার ঘরের পাহারাদার সৈন্যটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। অন্য সৈন্যদের কাছে জানতে চাইল কী ব্যাপার? অন্য সৈন্যরা ওকে হ্যারির কথাটাই বুঝিয়ে বলতে বলতে চলল। পেছনে তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—সাবাস্ ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসও চাপা

গলায় বলল—চুপ—এখনও অনেক বাকি। এবার হ্যারি বলল—তরোয়ালটা কোমরে গোঁজ।

ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে গুঁজে রাখল।

সারা রাস্তা দুঁজনে আর কোন কথা বলল না পাছে সৈন্যদের মনে কোনো সন্দেহ জাগে। ফ্রান্সিসের চিন্তা পরের কাজ। হ্যারির চিন্তা-ফ্রান্সিস সফল হবে তো? ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। মধ্য-আকাশ থেকে সূর্য পশ্চিম মুখো হয়েছে। ফ্রান্সিস ভুরু কুঁচকে সময়ের হিসেব করল।

ওদিকে কামেরাত শস্যটানা গাড়িতে মারিয়াকে শুইয়ে নিয়ে চলেছে। মারিয়ার শরীর ঢেকে দিয়ে ছিল একটা ফুল তোলা মোটা কাপড়ে। সেই কাপড়ে মারিয়ার মুখও ঢাকা। মারিয়া আচ্ছন্নের মত শুয়েছিল।

একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ির ঝাঁকুনি কম নয়। সেই ঝাঁকুনিতে মারিয়ার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। উঠে বসতে গেল। পারল না। একে তো অসুস্থ। তার ওপর ফ্রান্সিস ওর চুলের মুঠি ধরে যেভাবে টানাটানি করেছে তাতে মারিয়া আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। গাড়িটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। একপাশে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। মারিয়া কিছুই বুঝতে পারল না। ও গাড়িতে শুয়ে আছে কেন? কার গাড়ি? চালাচ্ছেই বা কে? আর যাচ্ছেই বা কোথায়?

দুর্বলস্বরে মারিয়া বলল—আমি এখানে কেন? কিন্তু চাকার ঘট্ ঘট্ শব্দে সে কথা গাড়িচালক কামেরাতের কানে গেল না।

হঠাৎই গাড়িটা থামল। চালকের আসন থেকে কামেরাত নেমে এল। পেছনে এসে দেখল—মারিয়া মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কামেরাত হেসে বলল—এখন শরীর কেমন লাগছে? ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষা মারিয়া বুঝল। বলল—অনেকটা ভালো। একবার ভাবল মারিয়া ফ্রান্সিসের কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ফ্রান্সিস যে দুর্ব্যবহার ওর সঙ্গে করেছে তাতে ফ্রান্সিসের সন্ধান করতে ওর মন চাইল না। মারিয়ার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু বলল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—আপনাদের জাহাজে। কামেরাত বলল।

—হ্যারিরা এখনও বন্দী? মারিয়া জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। কামেরাত বলল। তারপর বলল—মুখটা কাপড়ে ঢেকে শুয়ে থাকুন। সিনার্কার গুপ্তচররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার মুখ দেখলেই ওরা সন্দেহ করবে এই বিদেশী মহিলা এখানে কেন? যাচ্ছেই বা কোথায়?

মারিয়া মুখের ওপর কাপড়টা টেনে মুখ ঢাকল। ঠিক তখনই দু'জন সৈন্য গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ-ঢাকা মারিয়াকে দেখে সন্দেহ হল। কামেরাতকে জিজ্ঞেস করল—এই মহিলা কে? মুখ ঢাকা কেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো একে? কামেরাত বলল—ইনি আমার স্ত্রী। বাচ্চা হবে তাই শরীর খারাপ। নিয়ে যাচ্ছি দাইমার কাছে।—হুঁ—সাবধানে নিয়ে যাও। একজন সৈন্য বলল। সৈন্য দু'জন চলে গেল।

কামেরাত আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

এবার মারিয়া পাশ ফিরে শুতে গেল। ঢাকা কাপড়ে টান লেগে কাপড়টা কিছুটা সরে গেল। মারিয়ার গাউনটার পায়ের কাছে কিছু অংশ বেরিয়ে এল। গাড়িটা তখন সেই দুর্গের কাছাকাছি এসেছে। এসময় সিনার্কার গুপ্তচরের নজরে পড়ল গাড়িটা। গুপ্তচরটির সন্দেহ হতেই। ও ছুটে গাড়ির কাছে এল। বলল—গাড়ি থামাও। কামেরাত গাড়ি চালাতে চালাতেই বলল—কেন গাড়ি থামাবো কেন? গুপ্তচরটি ততক্ষণে মারিয়ার পায়ের কাছে গাউনের অংশটা দেখে ফেলেছে। ওর মনে সন্দেহ বাড়ল—এরকম সুতোর লেসের কাজ করা গাউনতো এখানকার মেয়েরা পরে না। গুপ্তচরটি আবার বলল—গাড়ি থামাও। কামেরাত কানেও নিল না কথাটা। যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল চালাতে লাগল। গুপ্তচরটি চিৎকার করে দুর্গের সামনে দাঁড়ানো সৈন্যদের ডাকল—সৈন্যরা এখানে এসো। দু'তিনজন সৈন্য ছুটে এল। গুপ্তচরটি বলল—গাড়ি থামাও এবার। কামেরাত দেখল আর উপায় নেই ধরা পড়তেই হল। মারিয়াও কী হচ্ছে দেখার জন্যে মুখ থেকে কাপড় সরিয়েছে। গুপ্তচরটি বলে উঠল—এই বিদেশিনী আর তার দলের লোকেরা সব বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। দুটোকেই কয়েদঘরে ঢোকাও। কামেরাত গাড়ি থামাল। সৈন্যরা ওকে নেমে আসতে বলল। কামেরাত নেমে এল। সৈন্যরা মারিয়াকে উঠে বসতে বলল। মারিয়া বুঝল না। কামেরাত স্পেনীয় ভাষায় বলল—রাজকুমারী আমরা ধরা পড়েছি। ওরা আমাদের কয়েদ ঘরে বন্দী করে রাখবে। শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে গেলাম।

মারিয়া গাড়িটায় উঠে বসল। সৈন্যরাই ধরে ধরে রাজকুমারীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল। কামেরাত ওষুধের পোঁটলাটা নামিয়ে নিল। দুর্গের সদর দেউড়ির দিকে যেতে যেতে কামেরাত সৈন্যদের বলল—উনি ভাইকিং দেশের রাজকুমারী—ভীষণ অসুস্থ। অন্য কোন ঘরে ওঁকে রাখুন। আমারও চিকিৎসা করতে সুবিধে হবে। দেউরিতে দলপতি ছিল। সৈন্যরা গিয়ে তাকে কথাটা বলল। দলপতি ঘাড় নেড়ে বলল—না—সিনার্কার অনুমতি না নিয়ে কিছু করা যাবে না।

অগত্যা সেই কয়েদ ঘরেই মারিয়া আর কামেরাতকে ঢোকানো হল। ঢটাং ঢং করে কয়েদ ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এটুকু হেঁটে এসেই মারিয়া হাঁপিয়ে পড়ল। খড় বাঁধা বিছানায় শুয়ে পড়ল। কামেরাত পাশে বসল। পুঁটুলি খুলে একটা ওষুধ বের করে মারিয়াকে খেতে দিল। ওষুধ খেয়ে মারিয়া অসাড় হয়ে শুয়ে রইল। মারিয়া এতক্ষণ বুঝল—কী দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। কামেরাতকে বলল ও সে কথা। কামেরাত বলল—ভয়ের কিছু নেই রাজকুমারী। কয়েকটা দিন ওষুধ খেলেই আপনি আবার শরীরে জোর পাবেন। এই দুর্বলতা কেটে যাবে। একটু থেমে বলল—সমস্যা হল আপনি এই বন্দী জীবন কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন।

—মানিয়ে নিতেই হবে। মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। বার বার মারিয়ার মনে হতে লাগলো—ফ্রান্সিস আর আগের মত নেই। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ও একেবারে অসহায়।

প্রায় অন্ধকার কয়েদ ঘরটায় এই দিনের বেলাও মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় চারদিকে তাকাতে তাকাতে কামেরাত দেখল রোক্কাও শুয়ে আছে। হাতদু'টো বাঁধা।

কামেরাত তাড়াতাড়ি রোক্কার কাছে উঠে গেল। রোক্কা কামেরাতকে দেখে ম্লান হাসল। বলল—তুমিও ধরা পড়েছো?

—শুধু আমি নই—ফ্রান্সিসদের দেশের রাজকুমারীকে এ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কামেরাত বলল। কথাটা শুনে রোক্কা একটু আশ্চর্য হল। ফ্রান্সিসতো সিনার্কাকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছে। অথচ তাদের দেশের রাজকুমারীকে বন্দী করা হল। রোক্কা এসব কিছু বলল না। শুধু বলল—কামেরাত—তোমার কাছে কিছু ওষুধ টষুধ আছে।

—সব আছে। আমার পুঁটুলিতে। সিনার্কার সৈন্যরা পুঁটুলির ভেতরের ওষুধটষুধ দেখে ছেড়ে দিয়েছে। আমি এক্ষুনি ওষুধ আনছি। কামেরাত বলল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এসে পুঁটুলি খুলে প্রয়োজনীয় ওষুধ বের করল। মারিয়াকে বলল রাজকুমারী রোক্কাকেও এই কয়েদ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মারিয়া শুনে আশ্চর্য হল। বলল—রোক্কা বন্দী। তাহলে তো তোমাদের বিদ্রোহের নেতা কে হবে।

—সে সব ঠিক হবে। রোক্কাকে তার বিদ্রোহী বন্ধুরা ঠিক মুক্ত করে নিয়ে যাবে। কামেরাত বলল।

রোক্কার কাছে এল কামেরাত। তারপর কাটা জায়গাগুলোয় মলম লাগিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোক্কা অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

দুর্গের সদর দেউড়ির সামনে পৌঁছল ওরা। দেখল-এখানে ওখানে সৈন্যরা জটলা করছে। ওদের দেখে সবাই ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মানে রানী ইসাবেলার নক্‌শাটা ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছে এই খবর সবাই জেনে গেছে।

দেউরির দরজার কাছে দলপতি দাঁড়িয়েছিল। দলপতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। হেসে বলল—মহামান্য সিনার্কা রানী ইসাবেলার নক্‌শাটা দেখতে চেয়েছেন।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সেটা। ফ্রান্সিস-কোমরে গোঁজা নক্‌শাটা বের করে হ্যারিকে দিয়ে বলল—মহামান্য সিনার্কা যেন দেখেই ফিরিয়ে দেন। আমাদের এখনই কাজে নামতে হবে। দলপতির হাতে নক্‌শাটা দিয়ে হ্যারি বলল সে কথা। দলপতি দু'একবার নক্‌শাটার এপিঠ ওপিঠ দেখল। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝল না। নক্‌শাটা একজন সৈন্যের হাতে দিয়ে সিনার্কার কাছে পাঠিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি বন্ধ সদর দেউড়ির কাছে এল। সৈন্যরা সরে গিয়ে ওদের যাবার জায়গা করে দিল। ঘর্ ঘর্ শব্দে দরজার একটা পাল্লা খুলে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাথুরে চত্বরটায় এল।

দলপতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হাসতে হাসতে বলল—জানেন নক্‌শা পেয়ে মহামান্য সিনার্কা আনন্দে সিংহাসনে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। হ্যারি বলল—তা তো হবেই। প্রায় একশো বছর আগে রানী ইসাবেলার নিজের হাতে আঁকা নক্‌শা পেয়েছেন। খুশী তো হবেনই। তবে নক্‌শা পেলেই তো আর গুপ্ত রত্নভাণ্ডার পাওয়া যাবে না। ঐ ঘর দু'টোয় আগে তো ঢুকতে হবে। নক্‌শা

মেলাতে হবে। তবে তো।

—তা ঠিক। দলপতি ওর বড় মাথাটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এপাশ ওপাশ দোলাল।

দলপতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের নিয়ে দুর্গের পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে ওদের নিয়ে এল। বলল—এই ঘরে আমি একা থাকি। এখন থেকে আপনারাও থাকবেন। মহামান্য সিনার্কা হুকুম দিয়েছেন আপনাদের আদর যত্নে যেন কোন অবহেলা না হয়। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—হ্যারি-রাণী ইসাবেলার রত্নালংকারের ভাণ্ডার। সিনার্কা এখন আমাদের জন্য কতকিছু করবে।

ঘরটায় দেখা গেল পরিচ্ছন্ন দড়িবাঁধা মোটা ঘাসের বিছানা। ওপরে পরিষ্কার মোটা নক্‌শাদার কাপড় পাতা।

—আপনারা বিশ্রাম করুন। যথাসময়ে খাবার দেওয়া হবে। হেসে এই কথা বলে দলপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথার পেছনে দু'হাত পেতে চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। অনেক চিন্তা মাথায়—মারিয়াকে নিয়ে কামেরাত জাহাজে উঠতে পারলো কিনা। সত্যিই রত্নালংকারের ভাণ্ডার আছে কিনা—নাকি সবটাই লোকমুখে প্রচলিত গল্প। এবার ভাবনা—কী করে রত্নভাণ্ডার পাওয়া যাবে। কী করে সবাইকে নিরাপদে জাহাজে ফিরতে পারবে।

গরাদ বসানো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফ্রান্সিস্ সময় অনুমান করল। আর দেরি নয়। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি বসে থেকো না। শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপরেই তোমাকে যেতে হবে। বার্গ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের আস্তানায়। গিয়ে বন্ধুদের বলবে তারা যেন সদর রাস্তা নয়—ঝোপ-জঙ্গল পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে এসে জাহাজে চলে যায়। শুধু বিস্কো জাহাজে উঠবে না। তীর ধনুক নিয়ে আলোকস্তম্ভের আড়ালে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। শুধু শাঙ্কোকে তুমি এখানে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে দলপতি এসে ঘরে ঢুকল। 'নক্‌শার কাগজটা কোমরের ফেট্টি থেকে বের করে হেসে ফ্রান্সিসকে ফেরৎ দিল। নক্‌শাটা নিয়ে ফ্রান্সিস এমনভাবে নক্‌শাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন খুব মূল্যবান কিছু দেখছে। তখনই একবার হ্যারিকে বলল—দলপতির কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নাও। এতটা পথ তুমি হাঁটাহাঁটি করলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এখন ক্লান্ত হওয়া চলবে না। অনেক কাজ সামনে।

হ্যারি দলপতিকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বলল।—সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সঙ্গে যদি চান সৈন্যও দিতে পারি। দলপতি বলল।—না—না—আমি একাই যাবো। হ্যারি বলল।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। তারপর সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

দুর্গের বাইরে হ্যারির জন্যে একটা তেজিয়ান ঘোড়া আনা হল। হ্যারি ঘোড়ায় চড়ে প্রথমে জাহাজঘাটার দিকে গেল। যাতে সেনাপতির মনে কোন সন্দেহ না হয়। তারপর সদর রাস্তা এড়িয়ে ঝোপজঙ্গল আর পাথুরে মাটির মধ্য দিয়ে বার্গ

পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটাল। ছোট ছোট ঝোপঝাড় পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ঘোড়া অনায়াসে জোর কদমে ছুটল।

ঘোড়ায় চড়ে হ্যারি যখন বার্গ পাহাড়ের কাছে এল তখন সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে অনেকটা নেমে এসেছে। ফ্রান্সিস তাড়া দিয়েছে। কাজেই সময় নষ্ট করা চলবে না।

বার্গ পাহাড়ের সেই গুহাটার কাছে আসতেই কয়েকজন বিদ্রোহী খোলা তরোয়াল হাতে হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল একজন ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। হ্যারি হেসে বলল—আমি রোক্কার লোক। ভয়ের কোন কারণ নেই। বিদ্রোহীদের মধ্যে দু'জন হ্যারিকে চিনল। ওরা জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? হ্যারি বলল—বন্ধুদের কাছে এসেছি। —বেশ যান। একজন বিদ্রোহী বলল।

ঘোড়া থেকে নেমে হ্যারি প্রায় অন্ধকার গুহাটায় ঢুকল। বেশ বড় গুহাটা টানা চলে গেছে। বিদ্রোহীরা কেউ শুয়ে আছে কেউ বসে আছে। জ্বলন্ত মশালের আলোয় হ্যারিকে দেখে বন্ধুরা ছুটে এল। হ্যারি বলল—আমাদের এখানে আর থাকা চলবে না। ফ্রান্সিসের নির্দেশ—তোমরা সবাই বার্গ পাহাড় থেকে বেরিয়ে নির্জন ঝোপঝাড় পাথুরে জায়গা দিয়ে জাহাজঘাটায় চলে যাবে। কেউ যেন তোমাদের দেখতে না পায়। শুধু শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে আমি আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দুর্গে গিয়ে পৌঁছবো।

—ফ্রান্সিস কোথায়? রাজকুমারী কোথায়? বিস্কো জিজ্ঞেস করল।

—রাজকুমারী এতক্ষণে বোধহয় জাহাজে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু আমাকে আর ফ্রান্সিসকে সিনার্কা বন্দী করেছে। তবে রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের লোভ দেখিয়ে সিনার্কাকে কব্জা করেছে ফ্রান্সিস। রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের জন্যে সিনার্কা আমাদের দুজনকে বন্দী করেও মুক্তি দিয়েছে। এখন ফ্রান্সিস পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে।

বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে হ্যারিকে বলল—রোক্কার সংবাদ জানেন?

—না—হ্যারি মাথা দুলিয়ে বলল—তবে রোক্কাকে শেষ দেখেছি বৈদ্যিমশাইএর বাড়িতে। মনে হয় রোক্কা ভালোই আছেন। হ্যারি আগেই ভেবে রেখেছিল—রোক্কার আবার বন্দী হওয়ার কথাটা বিদ্রোহী সঙ্গীদের বলা চলবে না। তাহলে বিদ্রোহী বন্ধুরা রোক্কাকে মুক্ত করার জন্য সেই দুর্গে যাবে। লড়াই হবে। রক্ত ঝরবে। কারণ সারিনের যুদ্ধে জয়লাভ করে এখন বিদ্রোহীদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। তাই হ্যারি এক্ষুণি কোন লড়াইতে জড়িয়ে যেতে চাইছেনা। একবার লড়াই শুরু হলে রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের কাজ অনেক পিছিয়ে যাবে। তাই হ্যারি রোক্কার বন্দী হওয়ার সংবাদটা জানালো না।

ভাইকিং বন্ধুরা সব তৈরী হয়ে গুহার বাইরে এল। হ্যারি রোক্কার এক বিদ্রোহী সঙ্গীকে অনুরোধ করল যাতে সে গোপনে বন্ধুদের জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিতে পারে। সঙ্গীটি ভাইকিংদের নিয়ে চলল।

হ্যারি আর শাঙ্কো ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া ছোটাল সেই দুর্গের দিকে।

দুর্গের চত্বরে তখন বেনিফেসিওর অধিবাসীরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে প্রায় একশো বছর পরে এক সাহসী ভাইকিং রানী ইসাবেলার আঁকা একটা নক্‌শা পেয়েছে। সিনার্কা অনুমতি দিয়েছেন। তাই আজ সেই দুঃসাহসী ভাইকিং নক্‌শা নিয়ে রানী ইসাবেলার ঘরে ঢুকবে। রানীর রত্নপেটিকা উদ্ধার করবে। লোকের ভীড় বেড়েই চলল।

হ্যারি আর শাঙ্কো যখন ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের সামনে এল সৈন্যেরা লোকজন সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ওদের দুর্গের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করল। ওরা দুর্গ চত্বরে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসকে দেখল সিনার্কার সঙ্গে কথা বলছে। সিনার্কা আর দু'জন অমাত্য সিনার্কার রাজকীয় গাড়িতে বসে আছে। কালো ওক কাঠের গাড়ি। তাতে রুপোলি লতাপাতা ফুল বসানো। সিনার্কা হাসছে। খুব খুশি।

হ্যারি আর শাঙ্কোকে দেখে ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। হ্যারিরা ঘোড়া থেকে নামল। ফ্রান্সিস বলল—আর সময় নষ্ট নয়। চলো। ফ্রান্সিসের পেছনে দেখা গেল দশ পনেরোজন সৈন্য। তবে তাদের হাতে অস্ত্র নেই। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—তুমি ওদের লো ল্যাতিন ভাষায় বুঝিয়ে বলো যে আমি আগে দুর্গের ছাতে উঠে যেমন ইঙ্গিত করবো সেইভাবে যেন ওরা কাজ করে। হ্যারি সেই সৈন্যদের কথাটা বুঝিয়ে বলল। সৈন্যরা মাথা নেড়ে জানাল যে ওরা বুঝেছে। সৈন্যদের দুর্গের জানালার নিচে অপেক্ষা করার জন্যে ফ্রান্সিস ইঙ্গিত করল।

এবার ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে দুর্গের পেছনে এল।

ওরা দুর্গের পেছনের খাদটায় এল। দেখল শাঙ্কোর বাঁধা লম্বা কাছিটা তেমনি বাঁধা আছে। পড়ে থাকা দড়িটার একটা মুখ শাঙ্কো কোমরে বেঁধে নিল। কাছি বেয়ে বেয়ে তিনজনেই গাছের ডালপালা ধরে দুর্গের পেছনের স্তূপকার খসে পড়া পাথরে স্তূপের ওপর উঠে এল। পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে বাঁধা কাছিটার মুখটা ফ্রান্সিস কোমরে বেঁধে নিল। তিনজনে এবার খুব সাবধানে ভাঙা পাথরের ওপর পা রেখে রেখে চলল দুর্গের মাথার দিকে। দু'জায়গায় পাথর নড়ে গিয়ে ফ্রানসিস আর শাঙ্কো প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। পড়লে গড়িয়ে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়তো। প্রাণে বেঁচে গেলেও হাত পা ভাঙতোই। কোনরকমে ভারসাম্য রাখল। আস্তে আস্তে তিনজন দুর্গের মাথায় উঠে এল। ফ্রান্সিস পশ্চিমদিকে তাকাল। দেখল পশ্চিমে সমুদ্রের মাথায় লাল আর কমলা রঙের খেলা চলেছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল ভীরে ভীড়াক্কার। সারা বোনিফেসের লোকেরাই যেন হাজির হয়েছে। হ্যারি আর শাঙ্কোও এসে নিচের ভীড় দেখল। ফ্রান্সিসদের দুর্গের ছাদে দেখে নিচের ভিড়ের মানুষেরা চিৎকার হৈ হৈ শুরু করে দিল। সিনার্কাও গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল ফ্রান্সিসদের দিকে।

এবার ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল দু'তিনটে বড় বড় পাথরের পাটাতন পড়ে আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ঐ পাটাতনগুলোর সঙ্গে দড়ির মুখটা বাঁধতে বলল। তিনজনে মিলে চেপে বাঁধল দড়িটা। দড়িটার অন্য মুখটা ফ্রান্সিস দুর্গের মাথা থেকে ঝুলিয়ে দিল। দড়ির সেই মুখটা দুর্গের পাথুরে দেয়ালের গা দিয়ে ঘেঁসে এল জানালার কাছে। ফ্রান্সিস দড়িটা বার কয়েক টেনে দেখল। বেশ শক্ত

করেই বাঁধা হয়েছে।

ফ্রান্সিস দড়িটা ধরে ঝুলে পড়ল। দুর্গের পাথুরে দেয়ালের গায়ে পা রেখে রেখে নামতে লাগল। দুর্গের পাথুরে গায়ে তখনও রোদ লেগে আছে। সূর্য অস্ত যেতে তখনও দেরি আছে। পাথুরে দেয়ালে পায়ের ভর রেখে রেখে ফ্রান্সিস জানালাটার সামনে এল। কিন্তু জানালার লোহার গরাদ ধরল না। দেয়ালে পা রাখল। কারণ রোক্কা বলেছিল দু'জন লোক জানালার গরাদ ধরে টেনেছিল ঘরে ঢোকার জন্যে। জানালার মাথা থেকে আলগা পাথর খুলে পড়েছিল আর দু'জনই মাথা ফেটে মারা গিয়েছিল। ফ্রান্সিস দুপা দিয়ে দড়ি আকড়ে ধরে কোমরে বাঁধা কাছির মুখটা বের করল। খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে গরাদগুলোর মধ্যে দিয়ে কাছির মুখটা ঢুকিয়ে বেশ শক্ত গেড়ো দিল। তারপর দড়ি বেয়ে বেয়ে দুর্গের মাথায় উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শাঙ্কো কাছির অন্য মুখটা নিচে ফেলে দাও। শাঙ্কো কাছির অন্য মাথাটা টেনে আনল। তারপর দুর্গের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিল। ফ্রান্সিস তখন নিচে দাঁড়ানো সিনার্কার সেই আটদশ জন সৈন্যকে কাছিটা ধরে টানতে বলল। সৈন্যরা বুঝল—ফ্রান্সিস কাছি টেনে জানালার গরাদগুলো ভেঙে ফেলতে বলছে।

সৈন্যরা কাছির মুখটা টেনে ধরল। তারপর মুখে শব্দ করে একসঙ্গে সবাই ভীষণ জোরে টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার মাথা থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো বৃষ্টির মত নিচে ছিটকে পড়ল। ধুলো বালি উড়ল। পাথর পড়তে দেখে নিচের লোকজন ভয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল—রাণী ইসাবেলা কোনোভাবে জানালার মাথার পাথরগুলো আল্‌গা করে রেখেছিলেন যাতে কেউ যেন জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াতে না পারে। যে দু'জন এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল তারা খসে পড়া পাথরে মাথা ফেটে মারা গিয়েছিল।

আবার ফ্রান্সিস কাছি টানার জন্যে সৈন্যদের ইঙ্গিত করল। আবার সৈন্যরা মুখে শব্দ করে একসঙ্গে হ্যাঁচ্‌কা টান দিতে লাগল। বারকয়েক টানতে হঠাৎ শব্দ তুলে গরাদগুলো ভেঙে গেল। ছিট্‌কে নিচে পড়ল। সৈন্যরা দ্রুত সরে গেল। বাঁ পাশের একটা গরাদ ভাঙলো না বাঁধা ছিল না বলে।

এবার জানালা খোলা। ফ্রান্সিস আগের মতই দড়ি বেয়ে বেয়ে জানালার কাছে এসে জানালার নিচের অংশে পা রাখল। দেখল একটু কাত হয়ে অনায়াসে ঘরটায় ঢোকা যাবে। ও শরীর একটু বেঁকিয়ে কাত হয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় ঢুকল।

নিচে থেকে সিনার্কা অমাত্যরা সৈন্যরা ভীড় করা বোনিফোসিওর লোকেরা সাগ্রহে তাকিয়ে রইল ঐ ভাঙা জানালাটার দিকে।

চারদিক নিস্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই ভিড়ে জটলায়। শুধু সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস ভাঙা জানালাটা দিয়ে মুখ বাড়াল। নিচের ভীড়ে চিৎকার হৈ হল্লা শুরু হল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে ঝুলন্ত দড়িটা ধরল। তারপর বেরিয়ে এল জানালাটা দিয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসের হাতে কিছুই নেই। বোনিফেসিওর লোকেরা হতাশ হল। ওরা আশা করেছিল প্রায় একশো বছর যাবৎ প্রচলিত লোকগল্পে

শোনা রাণী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার ঐ দুঃসাহসী বিদেশীটা উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু ওর হাতে কোথায় সেই রত্নভাণ্ডারের পেটিকা। ছাত থেকে হ্যারি আর শাঙ্কোও দেখল—ফ্রান্সিস খালি হাতে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে। ওদের মনে তখন একটাই চিন্তা—তাহ'লে ফ্রান্সিস কি এবার ব্যর্থ হলো? এই প্রথম হার স্বীকার করল?

দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিস আগের মত দুর্গের ছাতে উঠে গেল। হ্যারি আর শাঙ্কো রত্নভাণ্ডারের ব্যাপারে ফ্রান্সিসকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। ওরা জানে ফ্রান্সিস ঠিক সময়মত সব বলবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—তোমরা এখানে থাকো। আমি সিনার্কার সঙ্গে একটা কাজের কথা সেরে আসি।

ফ্রান্সিস আবার ছাতের ভাঙা অংশের পাথরের পাটতনের ওপর সাবধানে পা রেখে রেখে খাদটার গাছের ডাল ধ'রে ধ'রে নেমে এল।

চলল সিনার্কার কাছে। সিনার্কা তখনও দু'জন অমাত্যকে নিয়ে গাড়িতে বসে আছে। ফ্রান্সিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—মাননীয় সিনার্কা—আমি দু'টো ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা পাইনি।

—কিন্তু তোমার কাছে তো রানী ইসাবেলার আঁকা নক্শাটা রয়েছে। সিনার্কা বলল।

—হ্যাঁ—কিন্তু নক্শাটার রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা কর—দেখো—। সিনার্কা বলল।

ফ্রান্সিস এবার মাথা ঝুঁকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সিনার্কা রাজার মত সম্মান পেয়ে খুব খুশি। বলল—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ মহামান্য—বলছিলাম নক্শাটার রহস্য সমাধান জানে একমাত্র রোক্কা। যদি রোক্কাকে আমি ঐ ঘরে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করা সম্ভব। নইলে আমি একা পারবোনা। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা একটুক্ষণ চিন্তা করল। একদিকে মহামূল্যবান রত্নপেটিকা অন্যদিকে রোক্কার জন্য চিন্তা—যদি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। সিনার্কা বলল—রোক্কাকে সঙ্গে দিতে পারি কিন্তু যদি রোক্কা পালিয়ে যায়?

—আমরা রোক্কাকে পালাতে দেব না। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা ইঙ্গিতে দলনেতাকে ডাকল। দলনেতা খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিনার্কার গাড়ির কাছে এসে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল। সিনার্কা বলল—কয়েদঘর থেকে রোক্কাকে এখানে নিয়ে এস। শুধু রোক্কাকে অন্য কোন বন্দীকে নয়। দলপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই রোক্কাকে নিয়ে দলপতি ফিরে এল। ফ্রান্সিস রোক্কাকে দেখেই বুঝল রোক্কা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কপালে মুখে খোলা হাতে তরোয়ালের কাটাগুলো ফুলে উঠেছে। দু'তিনটে কাটা জায়গায় রক্ত জমে কালচে হয়ে উঠেছে। রোক্কার হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্সিস এবার চিন্তায় পড়ল—রোক্কার সঙ্গে ও যেরকম দুর্ব্যবহার করেছে তাতে রোক্কা বোধহয় ওকে বিশ্বাসই করবে না। কাজেই ওর সঙ্গে যেতেও চাইবে না। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল—অনেক সাবধানে ওকে এগোতে

হবে।

রোক্কা কাছে আসতে ফ্রান্সিস বলল—দেখুন রোক্কা—যে নক্‌শাটা আমি পেয়েছি সেটার সমাধান শুধু আপনিই জানেন। রোক্কা দুর্বল শরীরে যতটা পারে চেঁচিয়ে বলল—নকশাটা একেবারে জাল—মিথ্যে। ইসাবেলা ওরকম কোন নকশাই এঁকে জানালার গরাদ দিয়ে নিচে ফেলে দেন নি। ডাহা মিথ্যে এসব। ফ্রান্সিস বলল—আসলে এটা যে রত্নভাণ্ডার উদ্ধারের নির্দেশ আঁকা নকশা এটাই আপনারা বুঝতে পারেন নি।

—আপনি বুঝেছেন? অকৃতজ্ঞ ভাইকিং? গলায় বেশ জোর দিয়ে রোক্কা বলল।

—হ্যাঁ অনেকটা বুঝেছি। এবার আপনার সাহায্য চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কোনরকম সাহায্য করবো না। রোক্কা চেঁচিয়ে বলল।

সিনার্কা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে দাঁড়িয়ে দলপতিকে বলল—রোক্কাকে গলায় মাথায় তরোয়ালের ঘায়ে আধমরা করে ফেল। তবেই কথা শুনবে। দলপতি তরোয়াল খুলে ছুটে এল। তখনও রোক্কার হাত বাঁধা। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলল—এসবের কোন দরকার নেই। আমি রোক্কাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি রোক্কার কাছ থেকে নকশার নির্দেশ বের করবো। আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমিই ওকে নিকেশ করবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—প্রথমে যে করেই হোক রোক্কাকে নিয়ে ঘরটায় ঢুকতে হবে।

—কিন্তু রোক্কাকে পাহারা দেবার জন্যে দু'জন সশস্ত্র সৈন্য ওর সঙ্গে থাকবে যাতে রোক্কা পালাতে না পারে। সিনার্কা বলল।

—বেশ। এবার তাহ'লে আমাদের যাবার অনুমতি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

রোক্কাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস দুর্গের পেছনের সেই খাদের দিকে চলল। যেতে যেতে পাহারাদার সৈন্যদের স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমরাও কি দুর্গের ছাতে উঠবে? দু'জন পাহারাদার সৈন্য নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল—এরা স্পেনীয় ভাষা জানে না।

এবার ফ্রান্সিস রোক্কাকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—প্রথমেই আমি আপনার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি তার জন্য—কথাটা বলে মাথা একটু নিচু করে বলল—আমি ক্ষমা চাইছি। একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা হিসেবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। রোক্কা বেশ আশ্চর্য হল। ফ্রান্সিস কি তাহলে তখন অভিনয় করেছিল?

রোক্কা বলল—আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেছিলেন কেন?

—সিনার্কার মন পাওয়ার জন্যে। আমার ঐ ব্যবহারে সিনার্কা সন্তুষ্ট হয়েছিল। আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিল। তাই আজকে আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে দিল। ফ্রান্সিস বলল।

—রানী ইসাবেলার নক্‌শা কী আমি তাই জানি না। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস বলল—নক্‌শাটা পুরো ধাপ্পাবাজি। নক্‌শাটা আমিই দ্রুত হাতে এঁকেছি। তারপর ধূলোবালি মেখে ময়লা করেছি যাতে সিনার্কা মনে করে নক্‌শাটা অনেক পুরোনো।

—তাহলে আমি কী করবো? রোক্কা বলল।

—আমি যখন যা বলবো আপনি তাই করবেন। ফ্রান্সিস বলল।

রোক্কা মৃদু হেসে বলল—আপনি যে সিনার্কার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে চলেছেন সেই সিনার্কা আপনাদের রাজকুমারী আর কামেরাতকে কয়েদ ঘরে বন্দী করে রেখেছে। ফ্রান্সিস চমকে উঠে বলল—সে কি। এসব কথা তো সিনার্কা বা দলপতি কেউ আমাকে বলে নি।

—বললে আপনি যদি আর রত্নভাণ্ডারের খোঁজে না যান। তাই এ খবর আপনার কাছে গোপন করে রাখা হয়েছে। রোক্কা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। রোক্কার পাহারাদার দুই সৈন্য ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে ছুটে চলল সিনার্কার গাড়ির দিকে। সিনার্কা অমাত্যরা তখন রত্নভাণ্ডারের চিন্তায় মগ্ন। সবার মনেই সংশয়—এই বিদেশীটা কি রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবে?

তখনই ফ্রান্সিস সিনার্কার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল—মহামান্য রাজা—আপনি এটা কী করলেন?

—কেন? কী হয়েছে? সিনার্কা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল।

—আপনি রাজকুমারী আর কামেরাতকে কয়েদ ঘরে বন্দী করে রেখেছেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সিনার্কা বলল। ঠিক আছে রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলেই ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

—না মহামান্য রাজা এতে আমার উদ্যম নষ্ট হয়ে যাবে। আমার বিনীত অনুরোধ রাজকুমারী আর কামেরাতকে আমার এই প্রচেষ্টা দেখতে দিন। পাহারাদার কয়েকজন ওদের পাহারা দিক। তারপর রত্নভাণ্ডার পেলে ওদের মুক্তি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—আর না পেলে? সিনার্কা বলল।

—তখন আবার আমাদের বন্দী করে রাখবেন। ফ্রান্সিস বলল। সিনার্কা একটু ভেবে নিয়ে পাশে বসা অমাত্যদের সব বলল। কী কথাবার্তা হল তাদের মধ্যে ফ্রান্সিস বুঝল না। সিনার্কা এবার বলল—দলপতিকে পাঠাচ্ছি রাজকুমারী আর কামেরাতকে নিয়ে আসতে। কিন্তু সঙ্গে প্রহরী থাকবে চারজন।

—বেশ তাহলে ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন মহামান্য রাজা। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিস বার বার সিনার্কাকে মহামান্য রাজা বলাতে সিনার্কা খুশিতে আটখানা। সিনার্কা দলপতিকে ডেকে হুকুম দিল।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মারিয়ার হাত ধরে ধরে কামেরাত এল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়ার চোখমুখের সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসের মন দুঃখার্ত হল। কিন্তু ও মন শক্ত করল। সকলের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ফ্রান্সিসের পরিকল্পনার ওপর। এখন কারো কোন কষ্টের কথা ভাবতে গেলে চলবে না। সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল মাথা নিচু করল। ফ্রান্সিস বুঝল—মারিয়ার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে ও বাধ্য হয়েছে তাতে মারিয়াকে এখন সামলানো মুস্কিল হবে। তাই ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—মারিয়া আমাকে ক্ষমা কর। মারিয়া অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল—আমি এখন যা বলছি

সেইভাবে কাজ করো। লক্ষ্মীটি এখন রাগ করে থাকার সময় নয়। আমি কামেরাতকে নির্দেশ দিতাম কিন্তু সেটা দিতে গেলে আমাকে স্পেনীয় ভাষায় দিতে হবে। সিনার্কা বা অমাত্যরা সব বুঝে নেবে। আমাদের বিপদই বাড়বে তাতে। তাই তোমাকে আমাদের মাতৃভাষায় বলছি যা কেউ বুঝবে না। ফ্রান্সিস থামল। লক্ষ্য করল মারিয়া যেন একটু শান্ত হল। ফ্রান্সিস স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। বলল—আমি যখন রোক্কাকে নিয়ে ঐ ভূতুড়ে ঘরটায় ঢুকবো তখন সবাই ঐ দিকেই তাকিয়ে থাকবে। তোমাদের পাহারাদাররাও অন্যমনস্ক হবে। ঠিক তখনই ভীড়ের মধ্যে তুমি আর কামারেত একসঙ্গে মিশে মিশে থাকবে। যখন আমরা ঘরটায় ঢুকবো তখন পাহারাদাররা অন্যমনস্ক হবেই। ঠিক তখনই তোমরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পালাবে। কামেরাতকে নিয়ে জাহাজঘাটায় পালিয়ে যাবে। দু'জনেই আমাদের জাহাজে উঠবে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমরা কাজ সেরে ঠিক জাহাজে ফিরবো। এই নিয়ে একেবারে দুশ্চিন্তা করবে না। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। সাবধানে থাকবে। ব্যস্ আর কিছু বলার নেই। শুধু শেষ অনুরোধ আমার ওপর বিশ্বাস রেখো।

ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করে মারিয়ার দিকে তাকাল। দেখল—মারিয়ার চোখেমুখে খুশির আভা। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। ওরা এত কথা চারপাশের লোকেরা পাহারাদাররা সিনার্কা আর অমাত্যরা কিছুই বুঝল না।

ফ্রান্সিস রোক্কার কাছে এল। বলল চলুন। মারিয়া মৃদুস্বরে ফ্রান্সিসের সব কথা কামেরাতকে বুঝিয়ে বলল।

খাদটার কাছে এল দুজনে। ফ্রান্সিস পাহারাদার দু'জন সৈন্যের মুখের দিকে তাকাল। বুঝল—ওরা স্পেনীয় ভাষায় কথাবার্তা কিছুই বোঝে নি। ফ্রান্সিস একজন পাহারাদার সৈন্যের কোমরের খাপ থেকে এক ঝট্কা তরোয়ালটা খুলে নিল। অন্য সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল বের করল। ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলে ওকে শান্ত করল। তরোয়ালটা দিয়ে রোক্কার হাতবাঁধা দড়িটা কেটে ফেলল। তরোয়াল ফিরিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস বলল—রোক্কা—আপনাকে একটু কষ্ট করে দড়ি বেয়ে কিছুটা উঠতে হবে। পারবেন তো?

—হ্যাঁ পারবো—রোক্কা বলল—এখন আমি শরীরে মনে অনেক জোর পাচ্ছি।

দু'জনে খাদ থেকে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। অসুস্থ শরীর নিয়েও রোক্কা দমল না। দড়ি ধরে উঠতে গিয়ে দাঁত চেপে কষ্ট, কাটা জায়গার জ্বালা সহ্য করল। দড়ির ঘষ্টায় গালে কাটা জায়গাগুলো থেকে রক্ত পড়তে লাগল।

পাথরের ভাঙা পাটার ওপর দিয়ে সন্তর্পনে হেঁটে হেঁটে চলল দুজনে। প্রথমে ফ্রান্সিস। পেছনে রোক্কা। ওদের দেখাদেখি পাহারাদার দুজনও উঠতে লাগল। পাহারাদার দুজন বুঝল—রোক্কাকে নজরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাহলে সুযোগ পেয়ে রোক্কা নিশ্চয়ই পালাবে।

সবাই দুর্গের ছাদে উঠে এল।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশের লাল কমলা রঙের আলো মিলিয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। অন্ধকার বাড়বে। এখন মশাল চাই। নইলে

কিছুই দেখা যাবে না।—ফ্রান্সিস আর রোক্কা দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন।
হ্যারি এগিয়ে এসে বলল—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো মশাল জ্বালিয়ে আনতে গেছে।
ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে হাসল—শাঙ্কো আসল কাজটাই করতে গেছে।
ওরা ছাদের ওপর বসে রইল শাঙ্কোর অপেক্ষায়।
কিছুক্ষণের মধ্যে শাঙ্কো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ওদের কাছে এল।

এবার ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে দুর্গের ছাদের ধারে এল। দেখল নিচের ভীড় যেন আরো বেড়েছে। অনেক মশাল বেড়েছে। ফ্রান্সিস রোক্কাকে ডাকল। বলল—আসুন—আমরা দড়ি বেয়ে জানালাটার কাছে যাবো। তারপর ঘরটায় ঢুকবো।

—কিন্তু ঘরটার জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদ রয়েছে যে। রোক্কা বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সব ভেঙে উপড়ে ফেলা হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন—ঘরে ঢুকতে কোন অসুবিধে নেই।

এবার বাঁ হাতে মশাল ধরে ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। আস্তে আস্তে নামতে লাগল। একটু পরে রোক্কাও দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। দুজনে দড়ি ধরে ধরে নামতে লাগল। নিচে গাড়িতে বসা সিনার্কা গভীর মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের হাতের মশাড়লের দিকে তাকিয়ে রইল। সমুদ্রের হাওয়ায় মশালের আগুন কাঁপছে। সেই কাঁপা কাঁপা আলো পড়ছে ফ্রান্সিসের মুখে। অন্ধকারে শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস ডান হাত দিয়ে দড়ি ধরে ধরে আস্তে আস্তে নামছে তখন। নিচে দাঁড়ানো ভিড়ের লোকেরা ফ্রান্সিসের এই দুঃসাহসিক কাজের জন্যে মনে মনে প্রশংসা করতে লাগলো আর মশাল উঁচু করে নেড়ে নেড়ে ফ্রান্সিসকে উৎসাহ দিতে লাগল। ওরা ভেবে পেল না দিনের বেলা ঐ ভুতুড়ে ঘরে ঢুকতে লোকে সাহস পায় না। আর এই রাতের অন্ধকারে মাত্র একটা মশাল নিয়ে বিদেশিটা ঘরটায় ঢুকতে যাচ্ছে। বুকের পাটা আছে বলতে হবে।

বাঁ হাতে মশাল ধরে ফ্রান্সিস এবার জানালার পাথুরে জায়গাটায় বাঁ পাটা রাখল। তারপর আগে মশালটা ঘরের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর জানালা দিয়ে ঢুকল। রোক্কাও তখন জানালাটায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিস রোক্কাকে ধরে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ভীড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার হৈ হল্লা করে ফ্রান্সিসদের উৎসাহ দিতে লাগল। কামারেত বুঝল—এই সুযোগ। ওদের পাহারাদাররাও উত্তেজনায় চ্যাচাচ্ছে। ওদের দিকে নজরই নেই। কামেরাত মারিয়াকে আস্তে আস্তে বলল—এই সুযোগ—পালাতে হবে। বলেই কামেরাত ভীড়ে মিশে গেল। মারিয়াও ওকে অনুসরণ করল। ভীড় ছাড়িয়ে দুর্গের দেউড়ি পার হয়ে দুজনে দুর্গের বাইরে এল। কেউই ওদের লক্ষ্য করল না। সবাই তাকিয়ে আছে দুর্গের জানালাটার দিকে। দুঃসাহসী বিদেশীটা রানীর ইসাবেলার রত্নপেটিকা উদ্ধার করতে পারবে কিনা। বিদেশীটার সঙ্গে রোক্কাও যোগ দিয়েছে। দেখা যাক।

রাস্তায় নেমে মারিয়া বলল—ইস্—ফ্রান্সিস রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করল এটা আর দেখা হল না। কামেরাত বলল—উপায় নেই রাজকুমারী। এখন সবাই ঐ জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। এখনই পালানো সহজ। এবার যতটা সম্ভব দ্রুত চলুন জাহাজঘাটার দিকে। অপনাদের জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। ফ্রান্সিস তো

তাই বলেছেন।

—হ্যাঁ—মারিয়া বলল। শরীরের দুর্বলতা সত্ত্বেও মারিয়া যতটা দ্রুত সম্ভব হাঁটতে লাগল। পথ জনহীন। সবাই বোধহয় দুর্গের চত্বরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে গিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল।

মশালের আলোয় এখন ঘরটা অনেকটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। বোধহয় মশালের আলো চোখে লাগাতেই একপাল চামচিকে ঝটাঝট্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিস তো ঘরটা আগে দেখেছে। রোক্কা দেখে নি। তাই চারদিকে পাথরের ঘরটা দেখতে লাগল। দেখল—খাটটাও। খুব দামি ওক কাঠের তৈরি খাটটা এখন ধূলোয় ধূলোয় ধূসর। বিছানা শতছিন্ন। দেয়ালে একটা দেরাজমত। তাতে আয়না আটকানো। এখন আয়নার কাঁচ ধূলিমাখা।

দেয়ালের মশাল রাখার আংটায় ফ্রান্সিস মশালটা বসালো। তারপর ধূলিময় মেঝেতে নকশাটা পেতে উবু হয়ে দেখতে লাগল। রোক্কা তখন খাটটার দিকে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—এ ঘরটা আমার দেখা হয়ে গেছে। আপনি পাশের ঘরটায় দেখুন। কথাটা বলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—রোক্কা—আমার জামার পেছনটা ছিঁড়ে ফেলুন তো।

—সে কি। জামা ছিঁড়বেন কেন? রোক্কা বলল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ আয়নাটা পরিষ্কার করতে হবে। দেরাজটাও পরিষ্কার করতে হবে।

রোক্কা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের জামার পেছনদিকটা ধরে দুটো হ্যাঁচকা টান দিতেই জামাটা ছিঁড়ে গেল। আর একটানে ছেঁড়া কাপড়ের অংশটা খুলে এল। ফ্রান্সিসের জামাটা এখন শুধু সামনের দিকে রইল। ফ্রান্সিস ছেঁড়া কাপড়টা নিয়ে দেরাজের দিকে গেল। রোক্কা পাশের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে চিঁ চিঁক্ চিক্ শব্দ তুলে ছুঁচো আর ইঁদুরের ছুটোছুটি শুরু হল। বোঝাই যাচ্ছে এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হত। মশালের যেটুকু আলো এ ঘরটায় এসে পড়েছে তাই দেখে রোক্কার একথা মনে হল।

রোক্কা ফ্রান্সিস যে ঘরে আছে সেই ঘরে ফিরে এল। দেখল—ফ্রান্সিস ওর ছেঁড়া জামার কাপড়টা দিয়ে কী বাঁধছে। রোক্কা বলল—কী বাঁধছেন? ফ্রান্সিস হেসে বলল—রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা।

—সে কি! পেয়েছেন সেটা? কী করে পেলেন? রোক্কা জিজ্ঞেস করল।

—ঐ দেরাজের মধ্যে ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাকে দেখতে দেবেন না? রোক্কা সাগ্রহে বলল।

—এখন নয়—পরে। এখন ছাদে উঠতে হবে। এখানে একটা ভ্যাঁপসা গন্ধে গা গুলোচ্ছে। চলুন আর এখানে থাকার দরকার নেই। ফ্রান্সিস আংটা থেকে মশালটা তুলে নিয়ে বলল—রোক্কা—এবার আপনি মশালটা নিন। আমাকে তো রত্নপেটিকাটা নিতে হবে। আপনার কষ্ট হবে না তো?

—না—না। রোক্কা মশালটা নিয়ে জানালার কাছে গেল। জানালা থেকেই ডান হাতটা বাড়িয়ে ঝোলানো দড়িটা ধরল। তারপর দড়িটায় ঝুলে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে উঠতে লাগল ছাদের দিকে। নিচে তখন বহুলোকের চিৎকার শুরু

হল। কিন্তু চিৎকার থেমে গেল। রোক্কার হাতে তো রত্নপেটিকা নেই।

একটু পরেই জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিস দড়িটায় ঝুলে পড়ল। মশালের আলোয় নিচের সবাই দেখল ফ্রান্সিসের বাঁ হাতে ঝোলামত। তবে তো ওর মধ্যেই রত্নপেটিকা আছে—রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার। নিচের মানুষের হৈ হৈ চিৎকার শুরু হল। তারা হাতে ধরা মশাল ওঠাতে নামাতে লাগল। যতক্ষণ পর্যন্ত না ফ্রান্সিস দুর্গের মাথায় উঠে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার হৈ হল্লা চলল। সিনার্কা আনন্দে গাড়ির ওপরেই প্রায় নেচে উঠতে লাগলেন। প্রায় একশো বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও কেউ ঐ ঘরে ঢুকতেই পারে নি। সেই রানী ইসাবেলার রত্নালংকারের পেটিকা এই বিদেশিটা উদ্ধার করেছে। একটা চিন্তাও হল সিনার্কার। যদি বিদেশিরা রত্নভাণ্ডার নিয়ে পালিয়ে যায়? পারবে না। দুজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারায় রয়েছে। ওরা সাহস পাবে না।

প্রথমে রোক্কা তারপরে ফ্রান্সিস ছাদে উঠে এল। শাঙ্কো হ্যারি ছুটে এল। সৈন্য দুজনও। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—এটাই কি সেই রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা। ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ।

—আমরা একটু দেখব না? শাঙ্কো বলল।

—না—এটা সিনার্কাদের সম্পত্তি—তাদের হাতেই এটা পৌঁছে দিতে হবে। এখন খোলা চলবে না। ফ্রান্সিস এবার হ্যারিকে বলল—হ্যারি সৈন্যদের হাতে রত্নপেটিকা দিয়ে বলো যে এটা যেন ওরা সিনার্কার হাতে পৌঁছে দেয়। হ্যারি লো ল্যাতিন ভাষায় সৈন্যদের নির্দেশটা জানাল। ফ্রান্সিস ওর জামা ছিঁড়ে তৈরি ঝোলাটা একজন সৈন্যের হাতে দিল। সৈন্যটি ঝোলাটা হাতে নিয়ে বলে উঠল—বড্ড ভারি। রোক্কা বলল—কত রত্ন কত অলঙ্কার—ভারি তো হবেই। দুই সৈন্য তখন নেমে আসার জন্যে অন্ধকারের মধ্যে ছুটল পাথরের ভাঙা পাটার ওপরে পা রেখে রেখে। দুজনে হা হা করে হাসছে। সিনার্কাকে এই রত্নপেটিকা দিতে পারলে কত ইনাম পুরস্কার পাওয়া যাবে। ওরা তখন সেই চিন্তায় মগ্ন। খেয়ালই নেই যে রোক্কাকে পাহারা দিতেই ওদের পাঠানো হয়েছে। সৈন্য দুজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—আর একমুহূর্ত দেরি নয়। আমাদের যত শিগগিরি সম্ভব জাহাজাঘাটায় পৌঁছতে হবে। জল্‌দি নামো সবাই।

পাথরের পাটার ওপর দিয়ে ওরা যত দ্রুত সম্ভব ছুটে পার হল। তারপর দড়ি বেয়ে খাদে নেমে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো তুমি নিশ্চয়ই জাহাজঘাটায় পৌঁছবার জন্যে কোন দিক দিয়ে কীভাবে যেতে হবে তা জানো।

—আমার পেছনে পেছনে এসো। বলেই শাঙ্কো কিছু ঝোপঝাড়ের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিসরাও পেছনে পেছনে ছুটল। রোক্কা বলল—সিনার্কা তো রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা পেয়েই গেছে। সিনার্কার আশা মিটেছে। তবে কেন পালিয়ে যাচ্ছেন? ফ্রান্সিস বলল—ঝোলাটা খুলে সিনার্কা পাবে একখণ্ড পাথর। একটাও রত্নালংকার নেই।—সেকি—রোক্কা চম্‌কে উঠে বলল। হ্যারি শাঙ্কোও অবাক হল ফ্রান্সিসের কথা শুনে। ফ্রান্সিস বলল—পরে সব বলবো। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে

উঠে জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে।

ঝোপঝাড় পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সকলে জাহাজ ঘাটার কাছে এল। জাহাজঘাটার আলোকস্তম্ভে আজ আগুন জ্বলছে না। ফ্রান্সিসরা আলোকস্তম্ভের কাছাকাছি আসতেই বিস্কো বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার? আলোকস্তম্ভে আগুন জ্বলছে না কেন? বিস্কো বলল—সিনার্কার সৈন্যদের আগুন জ্বালাতে দিই নি। দুটো সৈন্য ঘায়েল হতেই বাকিরা পালিয়েছে। শাঙ্কোর ধনুক থেকে আমি তীর ছুঁড়েছিলাম। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—শাঙ্কো আমরা যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি। তুমি তীর ধনুক নিয়ে তৈরি হও। ফ্রান্সিসের কথাটা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল মশাল হাতে সিনার্কার একদল সৈন্য জাহাজঘাটার দিকে ছুটে আসছে। সবার আগে গাড়িতে চড়ে আসছে সিনার্কা নিজে। ফ্রান্সিস বুঝল—রত্নপেটিকার বদলে পাথর দেখে সিনার্কা রেগে আগুন হয়ে গেছে। ওর এখন মাথার ঠিক নেই। তাই নিজেই গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিসদের বাধা দিতে আসছে। সিনার্কা ধরেই নিয়েছে আসল রত্নপেটিকা ফ্রান্সিসরাই চুরি করেছে। এখন জাহাজে চড়ে পালাবে। তাই যত সৈন্য হাতের কাছে পেয়েছে তাদের নিয়েই ফ্রান্সিসদের জাহাজ আক্রমণ করতে আসছে।

শাঙ্কো তীর ছুঁড়ে মশাল হাতে সকলের সামনের সৈন্যটিকে ঘায়েল করল। সৈন্যটা মশাল ফেলে দিয়ে হাঁটু চেপে বসে পড়ল। মশালের আগুন লাগল অন্য দুজন সৈন্যের কাপটে মানে পোশাকে। তারা দুজনেই আগুন নেভাবার জন্যে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এতে ছুটে আসা সিনার্কার সৈন্যদের গতি কমে গেল। শাঙ্কো পেছনে তাকিয়ে দেখল ফ্রান্সিসরা সবাই জাহাজে উঠে গেছে। শুধু ফ্রান্সিস তখনও জাহাজে উঠার পাটাতনের কাছে তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো এবার তীর ছুঁড়ল সিনার্কাকে লক্ষ্য করে।

নিখুঁত নিশানা। সিনার্কার কাঁধে গিয়ে লাগল তীরটা। সিনার্কা গাড়ির নরম আসনের ওপর গড়িয়ে পড়ল। সিনার্কার এই অবস্থা দেখে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গেল। কিছু সৈন্য পালিয়ে গেল। কিছু সৈন্য সিনার্কার গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে ছুটে এল। ফ্রান্সিস বলল—হাত লাগাও। দুজনে কাঠের পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠল। দুজনে মিলে জাহাজ থেকে পাতা কাঠের পাটাতনটা তুলে ফেলল। শাঙ্কো ছুটে গিয়ে জাহাজের নোঙরটা ঘর ঘর শব্দে তুলে ফেলল। একদল ভাইকিং চলে গেল জাহাজের পাল খাটাতে। পাশেই ফেলুকা মানে যুদ্ধজাহাজে সিনার্কার কিছু সৈন্য ছিল। তারা কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজঘাটা থেকে জাহাজ বেরিয়ে এসে চলল মাঝ সমুদ্রের দিকে। জোর হাওয়ায় জাহাজের পাল ফুলে উঠল। জোর গতিতে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা অনেক দূর চলে এল।

ডেক-এর রেলিঙে ধরে ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে বোনিফেস বন্দর সিনার্কার যুদ্ধজাহাজ সব চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ মাঝসমুদ্রে চলে এল।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল।

নিচে কেবিনঘরগুলোয় এসে যে ঘরে আহত অসুস্থ রোক্কাকে রাখা হয়েছে সেই কেবিনঘরে ঢুকল। দেখল বৈদ্য কামেরাত রোক্কার পাশে বিছানায় বসে আছে আর মারিয়া রোক্কার কাটা জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস বুঝল—মারিয়ার শরীর অনেকটা সেরেছে। ফ্রান্সিস কামেরাতকে বলল—রোক্কার শরীর কেমন?—অনেকটা ভালো। তবে জ্বরটা এখনও ছাড়ে নি। কালকে নাগাদ জ্বর ছেড়ে গেলে বিপদের কিছু নেই। কিন্তু জ্বর না ছাড়লে চিন্তার কথা। কামেরাত বলল।

—মারিয়া কেমন আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—উনি এখন প্রায় সুস্থ। আর দুদিন ওষুধ পড়লে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। কামেরাত বলল। ফ্রান্সিস ডাকল—মারিয়া। মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। ফ্রান্সিস বুঝল—এখনও মারিয়ার রাগ পড়ে নি। ফ্রান্সিস ডান হাতটা আস্তে আস্তে মারিয়ার কাঁধে রাখল। মারিয়া সেই হাত নিজের হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল—মারিয়া—তোমার সঙ্গে ওরকম দুর্ব্যবহার না করলে তোমাকে নিয়ে কামেরাত পালাতে পারতো না। তুমি যেরকম চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করেছিলে তাতে আমার সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যেত। কাজেই তোমাকে থামাতে হয়েছিল। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—আমাকে ক্ষমা কর। মারিয়া চুপ করে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার বলল—মারিয়া আমার ওপর রাগ করে থেকো না।

এবার রোক্কা বলল—রাজকুমারী—আপনি ফ্রান্সিসের ওপর রাগ করে থাকবেন না। আমার সঙ্গেও ফ্রান্সিস অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিলেন। তখন বুঝিনি। এখন বুঝেছি ফ্রান্সিস ঠিক পরিকল্পনা করে এগিয়ে চলেন। ফ্রান্সিস আমাকে জীবনদান করেছেন। নইলে সিনার্কার ঐ কয়েদখানা থেকে কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারতাম না। আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা অবশ্যই আমাকে মুক্ত করতো কিন্তু একফোঁটা রক্ত খরচ না করে ফ্রান্সিস স্রেফ বুদ্ধির খেলায় সিনার্কাকে হারিয়ে আমাকে মুক্ত করেছে। একটু থেমে বলল—আপনি ফ্রান্সিসকে ক্ষমা করুন। উনি যা করেছেন সে সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক করেছেন।

হ্যারি বলল—রাজকুমারী আমিও ফ্রান্সিসকে ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি ফ্রান্সিস নিখুঁত পরিকল্পনা করে কাজে নেমেছিল। মারিয়া এবার যেন একটু নরম হল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর নিজেদের কেবিন ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। সারাটা দিন যা ধকল গেছে। ফ্রান্সিস ছেঁড়া জামাটা খুলল। তারপর ভীষণ ক্লান্তিতে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি শাঙ্কো সবাই রোক্কার কেবিনঘরে জড়ো হল। রোক্কা এখন অনেকটা সুস্থ। জ্বর ছেড়ে গেছে। কামারেত বলল—রোক্কার আর কোন ভয় নেই। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়ার জন্য রোক্কা যতটা দুর্বল হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই সেই দুর্বলতা কেটে যাবে।

রোক্কা বলল—ফ্রান্সিস—আপনি তো আমাকে পালঙ্কের দিকে যেতেই দিলেন কী ছিল ঐ পালঙ্কে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—সব বলছি।

হ্যারি বলে উঠল—তুমি কি রানী ইসাবেলার রত্নপেটিকা খুঁজে পেয়েছিলে?

ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ। ফ্রান্সিসের কথা শুনে সবাই চম্‌কে উঠল। শাঙ্কো বলল তবে ঐ রত্নপেটিকা নিয়ে এলে না কেন? হ্যারি কিছু বলল না। ওর কেমন মনে হল ফ্রান্সিস এবার ইচ্ছে করে হার স্বীকার করেছে।

—রত্নালংকারগুলো দেখেছিলে? মারিয়া বলল।

—না—ফ্রান্সিস বলল—তবে আমি নিশ্চিত ঐ রত্নপেটিকায় রানী ইসাবেলার সব রত্ন আর অলঙ্কার ছিল।

—ঠিক কী হয়েছিল বলো তো? হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলতে লাগলো—প্রথমবার তো আমি একাই ঘরটায় ঢুকেছিলাম। জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরের মধ্যে মেঝেয় পা রাখলাম। প্রায় একশো বছর পর এই ঘরের মেঝেয় বাইরের মানুষের পা পড়ল। জানালায় চেয়ে দেখলাম বাইরে বিকেলের আলো। সেই আলো জানালা দিয়ে আসছিল। সামান্য আলো। তাতে ঘরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

অন্ধকার অন্ধকার ভাবটা চোখে একটু সয়ে এলে দেখলাম—ঘরের বাঁদিকের পাথুরে দেয়ালে লাল পাথর দিয়ে অনেকগুলো লম্বাটে দাগ। বুঝলাম—রানী ইসাবেলা এইভাবেই দিনের হিসেব রাখতেন। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলাম—পাথরের দেয়ালে একটা কাঠের দেরাজ। একটা মাঝারি আকারের আয়না বসানো। সবকিছুর গায়ে চাপ চাপ ধূলো।

এবার দেখলাম ওদিকের দেয়ালে ঠেলে লাগানো একটা দামি ওক কাঠের পালঙ্ক। পালঙ্কের দুদিকের মাথায় উঁচু করে পেতল দিয়ে তৈরি নানা লতাপাতার নকশা। পালঙ্কের বিছানা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। পালক তুলো বেরিয়ে আছে। ধূলো জমে জমে পালঙ্কের কাঠ বিছানা যেন ঢাকা পড়ে গেছে। পালঙ্কের গায়ে নানা ফুললতাপাতার কাজ। কুঁদে কুঁদে তোলা। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল।

আস্তে আস্তে পালঙ্কটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেঁড়া খোঁড়া বিছানাটার মাঝখানে একটা কাঠের পেটিকা। দামি চেষ্টনাট কাঠের পেটিকাটার গায়ে মীনে করা ফুললতা পাতা। পেটিকাটা ভালো করে দেখতে গিয়ে চম্‌কে উঠলাম। সাদা হাড়ের ধূলিময় দুটো হাত রত্নপেটিকাটা ধরে আছে। এবার ধূলোর মধ্যে দিয়ে আন্দাজ করে বুঝলাম—দুটি কঙ্কাল। একটা বড় একটা ছোট। বুঝলাম—বড়টা রানী ইসাবেলার ছোটটি রানীর মেয়ে রাজকুমারীর। কী গভীর মমতায় দুজনে রত্নপেটিকাটা ধরে আছে। সন্দেহ নেই এই পেটিকাটাই রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার। ফ্রান্সিস থামল। উপস্থিত সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথাগুলো শুনছিল। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—রত্নপেটিকাটা তুলে নেব বলে হাত বাড়ালাম। কিন্তু পারলাম না পেটিকাটা তুলে নিতে। কী অপরিসীম ভালোবাসায় মমতায় মা আর মেয়ে সেই পেটিকাটা ধরে আছে। এখন আর ওরা রানী রাজকুমারী নয়। সাধারণ মানুষ—মা আর মেয়ে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল—এক অদ্ভুত পরিবেশ। কতদিন আগের কথা। সেই সময়টাই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মৃত্যুর সময়ও তারা রত্নপেটিকাটা হাতছাড়া করে নি। কী বলবো? আমার চোখে জল এসে গেল। আমি রত্নপেটিকাটা না নিয়েই জানালার কাছে চলে এলাম। দড়ি ধরে দুর্গের ছাতে

উঠে এলাম।

—তারপরে তো আমাকেও নিয়ে গেলেন। রোক্কা বলল।

—ওটা সিনার্কাকে ধোঁকা দেবার জন্যে জামা ছিঁড়ে সেই কাপড়ের ঝুলি তৈরি করে একটা প্রায় চৌকোনো পাথর ভরে আপনাকে নিয়ে ছাদে উঠে এলাম। সৈন্যদুটিকে ঐ পাথরটাই রত্নপেটিকা এরকম বুঝিয়ে সিনার্কার কাছে পাঠালাম। জানতাম রত্নপেটিকা পাওয়া গেছে এই আনন্দে সৈন্য দুটি রোক্কাকে পাহারা দেবার কথা ভুলে যাবে। হলও তাই। রোক্কাকে মুক্ত করে আমাদের জাহাজে নিয়ে এলাম।

সবাই নির্বাক হয়ে ফ্রান্সিসের বলা ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। একসময় রোক্কা আবেগে ফ্রান্সিসের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। একটু কান্নাভেজা গলায় বলল—ফ্রান্সিস যদিও রত্নভাণ্ডার উদ্ধার হলো না—তবু আমি আপনার মানবতাবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আপনি সত্যিই সাধারণ মানুষ নন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কী যে বলেন। মারিয়া হেসে বলল—রোক্কা ঠিক আমাদের মনের কথাই বলেছেন। ফ্রান্সিস বলল—এখন তো রানী ইসাবেলার রত্নভাণ্ডার আপনাদের হাতের মুঠোয়। সেই রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করে আপনার দেশবাসীদের কল্যাণের কাজে লাগাবেন—এই অনুরোধ। রোক্কা বলল—আগে সিনার্কা আর ওর মোসাহেবের দলকে দক্ষিণ কর্সিকা থেকে তাড়াবো। তারপর রানী ইসাবেলা আর রাজকুমারীকে রাজকীয় সম্মানে কবর দেবার ব্যবস্থা করবো। মা মেয়ে হাত ধরাধরি করে যেভাবে আপনি দেখেছেন একই কবরে তেমনিভাবে তাঁদের শুইয়ে রাখবো। শুধু রত্ন আর রত্নালংকার বিক্রি করবার জন্য নেব। রত্নপেটিকাটি দুজনে যেভাবে শুয়ে ধরে ছিলেন সেভাবে তাঁদের হাতে রাখবো। রত্নালঙ্কার বিক্রির অর্থ দিয়ে দেশ ও দেশবাসীর কল্যানে ব্যয় করবো। আপনাদের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করছি আমি। একটু থেমে রোক্কা বলল—এখন তো সিনার্কার সৈন্যরা আর জাহাজ আক্রমণ করতে আসবে না। নিশ্চিন্তে জাহাজটা ডাঙার কাছাকাছি নিয়ে চলুন। ভোর নাগাদ সারিন বন্দরে পৌঁছে যাবো তাহলে। সারিন আমাদের শক্ত ঘাঁটি। সব বিদ্রোহীদের একত্র করে আমরা বোনিফেস আক্রমন করবো কালকেই।

ভোর নাগাদ ফ্রান্সিসদের জাহাজ সারিন বন্দরে পৌঁছল। খুব বড় বন্দর নয়। রোক্কা আর কানারেত ফ্রান্সিসদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে দুজনে নেমে গেল।

আবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলল। বেগবান বাতাসে ফুলে উঠলো পালগুলো। জাহাজ ঢেউ ভেঙে চলল মাঝসমুদ্রের দিকে।

সমাপ্ত

এই পর্বের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি ঃ—

❊ সোনার ঘণ্টা ❊ হীরের পাহাড় ❊ মুক্তোর সমুদ্র ❊ তুষারে গুপ্তধন ❊ রূপোর নদী ❊ বিষাক্ত উপত্যকা ❊ মনিমাণিক্যের জাহাজ ❊ চিকমার দেবরক্ষী ❊ চুনীপান্নার রাজমুকুট ❊ কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ❊ যোদ্ধামূর্তির রহস্য